প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা
একবিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ—চৈত্র : ১৩৮০
সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বৈশাখ

জ্যৈষ্ঠ

আষাঢ়

শ্রাবণ

ভাদ্র

আশ্বিন

কার্তিক

অগ্রহায়ণ

পৌষ

মাঘ

ফাল্গুন

চৈত্র

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

একবিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

বৈশাখ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচী পত্র

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

মোঘল আমলের তোপ

পঙ্কজকুমার দত্ত

মধ্যযুগে যুদ্ধসামগ্রী হিসাবে বারুদের উপযোগীতা ভারতবাসীদের জানা ছিল কিনা তোপের প্রচলন ভারতে হয়েছিল কিনা যদি হয়ে থাকে তবে কবে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল, বারুদ কিংবা তোপ-বন্দুকের জ্ঞান ভারতবাসীর নিজস্ব আবিষ্কার কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্কের আর শেষ নেই। ইউরোপীয় পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে পল হর্ণ, রামদাস সেন, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, নড়ভী, ইরফান হবিব, রমেশচন্দ্র মজুমদার, বি জি সনদেশা, এল এন গগদেব, অরূপরতন ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেকেই এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন কিন্তু তর্কাতীত সিদ্ধান্তে আসা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি নির্ভরযোগ্য যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণের অভাবে। ভট্টিকাব্য হতে শুরু করে শুক্রনীতিসার সমরাঙ্গ সূত্রধার, নীতিপ্রকাশিকা, বাশিষ্ঠ ধনুর্বেদ সংহিতা, রাজলক্ষ্মীনারায়ণ-হৃদয় প্রভৃতি পুঁথিপত্র থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বিভিন্ন পণ্ডিত প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন বারুদ ও তোপ-বন্দুকের বিষয়ে ভারতীয়দের জ্ঞান নিতান্তই অর্বাচীনকালের নয়। দ্বাদশ শতক থেকে এদের কথা ভারতবাসীর জানা ছিল—আর ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে ব্যাপক না হলেও তোপ-বন্দুকের অল্প-স্বল্প ব্যবহার ভারতে চালু হয়েছিল। বলাই বাহুল্য বিরুদ্ধবাদীরা নিছক 'কেতাবী' প্রমাণ মানতে রাজী নন। তাঁদের চাই 'পাথুরে' প্রমাণ অর্থাৎ আদ্যিকালের দু-একটা তোপ-বন্দুক আস্ত কিংবা ভগ্নাংশ: সন-তারিখ উৎকীর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়—নিতান্তই যদি না মেলে তবে বয়সটি সহজবোধ্য ও সর্বজনস্বীকৃত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু ইতিহাস সচেতন দেশেও এমন প্রমাণ দাখিল করা সহজ নয় আর আমাদের মতন দেশে এমন প্রমাণ হাজির করা রীতিমত কঠিন তো বটেই, প্রায় অসম্ভব। তবে একেবারে কিছুই যে মেলেনি তা বলা চলে না। দাক্ষিণাত্যের গুলবর্গা দুর্গে পেটা-লোহায় তৈরী

ফুট আটাশেক দীর্ঘ তোপটির কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। এটির সঙ্গে ১৩।১৪ শতকের রুমী (ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগরীকে মধ্যযুগে ভারতবাসী 'রুম' নামে এবং রুমবাসী খ্রীষ্টধর্ম নাগরিকদের 'ফিরিঙ্গি' নামে উল্লেখ করত।) তোপের সাদৃশ্য খুবই প্রকট (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। গুলবর্গা দুর্গে তোপটি যে বিশেষ মণ্ডপ বা মঞ্চে (স্থানীয় নাম 'বালা হিসার') সংস্থাপিত আছে সেটির সঙ্গে ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতকের 'রুমী' বা 'মুর' দুর্গের 'Donjon' বা 'Keep' এর গঠনরীতির মিল অতি সাধারণ মানুষের চোখেও সহজেই ধরা পড়ে।

ফিরিস্তা রচিত পুথি থেকে উদ্ধৃত নড়ভী প্রদত্ত কেতাবী প্রমাণটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য (Abu Zafar Nadvi—The use of cannon in Muslim India—Islamic Culture XII, pp 405-18) ফিরিস্তা লিখে গেছেন যে ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাহমণি সুলতান মুহম্মদ শাহের সঙ্গে বিজয়নগরের রাজার যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বিজয়নগর রাজের সঙ্গে ছিল অসংখ্য তোপ। ঐসব তোপের অনেকগুলি বাহমণি সুলতান দখল করে নেন। সম্ভবতঃ অন্য কোন সূত্র থেকেও বাহমণি সুলতান অনতিকালের মধ্যে বেশ কিছু তোপ সংগ্রহ করেছিলেন কারণ উপরোক্ত যুদ্ধের মাস আটেক পরে বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে পুনরায় যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে বাহমণি সুলতানের সঙ্গেও ছিল রীতিমত বড় এক গোলন্দাজ বাহিনী। ঐ বাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন সফদরখান সিস্তানীর পুত্র মুকুররীব খান। তোপ ব্যবহারে তিনি বেশ কুশলতারই পরিচয় দেন। ফিরিস্তার গ্রন্থপাঠে আরও জানা যায় যে মুকুররীব খানের অধীনে বহু সংখ্যক তুর্ক ও রুমী ফিরিঙ্গি সেনা ছিল। দাক্ষিণাত্যে মুসলমান রাজ্যগুলির অধিপতিবৃন্দের মধ্যে বাহমণি সুলতানই প্রথম তোপ ব্যবহার করেন এবং সেই সময় থেকেই যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে তোপ দাক্ষিণাত্যে বিশেষ গুরুত্ব পেতে থাকে। (দাক্ষিণাত্যের দুর্গগুলিতে আগ্নেয়াস্ত্রাদি সংগ্রহের ব্যাপারে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কারণ গোলাকুণ্ডা, বিজাপুর, অহমদনগর রাজ্য যখন মোগল অধিকারে যায় তখন উপরোক্ত রাজ্যসমূহের অধীনস্থ দুর্গসমূহের অস্ত্রাগারের বিপুল সঞ্চয় দেখে বিজয়ী সেনাপতিবৃন্দ অবাক হয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আসীরগড় বিজয়পর্বে আবুল ফজলের উক্তি স্মর্তব্য।) ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে রায়চুরের যুদ্ধে সুলতান আদিলখান বিজয়নগরের স্বনামধন্য নরপতি রাজা কৃষ্ণদেবের নিকট পরাজিত হন। কৃষ্ণদেব রায়পুর দখল করেন এবং নিজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে রায়চুর দুর্গ থেকে প্রায় চারশো ছোটবড় তোপ সঙ্গে নিয়ে যান।

পর্তুগীজদের আগমনের অনেক আগে থেকেই পশ্চিম ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহে বিশেষতঃ গুজরাত অঞ্চলে তোপের প্রচলন হয়েছিল। 'রাসমালা' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে বুলসরের জলদস্যুদের উৎখাত করার জন্য ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাত অধিপতি যে নৌবহর প্রেরণ করেন, সেই বাহিনীতে তোপসজ্জিত রণতরী ও বন্দুকধারী বরকন্দাজ ছিল। (Forlees, A. K. Rasa-mala, Lond 1878, p 282) মিরাত-ই-সিকন্দরী পুথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে দাভলের জলদস্যুদের বিরুদ্ধে মহম্মদ বাঘেরা কর্তৃক যে সেনাদল প্রেরিত হয় সেই দলের সঙ্গে তোপ ও বন্দুকাদিও ছিল। পঞ্চদশ শতকের শেষপাদে অনুলিখিত জৈনধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্রের যে পুথিটি দেওসানপাড়ের জৈন মন্দিরে সংরক্ষিত আছে সেই পুথিটিতে বন্দুকধারী বরকন্দাজদের চিত্রও আছে। (New Documents of Indian Painting—Motichandra & Karl Khendelwal, Trustees of Prince of

Wales Museum)। অপর একটি সূত্র হতে জানা যায় যে আল ফানসো আলবুকার্ক যখন গোয়ায় পর্তুগীজ গভর্ণর ছিলেন তখন বিজাপুর সুলতান গোয়া দখলের অভিপ্রায়ে পুলাদ খানের অধ্যক্ষতায় (অধ্যক্ষতা পরে রাসেল খানের হস্তে ন্যস্ত হয়) এক বিরাট সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ঐ বাহিনীর সঙ্গে বহু ছোটবড় তোপও ছিল (H. C. I. P. vol, VI p 425)। ত্রিপুরা রাজপরিবারের কুলজী-গ্রন্থ তথা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস 'শ্রীরাজমালা' গ্রন্থে রাজা ধনমাণিক্যের বিরুদ্ধে গৌড়াধিপতি সুলতান হুসেন শাহের সেনাদল কর্তৃক ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে তোপ ব্যবহারের কথা উল্লিখিত হয়েছে। পূর্ব ভারতে তোপ ব্যবহারের প্রাচীনতম সংবাদ এটি। 'শ্রীরাজমালা পাঠে জানা যায় যে ১৫১৩/১৭ সাল নাগাদ গৌড়ীয় বাহিনী ত্রিপুরা আক্রমণ করে কিন্তু ত্রিপুর সেনাপতি রয়কাচগ কর্তৃক ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়। শত্রুশিবির লুণ্ঠনে প্রাপ্ত যে সমস্ত বস্তু রয়কাচগ রাজাকে উপহার দেন সেগুলির মধ্যে একটি পেতলের তোপও ছিল। তোপটি ধনমাণিক্যের পরিত্যক্ত রাজধানী উদয়পুরে বহুকাল অবহেলিতভাবে পড়েছিল, বর্তমানে এটি আগরতলায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রাঙ্গণে রাখা হয়েছে। (তোপটির কাণ্ডের দৈর্ঘ : ১১০ ইঞ্চি, মুহুরী-পরিধি (Circumference at Muzzle) ৩২″, গর্ভ-পরিধি (Circum. at Breech) : ৩৪″ মুহুরী ব্যাস (Diameter Muzzle) : ১১॥০, গর্ভ-ব্যাস Dim. at Breech) : ১২″ (calibre) : ৩″/'তীর'। তোপটির গায়ে একটি লিপি ছিল। কয়েকটি মাত্র বিচ্ছিন্ন পারসীক হরফ ব্যতীত বর্তমানে লিপিটির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এ কারণ এটির নির্মাণ-কাল, নির্মাতা ও অধিকারী সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র 'রাজমালা 'প্রদত্ত তথ্যের উপর নির্ভর করা অনেকেই সঙ্গত মনে করেন না কারণ যে সমস্ত পুথি অবলম্বনে রাজমালা সংকলিত হয়েছে সেই পুথিগুলির বহু অংশই পরবর্তীকালের প্রক্ষেপ বলে অনেকের ধারণা। বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যেতে পারে যে হুসেনী তোপ-বিষয়ক রাজমালার উক্তি খুব সম্ভবতঃ যথার্থ—অন্তত পক্ষে আত্মজীবনীতে বাবরের উক্তি এবং শেরশাহের নামাঙ্কিত কয়েকটি তোপের অস্তিত্ব হুসেনী তোপের অস্তিত্বের সম্ভাবনার আনুকূল্যই করে।

ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে মুঘল বাদশাহ বাবর যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন গৌড়ে রাজত্ব করছেন হুসেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২)। গৌড়ীয় গোলন্দাজ বাহিনীর দক্ষতার খ্যাতি তখন ভারত জুড়ে। বাবরের কানেও সে খ্যাতি পৌছেছিল। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক ঘটনার বিবরণদান প্রসঙ্গে বাবর অবশ্য কটাক্ষ করে লিখেছেন যে খ্যাতি অনুযায়ী দক্ষতা গৌড়ীয় বাহিনীর ছিল না। (Leyden & Erskine (Tr)) যাই হোক বাবরের উক্তি এবং ইন্দোর মিউজিয়ামে (DISKALKAR, D. B.—Some old Guns in the Indore Museum, Journal of Indian Hist, XXIII pp 40-42 1914) সংরক্ষিত শেরশাহের নাম ও নির্মাণ তারিখ (৯৩৮ হিজিরা বা ১৫৩১ খ্রীঃ) উৎকীর্ণ একটি তোপের অস্তিত্ব থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ত্রিপুরা আক্রমণ কালে হুসেনী-বাহিনীর সঙ্গে তোপ থাকা অসম্ভব নয়, অন্যথায় স্বীকার করতে হয় এক দশকেরও কম সময়ের মধ্যে গৌড়ীয় বাহিনী তোপ সংগ্রহ ও ব্যবহারে দক্ষতা (যে দক্ষতার খ্যাতি সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল) অর্জন করেছিল। বরঞ্চ ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে বঙ্গে তোপের প্রচলন স্বীকার করা অনেক বেশী নিরাপদ। মুর্শিদাবাদের হাজার-দুয়ারী প্রাসাদের প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত বাচ্ছাওয়ালী

তোপটি* উপরোক্ত উক্তিকে জোরদার-ত করেই এমন কি আরও অনেক সম্ভাবনার আভাষ দেয়। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার বহু ভাগ্যান্বেষী ভারতে এসেছিল বণিক, কারিগর কিংবা কলাবন্ত হিসাবে। যুদ্ধব্যবসায়ী সৈনিকও এসেছিল বিপুল সংখ্যায়। প্রবন্ধকারের ধারণা ঐ সব সৈনিকরাই ভারতে তোপ (এবং বন্দুকাদি) অথবা তৎবিষয়ক কারিগরী জ্ঞান আমদানী করেছিল। মনে হয় একাধিক স্বতন্ত্রধারায় এই আমদানী হয়েছিল। প্রথম ধারাটি এসেছিল আরবদেশের মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ফিরিস্তা উল্লিখিত তোপ অথবা গুলবর্গার পেটালোহার তোপ বোধহয় এদের মারফৎই এসেছিল অথবা এরাই তৈরী করেছিল এদেশের মাটিতে। (কুর্গের বন্দুকের বিচিত্র ছাঁদের কুঁদো বোধহয় প্রাচীন রুমী কুঁদোর স্মৃতিই বহন করছে) দ্বিতীয় ধারাটি এসেছিল পারস্যের মারফৎ গুজরাত অঞ্চলে শুক্রনীতিসার টীকাগ্রন্থাদি রচনার কালে—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে অথবা স্বল্প পরিচয়জনিত জ্ঞানের অপ্রতুলতার কারণে টীকাকার বিশদ আলোচনা থেকে বিরত থেকেছেন।

তৃতীয় ধারাটি এসেছিল আফগানিস্থানের মারফৎ উত্তর পশ্চিম গিরিপথের মধ্য দিয়ে। কাবুলি বন্দুক এবং আকবরকালীন ভারতীয় বন্দুক সেই রকমের আভাস দেয়। [উপরোক্ত বন্দুকগুলির কুঁদোর স্থূলত্ব ও বক্রতা চতুর্দশ শতকের রুমী বন্দুককে মনে পড়িয়ে দেয়। প্রবাদ আছে তৈমুরলঙ পশ্চিম এশিয়া থেকে যে সব কারিগরকে বন্দী করে স্বরাজ্যে আনেন তারাই আফগানিস্থানে বন্দুকের প্রচলন করে—তারপর সুদীর্ঘকাল ঐ দেশে বন্দুকের কোন উন্নতি না হওয়ায় বা রূপের কোন পরিবর্তন না হওয়ায় অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের কাবুলী বন্দুকের কুঁদো ও প্রাচীন রুমী বন্দুকের কুঁদোর সাদৃশ্য চোখে পড়ে।]

স্বতন্ত্র গোত্রের শেষ ধারাটি এসেছিল ইউরোপ থেকে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিক ও উপনিবেশকারীগণের মারফৎ। যদিও প্রথম পর্যায়ে তারা উন্নত যুদ্ধসামগ্রী বা কারিগরী জ্ঞান খুবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন রাখত তবে পরবর্তীকালে (যথা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী) এদের অনেকেই ভারতীয় রাজা-বাদশাহের অধীনে চাকুরী নেয় এবং পৃষ্ঠপোষক রাজাদের জন্য বিপুল সংখ্যায় বিচিত্র ধরণের আগ্নেয়াস্ত্রাদি তৈরী করে।

---

*বাচ্ছাওয়ালী তোপ ॥ পেটা লোহায় তৈরী এই তোপটির মোট দৈর্ঘ ৩৫১ সেমিঃ, মুহুরী পরিধি : ২৩৬, গর্ভের দৈর্ঘ ১০৭ সেমিঃ, গর্ভ-পরিধি : ১৩১ এর গর্ভটি মূল কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। অগ্নিসংযোগের আগে গর্ভটি কাণ্ডের সংঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। সংযুক্তি অবস্থায় গর্ভের কিছু অংশ কাণ্ডের মধ্যেই অবস্থান করে। ঐ অংশে কাণ্ডের অন্তর্গাত্রে ও গর্ভের বহির্গাত্রে বিশেষ কায়দায় খাপ বা খাজ কাটা আছে। গর্ভটিকে কাণ্ডের মধ্যে খাজ বরাবর রেখে একটু মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই গর্ভ কাণ্ডের সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে আটকে যায়। কাণ্ড ও গর্ভ উভয়েরই সংযুক্তি-প্রান্তে বরাবর তিনটি মজবুত কড়া লাগান আছে। গর্ভ ও কাণ্ড সঠিকভাবে সংযুক্ত হলে কড়াগুলি মুখোমুখিভাবে অবস্থান করে। গোলা নির্গত হবার প্রতিক্রিয়ায় গর্ভটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা নিবারণের জন্য অগ্নিসংযোগের আগে কড়াগুলি (চামড়ার) দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত।

উপসংহারে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে ভারতে তোপের আমদানী ও ব্যবহার প্রচলন প্রসঙ্গে স্থান, কাল ও আমদানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষের সম্বন্ধে যে মতামত বা প্রকল্প (Hypothesis) ব্যক্ত করা হয়েছে সেই মতামতকে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

তোপের প্রকার ভেদ ॥ মুঘলযুগের পুথিপত্র ঘেঁটে আর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত তোপগুলি দেখে মুঘল আমলে তোপের বৈচিত্র্য ও প্রকার ভেদ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। দরবারী চিত্রশিল্পীরা সে আমলের যুদ্ধ-বিগ্রহের যে সব চিত্রভাষ্য রেখে গেছেন সেগুলিও এ ব্যাপারে মূল্যবান উপাদান যোগায়।

'তোপ' একটি সাধারণ সংজ্ঞাবাচক শব্দ। কিন্তু বাবর-হুমায়ুনের আমলে দৈত্যাকার বৃহদায়তন আগ্নেয়াস্ত্র বোঝাতে 'ফেরিঙ্গা' এবং 'তোপ' উভয়ই বেশ চালু ছিল।

'অরাবা', 'জরবজান', রাথলা প্রভৃতি ছিল হালকা ও মাঝারী ধরণের শকটবাহিত তোপ। হাজির-ই-রিকাব বা তোপখানা-ই-রিকাব ছিল অশ্বশকটবাহিত। 'ফিলী', 'সুতারী' ও 'গাইয়ী' ছিল যথাক্রমে হাতি, উট ও বলদ বাহিত শকট-তোপ। উট ও গজপৃষ্ঠে স্থাপিত তোপের নাম ছিল যথাক্রমে শুতরনাল ও গজনাল। জম্বুর বা জম্বুরক, ঝাঝাওয়াল, রমজন্কী প্রভৃতি ছিল হালকা ধরণের তোপ। একজনমাত্র মানুষ বইতে পারে এমন এক বিশেষ ধরণের তোপের নাম ছিল
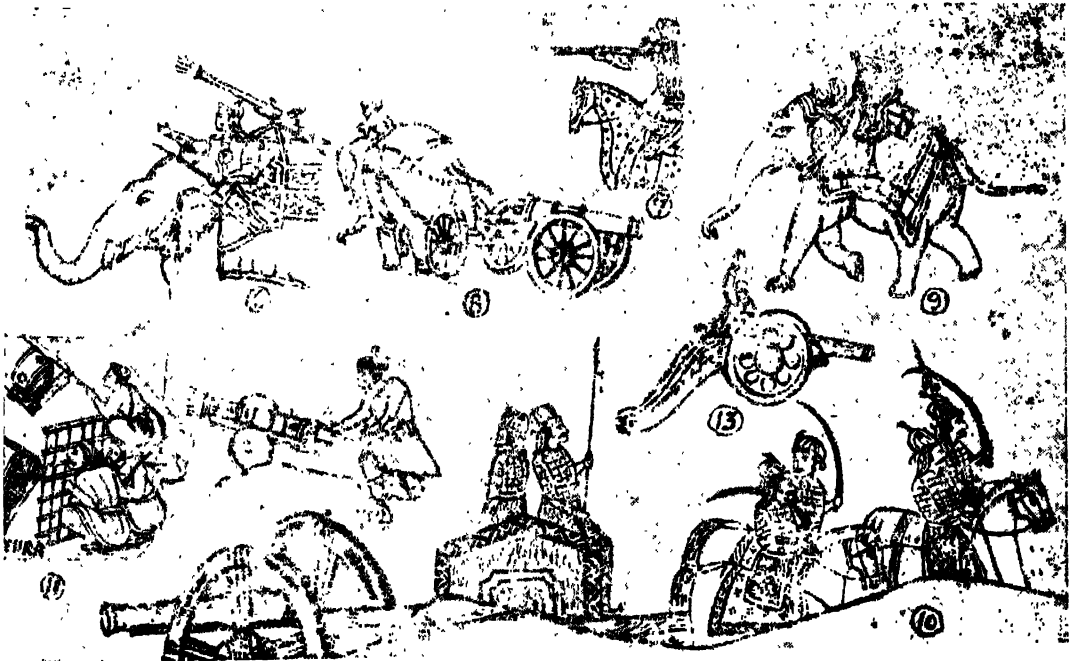
কয়েক ধরণের তোপের চিত্র প্রতিলিপি

'নয়নাল। নৌকার ওপর বসাবার উপযোগী হালকা তোপকে বলা হত 'নাওয়ারা'-তোপ। 'ডেগ' বা 'হুক্কাদান' আধুনিক Mortar এর সমগ্রোত্রীয়। 'গাভেরা, 'ধমকা' 'হাবাত' ছিল বর্তমান কালের Howitzer-এর অনুরূপ। এ ছাড়া চামড়ার তৈরী তোপ, গাছের গুড়ি থেকে তৈরী তোপের খবরও পাওয়া গেছে। বহনের সুবিধার জন্য কয়েকটি অংশ ভাগ করে ফেলা যায় এবং প্রয়োজনে সহজে জোড়া দিয়ে কার্যোপযোগী করা যায় এমন এক ধরণের তোপের খোঁজ পাওয়া যায় আইন-ই-আকবরীতে। বহু নালী তোপের খবরও আছে ঐ পুথিতে। বলাই বাহুল্য এগুলি ছিল অতি বিশিষ্ট এবং এদের ব্যবহার ছিল খুবই সীমিত।

বাবরের আত্মজীবনীতে 'ফেরিঙ্গা' সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বিবরণ না থাকায় ফেরিঙ্গার সঠিক রূপটি জানা যায় না, তবে 'ফেরিঙ্গা' নামটি ইঙ্গিত দেয় যে এটির নির্মাণ ব্যাপারে ফেরিঙ্গি (রূম) উৎস কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট (হয় 'ফিরিঙ্গি' দেশে নির্মিত ও তথা হইতে সংগৃহীত অথবা কোন ফিরিঙ্গি কর্তৃক ভারতেই নিমিত) বাবরের আত্মজীবনীর দু-একটি উক্তি থেকে অনুমান করা হয় ফেরিঙ্গার 'গর্ভ' কাণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেত। হয়ত এগুলি ছিল বিখ্যাত দার্দানেলিস তোপের অনুরূপ।

দৈত্যকার যে সমস্ত তোপ আজও টিকে আছে তাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গুজরাত অধিপতি বাহাদুর শাহের পেতলের তোপটির কথা। পর্তুগীজ সেনাপতি নানহো-দ্য-কুনহার হাতে বাহাদুর শাহের পরাজয়ের পর তোপটি পর্তুগালে প্রেরিত হয় এবং তোপটি বর্তমানে ঐ দেশের সেন্ট জুলিয়ান দুর্গে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় দৈত্যসম তোপের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতি তোপ হচ্ছে বিজাপুরের **'মালিক-ই-ময়দান'**। মহম্মদবিন্ হুসেনরূমী নামে কন্সটান্টিনোপল থেকে আগত জনৈক তুর্কী আহম্মদনগরে ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। ঢালাই পদ্ধতিতে নির্মিত এই তোপটির মোট দৈর্ঘ্য ৪৩৫ সেন্টিমিটার, মুহুরী-ব্যাস ১৬৫ সেঃ মিঃ, 'তীর' ৭১ সেমিঃ, এবং এটি ১২ ০ কিলো ওজনের লোহার গোলা নিক্ষেপে সক্ষম।

এটির 'নালী'র মধ্যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারে। তোপটির গায়ে পারসীক হরফে নির্মাতা ও অধিকারীর নাম, নির্মাণ তারিখ উৎকীর্ণ আছে, মুহুরীটি বিচিত্রভাবে কারুকার্য খোদিত।

বিদর দুর্গে যে পেতলের তোপটি আছে আকার ও আয়তনে সেটি মালিক-ই-ময়দানেরই অনুরূপ তবে মালিক-ই-ময়দানের মত কারুকার্য খোদিত নয় এবং বয়সেও কিছু কম।

আকৃতি ও আয়তনে দৈত্যসম না হলেও অতি দীর্ঘ আর এক ধরণের তোপ ভারতে ব্যবহৃত হত। পেটা লোহার তৈরী এই ধরণের দীর্ঘতম তোপটি রয়েছে বিদরে। এটি প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ। গুলবর্গা দুর্গেও এই ধরণের তোপ রয়েছে। শেষোক্ত তোপটিই সম্ভবতঃ ভারতের প্রাচীনতম তোপ— এটির কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। বঙ্গদেশের দলমাদল ও জাহানকোষা তোপও পেটা লোহায় তৈরী। এইসব বৃহদায়তন দূরপাল্লার তোপ সাধারণত দুর্গমধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত বুরুজ বা মঞ্চে বসান থাকত তবে প্রয়োজনে শকটে চাপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির করা হত। পরিবহনের জন্য অনেক সময় কয়েকশত বলদের দরকার হত। তাছাড়া চড়াই উৎড়াইয়ে ভরা উপল বন্ধুর পথে প্রয়োজনে

সাহায্য করার জন্য বিশেষভাবে তালিম দেওয়া হাতী প্রতিটি তোপের সঙ্গে সঙ্গে চলত। লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় এমন একটি তোপ পরিবহণের চিত্র আছে। [সাহায্যকারী হাতিকে কর্মরত অবস্থায় যে সব মানুষ দেখেছেন তারা সবাই পঞ্চমুখে হাতীদের প্রশংসা করেছেন। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রশংসাবাণী অব্যাহতভাবে শোনা গেছে দেশী ও বিদেশী মানুষের মুখে।]

শকটবাহিত তোপ

এই গোত্রের হাল্‌কা মাঝারি তোপগুলি অরাবা, জরবজান, রাখলা প্রভৃতি নানান নামে পরিচিত ছিল। খুব সম্ভবত শকটের রূপ ভেদই ছিল নাম ভেদের কারণ। যাই হোক ষোড়শ শতকের হালকা মাঝারি শকট তোপ বোঝাতে মুঘল দরবারের ঐতিহাসিক ও লেখকবৃন্দ 'জরবজান' শব্দটিই বেশী ব্যবহার করেছেন। হুমায়ুন যখন কনৌজ আক্রমণ করেন তখন তাঁর সৈন্যদলে চার জোড়া বলদ-বাহিত শকট তোপ 'জরবজান' ছিল প্রায় সাতশত। এগুলি থেকে পাঁচশো মিথকাল ওজনের গোলা ছোঁড়া যেত। ভারী শকটতোপ ছিল একুশটি—এগুলি পরিবহনের জন্য ষাটজোড়া বলদের প্রয়োজন হত—গোলা ছোঁড়া যেত প্রায় পাঁচহাজার মিথকাল ওজনের। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে শকটতোপ বোঝাতে 'রাখলা' শব্দটির বহুল ব্যবহার দেখা যায়—এগুলি ছিল খুবই হাল্‌কা ধরণের তোপ।

শকট তোপের প্রসঙ্গে 'তোপখানা-ই-রিকাব' (অথবা হাজির-ই-রিকাব) অর্থাৎ অশ্ববাহিত শকটতোপের কথা আলাদাভাবে অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার। যুদ্ধক্ষেত্রে এদের ব্যবহার বিশেষ না থাকলেও যাত্রাপথে বাদশাহের দেহরক্ষীদলের সহযাত্রী হত এগুলি। তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরাতে এদের উল্লেখ রয়েছে। বার্ণিয়ার, মানুচী এবং আরও অনেকে এদের কথা লিখে গেছেন। বার্ণিয়ারের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানা যায় যে তোপগুলি হত পেতলের। সযত্নে নির্মিত এবং সুন্দরভাবে চিত্রিত ও রঙীন পতাকায় শোভিত শকটে এগুলি বসান থাকত। শকটগুলি দুটি মাত্র অশ্বই অক্লেশে টেনে নিয়ে যেতে পারত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অশ্বদুটিকে শকটচালক এবং তোপের সঙ্গে বারুদ প্রভৃতি আনুসাঙ্গিক বস্তু বোঝাই দুটি পেটিকাও বহন করতে হত—পেটিকা দুটির একটি থাকত তোপের সামনে এবং অপরটি থাকত তোপের পিছনে। শকটের ঠিক পিছন পিছন চলত অন্য আর একটি অশ্ব এবং একজন সহকারী চালক ক্লান্ত অশ্ব ও চালককে প্রয়োজন মত বিশ্রাম দেবার জন্য। লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি মুঘল চিত্রে বার্ণিয়ার বিবৃত বৃত্তান্তের প্রায় অবিকল প্রতিফলন দেখা যায়।

বাহুল্যবর্জিত সাদামাটা ধরণের শকটে একটি অনুভূমিক দণ্ডের দু প্রান্তে থাকে দুটি চাকা। দণ্ডের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে যুক্ত ছোট একটি পাটাতনের উপর তোপটি আটকে দেওয়া হত (তোপের চেয়ে পাটাতনের দৈর্ঘ্য হত খুবই কম)। সাধারণ সময়ে লেজটি মাটিতে ঠেকিয়ে তোপটি সবসময়ে আকাশমুখী হয়ে থাকত এবং ব্যবহারের-কালে নিশানা ঠিক করবার জন্য কৌণিক উন্নতির হেরফের করতে হলে লেজটি আকাশের দিকে টেনে তোলা হত।

অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের শকটে পাটাতনের আয়তন তোপের চেয়ে অনেক বেশী হত। প্রকৃতপক্ষে পাটাতনটি আয়তাকার ক্ষেত্রের রূপ নিত এবং পাটাতনের দৈর্ঘ্য তোপ অপেক্ষা কিছু বেশীই হত। পাটাতনের উপর তোপটি শায়িত থাকত এবং পাটাতনের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হত—বাঁধার জন্য তোপের গায়ে ও পাটাতনের বিভিন্ন অংশে কড়া লাগান থাকত। চাকার সংখ্যা এগুলিতেও দুটিই হত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশমুখী হয়ে থাকত।

আরও উন্নত ধরণের দুটি চাকাওয়ালা শকটে পাটাতনের বদলে একটি কাঠামো ব্যবহার করা হত। কাঠামোর যে প্রান্তটি তোপের লেজের দিকে থাকত সেই দিকটি বেঁকে এমনভাবে নেমে আসত যে মুক্ত প্রান্তটি ভূমি স্পর্শ করে থাকত এবং সাধারণ অবস্থায় তোপটি আকাশমুখী না হয়ে অনুভূমিক হত। অল্প ব্যবধানে দু খণ্ড মজবুত কাঠ রেখে কয়েকটা আড়-কাঠ দিয়ে সংযুক্ত করে কাঠামোর অনুভূমিক অংশটি তৈরী হত। বঙ্কিম অংশটিও দুখণ্ড মজবুত কাঠ দিয়ে তৈরী হত। বঙ্কিম বাহু দুটি যতই মুক্তপ্রান্তের দিকে অগ্রসর হত ততই তাদের পারস্পরিক ব্যবধান কমে আসত। (অনেক শকটে অবশ্য বাহুদ্বয়ের পারস্পরিক ব্যবধানের তারতম্য ঘটত না) এই গোত্রের সাদাসিধে ধরণের কাঠামোগুলি একেবারে বাহুল্যবর্জিত—দু খণ্ড নিরেট কাঠ দিয়ে সমস্ত কাঠামোটি তৈরী হত। অনুভূমিক অংশটি হত একটি খণ্ড এবং বঙ্কিম অংশটি হত অন্য খণ্ড। মুঘল আমলের শেষ দিকে বঙ্কিম অংশের মুক্ত প্রান্তে একটি ছোট চাকা লাগাবার রেওয়াজ হয়। লাহোর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত 'জমজমা' তোপ এই ধরণের তিন চাকাওয়ালা শকটের উপর স্থাপিত—এই শকটটি অবশ্য জমজমার সমকালীন কি না সঠিকভাবে বলা যায় না। খুব সম্ভবত মহারাজা রণজিৎ সিংহের কারিগরগণই এই ত্রি-চক্রী-শকটটির নির্মাতা।

ষোড়শ শতকের অষ্টম-নবম দশকে আঁকা মুঘল ছবিতে ভূরি ভূরি চারচাকাওয়ালা তোপবাহী শকট দেখা যায় মনে হয় মুঘল আমলের প্রায় গোড়া থেকেই চারচাকার শকট চালু ছিল। ভারী তোপের জন্য এদের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। ছবিগুলি দেখে মনে হয় কাষ্ঠখণ্ড নয় মাঝারি ধরণের গাছের আস্ত কাণ্ডই কাঠামো তৈরীতে ব্যবহার করা হয়েছে। দুর্গ অবরোধকারীদের ব্যবহৃত দূরপাল্লার দৈত্যাকার 'গড়ভঞ্জন' তোপের শকটগুলি সত্যসত্যই এই ধরণের কাঠ দিয়েই তৈরী হত। একাধিক বৃত্তাকার নিরেট কাঠের খণ্ড যুক্ত করে এদের চাকাগুলি তৈরী হত। হালকা তোপের শকট-চক্র অবশ্য চক্রযষ্টি (spoke) সহযোগেও তৈরী হত।

গজনাল

এগুলির গঠন, আকৃতি ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। আইন-ই-আকবরীতে অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে : 'যে তোপ একটি মাত্র হাতী বয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই তোপকেই গজনাল বলে।' কিন্তু তোপটি হাতীর পিঠে বসান থাকত কিনা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। আকবরনামা, তব্‌কত্‌-ই-আকবরী, তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী প্রভৃতি গ্রন্থে গজনাল প্রসঙ্গে যে সব উক্তি রয়েছে সেগুলি থেকেও বিশেষ কোন আভাষ পাওয়া যায় না। তবে আইন-ই-আকবরীতে এক বিশেষ শ্রেণীর তোপ হিসাবে গজনালের আলাদাভাবে উল্লেখ দেখে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে
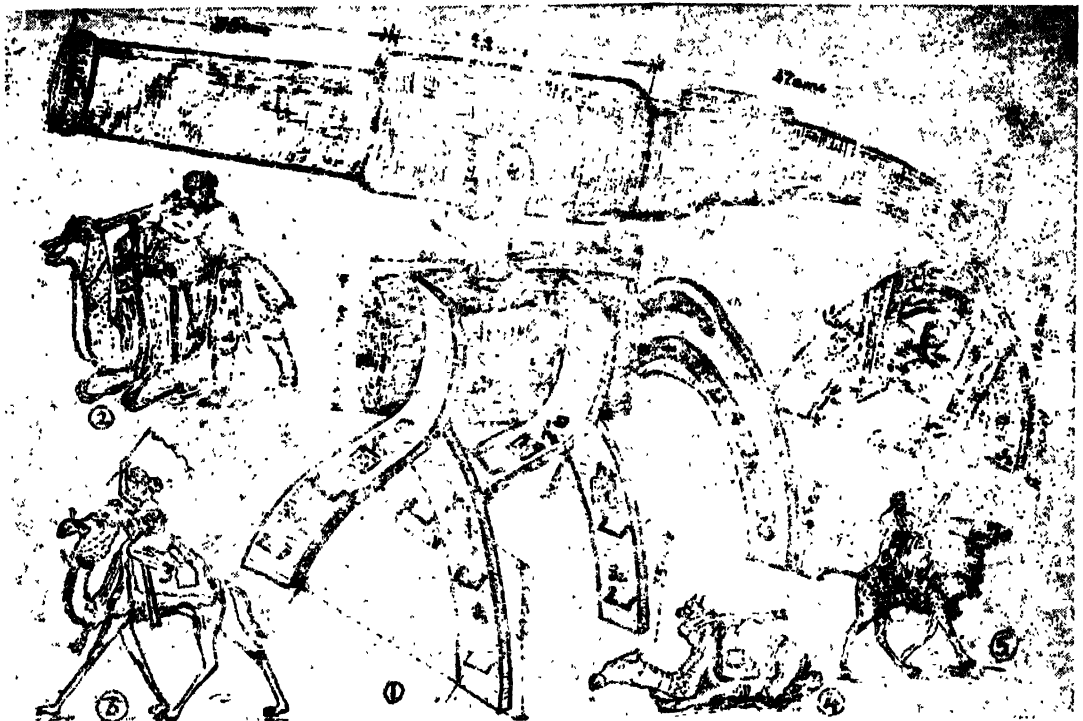
সুতরনাল ও বন্দুকধারী সওয়ার

'গজনাল' ছিল গজপৃষ্ঠে স্থাপনের উপযোগী হালকা তোপ। জয়পুর মহারাজার সংগ্রহস্থিত 'রজমনামা'র একটি যুদ্ধদৃশ্যে (ভগবানদাস কৃত) গজপৃষ্ঠে স্থাপিত তোপ দেখা যায়। ঢাকার উপকণ্ঠে দেওয়ানবাগের উৎখননে প্রাপ্ত তোপগুলির মধ্যে…'সরকার'.. ইসা খান মছলন্তী.. 'উৎকীর্ণ ছোট তোপটি স্টেপ্‌লটন্‌ সাহেব 'গজনাল' বলে সনাক্ত করেছেন।*

সুতরনাল

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে আরম্ভ করে বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্ত পর্যন্ত আজস্র গ্রন্থ ও সরকারী নথিপত্রে (যথা বৃটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত দস্তুর-উল-আমল/জওয়াবিত-ই-আলমগিরী) সুতরনালের কথা অসংখ্যবার উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও পণ্ডিতমহলে সুতরনালের রূপ ও চালনার পদ্ধতি

* অষ্টাদশ শতকের শেষপাদ তথা উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে ইউরোপীয়গণ লিখিত গ্রন্থাদিতে 'গজনাল' পায়াযুক্ত গুরুভার-বন্দুক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। যদিও আকবর-জাহাঙ্গীর আমলে যুদ্ধে গজপৃষ্ঠ হতে বন্দুক চালনা প্রচলিত ছিল (আকবরনামা : ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়াম লণ্ডন, চেষ্টারবেটি সংগ্রহ ডাবলিন দ্রষ্টব্য) কিন্তু ঐগুলি তৎকালে গজনাল নামে পরিচিত ছিল না বলেই মনে হয়।

নিয়ে মতান্তরের শেষ নেই। কারণ সপ্তদশ শতকের গ্রন্থাদিতে বর্ণিত সুতরনালের সঙ্গে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের পুথিপত্রে উল্লিখিত সুতরনালের বর্ণনায় যথেষ্ট হেরফের লক্ষ্য করা যায়। দিল্লীর লালকেল্লাস্থিত পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত সুতরনালটি অবশ্য সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগে নির্মিত এই সুতরনালটি পেতল দিয়ে তৈরী হালকা তোপই বটে এবং কাঠের যে কাঠামোটির উপর তোপটি সংলগ্ন রয়েছে সেটি একটি বিশেষ কায়দায় তৈরী : যে কোন উটের পিঠে সহজে ও স্বচ্ছন্দে বসান যায়। (এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য বুলেটিন অফ্ দি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল : তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

নানা কারণে মুঘল রাজত্বের শেষ পর্যায়ে 'গজনাল/সুতরনালের' মত হালকা তোপ নির্মাণ বন্ধ হয়ে যায়—কিন্তু হাতী বা উটের পিঠে চেপে আগ্নেয়াস্ত্র চালনার বিশেষ সুবিধাটুকু পাবার জন্য 'সুতর ও ফিলি'সওয়ার'গণ (উট ও গজারোহী সৈনিক) কর্তৃক দূরপাল্লার ভারী বন্দুক ব্যবহারের রেওয়াজ চালু হয়ে যায়—এবং তার ফলে পরবর্তীকালের লেখকগণ কয়েক ধরণের ভারী বন্দুককে গজনাল/সুতরনাল অভিধায় অভিহিত করেন।

জম্বুর বা জম্বুরক্

গজনাল, সুতরনালের মত জম্বুরকে কেন্দ্র করেও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। রাজস্থানের কয়েকটি সংগ্রহশালায় (যথা আলোয়ার মিউজিয়াম) দৈবক্রমে সংরক্ষিত অল্প কয়েকখানা জম্বুর সমস্যার জটিলতা দূর করেছে। এগুলি কিন্তু তোপ নয় গুরুভার ও অতি ক্ষুদ্র এক ধরণের বন্দুক—নলটির দৈর্ঘ খুবই কম ফুটদেড়েক মাত্র, কিন্তু নালীর ব্যাস সাধারণ বন্দুক-নালীর থেকে অনেক বেশী। নালীর সঙ্গে যুপকাষ্ঠবৎ একটি পায়া যুক্ত থাকে। জম্বুরের কুঁদোটিও বিচিত্র আকারের : ছোটখাট লাউয়ের মত। ঝাঝাওয়াল—দুর্গপ্রাকার থেকে এবং পার্বত্যযুদ্ধে একধরণের ভারী দূরপাল্লার বন্দুক উল্লেখ করা হয়েছে মুঘল আমলের পুথিপত্রে [শাহাদাত-ই-ফররুখ্শীয়র ওয়া জুলুস-ই-মুহম্মদ শাহ—মীর্জা মুহম্মদ বক্স (আসব) : বৃটিশ মিউজিয়াম : B. M. Or. f 1826], মুঘল চিত্রাদিতে এদের দেখা যায় (লণ্ডনস্থ ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আকবরনামায় দ্রষ্টব্য) এদের নাম ছিল ঝাঝাওয়াল (অথবা উক্ত শব্দ উদ্ভূত বিভিন্ন অপভ্রংশ রূপ)। সাধারণত তিনপায়াযুক্ত একটি কাঠামোতে এগুলি বসান থাকত। মুঘল রাজত্বের শেষদিকে 'যুপকাষ্ঠবৎ পায়া'সহ ঝাঝাওয়ালেরও চলন হয়েছিল।

নরনাল

আইন-ই-আকবরীতে উল্লিখিত নরনালের কথা অন্য কোন পুথিপত্রে বিশেষ দেখা যায় না। ইউরোপীয় 'হ্যাণ্ডগানের' মুঘল প্রতিরূপ বলা যেতে পারে নরনাল। দেবসানপাড় জৈনমন্দিরের 'কল্পসূত্র' পুঁথিচিত্রের সৈনিকদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্রগুলি 'হ্যাণ্ডগান' বলে কোন কোন বিশেষজ্ঞের ধারণা (লণ্ডনস্থ টাওয়ার অফ লণ্ডনের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ রাসেল রবিনসন্ ঐ মত পোষণ করেন।)

পরিশিষ্ট

তুর্কীগণ মধ্যযুগে পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এমন কি ইউরোপের কন্সটান্টিনোপল নগর ও তার আশপাশের বেশ কিছু অংশ দখল করে নিয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। ইতিহাসে এরা 'অটোমান' তুর্কী নামেই বেশী পরিচিত। মধ্যযুগের ভারতীয়দের কাছে কন্সটান্টিনোপল নগর 'রুম'

নামে পরিচিত ছিল আর খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী রুমবাসী অভিহিত হত ফিরিঙ্গি অভিধায়। তোপ-বন্দুক-তুফাঙ ব্যবহারে রুমীতুর্কীগণ ছিল খুবই দক্ষ। চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতকের বেশ কয়েকটি রুমী তোপ আজও টিকে আছে অক্ষত অবস্থায়। প্রাথমিক পর্বে তোপ তৈরী হত পেটা লোহায়। তোপের প্রধান দুটি অংশ বেলনাকার 'নালী (Barrel) এবং গর্ভ (Chamber) সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করা যেত। ব্যবহারকালে অংশদ্বয় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা যেত। দৃঢ় সংযুক্তির জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করা হত। প্রাথমিক পর্যায়ে 'নালী ও গর্ভে বিশেষ কায়দায় (যথা Devotailing) খাঁজ কেটে, খাঁজ বরাবর রেখে চামড়ার দড়ি দিয়ে দুটি অংশকে বেঁধে দেওয়া হত। ইংরেজী বর্ণমালার 'L' আকৃতির একখণ্ড কাঠের উপর তোপটি শায়িত থাকত। তোপের গায়ে এবং কাঠের উপর কয়েক জায়গায় কড়া লাগান থাকত এবং উভয়কে চামড়ার দড়ি দিয়ে বাঁধা হত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে (পঞ্চদশ শতকে) ঢালাই পদ্ধতিতে পেতলের তোপ নির্মাণ শুরু হয়। আকারে ঐ সব তোপ হ'ত দৈত্যাকার—তবে আগের মতই হত দুখণ্ডে অর্থাৎ 'নালী' ও গর্ভ বিচ্ছিন্ন করা যেত। এই সময়ের একটি বিখ্যাত রুমী তোপ হচ্ছে দার্দানেলিস তোপ (বর্তমানে টাওয়ার অফ লণ্ডনে সংরক্ষিত) এটির নালীর অন্তর্গাত্রে এবং গর্ভের বহির্গাত্রে প্যাঁচকাটা আছে স্ক্রুর মতন। দৃঢ় সংযুক্তির জন্য প্রধানত প্যাচের উপরই নির্ভর করা হত। গর্ভ নালীর সহিত সংযুক্ত করার পর বারুদ ভর্তি করার রেওয়াজ খুব সম্ভবতঃ এই সময়েই প্রচলিত হয়। এরই ফলে একটি মাত্র খণ্ডে অর্থাৎ নালী ও গর্ভ স্থায়ীভাবে যুক্ত অবস্থায় তোপ নির্মাণ প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত সাফল্য আসে।

বলা বাহুল্য মধ্যবর্তী পর্যায়ে মিশ্র আদলের নানা ধরণের তোপ নির্মিত হয়। নবজাগৃতির পর ইউরোপীয় ভূখণ্ডে তোপনির্মাণে জোয়ার আসে এবং উন্নত ধরণের নানা প্রকার তোপ উদ্ভাবিত হয়।

শ্রীশচন্দ্র বসু বিদ্যার্ণব

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর শহরে শ্রীশচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা শ্যামাচরণ বসু অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা জেলার টেংরা ভবানীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ হইতে লাহোরে আসিয়া প্রথমে তিনি শিক্ষকতায় প্রবৃত্ত হন, পরে পাঞ্জাবের সরকারের অধীনে শিক্ষাদপ্তরে চাকুরী গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের শিক্ষা অধিকর্তার প্রধান কর্মচারীরূপে পাঞ্জাব প্রদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে শ্যামাচরণ প্রভূত সহায়তা দান করেন, এই সহায়তা সরকার ও জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অকালে ইঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তাঁহার সর্ব-জ্যেষ্ঠ সন্তান শ্রীশচন্দ্রের বয়স ছিল মাত্র ছয় বৎসর। শ্রীশচন্দ্রের মাতা ভুবনেশ্বরী সবিশেষ বুদ্ধিমতী ছিলেন। চারিটি নাবালক পুত্র-কন্যাদের সুশিক্ষা দানে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র লাহোরে পাঠরত থাকিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স্ পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। পাঞ্জাবের পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রদেশের পরীক্ষাগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হইত। বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্র উচ্চশিক্ষার জন্য লাহোরের সরকারী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর সেণ্ট্রাল ট্রেনিং কলেজ হইতে শিক্ষকতা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশচন্দ্র লাহোর সরকারী বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইহার কিছুকাল পর তিনি লাহোর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদ গ্রহণ করেন। লাহোর মডেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালে শ্রীশচন্দ্র উর্দ্দু ভাষায় প্রাকৃতিক ভূগোল বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন। এই সময়ে তিনি "ষ্টুডেণ্ট'স ফ্রেণ্ড্" নামে একটি ইংরাজী সাময়িক পত্র সম্পাদন ও পরিচালনায় ব্রতী হন। শিক্ষকতা কার্যে ব্যাপৃত থাকার সময়ে অধ্যবসায়ী শ্রীশচন্দ্র স্বাধীনভাবে আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কর্তৃক গৃহীত আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীশচন্দ্র বর্তমান উত্তর প্রদেশের মীরাট শহরে আসেন এবং তথায় আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিন বৎসর কাল স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসায়ের পর শ্রীশচন্দ্র সরকারের অধীনে মুন্সেফের পদ গ্রহণ করেন। বেরিলী শহরে কিছুকাল কার্য করার পর তিনি এই পদ ত্যাগ করেন এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে আসিয়া হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে ব্রতী হন। অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীশচন্দ্র একজন দক্ষ আইনজীবীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইতিমধ্যেই তিনি পিট্‌ম্যান উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে আশুলিখন (Short Hand) শিক্ষা করিয়াছিলেন এই জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক বিচারপতিদের 'রায়' গুলির আশুলিখনের কার্যও তাঁহাকে করিতে দেওয়া হইত, ইহাতেও তাঁহার বেশ আয় হইত। আইন অধ্যয়ন করার সময় ও মীরাটে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হন। ইহার কারণ ইহাই ছিল যে হিন্দু আইন উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে

মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থকারগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সংস্কৃত-ভাষা জানা না থাকিলে এই পুস্তকগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আর কোন উপায় নাই। এই কারণে সংস্কৃত শিক্ষা করিতে যাইয়া শ্রীশচন্দ্র উপলব্ধি করেন যে পাণিনি রচিত ব্যাকরণ আয়ত্ত না করিতে পারিলে সংস্কৃত শিক্ষাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই অবস্থায় তিনি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় বা ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের কোন অনুবাদ বা টিকা না থাকায় এই ব্যাকরণ আয়ত্ত করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। ইতিপূর্বে অটোব্যট্ লিঙ্ক (১৮১৫-১৯০৪) নামে এক জার্মান পণ্ডিত এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণভাবে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। জার্মান ভাষায় শ্রীশচন্দ্রের কিছু জ্ঞান ছিল। নিজের সংস্কৃত ও জার্মান ভাষা জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া শ্রীশচন্দ্র সুদীর্ঘকালের সাধনা দ্বারা "অষ্টাধ্যায়ী" উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন ও ইহা মূল ও ব্যাখ্যা সহ ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া উহা প্রচার করিতে মনস্থ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টে ব্যবসায়ে রত থাকার কালে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি সূত্রের প্রথম অধ্যায় কাশিকা বৃত্তি বা ভাষ্যসহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহার সহিত তাহার নিজস্ব টিকা ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই অনুবাদের ভূমিকায় শ্রীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন যে পাণিনির সূক্ষ্ম বিচার শক্তি ও বিষয়বস্তুর সুশৃঙ্খল বিন্যাস প্রণালী এমনই অপূর্ব যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনে যাঁহারা আগ্রহী তাঁহাদের পক্ষে ইহার অধ্যয়ন অত্যাবশ্যক। ইউক্লিডের জ্যামিতি যে পরিমাণে পাশ্চাত্য জগতে মস্তিষ্কের অনুশীলনে সহায়তা করিয়াছে, পাণিনীয় ব্যাকরণও তেমনি ভাবে সংস্কৃত অনুশীলন-কারীগণের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জিত করিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে পাণিনীয় ব্যাকরণের ন্যায় সুলিখিত ব্যাকরণ জগতের কোন ভাষাতেই লিখিত হয় নাই। শ্রীশচন্দ্র কৃত পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর ইংরাজী অনুবাদের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ার পর উহা দেশে ও বিদেশে প্রভূত সমাদর লাভ করে। ম্যাক্সমুল্যার (অক্সফোর্ড), ইয়োলি (জার্মানী), হুইটনি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), ফাউজবোল (ডেনমার্ক), পিশেল (জার্মানী) প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ শ্রীশচন্দ্রের পাণিনি অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য ম্যাক্সমুল্যার এই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে তিনি প্রথম যৌবনে যখন সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন তখন এই অনুবাদটি পাওয়া গেলে তাঁহার পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা খুবই সুগম হইত। শ্রীশচন্দ্র অনূদিত পাণিনির অনুবাদের কিছু অংশ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়। আইন ব্যবসায় ও সংস্কৃত চর্চা দুইটি এক সঙ্গে চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব মনে করিয়া শ্রীশচন্দ্র আইন ব্যবসায় ত্যাগ করেন এবং সরকারী বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। এইরূপে মুন্সেফের পদ পাইয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে আসেন। এই সময় গাজীপুরে তাঁহার ভ্রাতার এক বন্ধু হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ারের পদে কার্য করিতেন। হরিপ্রসন্ন বাল্যকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করেন। হরিপ্রসন্ন অতিশয় সুপণ্ডিত ও ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। হরিপ্রসন্নের সাহচর্যে শ্রীশচন্দ্রের সংস্কৃত-চর্চার বিশেষ সুবিধা হয়। বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত হরিপ্রসন্নের সহযোগিতা দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর বর্তমান উত্তর প্রদেশের পিতার কর্মস্থল এটোয়া শহরে হরিপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। বি-এ পাশ করিয়া ইনি পুনা হইতে পূর্তবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইঞ্জিনীয়ার

বা পূর্তবিদ্ হন। বাল্যকালে ইনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ত্যাগ করিয়া প্রথমে তিনি আলমবাজার মঠে আসেন। বেলুড়মঠ স্থাপন কালে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে ইনি বেলুড়মঠের নক্সা প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে স্বীয় তত্ত্বাবধানে বেলুড়মঠে গৃহাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বেলুড়মঠে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী অখণ্ডানন্দের পরলোকগমনের পর ইনি রামকৃষ্ণ মিশনের 'প্রেসিডেন্ট' পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছানুসারে তাঁহার প্রস্তাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের একটি নক্সা পূর্তবিদ্ বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক রচিত হয় এবং স্বামীজি ইহা অনুমোদন করেন। বিবেকানন্দের মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের অধ্যক্ষতায় তাঁহারই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়া ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠের এই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরটির পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা স্বামী বিজ্ঞানানন্দের পূর্তবিদ্যা-জ্ঞান ও প্রতিভার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পর ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল এলাহাবাদে এই মহাপুরুষ পরলোক গমন করেন। বিজ্ঞানানন্দ 'সূর্য সিদ্ধান্ত' নামক জ্যোতিষ বিষয়ক একটি সংস্কৃত পুস্তক বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদন করেন, ইহা শ্রীশচন্দ্রের পাণিনি কার্যালয় হইতে প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত বিজ্ঞানানন্দ বরাহমিহির রচিত বৃহজ্জাতকম্ গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনূদিত করেন, এই গ্রন্থটি সেক্রেড্ বুকস অফ দি হিণ্ডুস্ গ্রন্থমালার দ্বাদশ গ্রন্থরূপে বামনদাস বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (১৯১২)। জলসরবরাহ বা জল কল স্থাপন সম্বন্ধে (জলসরবরাহের কারখানা—১৯০৬) বিজ্ঞানানন্দ কর্তৃক বাংলাভাষায় দুই খণ্ডে রচিত পুস্তকটিও পাণিনি কার্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। (দ্রঃ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, এলাহাবাদ, ১৩৫৪)।

গাজীপুরে মুন্সেফের কর্মে রত থাকার সময় শ্রীশচন্দ্রকে একটি জটিল মামলা পরিচালন করিতে হয়। এই মামলায় বিচার্য বিষয় এই ছিল যে মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা ওয়াহবী সম্প্রদায় ভুক্ত তাঁহাদের সুন্নীমুসলমানদের সঙ্গে মসজিদে একই সঙ্গে প্রার্থনার অধিকার আছে কিনা। এই মামলার উভয় পক্ষের সওয়াল শুনিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকেন নাই। তিনি নিজে আরবী ভাষা জানিতেন। এই মামলা উত্থাপিত হওয়ার পর তিনি আরব, ইরাণ প্রভৃতি মুসলমান প্রধান দেশগুলি হইতে মুদ্রিত প্রাচীন মুসলিম ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ আনাইয়া তাহা সযত্নে পাঠ করেন এবং এই রায় দেন যে মুসলিম ধর্মশাস্ত্র মতানুযায়ী যে কোন শ্রেণীর মুসলমান মসজিদে গিয়া প্রার্থনা করিবার অধিকারী। শ্রীশচন্দ্রের এই রায়টি ভারতীয় আইনের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইয়া আছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র বারাণসীতে স্থানান্তরিত হন। এই সময়ে তাঁহার সহিত ভারতানুরাগিণী শ্রীযুক্তা এনি বেশান্টের পরিচয় স্থাপিত হয়। ইহার প্রভাবে শ্রীশচন্দ্র কাশীস্থ থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগদান করেন। কাশীতে আসার পর শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রচর্চার অধিকতর সুযোগ লাভ করেন। কাশীর তাত্যাশাস্ত্রী নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সহায়তায় তিনি পাণিনির দুরূহ সূত্রগুলি উত্তমরূপে অধ্যয়ন করেন। কাশীতে অবস্থানকালে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির কাশিকা সহ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ সম্পন্ন করেন। এই

অনুবাদের খণ্ডগুলি ১৮৯১ হইতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এলাহাবাদ হইতেই প্রকাশিত হয় (১)। রয়েল আটপেজী আকারের মোট ১৬৮২ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হয়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র এলাহাবাদে জেলা ও সেসন্স জজ রূপে বদলী হন। বারাণসী বাসকালেই তিনি এই উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র পুনরায় জেলার বিচারকরূপে বারাণসী বদলী হন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তিনি প্রাক্-অবসরকালীন ছুটি গ্রহণ করেন এবং পরবৎসরের মার্চ মাসে পুরাপুরি ভাবে চাকরী হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র ভারতসরকার কর্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী বিদ্যাবত্তার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে 'বিদ্যার্ণব' উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে জেলা জজ রূপে বদলী হওয়ার পর শ্রীশচন্দ্র তাঁহার নিজ বাটি এলাহাবাদের বাহাদুরগঞ্জস্থ ভুবনেশ্বরী আশ্রমে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে পাণিনি কার্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ কার্যে তাঁহার সুযোগ্য কনিষ্ঠ সহোদর মেজর বামনদাস বসু তাঁহার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্জনের পদ হইতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করিয়া বামনদাস জ্যেষ্ঠভ্রাতার শাস্ত্রপ্রচার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত প্রবর ম্যাক্সমূল্যর পরিকল্পিত ও সম্পাদিত 'সেক্রেড্ বুকস্ অব দি ঈষ্ট' গ্রন্থমালার আদর্শে পাণিনি কার্যালয় হইতে দুর্লভ বা অপ্রকাশিত হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ 'সেক্রেড্ বুকস্ অব দি হিণ্ডুস' নামক সিরিজে প্রকাশের ব্যবস্থা হইলে সুপণ্ডিত বামনদাস তাহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। এই সিরিজে প্রায় পঁচিশটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, ইহার মধ্যে অনেকগুলি খণ্ডই শ্রীশচন্দ্র রচিত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থমালা প্রবর্তিত হয়। ইংরাজী ভাষায় পাণিনির অনুবাদ প্রকাশের পর শ্রীশচন্দ্র ভট্টোজী দীক্ষিত প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণগ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন। ইতিপূর্বে সুবিখ্যাত ইংরাজ সংস্কৃতজ্ঞ হোরেস হেমান উইলসন (১৭৮৬—১৮৬০) এই অনুবাদে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। শ্রীশচন্দ্রের এই অনুবাদটি ১৯০৫ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে খণ্ডে খণ্ডে বৃহদাকারের ২৪০০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয় (২)। এই অনুবাদ কার্যে শ্রীশচন্দ্র বামনদাসেরও সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। আর্থার ম্যাকডোনেল, সিসিল বেণ্ডেল প্রভৃতি বৈদেশিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীশচন্দ্র অতিশয় ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি হিন্দুদের নিত্যকর্ম পদ্ধতি বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন—এই পুস্তকটি ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি পরে আরও দুইবার পুনর্মুদ্রিত হয় (৩)। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী প্রকাশের পূর্বে শ্রীশচন্দ্র শিব সংহিতা নামক গ্রন্থের সারমর্ম ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেন (৪)। পরবর্তীকালে তিনি মূল গ্রন্থটিরও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (৫)

উপনিষদ শাস্ত্রে গভীর অনুরাগ ছিল। অষ্টাধ্যায়ীর অনুবাদ কালেই তিনি শঙ্কর ভাষ্যসহ ঈশোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন (৬)। পরবর্তীকালে শ্রীশচন্দ্র ভাষ্যসহ প্রধান প্রধান উপনিষদগুলির মূল ও ইংরাজী অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিয়াছিলেন (৭-১১)। কয়েকটি উপনিষদের মধ্বাচার্য বা আনন্দতীর্থ কৃত ভাষ্যের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় সর্বপ্রথম শ্রীশচন্দ্রই অগ্রণী।

এতদ্ব্যতীত শ্রীশচন্দ্র উপনিষদগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনামূলক একটি গ্রন্থও রচনা করেন। এই গ্রন্থটি তাঁহার জীবনান্তের পর সেক্রেড্ বুকস্ অব দি হিণ্ডুস্ গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয় (১২)। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় এই উপনিষদগুলি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পর্যালোচনা করিয়া শ্রীশচন্দ্র বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। উপনিষদগুলি অধ্যয়নকালে বেদান্তশাস্ত্রের প্রস্থান ত্রয়ের দ্বিতীয়তম গ্রন্থ বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থটি শ্রীশচন্দ্র যত্নের সহিত অধিগত করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের চারিটি অধ্যায়ের ৫৬০টি শ্লোক, এই গ্রন্থের বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ভাষ্যটি সহ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টরূপে শ্রীশচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বরচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত এই গ্রন্থে বলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত প্রমেয় রত্নাবলী গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যাও সংযোজিত হইয়াছিল (১৩)। ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীশচন্দ্র পরবর্তীকালে আরও একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকটিতে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়টি শ্রীশচন্দ্র নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীকণ্ঠ বল্লভ প্রভৃতি আচার্যগণের মতের পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করেন। এই গ্রন্থটিতেও শ্রীশচন্দ্রের অপূর্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় (১৪)। প্রথম যৌবনে যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের অনুরাগ এবং কয়েকটি যোগশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদের বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে শ্রীশচন্দ্র পূর্বে ইংরাজীতে অনূদিত শিবসংহিতা ও ঘেরণ্ডসংহিতা নামক যোগগ্রন্থদ্বয় মূল, টীকা, টিপ্পনী, ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে শ্রীশচন্দ্রের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকাও সংযোজিত হইয়াছিল। ঘেরণ্ড সংহিতা একটি হঠযোগ বিষয়ক প্রাচীন পুস্তক। ঘেরণ্ড নামক হঠযোগ বিশারদ এক মুনির সহিত তাঁহার এক জিজ্ঞাসু শিষ্য চণ্ডকপালীর কথোপকথনের আকারে ইহা বিবৃত হওয়াতে পুস্তকটি 'ঘেরণ্ড সংহিতা' নামে আখ্যাত হইয়াছে।

দক্ষ ব্যবহারজীবী ও বিচারক শ্রীশচন্দ্র প্রাচীন হিন্দু ধর্মশাস্ত্র যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি গ্রন্থটি বিজ্ঞানেশ্বর রচিত মিতাক্ষরা ভাষ্য ও বলমভট্ট রচিত টীকা সহ ইংরাজীতে অনূদিত করিয়াছিলেন (১৬)। যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি বিষয়ে শ্রীশচন্দ্র ইহার পরও একটি আলোচনা মূলক পুস্তক রচনা করেন (১৭)। প্রথম যৌবনে শ্রীশচন্দ্র হিন্দুধর্মশাস্ত্রগুলির সারসঙ্কলন পূর্বক প্রশ্নোত্তররূপে ইংরাজীতে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি 'সেক্রেড বুকস্ অব দি হিণ্ডুস্' গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয় (১৮)।

শ্রীশচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু তিনি কোনরূপ ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার বশবর্তী ছিলেন না। বাইবেল গ্রন্থের যথাযথ মর্মগ্রহণের জন্য তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরবী ও ফার্সী শিক্ষা করিয়া তিনি ইসলাম ধর্মের মর্ম গ্রহণ করেন। কুমার দারা শিকোহ্ কর্তৃক ফার্সী ভাষায় লিখিত 'ইবন্ শাজাহান্' গ্রন্থটি তিনি ইংরাজীতে অনূদিত করিয়া প্রকাশ করেন (১৯)। ল্যাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শ্রীশচন্দ্র যত্নের সহিত আয়ত্ত করিয়াছিলেন। হিন্দী ভাষাও পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশবাসী শ্রীশচন্দ্রের বিশেষ আয়ত্ত ছিল। হিন্দী ভাষায় তিনি একটি বর্ণ পরিচয় ও হিন্দীভাষায় শ্রুতিলিখন প্রণালী (শর্ট হ্যাণ্ড) বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। উত্তর ভারতে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা সংগ্রহ করিয়া শ্রীশচন্দ্র উহা ইংরাজী ভাষায়

লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থটি শ্রীশচন্দ্র 'সেখ চিল্লী' ছদ্মনামে প্রচার করেন (২০)। এই পুস্তকটি সর্বত্রই সমাদৃত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই পুস্তকের একটি বঙ্গানুবাদ প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 'হিন্দুস্থানী উপকথা' নামে সম্পাদিত হইয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটি তাঁহার কন্যাদ্বয় শান্তা ও সীতাদেবী কর্তৃক অনূদিত হইয়াছিল।

অধ্যয়ন ও ধর্মচর্চায় ব্যাপৃত থাকিলেও শ্রীশচন্দ্র নিজেকে বহির্জীবন হইতে সঙ্কুচিত করিয়া রাখিতেন না। আত্মীয় পরিজন ব্যতীত যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিত সেই তাঁহার উন্নত চরিত্র, সৌজন্য আন্তরিকতা ও উদারতায় মুগ্ধ হইত। বিদ্যাবত্তার সহিত এতগুলি সদগুণের সমাবেশ একটি মানুষের মধ্যে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীশচন্দ্র কার্যোপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে যেখানেই বাস করিতেন সেখানেই তিনি জনকল্যাণমূলক কার্যে সহযোগিতা করিতেন। মাতার অনুরোধে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ইতিপূর্বে এই স্থানে দেশীয়গণ দ্বারা পরিচালিত কোন বালিকা বিদ্যালয় ছিল না। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত বালিকাগণের ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য ও বিজাতীয় মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মাতা ভুবনেশ্বরী শ্রীশচন্দ্রকে এই বিষয়ে অবহিত করিয়া দেওয়াতে শ্রীশচন্দ্র বহু পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ করিয়া স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হন।

উত্তরপ্রদেশের বেরিলী শহরে সাবজজরূপে কার্যকালে শ্রীশচন্দ্র তথায় একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হন। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীশচন্দ্র কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের একজন 'ন্যাস-রক্ষক' ও পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার ব্যাপারে শ্রীশচন্দ্র সরকারী অনুরোধে প্রচণ্ড পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল।

চাকুরী হইতে অবসরগ্রহণের কিছুকাল পরে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন এলাহাবাদে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে শ্রীশচন্দ্রের জীবনান্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর সুপ্রসিদ্ধ মডার্ণ রিভিউ পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—He was like an elder brother to us. May his great soul ever have the congenial work and the union with the supreme spirit for which he longed।' (Modern Review, July 1918) (দ্রঃ—মডার্ণ রিভিউ, আগষ্ট, ১৯১৮, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৫)

শ্রীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য অনুজ বামনদাস পিতৃতুল্য অগ্রজের গ্রন্থগুলি প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন এবং আজীবন 'সেক্রেড বুকস অফ দি হিণ্ডুস' গ্রন্থমালা প্রকাশ অব্যাহত রাখেন।

বামনদাস ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশচন্দ্রের যত্নে ও চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ডে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তিনি M. R. C. S. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ভারতীয় মেডিক্যাল সারভিসে যোগদান করেন ও সিভিল সার্জন পদে উন্নীত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বেচ্ছায় চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি অগ্রজের সঙ্গে একযোগে বিদ্যানুশীলনে ব্রতী হন। 'সেক্রেড্ বুকস্ অফ দি হিণ্ডুস্' গ্রন্থমালার সম্পাদনে ব্রতী থাকিয়াও বামনদাস বহুসংখ্যক মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ

রচনা করেন। বামনদাস রচিত প্রামাণ্য পুস্তকগুলির মধ্যে এইগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—Rise of the Christion power in India 5vols, 1923. History of Education in India under the East India Company, 1924. Ruin of Indian Trade and Industries—1925. The Consolidation of Christian power in India, 1927. The Colonisation of India by Europeans—1925. Indian Medicinal plants (with Lt. Col Kritikar) 6vols--1918. Story of Satara—1922. ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর মেজর বামনদাস বসু এলাহাবাদে পরলোক গমন করেন। বামনদাস 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিশেষ সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। মডার্ণ রিভিউ পত্রে বামনদাসের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্রঃ প্রবাসী—২য় ভাগ, ১৩৩৭ মডার্ণ রিভিউ—ডিসেম্বর, ১৯৩০)।

সেক্রেড্ বুকস্ অফ দি হিন্দুস্ গ্রন্থমালায় শ্রীশচন্দ্র রচিত গ্রন্থগুলির নাম ইতিপূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বামনদাস সম্পাদিত এই গ্রন্থমালায় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির নামও উল্লেখযোগ্য—vol IV পাতঞ্জল যোগসূত্র, (রামপ্রসাদ অনূদিত) ১৯১০ ; vol VI বৈশেষিক সূত্র-কনাদ (নন্দলাল সিং) ১৯১১, vol VII ভক্তিশাস্ত্র (নন্দলাল সিংহ, মন্মথনাথ পাল) ১৯১২, vol VII গৌতমীয় ন্যায়সূত্র (সতীশ বিদ্যাভূষণ) ১৯১৩ ; voI XII The Positive Back ground of Hindu Sociology (Prof Benoy Sarkar)—1914 জৈমিনীয় পূর্বমীমাংসাসূত্র-(গঙ্গানাথ ঝা), ১৯১৬ ; vol XVII মৎস্য পুরাণ (২য় খণ্ড)—১৯১৬, ১৯১৭ vol XVIII, শ্বেতাশ্বেতর ও ব্রহ্মোপনিষৎ (সিদ্ধেশ্বর বর্মা) ১৯১৬ vol XXIV, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (রাজেন্দ্রনাথ সেন) ১৯২২

(১) Astadhyayi of Panini

Parts 1—1V, Allahabad, 1891, Parts V—V111, Allahabad, 1894 ; Parts IX—XII, Allahabad 1894. Parts XIII—XVI, Allahabad 1896, Parts XVII—XX, 1897, Parts XXI—XXIV 1897 ; Parts XXV—XXVIII 1897 ; Parts XXIX—XXXII 1898.

(২) Siddhanta Kaumudi by Bhattoji Dixit 3 vols 1905—9, Allahabad —(with B. D. Basu).

(৩) The Daily practices of the Hindus—Allahabad 1899, 2nd edn. 1909 3rd edn. (on Sacred Books of the Hindus vol XX 1918)

(৪) The esoteric philosophy of the Tantras—Siva Samhita, Calcutta 1887,

(৫) Siva Samhita (Eng Tran) 1905

(৬) Isa upanishad with Bhasya by Sankar, Bombay, 1895

(৭) Isa upanishad (Eng. Trans & Notes), 1902

(৮) Kathopanishad (Text, Eng Trans & Notes)—1905

(৯) Isha, Kena, Katha, Prasna, Mundaka and Mandukya Upanished (Eng. Trans of Text, Sacred Books of the Hindus—Vol I) Allahabad 1909.

(১০) The Chandyoga Upanishad with Bhasya by Madhwacharya (Eng. Trans.) S. B. H vol III—Allahabad, 1910.

(১১) The Brihad Aranyaka Upanishad Text, Eng. Translation with translation of Madhwacharyas commentary with Ramakshaya Chatterjee S. B. H vol XIV, Allahabad 1916.

(১২) Studies in the first six Upanishad and the Isa and Kena Upanishads with the Commentray of Sankara (S. B. H vol XVII), Allahabad 1919.

(১৩) Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary of Baladeva (S. B. H, vol—V), Allahabad, 1912.

(১৪) Studies in the Vedanta Sutras and Upanishads. (S. B. H vol XXII), Allahabad, 1919.

(১৫) The yoga Sastra with an introduction to Yoga Philosophy. (S. B. H vol XV) Allahabad, 1915.

(১৬) Yajnavalkya Smriti with Commentary of Vigyaneswar called Mitaksara and Notes from the gloss of Balambhatta (S. B. H vol 2) Allahabad, 1909 and 1918.

(১৭) The Sacred Law of the Aryas as taught by the school of Yajnavalkya—Allahabad 1913.

(১৮) A catechism of Hindu Dharma 1899 Reprinted in (S. B.H Extra vol) Allahabad 1919.

(১৯) The Compass of Truth (Tr. from Darashikuhs Ibun Shah Jahan) 1912.

(২০) Folk Tales of Hindustan.—Allahabad 1908.

পাশ্চাত্যে আর্যবিদ্যানুশীলনের প্রভাব

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

কোন এক দেশ বা জাতির অপর এক দেশ অথবা জাতির উপরে প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে প্রথমেই প্রশ্ন উঠে প্রভাববিস্তারের মূল কারণ কি? সাধারণতঃ দেখা যায়, শক্তিমানের প্রভাব পড়ে দুর্বলের উপরে। এই শক্তির অবশ্য প্রকারভেদ আছে; এটা সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অথবা আদর্শগত হতে পারে। যে কোন ভাবেই হোক না কেন, যে জাতি বা যে সংস্কৃতি অপেক্ষাকৃত শক্তিমান তার প্রভাব পড়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বলের উপরে। তাই এই প্রভাব ভৌগোলিক সন্নিধিনিরপেক্ষ। ইউরোপের উপরে ভারতের বা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারের আপাতদৃষ্টিতে কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষ ২০০ শত বৎসর ইউরোপীয় জাতিদের পদানত ছিল। বর্তমান ভারতের উপরে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব ইতিহাসপাঠকমাত্রেরই সুবিদিত। এর মূল কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। কিন্তু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে একসময়ে ভারতবর্ষ বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল এজন্য ইউরোপের উপরেও ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাববিস্তারের সম্ভাবনা একেবারে অযৌক্তিক নয়।

ইউরোপে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের যথার্থরূপ নির্ণয় করতে হলে দেখতে হয় যে ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক গ্রন্থাদির পঠনপাঠনের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যক্রমে আর্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি ইউরোপের কোন দেশে কি ধরণের? ভারত থেকে সংগৃহীত গ্রন্থাদি-পুথিপত্র, প্রত্নতাত্ত্বিক ও শিল্পনিদর্শনসমূহের সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কোন দেশে কিরূপ? আর্যবিদ্যা সম্পর্কে চিন্তাশীল ইউরোপীয় মনীষীদের অভিমত কি এবং সাধারণ ইউরোপীয় জনগণের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে প্রাচ্যবিদ্যানুশীলনের কোন প্রভাব উপলব্ধ হয় কিনা?

এই প্রসঙ্গে প্রথমে আর্যবিদ্যা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সম্ভবতঃ Monier Williamsই সর্বপ্রথম Indic Studies-এর প্রতিশব্দরূপে 'আর্যবিদ্যা' পদটি প্রয়োগ করেন। ইংলণ্ডে প্রায় প্রত্যেটি বিদ্যালয়ে Oriental Studies নামে একটি বিভাগ আছে। জার্মানীতে অনুরূপ বিভাগ Dept. of Indology নামে পরিচিত। এই Oriental Studies এর পাঠ্যক্রমে গত ২০০ বৎসর ধরে সংস্কৃত এবং ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। সম্প্রতি এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর নানান ভাষা ও চৈনিক, জাপানী এবং ব্রহ্মদেশ সংক্রান্ত নানান বিষয়ের পঠন-পাঠন এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইংলণ্ডে এই রীতি দেখা গেলেও ইউরোপের অন্যান্য প্রধান দেশগুলিতে Indology বিভাগে ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস কলা প্রভৃতি বিষয়সংক্রান্ত সকল তথ্যেরই ব্যাপক পঠনপাঠন হয়। সর্বজনরুচিকর না হলেও একথা ঐতিহাসিক সত্য যে ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি যা কিছু বোঝায় তা প্রধানতঃ এবং প্রায় সর্বাংশে আর্যহিন্দু-সমাজেরই দান। ভারতীয় সংস্কৃতির পরিচায়ক প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় এবং সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত প্রাকৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী। বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য ভারতীয় ধর্ম ও দার্শনিক প্রস্থানের হিন্দু-দর্শন ও সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্ন যোগ থাকায় এগুলি ব্যাপকভাবে ভারতীয় আর্যহিন্দুসংস্কৃতিরই

অন্তর্ভুক্ত। এই আর্যসংস্কৃতির অনুশীলনই আর্যবিদ্যা এবং প্রতীচ্যে Oriental studies বা Indology এই ভাবধারার পরিচায়ক। ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও হল্যাণ্ড এই কয়টি দেশ ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ভারতের সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংযোগ স্থাপন করছে। ব্রিটিশ বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড রূপে দেখা দেবার পর থেকেই এদেশে শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শাসককুল ভারতীয় জনসমাজের শিক্ষা দীক্ষা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে। এই সচেতনতাই উত্তরকালে প্রতীচ্যে আর্যবিদ্যার প্রভাববিস্তারের মূল কারণ হয়ে উঠে। সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ্চাৎপদ হলেও ফরাসী এবং ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণ আর্যবিদ্যাকে কেবলমাত্র ইউরোপের দুই ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন নি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রভাবাধীন রাজ্যগুলিতেও আর্যবিদ্যার নবীন সংক্রমণে সহায়ক হয়েছেন। একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে স্বর্ণপ্রসূ ভারতে প্রবেশের পথ সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে রুদ্ধ হওয়ায় নবজাগ্রত জার্মানজাতি ভারতের সাংস্কৃতিক চিন্তার পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে ভারতে প্রভাববিস্তারের চেষ্টা করে। অবশ্য আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ববোধও জার্মানিতে আর্যবিদ্যানুশীলনের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়। যে ভাবেই হোক না কেন একথা আজ অবিসম্বাদিত যে ভারতবর্ষ ও জার্মানীর মধ্যে সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের সূচনা আর্যবিদ্যানুশীলনের মাধ্যমেই।

গ্রেট ব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের সূচনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকেই। কিন্তু তার আগেই ইউরোপে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যের কথা প্রচারিত হয়েছিল। ইতালীয় পণ্ডিত Fillippo Sasetti ১৫৮৩-১৫৮৮ এই তিন বৎসর ভারতবর্ষে বাস করে ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্যতম গ্রন্থ 'রাজনিঘণ্টু'কে ইতালীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। সংস্কৃত ভাষা ও ইউরোপের অন্য দু একটি ভাষার মধ্যে উৎপত্তিগত সাদৃশ্যের কথাও Sasetti তাঁর রচনার মাধ্যমে প্রচার করেন।(১) ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইউরোপে এই বোধহয় সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও চর্চা গ্রেট ব্রিটেনে ১৭০০ শতকের পর থেকে আরম্ভ হয়। এই সময়ের কিছু আগে থেকেই ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পুরাতত্ত্বের দিকে ব্রিটিশ বণিক সম্প্রদায়ের এক অংশের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এদের মধ্যে Warren Hastings ও Rffles প্রমুখ কয়েকজন ছিলেন কোম্পানীর শাসককুলের অন্তর্গত। পরাধীন দেশের সুষ্ঠ শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতীয় সমাজ, রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য জানতে উদ্যোগী হন এবং কালক্রমে সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিরাট জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে পরিচিত হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনেক কর্মচারী ব্যবসাসংক্রান্ত কাজকর্মের মাধ্যমেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও পুরাতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হন। আবার নিছক অবসরবিনোদনের জন্যই native culture সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠে আগ্রহী হয়েছেন এমন লোকের খবর প্রাচীন দলিলপত্র থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এর সম্মিলিত প্রভাব ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভগবদ্গীতার কয়েকটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করে Warren Hastings যে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে তা অজানা নয়। কৌতূহল ও-অনুসন্ধিৎসা থেকে বিদেশী শাসক সম্প্রদায় যে ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক সম্পদের যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিল সমসাময়িক পত্রে তার

একাধিক নজির আছে।(২) ঠিক কোন প্রেরণা থেকে ভারতবর্ষীয় হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এবং অন্যান্য ধর্ম ও সাহিত্যসংক্রান্ত পুঁথিপত্র ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত করা হতে থাকে সেটা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। খানিকটা ব্যক্তিগত সংগ্রহ প্রচেষ্টা, কিছুটা যুদ্ধের ফলে পাওয়া সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের মনোভাব এবং জিজ্ঞাসু গবেষকের কৌতূহল মেটানোর চেষ্টা—এসবের মিলিত প্রভাবে গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন স্থানে প্রাচ্যতত্ত্বসংরক্ষণের কেন্দ্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে সীমাবদ্ধভাবে উৎসাহদান শাসক সম্প্রদায়ের অন্যতম নীতি বলে গণ্য করা হত। Sir Willim Jones প্রমুখ বহুভাষাবিদ্ এবং বহুদর্শী পণ্ডিতবৃন্দ ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনকে কেবলমাত্র বিজিত ও বিজয়ী দেশ দুটির মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধির উপায় মনে না করে দেশকালাতীত গণ্ডিতে সমস্ত মানবজাতির আত্মিক সম্পদবৃদ্ধির অন্যতম উপায় রূপে দেখানোর চেষ্টা করেন।(৩) William Jones এর সেই অবিস্মরণীয় উক্তি 'Whenever we direct our attention to Hindu Literature the notion of infinity presents itself' আজও ভারত ও প্রতীচ্যের সাংস্কৃতিক বিনিময়ের মূলমন্ত্র হয়ে আছে। Hastings ও Willim Jones এর চিন্তধারার অনুকূলে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুশীলন বিস্তৃত হলে গ্রেটব্রিটেন তথা সমগ্র ইউরোপ ও পাশ্চাত্ত্য জগতের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের বৃহত্তর সম্ভাবনা দেখা যেত। ১৭০০ শতকের শেষভাগে প্যারিসে গ্রন্থাগারের জন্য সংস্কৃত পুস্তক সংগ্রহ ও অমরকোষের ফরাসী অনুবাদ প্রকাশ, ১৭ ৯ সালে সর্বপ্রথম প্যারিসে সংস্কৃত গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, ১৮০১ সালে উপনিষদের অনুবাদ এবং ১৮১৪ সালে College De France এ পাশ্চাত্ত্য জগতে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক পদ প্রতিষ্ঠা—এইগুলি মিলিত ভাবে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রভাববিস্তারের সম্ভাবনাময় সূচনার ইঙ্গিত করে। গ্রেটব্রিটেনেও সমসাময়িক কালে East India Company-র গ্রন্থাগার ছাড়াও Royal Asiatic society-র গ্রন্থাগারে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পুথিপত্র সংগ্রহ, British Museum-এ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় নিবদ্ধ পুথি-পত্র দলিল এবং মূল্যবান পুরাতত্ত্বের সংগ্রহ ও গবেষণার সূচনা এ সবের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। ১৮০৫ সালে East India Company-র তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত Hartford College এ অধ্যাপক উইলসন সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে সংস্কৃত ভাষায় অধ্যাপনার সূচনা করেন।

কিন্তু গ্রেটব্রিটেনে তথা পাশ্চাত্ত্য জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনে সর্বপ্রথম প্রচণ্ড আঘাত আসে Lord Macauley-র কাছ থেকে।(৪) তাঁর সদম্ভ উক্তি—'I have never found one among them (i. e. Orientalists) who could deny that a single shelf of a good European Library was worth the Whole native Literature of India and Arabia' এবং তৎপরবর্তী কার্যক্রম সমগ্র ভারতীয় বিদ্যার অনুশীলনের স্ফুটনোন্মুখ অবস্থায় ভয়াবহ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে যার প্রভাব আজও মুছে যায় নি। স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল ব্রিটিশ জাতি প্রাচ্যতত্ত্ব ও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চায় অর্থব্যয়ের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠতে থাকে। এজন্য দেখা যায় যে গ্রেটব্রিটেনে প্রাচ্যবিদ্যার ও ভারত সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় প্রথম উদ্যোগী হলেও সমগ্র ১৮০০ সালের

মধ্যে কেম্ব্রিজ, অকস্‌ফোর্ড এডিনবার্গ ও ম্যাঞ্চেষ্টার এই চারিটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনার মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃত বিষয়ে অনুশীলন হচ্ছে ; অথচ একই সময়ের মধ্যে France-এ ৬টি কেন্দ্রে সংস্কৃত ভাষায় গবেষণা ও অধ্যাপনা চলছে, Germany-তে নয়টি কেন্দ্র এবং Checkoslovakia, Australia, Sweden, Norway, Holland, Denmark প্রভৃতি দেশে এক অথবা একাধিক কেন্দ্রে। অধ্যাপক E. B. Cowell তাঁর ছাত্রাবস্থায়(৫) ব্রিটেনে সংস্কৃত ভাষার পঠনপাঠনের অব্যবস্থার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'England in spite of her vast opportunities has done least for Oriental Literature' এটা হচ্ছে ১৮৪৬ সালের কথা। সমসাময়িক তথ্য থেকে পাওয়া যায় যে তৎকালীন Board of Directors ভারতীয়দের মধ্যে useful learning প্রচারে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবাসী অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, এজন্য এদের ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কার অপসারিত না হলে কোন রকমের জাগতিক বা মানসিক উন্নতি হবে না। পরিচালকবর্গের একটি বৃহৎ অংশ মেকলের মত অনুসরণ করে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে অর্থব্যয় করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কেবলমাত্র ভারতে শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে native learning বিষয়ে যে পরিমাণ অর্থব্যয় অপরিহার্য সেই পরিমাণ অর্থই তাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক অনুশীলনে ব্যয় করতে প্রস্তুত হন। এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনিবার্য প্রভাব ইংলণ্ডের সমসাময়িক এবং অব্যবহিত পরবর্তীকালের রাষ্ট্রপরিচালকদের মধ্যেও দেখা যায়। এর ফলে ইংলণ্ডে ১০০ বছরের মধ্যে উপরিউক্ত ৪টি কেন্দ্র ছাড়া অন্য কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত কোন অনুশীলন বা গবেষণার ব্যবস্থা হয় নি। কিন্তু জার্মানীতে ঐ সময়ের মধ্যেই এক অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও আগ্রহের সঙ্গে সংস্কৃতভাষার শিক্ষা ও পঠনপাঠন আরম্ভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মানী ও ভারতীয় সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় গবেষণার পীঠস্থান হয়ে ওঠে। বহির্বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসারে জার্মানীতে আর্যবিদ্যা অনুশীলনের দান অসামান্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংল্যাণ্ডের দুটি প্রধান সংস্কৃতের অধ্যাপক পদই বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত Oxford-এর বোডেন সংস্কৃতাধ্যাপক পদটি Colonel Boden-এর অর্থানুকূল্যে ১৮৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত ও Edinburg-এর সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ John Muir-এর সাহায্যে ১৮১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডে প্রাচ্যতত্ত্বানুশীলনে প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৯০৭ সালে Reay Committee গঠন এবং এই সংস্থার সুপারিশ অনুসারে School of Oriental Studies-এর প্রতিষ্ঠা। ১৯১৬ সালে এই বিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৭ সালে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময়ে এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২৫। ১৯২৮ সালে school of the University of London থেকে নাম বদলে এই বিদ্যালয়ের নাম হয় school of Oriental and African studies, University of London. বর্তমানে গ্রেটব্রিটেনে আর্যবিদ্যানুশীলনের এইটি সর্বপ্রধান কেন্দ্র। একে এককথায় আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। এই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের মোট অধ্যাপক সংখ্যা ১৫৫, ছাত্রসংখ্যা ৮০০ অথবা কিছু বেশী। এই ছাত্রসংখ্যার একতৃতীয়াংশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশ থেকে আসে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ২৫০০ ভাষায় লেখা প্রায় ১০ লক্ষ গ্রন্থের সঞ্চয়ে এই বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। মোট ১৩০টি ভাষায় এখানে অধ্যাপনা ও গবেষণার সুযোগ আছে এবং

এর শিক্ষণভার মোটামুটি ১০টি বিভাগে বিভক্ত। এখানকার বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সংস্কৃত, পালি, হিন্দী, তামিল, বাংলা, উড়িয়া, প্রাচীন ভারতীয় ও আধুনিক ভারতীয় ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, চিত্রকলা, ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় আইন, ভারতীয় সঙ্গীত প্রভৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব গবেষণা পত্রিকা আছে। school of Oriental and African studies ছাড়া বর্তমানে গ্রেটবিটেনে আর্যবিদ্যা অনুশীলনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য স্থান হল Oxford. ১৯৪৭ সালে ইংলণ্ডে প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ে গবেষণার ও শিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ব্রিটিশ সরকার Scarbrough Commission (৬) এবং সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অধীনে Hayfer sub-Committe নিয়োগ করেন। Scarbrough Commission এর অন্যতম সুপারিশ ছিল লণ্ডনে প্রাচ্যতত্ত্ববিষয়ে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ সংস্থার সৃষ্টি। এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত হয়নি কিন্তু S. O. S-কে সরকারী সাহায্য দান এবং অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাবটির কিছু অংশ গৃহীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। ১৯২৫ সালে অধ্যাপক Keith ইংলণ্ডে ভারতীয় বিদ্যা বিষয়ে গবেষণার অপ্রাচুর্যে দুঃখিত হয়ে বলেছিলেন 'It is deeply to be regretted that British opinion should be so heedless of the duty of contributiug to the investigation of the ancient civilisation of a Land whence Britain has derived so much of her power and wealth' এই কথারই প্রতিধ্বনি করে অধ্যাপক Turner ১৯৪৭ সালে বলেন "never before had Indian Studies in this Country reached so low an ebb.' বলা বাহুল্য লণ্ডনে S. O. S. কে বাদ দিলে গ্রেট্‌ব্রিটেনের সর্বত্রই ভারতীয় সংস্কৃতির অনুশীলনের শোচনীয় চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপক Rhys Davis-এর সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক পদটির বিলোপসাধন করা হয়েছে। কেম্ব্রিজে পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় ১৯৫৩ সালে একটি Oriental Institute প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি Oriental Series প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে Oriental Institute থেকে ভারতীয় প্রাচ্যতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভাগ পুনরায় সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গে যুক্ত করে Oriental Instituteটিকে সাধারণ পুরাতত্ত্ব সংগ্রহালয়ে পরিণত করা হয়েছে। এ ছাড়া লণ্ডনে Victoria Albert Museum এর ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার উৎসাহমূলক নীতি গ্রহণ করেন নি। যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে বর্তমানে ভারতীয় আর্যবিদ্যানুশীলনকেন্দ্র মোট ৯টি, বিভক্ত পশ্চিম জার্মানীতে ১৪টি অথচ ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে মাত্র ৪টি। ইংলণ্ডে প্রাচ্যতত্ত্বানুশীলনের ইতিহাস অকস্‌ফোর্ডের ইণ্ডিয়ান্ ইনস্টিটিউট্ এর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়াম্‌স্ গ্রেটব্রিটেনে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির শিক্ষা ও স্থায়ী প্রচারের জন্য দীর্ঘ ২১ বৎসর আপ্রাণ চেষ্টার পর ১৮৮৩ সালে অকস্‌ফোর্ডে Indian Institute প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচ্যতত্ত্বানুশীলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল এই Indian Institute (আর্যবিদ্যাভবন)। এই ভবন নির্মাণের সমস্ত অর্থই দানব্যরূপে সংগৃহীত এবং এই অর্থের অধিকাংশই ভারতীয় জনসাধারণের ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের দান। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের বিবিধ নিদর্শন মূল্যবান চিত্রসংগ্রহ ও ৫০০০০ এর অধিক সংস্কৃত পুস্তকসম্ভারে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থাগার প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতীয় সংবাদপত্র পাঠের একমাত্র কেন্দ্র।

সংস্কৃত ছাড়া বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত বহু প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থে এবং প্রাচ্যতত্ত্ব সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণা পত্রিকায় সমৃদ্ধ এই আর্যবিদ্যাভবনের গ্রন্থাগার। ১৯৫৮ সালের আগে Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যাশিক্ষার এইটি ছিল কেন্দ্র। ১৮৮৭ সালে তৎকালীন Prince of wales মহামান্য Albert Edward এই ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। সেই সময়ে তিনি যে শিলালিপি স্থাপন করেন তাতে এই ভবনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা ব্যক্ত করে বলা হয়—

ঈশানুকম্পয়া নিত্যমার্যাবিদ্যা মহীয়তাম্
আর্যাবর্ত্ত-আঙ্গলভূম্যোশ্চ মিথো মৈত্রী বিবর্ধতাম্ ॥

অর্থাৎ, 'ঈশ্বরের করুণায় আর্যবিদ্যার প্রসার হউক এবং আর্যাবর্ত্ত ও আঙ্গলভূমির পারস্পরিক মৈত্র বর্ধিত হউক।' কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে মহান উদ্দেশ্যে এই ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য এবং মনিয়র উইলিয়ামস্ এর মৌলিক সনদ ও অন্তিম নির্দেশকে অগ্রাহ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানসঙ্কুলানের অজুহাতে এই আর্যবিদ্যা ভবনকে প্রশাসনের কুক্ষিভুক্ত করতে কৃত সঙ্কল্প হন। এই ধরণের কাজের ফলে ভারত ব্রিটেন সাংস্কৃতিক মৈত্রী এবং প্রাচ্যতত্ত্বের অনুশীলন সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে জেনে বর্তমান Boden সংস্কৃতাধ্যাপক T. Burrow যুক্তিপূর্ণ ও তীব্র ভাষায় এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান যে আর্যবিদ্যাভবনকে প্রশাসনের অধীন করলে অক্সফোর্ডে সংস্কৃত ও প্রাচ্যতত্ত্বসংক্রান্ত গবেষণা ও অধ্যাপনার উৎকর্ষহানি ঘটাবে এবং বহির্বিশ্বে অক্সফোর্ডের মর্যাদাহানি হবে। কিন্তু তাঁর দৃপ্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ভবনকে গ্রাস করেন এবং Indian Institute Library আর্যবিদ্যাভবন থেকে বিপরীত দিকস্থ Bodelian Libraryর চারতলায় স্থানান্তরিত হয়। দীর্ঘকাল অবহেলিত থা ার পর সম্প্রতি আর্যবিদ্যাভবনের ২০০ শতাধিক পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ নবনির্মিত Oriental Institute ভবনের ভূগর্ভকোষ্ঠে স্থান পেয়েছে। আর্যবিদ্যাভবনের এই অবলুপ্তিতে দুঃখিত হয়ে দরদী অধ্যাপক Burrow কয়েকটি মর্মভেদী করুণ শ্লোকে যা লিখেছিলেন তাকে এককথায় Elegy on the Indian Institute এই আখ্যা দেওয়া চলে। এর সবচেয়ে হৃদয়গ্রাহী অংশ হচ্ছে……

ততঃ ষষ্টিতমে বর্ষে দুর্নয়গ্রস্তবুদ্ধিভিঃ
বিদ্যালয় মহামাত্রৈ রার্যধর্ম পরাঙ্‌ মুখৈঃ।
সরস্বতীং লঘূকৃত্য পাণ্ডিত্যমবমন্য চ
তয়োর্ভূম্যোস্থিরকৃত্য মৈত্রীমনর্থকামিব।
কায়স্থ রাক্ষসানাঞ্চ পরস্বাদান গৃদ্ধিনাম্
গণকানাঞ্চ হস্তেষু প্রাপিতা স্বার্থসিদ্ধয়ে।
বিদ্যাবিহীনা শালৈষা পরৈর্নীতা পরাভবম্
অযোধ্যা প্রোষিতে রামে নষ্টশ্রীরিব শোচতি।(৭)

অর্থ—'এই ভবন প্রতিষ্ঠার পর ষষ্টিতম বৎসরে আর্যধর্মপরাঙ্‌ মুখ ও দুর্নয়গ্রস্তবুদ্ধিসম্পন্ন বিদ্যালয় মহামাত্রগণ দেবী সরস্বতীর মহিমাকে লঘু করিয়া পাণ্ডিত্যকে অস্বীকার পূর্বক তাঁহাদের আসন অবনত

করিল। আর্যাবর্ত্ত ও আঙ্গলভূমির মৈত্রী অনর্থক বিবেচনা করিয়া পরস্বাদানতৎপর কায়স্থ রাক্ষস ও গণকগণের হস্তে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহা অর্পিত হইল। তাহাদের দ্বারা পরাভূত এই বিদ্যাভবন বিদ্যাহীন অবস্থায় রামচন্দ্র পরিত্যক্ত অযোধ্যার ন্যায়ই এক্ষণে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে।' ১৯১৬ সালে সংস্কৃত সমেত সমস্ত প্রাচ্যদেশীয় ভাষার শিক্ষণের জন্য অক্সফোর্ডে Oriental Institute নামে পৃথক একটি ভবন নির্মিত হয়। বর্তমানে এই ভবনে চীনা জাপানী ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশীয় ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও পালিভাষায় অধ্যাপনা চলে। এই বিদ্যাভবনে একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থাগার আছে। তার অধিকাংশ গ্রন্থই পরলোকগত অধ্যাপক Thomas এর দান। আর্যবিদ্যাভবনের বাংলাগ্রন্থ সংগ্রহ আনুমানিক ৪০। হ্যালহেড রচিত বাংলাভাষার ব্যাকরণ এবং ১৮০৩—১৮০৮ সালে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত রামায়ণ, মহাভারত, হিতোপদেশ ও ১৮৩৫ সালে প্রকাশিত তোতাসংবাদ—এগুলি এই গ্রন্থসংগ্রহের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। অক্সফোর্ডে আর্যবিদ্যাভবনের গৌরবহানির সঙ্গে সঙ্গেই অক্সফোর্ডে সংস্কৃতশিক্ষার বিশ্বব্যাপী মর্যাদা যে বহু পরিমাণে ক্ষুন্ন হয়েছে একথা কোন বিবেচক প্রাচ্যতত্ত্ববিদের কাছে অজ্ঞাত নয়।

গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা ও সংস্কৃতির অনুশীলনের এই নৈরাশ্যজনক পটভূমিকায় হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংক্রান্ত এবং বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথিপত্র ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থা অনুমান করা যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আওতা থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করলে কোম্পানীর সংগ্রহভুক্ত বিপুল পরিমাণে পুথি ও অন্যান্য সংগ্রহ India office নামে বহু পরিচিত গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গ্রন্থাগার ও ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত পুঁথিপত্র ও অন্যান্য সংগ্রহের ধারাবাহিক তালিকাও পঞ্জী পাওয়া যায়। মোটামুটি India office-এর তালিকাভুক্ত পুঁথিপত্র কমবেশী ১১,০০০ এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে প্রায় ৬০০০। কিন্তু এ ছাড়াও সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ার্লাণ্ডে যে বিপুল পরিমাণ পুঁথিপত্র চিত্রকলা ও পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ ছড়িয়ে আছে তার কোন সঠিক হিসাব নেই। সেনাবাহিনীর অনেক পদস্থ কর্মচারী অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিগত সংগ্রহের আকর্ষণে পরাজিত নৃপতি ও সৈনিকদের কাছ থেকে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি, মুদ্রা, চিত্রকলা এবং অন্যান্য শিল্প নিদর্শন সংগ্রহ করতেন। শাসকদের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ ভারতীয় রাজকুল তাঁদের মূল্যবান সংগ্রহশালা থেকে ব্যক্তিবিশেষকে উপহাররূপে অথবা কোন সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য বহুমূল্য শিল্পনিদর্শন দান অথবা বিক্রয় করেছেন। সামরিক বিভাগভুক্ত চিকিৎসকেরা চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ের দুষ্প্রাপ্য পুঁথিসংগ্রহ করে স্বদেশে যাত্রা করেছেন। যথার্থ অধিকারীর দেহত্যাগের পর এই সব সংগ্রহের অধিকাংশই নিলামে বিক্রীত হয়েছে। উত্তর ইংল্যাণ্ডের Darlington Museum কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট থেকে ৮টি দুর্লভ প্রাচীন কাশ্মীরীয় পুঁথি সংগ্রহ করেন। কিভাবে সেগুলি নিলামে আসে তা অজ্ঞাত। এই ৮টি পুঁথির ২টি আয়ার্লাণ্ডের কোন গ্রন্থাগারে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। এই ধরণের একটি দুর্লভ কালীঘাট চিত্র সংগ্রহ লণ্ডনে Duke Street-এর একটি প্রদর্শনীতে দেখা গেছে। লণ্ডনের পুস্তক ব্যবসায়ী জগতে ভারতীয় পুঁথিপত্র ও পুরাতত্ত্বের গোপন ব্যবসা অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে গুপ্তভাবে পুরাতত্ত্ব নিদর্শন চিত্রকলা এবং পুঁথিপত্র ইউরোপ ও আমেরিকায় আসছে এবং

উচ্চমূল্যে বিক্রীত হচ্ছে। এ বিষয়ে সমস্ত জাতি সজাগ না হলে দুর্লভ স্বদেশীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হবে না।

Oxford এর Bodeleian গ্রন্থাগারে নেপালের মহারাজা চন্দ্রসামশের ১৯০০ সালে প্রায় ৬,৬০০ সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত পুথিপত্র দলিল প্রভৃতি দান করেন। আজ পর্যন্ত তার কোন তালিকা প্রকাশিত হয় নি। অথচ এই Bodeleian গ্রন্থাগারে ভারতের প্রাচীনতম চিকিৎসা বিষয়ক পুঁথি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের Bower Mss. রক্ষিত আছে। Auriel stein-এর মধ্য এশিয়ার পুরাতত্ত্ব আবিষ্কারের রোমাঞ্চকর কাহিনী সম্বলিত ব্যক্তিগত diary এই গ্রন্থাগারে দুর্লভ আকর্ষণ। শামসের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত বাংলা পুথির মধ্যে ১৭৭২ খৃঃ অব্দের চৈতন্যমঙ্গল (সম্পূর্ণ) ও ১৭৭৯ সালের সম্পূর্ণ কবি কঙ্কনচণ্ডী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপযুক্ত তালিকা প্রণয়নের ত্রুটিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পুঁথি সংগ্রহ অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় আছে। Cambridge বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধ সংস্কৃতি পুথি সংগ্রহের কিছু অংশ অধ্যাপক Bendall তালিকাভুক্ত করেছিলেন। বাকী প্রায় ১৫০০ বা তার বেশী সংগ্রহের কোন সম্পূর্ণ তালিকা নেই। এই সংগ্রহে কয়েকটি গ্রন্থকে বাংলা বলে নির্দিষ্ট করা থাকলেও পরীক্ষায় দেখা গেছে সেইগুলি প্রাচীন নাগরী বা নেওয়ারী লিপিতে লেখা। এই সংগ্রহে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটি প্রাচীন রেখাচিত্র আছে যা স্থাপত্যবিষয়ে গবেষণার অভিনব উপাদান। দশমাতৃকার প্রাচীন পঞ্চদশ শতকের চিত্রও এই সংগ্রহের উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। এইরকম একটি ত্রুটিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে London Welcome Medical Historical Library; Victoria Albert Museum, ম্যাঞ্চেষ্টারে John Rylands Library, কেম্ব্রিজে Fitzwilliam Museum এবং ডাবলিনে Chester Betty Libraryর পুঁথি ও চিত্রসংগ্রহ রয়েছে। লণ্ডনের Welcome Medical Libraryতে প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, ধাতুব্যবহার, রত্ন পরীক্ষা এ সমস্ত বিষয়ে আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত লেখকের অনেক মূল্যবান রচনা আছে। এই গ্রন্থাগারে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, চক্রপাণি প্রমুখ প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের গ্রন্থের দুর্লভ সংগ্রহ আছে। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান পুঁথিসংগ্রহ কমপক্ষে ৪ হাজার। গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থসংগ্রহের কোন তালিকা বা পঞ্জী প্রণীত হয়নি। ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্-এর বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এইভাবে বিক্ষিপ্ত পুথিপত্র ও চিত্রের সংখ্যা প্রায় ২০০০, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদের বিবরণ অসম্পূর্ণ। তুলট কাগজ, দেশী লাল কাগজ ভূর্জপত্র, সূক্ষ্ম গাছের ছাল অথবা মসলিন এবং গরদ এগুলির উপরে লেখা চিত্রমণ্ডল (scrooll) এবং অন্যান্য শিল্পনিদর্শন Oxford এর All Souls College, Manchester Jhon Rylands Library এবং Chester Betty Libraryতে একই অবস্থায় আছে। গ্রেটব্রিটেনের আর্যবিদ্যানিদর্শনগুলির অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। মহানুভব আইরিশ রাষ্ট্রনায়ক De Valera ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল। Dublin-এর Trinity College-এ প্রাচীন সাহিত্যের পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত সাহিত্য ও আর্যবিদ্যার (Indology) অন্তর্ভুক্তি তার এই অনুরাগের পরোক্ষ ফল। বর্তমানে School of Advanced studies, Dublin-এর অধীনে Celtic ভাষাগোষ্ঠীর অধ্যাপনায় সংস্কৃত পাঠ্যবিষয়রূপে নির্দিষ্ট এবং

Trinity College এ সংস্কৃতভাষার একজন সহকারী অধ্যাপক আছেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজধানীতে Chester Betty Libraryতে ভারতীয় আর্যবিদ্যাসংক্রান্ত মূল্যবান পুঁথি ও চিত্রসংগ্রহ আছে। এই সংগ্রহশালাটি পূর্বে লণ্ডনে অবস্থিত ছিল; ১৯২০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হয়। ক্রমবর্ধমান এই গ্রন্থাগারের বর্তমান তালিকাভুক্ত পুঁথি সংগ্রহ প্রায় ২০০। এ ছাড়া প্রায় ৬০০ দুর্লভ ভারতীয় চিত্রসংগ্রহে এই গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ। এর মধ্যে রাজপুত, ভোজপুরী, কাঙড়া কুলু এবং গাড়ওয়াল এ সমস্ত দেশের চিত্রকলা ছাড়া মিনিয়েচার এবং পুর্বভারতীয় পটও দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলায় হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারা ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমন্বয় হচ্ছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ এই চিত্রকলায় পাওয়া যায়।

আর্যহিন্দুসংস্কৃতির এই ধরণের বহু নিদর্শন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আজও অবহেলিত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে। সামগ্রিকভাবে ইউরোপে ভারতীয় আর্যবিদ্যানুশীলনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। উপরিউক্ত তথ্য থেকে সহজেই দেখা যায় যে গ্রেট ব্রিটেনে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বেশী নিদর্শন থাকলেও শাসকসম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়ে উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এযাবৎ কেবলমাত্র সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডারের রক্ষণাবেক্ষণের ন্যূনতম ব্যবস্থাই তারা করে আসছেন। ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য অনেক মনীষী যেমন Max Muller, Cowell, Keith, William, Jones, Thomas এঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আর্যবিদ্যানুশীলনে এবং তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিসাধনে উৎসাহী হলেও গোটা ইউরোপের সামাজিক জীবনে প্রাচ্যতত্ত্ব তথা আর্যবিদ্যানুশীলনে কোন প্রভাব দেখা যায় না। বর্তমানে ইউরোপের প্রাচ্যতাত্ত্বিকগণ ভাষাতত্ত্বসম্পর্কীয় আলোচনায় অধিক আগ্রহী। William Jones, Monier Williams এবং Keith-এর মতন বহুমুখী কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ব্রিটেন কেন ইউরোপের অন্য কোন দেশে নেই বললেই চলে। অকস্‌ফোর্ডের বোডেন অধ্যাপক T. Barrowর মতন দু-একজন যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল তারাও স্বদেশীয় সরকারের ঔদাসীন্যের প্রতিবিধানে অক্ষম। ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান দৃষ্টিকেন্দ্র ভারত থেকে সরে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন অংশে স্থাপিত হয়েছে। নিজস্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তায় বৃটেন অহরহঃ উদ্বিগ্ন। এ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সম্পদের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় অর্থনিয়োগ করবে এ আশা বাতুলতামাত্র। India office সংক্রান্ত দীর্ঘসূত্রী আলোচনাই ব্রিটেনের নৈরাশ্যব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। Norway, Belgeum, Sweden প্রভৃতি দেশে আর্যবিদ্যানু-শীলনের গৌরবময় ঐতিহ্য এখন অবলুপ্তপ্রায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপকপদ বিলুপ্ত করে ঐ বিষয়কে আর্কিওলজি বা লিঙ্গুইষ্টিক্‌স্‌-এর সঙ্গে মিলিত করা হয়েছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অপঞ্জীকৃত আর্যবিদ্যাবিষয়ক পুঁথিপত্রের সংখ্যা প্রায় ৩০০০০।(৮) একমাত্র জার্মানীতেই এইগুলিকে যথাযথভাবে পঞ্জীভুক্ত করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঠ্যক্রমে আর্যবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি, পুঁথিপত্রের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামগ্রিক ঔৎসুক্য এই কয়টি দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে আর্যবিদ্যানুশীলনের যথার্থপ্রভাব একমাত্র জার্মানীতেই পড়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ সংঘাতেও যে এই প্রভাব বিলুপ্ত হয়নি তার নিদর্শন একমাত্র পশ্চিম জার্মানীতেই ১৫টি শিক্ষাকেন্দ্রে আর্যবিদ্যানুশীলন এখনও অব্যাহত।

জার্মানী ছাড়া অন্যান্য ২/১ টি ক্ষেত্রে আর্যবিদ্যানুশীলনের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। জড়বাদী ইউরোপের সাধারণ মানুষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও কোথাও কোথাও ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণায় নতুন উৎসাহ চোখে পড়ে। ভারত সংস্কৃতির গবেষকগণ আজও অতীত ভারতকে স্বপ্নের দৃষ্টিতে দেখেন। ভারতীয় আর্যহিন্দুদের জীবনাদর্শ, পারিবারিক জীবনের নীতিবোধ, একান্নবর্তী পরিবার সাধুসন্ত ও মহাত্মাদের জীবন চরিত—এসব বিষয়ে সাধারণ শিক্ষিত ইউরোপীয় জনসমাজের মধ্যে কৌতূহল এবং ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভ্রমপূর্ণ আকর্ষণ দেখা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত ধর্ম-প্রচারের প্রভাব চিন্তাশীল ও ধার্মিক জনগণের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান ব্রিটেনে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের কিছু হুজুগ দেখা গেলেও যুবসমাজের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আর্যবিদ্যাবিষয়ে যথার্থ শ্রদ্ধাবান যুবক বিরল। সেই তুলনায় জার্মানীতে নতুন করে গীতাপ্রচার সমিতির অভ্যুদয় এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্রস্থাপন এবং রাশিয়ায় সংস্কৃত ভাষাকেই ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্য পরিচায়করূপে গ্রহণ করা—আর্যবিদ্যানুশীলনের নবীন সম্ভাবনার সূচনা করে। ইউরোপের প্রতীয়মান ঐশ্বর্যের পেছনে যে অসন্তোষ ও অতৃপ্তি পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজকাল পাশ্চাত্য মনীষীরা গভীরভাবেই চিন্তা করছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এই কারণেই। সবকিছুর মধ্যেও সর্বহারা এই ভাব থেকে মুক্তির জন্য Filliozat চিকিৎসাবৃত্তি ত্যাগ করে আর্যবিদ্যানুশীলনে লিপ্ত হয়েছেন, মনীষী রোমা রোঁলা প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে আত্মার তৃপ্তি অন্বেষণ করেছেন এবং এ যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক Toynbee তাঁর বিখ্যাত উক্তি 'Salvation lies in the Indian way' এর মাধ্যমে আর্যবিদ্যানুশীলনকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১. Sanskrit and allied Indological studies in Europe—Dr. V. Raghwan. p 21.

২. British contribution to Indian studies—Sir Atul Chatterjee and Sir Richard Burn. London 1943. p 34-35.

৩. Asiatic Researches, Calcutta, vol I, 1788. p 354.

৪. Selections from Educational Records. pt. I (1781—1839) p 109.

৫. November, 1850.

৬. Report of the Hayfer Sub-commitre on Oriental, Slavonic, East European and African studies, London H. M. S. O. 1947

৭. সারস্বত সুষমা, মাদ্রাজ ১৯৫০

৮. Oriental and Asian Bibliography. J. D. Pearson. 1966. p 21—23 and Sanskrit and Allied Indological Studies in Europe (Dr. V. Raghawan) গ্রন্থের হিসাব অনুসারে।

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

এই গ্রন্থটিতে কেমন করে ঢুকে পড়েছে এই পংক্তিটি তা কেউ বলতে পারেন না। গ্রন্থটি হলো 'ঔচিত্য বিচার চর্চা'। আর পংক্তিটি হলো 'ক্ষেমেন্দ্র ইত্যক্ষয় কাব্যকীর্তিশ্চক্রে ন বৌচিত্য বিচার চর্চাম্' অর্থাৎ ক্ষেমেন্দ্র কাব্য জগতে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন ঔচিত্য বিচার চর্চা রচনা করে। এ গ্রন্থের লেখক ক্ষেমেন্দ্র।

ও গ্রন্থের ঐ পংক্তিটি দেখে পণ্ডিতদের মন মলিন হয়ে যায় এইজন্য যে, রসের ঔচিত্য বিচারের ক্ষেত্রে ক্ষেমেন্দ্রকেই আদিতম পুরুষ বলা যায় না। কারণ তাঁর (১০৫০ খৃঃ) বহু বহু আগেই এই ভারতের রসগুরু ভরত ঔচিত্য বিচারের প্রয়োজন বুঝেছিলেন, তিনি তাঁর নাট্য শাস্ত্রের ২৩.৬৯ শ্লোকে লিখেছেন— 'অদে শজো হি বেষস্থ ন শোভাং জনয়িষ্যতি।

মেখলোরসি বন্ধে চ হাস্যায়ৈবোপজায়তে॥

অনৌচিত্যাদৃতে নাস্য রস ভঙ্গস্য কারণম্।

ঔচিত্যোপনিবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥

অর্থাৎ যেখানে যা মানায় তাই পরলেই শোভা, কটির মেখলা বুকে পরলে শোভা হয় না, তাতে হাসিই পায়। ঠিক ঐ রকমই হয় অনৌচিত্য নিবন্ধনে। অনৌচিত্যে যেমন রস ভঙ্গ হয় তেমনটি আর কিছুতে হয় না। রসের চরম উৎকর্ষ ঔচিত্যবোধে।

অতএব বলা যায় না ক্ষেমেন্দ্রই রসচর্বণার ক্ষেত্রে 'ঔচিত্য বিচারকে' নতুন আমদানি করেছেন। তবে বলা যায় ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্য বিচারের যে পদ্ধতি সেটি অভিনব। এবং সেটি তাঁর আগে অমন জোরের সঙ্গে আর কোনও রসিক বলেন নাই। ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন রসের চমৎকারিত্ব আছে ঔচিত্য বোধে। এবং সেই ঔচিত্যই হলো রসের প্রাণ। আমি সেই বিচারই করছি—

ঔচিত্যস্য চমৎকার কারিণশ্চারু চর্বণে।

রস জীবিত ভূতস্য বিচারং কুরুতেহ ধুনা॥ ঔচিত্য ৩।

কথাটা এই যে যেটা যার উচিৎ, যেটার সঙ্গে যার খাপ খায়, তারই নাম 'ঔচিত্য'

উচিতং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ।

উচিতস্য চ যো ভাব স্তদৌচিত্যং প্রবক্ষ্যতে॥

অতএব আপনারা পরিষ্কার জেনে রাখুন রসসিদ্ধ কাব্য শাস্ত্রের প্রাণই হলো ঔচিত্য।

ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্॥ ঐ ৫

পণ্ডিতবৃন্দ দেখেছেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হয়ে ক্ষেমেন্দ্র এসেছিলেন এই ভারতে এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃতিত্ব স্থাপন করে গিয়েছে তাঁর রচিত ত্রিশ খানি গ্রন্থে—বৃহৎ কথামঞ্জরী, ভারতমঞ্জরী, রামায়ণ মঞ্জরী, পবনপঞ্চাশিকা, সুবৃত্ততিলক, বিনয় বল্লী, লাবণ্যবতী, মুনিমত মীমাংসা, নীতিলতা, অবদান কল্পলতা, অবসর সার, ললিত রত্নমালা, মুক্তাবলি কাব্যম্, বাৎস্যায়ন সূত্রসার, ঔচিত্য বিচার

চর্চা, পদ্মকাদম্বরী, শশিবংশ কাব্যম্, দেশোপদেশম্ নর্মমালা, চিত্র ভারত, কনক জানকী অমৃত তরঙ্গ, চতুর্বর্গ সংগ্রহ, কবিকণ্ঠাভরণ, দর্পদলন, কলাবিলাস, সময় মাতৃকা, সেব্য সেবকোপদেশ, দশাবতার চরিতম্ এবং চারু চর্য্যা।

ক্ষেমেন্দ্রের এইসব গ্রন্থের প্রকাশ অদ্যাবধি একটি কোন পুস্তক প্রকাশালয় থেকে হয় নি। কতকগুলি পুনা আনন্দ আশ্রম, কয়েকটি বোম্বাই-এর বেঙ্কটেশ্বর প্রেস আর কয়েকটি করেছেন কাশী চৌখাম্বা এবং মাষ্টার খেলাড়ী লাল এণ্ড সন্স। তবে প্রায় ছাপা হয়ে গিয়েছে এবং এটিতে ওটিতে যে সব গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়—সেগুলির সবই ক্ষেমেন্দ্রের রচিত।

ক্ষেমেন্দ্রের রচনায় পাওয়া যায় তাঁর পূর্ববর্তি কবি, আলঙ্কারিক দার্শনিক ও নিজের অধ্যাপকের নাম ও তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ক্ষেমেন্দ্র সেইসব নাম এবং নিজের গ্রন্থের মধ্যে নিজের জীবন কথারও পংক্তি রচনা করেছেন। সেগুলি সংগ্রহ করলে জানা যায় তিনি সর্বাধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন প্রথমে মহাকবি ব্যাস, তারপর কালিদাস, তারপর রাজশেখরের প্রতি।

ঐসব নামগুলি এই—ব্যাস, উৎপলরাজ, তুঞ্জীর, কলশ, কালিদাস, ভাস, হর্ষ রত্নাকর, পরিমল, বল্লট, গৌড়িনক, রাজশেখর, ইন্দুরাজ, বীরদেব, সাহিল, ভট্টনারায়ণ, দীপক, মুক্তাকন, শ্যামল, ভবভূতি, লাটডিণ্ডির, রিসলো, যশোবর্মা, চক্র, বাগভট্ট, ভর্তৃমেণ্ঠ, অভিনন্দ, মাঘ, পরিব্রাজক, গঙ্গক, (ইনি ক্ষেমেন্দ্রের অধ্যাপক বলে লিখেছেন) ভারবি, ভর্তৃহরি, চন্দ্রক, শিবস্বামী, ইন্দ্রভানু, ময়ুর, মুক্তিকলশ, দামোদর গুপ্ত, ভট্টবাচস্পতি, ভট্টভল্লট, বিদ্যানন্দ, মাতৃগুপ্ত, বাণ, মালবরুদ্র, কার্পটিক, প্রবরসেন, মুক্তাপীড়, অমরু, অনন্দ বর্ধন, ভট্টপ্রভাকর, ধর্মকীর্তি ভট্টলট্টন কুমারদাস, মালব কুবলয়, বরাহমিহির, গন্দিনক, ভট্ট উদয় সিংহ ও রাজপুত্র লক্ষ্মণাদিত্য (শেষের দুজন ক্ষেমেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন)। ক্ষেমেন্দ্র এসব নামের উল্লেখ করেছেন তাঁর কবি কণ্ঠাভরণ ঔচিত্য বিচারচর্চা এবং সুবৃত্ততিলকে।

ক্ষেমেন্দ্রের জন্ম এবং তিরোধন কাল জানা যায় তাঁরই রচিত গ্রন্থাবলির পংক্তি ধরে। ভারত মঞ্জরীতে লিখেছেন—

আচার্য্য শেখর মণেঃ বিদ্যাবিবৃতি কারিণঃ।
শ্রুত্বাভিনব গুপ্তাখ্যাৎ সাহিত্যং বোধবারিধেঃ॥

ক্ষেমেন্দ্র প্রসিদ্ধ দার্শনিক অভিনব গুপ্তের কাছে সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই অভিনব গুপ্ত তাঁর প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনের ব্যাখ্যাটি ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। তারই সূত্রধরে আলোচনা করলে মনে করা যায় যে গুরু শিষ্যের রচনা ব্যবধান অন্ততঃ ২৫ বৎসর। অর্থাৎ ৯৯০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময় ক্ষেমেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর তার দশাবতার রচিত কাব্যের সূত্র ধরলে জানা যায় তিনি শেষ জীবনে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং ত্রিপুরেশ পর্বতে অবস্থান করতেন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত ওইখানেই ছিলেন। তাতে মনে করা হয় ক্ষেমেন্দ্রের মৃত্যুকাল ১০৬৫ খ্রীষ্টাব্দে।

এর আর একটি কারণ দশাবতার চরিতে কলশের উল্লেখ রয়েছে। সেই কলশ ছিলেন কাশ্মীরের রাজা। তারই তখন শাসনকাল। কবি কণ্ঠাবরণ, ঔচিত্যবিচার চর্চা, সুবৃত্ততিলক এবং সময়মাতৃকা গ্রন্থের রচনা শেষ করে কবি অনন্তের প্রশস্তি রচনা করেছেন। অনন্ত ছিলেন কলশের পিতা। অনন্তের কাল ১০২৮ থেকে ১০৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। এবং কলশের কাল ১০৬৩-১০৮৯। এই

সময়ের পরেই ক্ষেমেন্দ্রের জীবনাবসান ঘটেছে। অতএব ক্ষেমেন্দ্রকে ধরা যায় তিনি একাদশ শতকের একটু আগে এবং একটু পরে।

ভারত মঞ্জরীতে ক্ষেমেন্দ্র নিজের পিতার বেশ দীর্ঘ প্রশস্তি রচনা করেছেন তাতেই জানা যায় তিনি ছিলেন বিশাল সম্পত্তির মালিক, উদার চরিত্র, দাতা, এবং পরদুঃখ কাতর। অতএব ক্ষেমেন্দ্র সুখী ও সম্পন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন, এবং নিজে বিবাহিত জীবন যাপন করেছিল আর সোমেন্দ্র নামে এক যোগ্য পুত্রের জনকও হয়েছিলেন।

কবি কণ্ঠাভরণের ৪।৩ শ্লোকে লিখেছেন

কৃত্বা নিশ্চলদৈব পৌরুষময়োপায়ং প্রসূত্যৈ গিরাম্।
ক্ষেমেন্দ্রেণ যদর্জিতং শুভফলং তে পাতু কাব্যার্থিনাম্॥

অতএব তাঁর কবিত্বশক্তি যতটা বিকশিত হয়েছিল দেবী সরস্বতীর উপাসনায় ততটা কিন্তু স্বাভাবিক প্রতিভায় স্ফুরিত হয় নাই। অর্থাৎ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অনুধ্যান এবং মন্ত্রাত্মক সরস্বতী উপাসনাও তিনি করেছিলেন।

তবে ক্ষেমেন্দ্রের জীবন পরিবেশ ছিল গুণিবৃন্দের সমাবেশের মধ্যে। তিনি নীরস তর্কশাস্ত্র এবং নীরস ব্যাকরণ শাস্ত্র চর্চায় বেশীদিন কাটান নাই, সে সব চর্চাকে তিনি সুকোমল সাহিত্য জীবনে বিঘ্ন মনে করতেন "ন তার্কিকং কেবল শাব্দিকং বা কুর্য্যাদ্ গুরুং সূক্তি বিকাশ বিঘ্নম্। কবি কণ্ঠাভরণ ১।১৫

যস্তু প্রকৃতশ্ম সমান এব কষ্টেন বা ব্যাকরণেন নষ্টঃ।
তর্কেন দগ্ধোনৈল ধূমিনা বা প্যাবিদ্ধ কর্ণঃ সুকবি প্রবন্ধৈঃ। কবি ক ১।১২
যঞ্চেৎ পুনস্তার্কিক গন্ধমুগ্রম্। কবি ক ১।১৯

ক্ষেমেন্দ্রের জীবনে মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যামৃতের পান প্রচুর ঘটেছে—পঠেৎ সমস্তান্ কিল কালিদাস কৃত প্রবন্ধনিতিহাসদর্শী॥ কবি ক ১।১৯

তাছাড়া তাঁর জীবন কাটতো, অভিধান পাঠ, গান শোনা, গাথা শোনা, দেশীয় ভাষায় রচিত কাব্য শোনায়—গীতেষু গাথাস্বথ দেশভাষা কাব্যেষু দদ্যাৎ সরসেষুকর্ণম্। কবি ক ১।১৭

ক্ষেমেন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ছিলেন উজ্জ্বল চরিত্রের, এবং নিজেও ছিলেন মার্জিত রুচির কথাশিল্পী এবং উজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত। বেশী সময় যেত তাঁর সম-সাময়িক নাটক দেখায়, এবং ভাল ভাল রচনার গান শোনায়। তাছাড়া ভাল ভাল নাম করা কবিদিকে দেখতে যেতেন তাঁদের কাব্যচর্চা শুনতেন, নিজের বাড়ীতে এনে তাদের প্রচুর সমাদর করতেন। এসব কথা লিখেছেন কবি কণ্ঠাভরণে

নাটকাভিনয় প্রেক্ষা শৃঙ্গারালিঙ্গতামতিঃ।
কবীনাং সস্তবে দানং গীতেনাত্মাধিবাসনম্॥ ঐ ২।৫

ক্ষেমেন্দ্রের ছিল লোকাচার বোধ প্রচুর। লোকোক্তির সংগ্রহ, সাধারণ শ্রেণীর পুরুষ, রমণীদের আচার ব্যবহার, কথোপকথন, তাদের বেশভূষায় অনুরাগ বিরাগের মাধ্যমে মনোবিশ্লেষণ, চিত্রকলা রচনার মাধ্যমে মনস্তত্ত্বের অনুশীলন, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনার মাধ্যমে মানবিকতাবোধ, এসব তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য শ্লোক রচনা, দেশদেশান্তরে ভ্রমণের দ্বারা ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জন করা এইসব অভ্যাস তাঁর জীবনে আপনা আপনি স্ফূর্ত হতো।

এসব তথ্য জানা যায় তাঁর অমর গ্রন্থ 'সময় মাতৃকা' গ্রন্থেতে' (এটি কাশীতে এখন ছাপা হয়েছে)।

ক্ষেমেন্দ্র কোন ধর্মে অনুরক্ত ছিলেন তা জানা যায় 'ভারত-মঞ্জরী' গ্রন্থে। পণ্ডিতরা জানেন শৈব-দর্শন এবং শৈবধর্মের পীঠভূমি কাশ্মীর। সেই পবিত্র কাশ্মীরেই ক্ষেমেন্দ্রের পিতা পরম নিষ্ঠার সঙ্গে শৈবধর্ম পালন করেছিলেন, তারই ফলে ভগবান শঙ্করেরই করুণাবরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। এবং সেই শঙ্করের প্রতিমা আলিঙ্গন করেই তার পিতা শিবধামে অনন্তকালের প্রবাসী হয়েছিলেন।

অতএব শৈব পিতার আশ্রয়ে থেকে ক্ষেমেন্দ্র স্বতঃই শৈব ছিলেন। এবং পিতার শৈবধর্মের অনুরাগ ভক্তির দ্বিতীয় বীজাঙ্কুর ক্ষেমেন্দ্রেই নিহিত হয়েছিল নিঃসন্দেহে। সেই বীজ পল্লবিত হয়েছিল শিক্ষাগুরু অভিনব গুপ্তের সাহচর্যে। কিন্তু মহাকালের এক বাতাস এসেছিল ক্ষেমেন্দ্রের জীবনে যাতে ভেসে এসেছিল বৈষ্ণবের মহাভাগবতীয় একটি অক্ষয় বীজ। যে বীজটি ক্ষেমেন্দ্রের জীবনের চরম কালতক সঞ্জীবিত হয়ে মহীরুহরূপে পরিণত হয়েছিল।

সে বাতাস ব'য়েছিল অন্যতম দীক্ষাগুরু সোমপাদ নামে এক বৈষ্ণবের আগমনের দ্বারা। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর প্রতি সর্বাধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাই মঞ্জরীতে লিখেছেন—

শ্রীমদ্ ভাগবতাচার্য সোমপাদাব্জরেণুভিঃ।
ধন্যতাং পরাংপ্রাপ্তো নারায়ণ পরায়ণ॥ (ভারত মঞ্জরী)

তাছাড়া তাঁর অপর একখানি গ্রন্থ 'বৃহৎ কথামঞ্জরী'র ১৯।৩৭ শ্লোকেও তা লিখেছেন।

ক্ষেমেন্দ্র ওই দুইখানি গ্রন্থে একথাও লিখেছেন যে, তাঁর সর্বাধিক প্রিয় গুরু অভিনব গুপ্ত অপেক্ষা বৈষ্ণবগুরু সোমপাদই তাঁর মনকে বেশী আকৃষ্ট করেছেন। এবং তারই ফলে তিনি সারাটি জীবন ভাগবত বৈষ্ণবধর্মেই চিত্তমন সমর্পণ করেছেন। এরই ফলে এই 'দশাবতার চরিত' কাব্যের উদয়।

ক্ষেমেন্দ্র কিন্তু ভাগবতধর্মের অন্ধ অনুরাগী ভক্ত ছিলেন না। তিনি অন্যান্য ধর্মের প্রতিই প্রচুর সমাদর জ্ঞাপন করেছেন। একথা লিখেছেন কবি কণ্ঠাভরণের ২।১৯ শ্লোকে—সাম্য সর্বসুরস্তুতৌ···। এই ভাবে সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনটি ছিল তার অকপট। তাই 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের প্রতি প্রণতি জ্ঞাপন করে তাঁর জন্মজন্মান্তরের পবিত্র কাহিনীগুলিকে সুন্দর শব্দ যোজনার দ্বারা মনোরম কাব্য রচনা করেছেন। এই গ্রন্থটিকে তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করা হয় পরবর্তীকালে। এই গ্রন্থটিকে ভারতীয় বৌদ্ধসমাজে এত বেশী সমাদর করা হয় যে একজন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবের রচিত এ গ্রন্থ এমন ধারণাও তারা করেন না।

ক্ষেমেন্দ্র কতদিন জীবিত ছিলেন এবং কত খৃষ্টাব্দের পুরুষ ছিলেন তা জানার উপায় নিজেই করে গিয়েছেন, তিনি কাশ্মীরের গণনারীতিতে তৎকালের সূচনা দিয়ে বলেছেন—'সংবৎসরে পঞ্চবিংশে পৌষ শুক্লাদি বাসরে। শ্রীমতাং ভূতিরক্ষায়ৈ রচয়িতাহয়ংস্মিতোৎসবঃ। (সময় মাতৃকা) স্থানীয় গণনায় ওটি ১০৫০ খৃষ্টাব্দ হয়।

শিল্পে-সুষমায় ও লোকাচারে বড়ি

পূর্ণচন্দ্র দাস

আলপনা অঙ্গ থেকে বেরিয়ে কেবল আঙিনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখল না, সৌন্দর্যের গুণে খাদ্যেও সে তার স্থান করে নিল। আলপনার অনুপ্রবেশে খাদ্য তখন কেবল খাদ্যবস্তু হয়েই রইল না পরিণত হল শিল্পে। যে খাদ্য-শিল্পগুলি সাধারণ লোকের জীবিকার সাহায্য করে তাদের মধ্যে বড়ির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বড়া ও বড়ির, দু'টির প্রধান উপাদান এক হলেও খাদ্যের রূপ পাওয়ার বেলায় একটি কাঁচা অবস্থায় তৈল-পক্ক করতে হয় অপরটি তৈরীর পরে শুকিয়ে নিয়ে তৈল-পক্ক করে। যদিও পল্লী-বাংলার গার্হস্থ্যধর্মে গৃহলক্ষ্মীদের মতে বড়ির হাত না করে নবান্নের হাঁড়িতে হাত দিতে নাই। আবার উড়িষ্যার খাদ্য তালিকায় বড়ির স্থান সম্বন্ধে ষষ্ঠি-মঙ্গল পালার সাধ ভক্ষণের লোকসঙ্গীতে আছে—

'মুগভাঙা দেই খেচুড়ি রাঁধিব
নড়িয়া দেব মিশাই,
বাইগনকু পুড়ি তাঁহি মিশিব ফুল-বড়ি গো,
শ্বেত-পুরনিরে সরিষা পিয়াজ,
খোসলারে সীম বড়ি।'

(নারিকেল দিয়ে মুগের ডালের খিচুড়ি। বড়ি দিয়ে বেগুন পোড়া। সর্ষেবাটা পেঁয়াজবাটা দিয়ে শ্বেত-পুনর্ণবা শাক। সীম, বড়ি ও নটে শাকের চচ্চড়ি অতি উপাদেয় খাদ্য।)

বড়ি নবান্নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ কেন? সে বিষয়ে প্রথমে পাঠক সাধারণের কৌতূহল নিরসনের প্রয়োজন।—বড়ির প্রধান মালমসলা হল বিউলি কড়াই ও চাল কুমড়ো। এ দু'টির মধ্যে প্রথমটির উৎপাদনে কম-বেশীর মাধ্যমে কৃষক তার বৎসরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানতে পারে। বিউলিকে আলোচ্য অঞ্চলে বিরি বলে। বর্ষার প্রারম্ভেই ডাঙ্গায় লাঙ্গল দিয়ে বিরি ছড়িয়ে দেয়। পাকা ধান আমদানী হওয়ার আগেই বিরি আমদানী হয়ে যায়। অভিজ্ঞ কৃষক একটি গাছের চার পাঁচটি শুঁটির ভিতরকার দানার গড় নির্ণয় করে। বিঘা প্রতি কত মণ করে ধান হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারেন। ডাক সংক্রান্তির দিন ধানগাছের রোগনাশক ওষধিগুলির সঙ্গে বিরিকেও পলাশ পাতায় পোঁটলা বেঁধে ধানের ক্ষেতে ফেলে দেয়। এতে ধানগাছ নিরোগ হয় ও বিরির মত ফলন হয় বলে ধারণা।

দ্বিতীয়টি হল চাল-কুমড়ো। ঘরের চালের উপর এই কুমড়ো হয় বলে এর নাম চাল-কুমড়া। কিম্বদন্তী আছে লাউ ও চাল-কুমড়োর ফলনের কম বেশীর দ্বারা গৃহস্থের আসন্ন-প্রসবা স্ত্রীর পুত্র হবে কি কন্যা হবে সে বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করা যায়। বয়স্করা বলেন লাউ বেশী হলে কন্যা আর চাল-কুমড়ো বেশী হলে পুত্র। পুত্রের ভবিষ্যৎবাণী বহনকারী এই চাল-কুমড়োকে পুত্র কন্যার মঙ্গলের জন্য কালী পূজা ও দুর্গা পূজায় পুত্র কল্পনা করে বলি দেওয়া হয়। তাই মেয়েদের চালকুমড়ো কাটতে নেই।

তরকারীর জন্যই হোক বা বড়ির জন্যই হোক চাল-কুমড়ো ছেলেদের দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া হয় এই সব কারণেই নবান্নের সঙ্গে বড়ির গাঁটছড়া বাঁধা।

গৃহস্থ কৃপণ কি দাতা সেটি স্থির হয় বড়ি দেওয়ার দিন। এইদিন যদি কুয়াসা বা মেঘ হয়, তাহলে গৃহস্থ কৃপণ বলে প্রতিপন্ন হন। বড়ি দেওয়ার দিনের আবহাওয়ার উপর গৃহস্থের আত্মসম্মান নির্ভর করে।

এগরা থানার পুষ্প মহান্তি বললেন 'মূলো, মানকচু, পেঁপে প্রভৃতি ফলমূলের শাঁসের সঙ্গে নানান ডালের সংমিশ্রণে বা শুধু ডাল দিয়েও বড়ি তৈরী হয়। ঐ বড়ি যে কোন লোক তৈরী করতে পারেন কিন্তু চালকুমড়ো ও বিরি দিয়ে বড়ি দেওয়া, যাঁদের বংশে বড়ির হাত আছে তাঁরাই কেবল দিতে পারেন। অন্য লোকে দিতে পারেন না। চালকুমড়োকে পুত্র বা বংশ বলে কল্পনা করা হয় তাই এটি 'বংশাবলি'। না মানলে অনেক অঘটন ঘটতে পারে।'

বড়ি দেওয়াকে একটি উৎসব বললেও অত্যুক্তি হয় না। লক্ষ্মী পূজা, ষষ্ঠী পূজা, কার্তিক পূজা প্রভৃতি বার-ব্রতের উৎসবগুলিতে যেমন পাড়া-পড়শিদের নেমন্তন্ন করা হয় ঠিক তেমনি বাড়ীতে কাজকর্ম করার জন্য যত লোক থাকুক না কেন নবান্নের দিন যে বড়ি দেওয়া হয় ঐদিন পাড়া-পড়শির বৌ ঝিদের বিরি বাটা ও বড়ি দেওয়ার জন্য ডাকতে হয়। বড়ি-উৎসব এক মহা হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার।

ফুল বড়ি, বাতাসা বড়ি, জিলাপি বড়ি, আলপনা বড়ি, নারিকেল বড়ি, দাঁতিয়া বড়ি, নিম বড়ি প্রভৃতি নানান রকমের বড়ি তৈরী হয়। বড়ি দেওয়ার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে শীতকাল। স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করে শাশুড়ী, বউ, মেয়ে সবাই নতুন কাপড় পরে বড়ি দেওয়ার আসরে নেমে পড়েন। যিনি সবচেয়ে বয়সে বড় ও গুরুজন তিনিই এক লাইনে তিনটি বড়ি দেন তিন পুরুষের নাম করে। আর ঐ বড়ির মাথায় সিঁদুর দিয়ে তিনটী দুর্বা পুঁতে দিয়ে তার উপর ধান ছড়িয়ে দেন। ঐ সময় শঙ্খধ্বনি করা হয় ও সবাই প্রণাম করেন। আর মুখে বলেন—

নূতন কাপড়—পুরাতন ভাতে
দিন কাটুক মা—বড়ি হাতে।

এরপর সবাই বড়ি দিতে আরম্ভ করেন। বড়ি শুকিয়ে গেলে সমস্ত পাড়া প্রতিবেশীদের বড়ি বিলান হয়।

ফুলবড়ি দিতে হলে যে দিন বড়ি দেওয়া হবে তার দু'দিন আগে চালকুমড়োকে লম্বালম্বিভাবে কেটে গিল কাঁটা বা দাঁতওয়ালা ঝিনুক দিয়ে কুরে ফেলতে হয়। কুরোনো শাঁষটি একটি পাতলা কাপড় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় জল ঝরে যাওয়ার জন্য। বড়ি দেওয়ার জন্য প্রথমে বিরিকে চাপে ভেঙে নেয়। তারপর ঐ ভাঙা বিরি বা বিরির ডালকে জলে ভিজিয়ে রাখে। জল পেয়ে ডালগুলি যখন ভিজে যায় তখন সেগুলিকে খুব ভাল করে ধুয়ে নিতে হয় যাতে ডালের গায়ে একটুও খোসা না থাকে। যেদিন বড়ি দেওয়া হবে তার আগের দিন বিকেল বেলায় ভিজা ডালকে মসৃণ করে বেঁটে সমস্ত রাত শিশিরে বসিয়ে রাখে আর চাল-কুমড়োর শাঁষকে ঘুঁটের ছাইগুঁড়ো করে নীচে দিয়ে উপরে একটা কাপড় পেতে তার উপর চাল-কুমড়োর শাঁষ বিছিয়ে দেয় যাতে ওটি শুকিয়ে একেবারে

ঝরঝরে হয়ে যায়। পরদিন সকালে ঐ বিরি বাটা ও চালকুমড়ার শাঁস একসঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ওতে মসলা দেওয়া হয় পাঁচফোড়ন, জিরে গুড়ো, তেজপাতাগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো। গুঁড়ো করার আগে এগুলোকে ভেজে নিতে হয়। আর দেওয়া হয় আদা বাঁটা। সব ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে পরে অল্প অল্প করে একটা জায়গায় তুলে নিয়ে ফেনাতে হয়। অর্ধেক ফেনানো হলে তাতে নুন দিতে হবে, তারপর আবার ফেনাতে হবে। ফেনানো ঠিক হল কিনা দেখার জন্য জলের উপর একটু ফেলে দেখতে হয়। যদি জলে ভাসে তাহলে ঠিক ফেনানো হয়েছে। তারপর বড়ি দেয়। ফুল বড়ির আকার এক একটি ছোলার মত। দশ বারোসের একটা চাল-কুমড়োয় তিন চার সের বিরির প্রয়োজন।

বাতাসা বড়ি ফুলবড়ির মত নিয়মেই করা হয়। এতে কুমড়োবীচির খোসা ছাড়িয়ে মেশান হয়। বাতাসা বড়ি আকারে ফুল-বড়ির প্রায় পাঁচ গুণ। বড়ি দেওয়ার জায়গাটিতে প্রথমে একটু তেল ঘসে নিয়ে পরে দেওয়া হয়। আধাআধি শুকনো হওয়ার পর কাপড়ের সাহায্যে ছায়া করে বড়ি শুকোতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বড়ির গায়ে বেশী রোদ না লাগে।

লতাবড়ি বা আলপনাবড়িতে চাল-কুমড়োর প্রয়োজন হয় না শুধু বিরির ডাল দিয়ে করে। সমস্ত নিয়মই ফুলবড়ির নিয়মের মত। আলপনাবড়ি দেওয়ার পূর্বে ডাল বাটাকে আর একবার বেটে নিতে হয়। যেখানে বড়ি দেওয়া হবে সেই জায়গাটার উপরে বেশী করে পোস্তদানা ছড়িয়ে দেয়। এক টুকরো নতুন কাপড়ের ছোলার মত একটা ফুটো করে নিয়ে ফুটোর চারিদিক ভাল করে সেলাই করে যাতে ফেঁসে না যায়। তারপর ওর মধ্যে ডাল বাটা দিয়ে কাপড়টার চারদিক মুঠোর মধ্যে পুরে ধীরে ধীরে চাপ দিলে কাপড়ের ফুটোর ভেতর দিয়ে সরু হয়ে ডালের কাই বেরোতে থাকে। শিল্পী ছড়ানো পোস্ত দানার উপর লতা-পাতা, ফুল, লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ, হাতী, খরগোস ইত্যাদি নানান আকারের বড়ির রূপ দেন। আলপনা বড়িও অর্ধেক শুকনো হওয়ার পর তার উপর পাতলা কাপড় ঢাকা দিয়ে শুকনো করা হয়।

জিলাপী বড়িতেও চাল-কুমড়ো দেওয়া হয় না। এর নিয়মও আলপনা বড়ির মত। এতেও অর্ধেক ফেনিয়ে নুন দেওয়ার সময় অল্প কালজিরে মিশিয়ে দিতে হয়। জিলাপী বড়ি দেওয়ার জায়গায় পোস্ত ছড়ানো হয় না, সরষের তেল ঘসে দিতে হয়। শুকোনোর ব্যবস্থা আলপনা বড়ির মত।

দাঁতিয়া বড়ি দেওয়া হয়, বিরি ভাঙার সময় যে সমস্ত অপুষ্ট বিরি ও বিরির কণা থাকে সেগুলিকে বেঁটে। এতেও চাল-কুমড়োর বীচি দেওয়া হয়। এ বড়ি দেওয়া হয় কলাপাতার উপর, বড়িগুলি হয় চ্যাপটা, আয়তনে এক একটা রূপোর টাকার মত।

নারিকেল বড়িতে বিরির ডাল বাটা ও নারিকেল কুরা সমান পরিমাণ দিতে হয়। এগুলির আকার বাতাসা বড়ির মত। সব সময় নিমপাতা পাওয়া যায় না বলে বুদ্ধিমান গৃহস্থ নিমপাতা বেঁটে নিমবড়ি করে রেখে দেন।

বড়িতে পোকা না ধরার জন্য কালোজিরের ভাগ নির্ণয়ই শিল্পীর বাহাদুরী। বড়ির ভাঁড়ের মধ্যে নিমবড়ি ও বেবুনা পাতা ছড়িয়ে রাখলে বড়িতে পোকা ধরে না।

বড়ি না হলে পাকা রাঁধুনীর রান্নার অঙ্গহানি ঘটে। কথায় বলে—

ঝোল ঝালে কি অম্বলে, সবটাতেই বড়ি চলে॥

ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন ॥ শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়-সংকলিত ও সম্পাদিত। শিক্ষা অধিকার-ত্রিপুরা কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য : কুড়ি টাকা

ভারবর্ষের পূর্বপ্রান্তে যে ছোট্ট দেশীয় রাজ্যটি অরণ্য ও পর্বতের ছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছিল নানা কারণে তার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্য নিতান্তই ছোট; পঞ্চদশ যোড়শ শতাব্দীতে কিছু শক্তিমান নরপতি যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্য প্রদর্শন করে এই রাজ্যটিকে পূর্বাঞ্চলীয় নিভৃতি থেকে ইতিহাস প্রবাহের মধ্যস্রোতে এনে ফেলেছিল। কিন্তু সে গৌরব স্বল্পকালীন। রাজস্ব সামান্য, জনসাধারণ অশিক্ষিত, পথঘাট অরণ্যপর্বতে বাধাগ্রস্ত, নিজস্ব উৎপাদনের তালিকায় গৌরব করার মত কিছু নেই কিছু সৌখীন হাতের কাজ ছাড়া; ভারতবর্ষের মত এই বিরাট দেশে দাগ কাটবার আর কিই বা থাকতে পারে তার। এ প্রশ্ন মনে ওঠা স্বাভাবিক।

'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট সংকলন'-এ প্রশ্নের ব্যর্থহীন উত্তর যুগিয়ে দিয়েছে। ত্রিপুরার যা পরম গৌরব তা তার যুদ্ধকীর্তি নয়, মন্দির মসজিদ নয়, তা তার বাংলা ভাষা। আজ একথা সকলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে পৃথিবীর মধ্যে বাংলা ভাষাই প্রথম রাষ্ট্রভাষা হয়েছে আজকের মুজিবর রহমানের বাংলাদেশে নয়, মানিক্য-রাজাদের ত্রিপুরা রাজ্যেই। এ কথাও জানা দরকার যে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন কলকাতার শহরে বাংলাগদ্য রসের রাজপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন দূর ত্রিপুরার রাজদরবার পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির ঐতিহ্য অনুসারে ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলাভাষার একটি কাজ চালানো রূপ গড়ে তুলছেন। বাংলা গদ্য দীর্ঘকাল ত্রিপুরা রাজদরবারের ব্যবহারের ভাষা। কল্যাণমাণিক্য এবং গোবিন্দমাণিক্যের দানপত্র পাওয়া গেছে বাংলায়। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ-মাণিক্যের বাংলায় লেখা একটি দানপত্র পাওয়া গেছে : 'শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্যদেব বিষমসমর-বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামা…রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণে মৌজে পাঁচথুপি। ভূমি ব্রহ্মোত্তর কামদেব পণ্ডিত পাইছিল অখনে সেই ভূমি বেটা শ্রী…পণ্ডিতেরে দিলাম। প্রিতে ব্রহ্মোত্তর এই ভূমি নিজ হাতে হালে চাষ করিঅ সুখভোগ করৌক।' মহারাজ রাজধরমাণিক্যের আমলের মুদ্রা বাংলা হরফে লেখা—'শ্রীশ্রীযুত রাজধর মাণিক্যদেব শ্রীসত্যবতী মহাদেবৌ।' বাংলা ভাষায় বাংলা হরফে অন্য কোন মুদ্রা অন্য কোথাও পাওয়া গেছে বলে জানি না। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য এবং মহারাজ জগৎ মাণিক্যের আদেশে রচিত কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গেছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কবিরা বলেছেন যে রাজাদেশেই তাঁরা সাধারণ লোকের বোঝবার জন্য কাব্য লিখেছেন বাংলাভাষায়।

উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরার রাজদরবার এই প্রাচীন ধারার অনুসরণ করেছে। যাবতীয় রাজকার্য বাংলায় চলেছে। ঈশানমাণিক্য থেকে সুরু করে ত্রিপুরার শেষ স্বাধীন নৃপতি বীরবিক্রমের আমল পর্যন্ত (প্রায় আশী বছর) অসংখ্য রোবকারী বাংলা ভাষায় জারী করা হয়েছিল। সেইগুলি

সব একত্রে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলাসাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে সরে থেকেও ত্রিপুরা রাজ্যে এক অতি বলিষ্ঠ বাংলা গদ্যভঙ্গীর সৃষ্টি হয়েছিল। আর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হলো এই যে এই বাংলাগদ্যভঙ্গী যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরা ছুৎমার্গবাদী ছিলেন না। তৎসম শব্দ ছাড়া আর কিছু চলবে না এই সংকীর্ণতা তাঁদের ছিল না। তাঁরা অবলীলাক্রমে ফরাসী আর ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করে বাংলাগদ্যকে সতেজ করেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সংকলন কেবল বিংশ শতাব্দীর গেজেট থেকে, তাই উনবিংশ শতাব্দীর দু'একটি রোবকারী এখানে তুলে দিলে দেখা যাবে যে আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলাভাষা শুধু সাহিত্য হিসাবে নয় রাজকার্যের উপযোগী ভাষা হিসাবেও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। দুটি রোবকারী এখানে উদ্ধার করা গেল :

১। রোবকারী কাছারী এলাকে রাজগী পর্বত ত্রিপুরা
হুজুর শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ॥
ইতি সন ১২৭১ ত্রিপুরা তারিখ ১৬ই শ্রাবণ।

এ পক্ষ বাতব্যাধি পীড়াতে শারীরিক কাতর হওয়া প্রযুক্ত রাজত্ব ও জমিদারী শাসন বিষয় কার্য সুচারুমতে নির্বাহ হইতেছে না, এবং যে প্রকার ব্যামোহ ৶ ইচ্ছাধীন কোন সময়ে প্রাণবিয়োগ হয় তাহারও নিশ্চয় নাই। এ মতেই ও পক্ষের খানদানের চিররীতি মতে ঐ কার্য নির্বাহ তদর্থক যুবরাজ ও বরঠাকুর নিযুক্ত করা প্রয়োজন, সে মতে হুকুম হইল যে—

যুবরাজী পদে এ পক্ষের ভ্রাতা শ্রীলশ্রীমান বীরচন্দ্র ঠাকুর ও বরঠাকুরী পদে প্রথম পুত্র শ্রীল শ্রীমান ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ঠাকুর ও কর্তাপদে দ্বিতীয় পুত্র শ্রীল শ্রীমান নবদ্বীপচন্দ্র ঠাকুরকে নিযুক্ত করা যায় ও এ বিষয়ের এত্তেলা স্বরূপ এই রোবকারীর এক এক কিত্তা নকল জেলা চট্টগ্রাম ও জেলা ঢাকা প্রদেশের শ্রীল শ্রীযুক্ত দায়ের সায়ের কমিসনার সাহেব বাহাদুরান ও জেলা শ্রীহট্টের শ্রীল শ্রীযুক্ত জজসাহেব ও শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব ও শ্রীযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরান হুজুরে প্রেরণ করা হয় ইতি।

মোকাবিলা—শ্রীগুরুদাস বর্ধন পেস্কার শ্রীশ্রীসহী

(কারো কারো মতে এই রোবকারী আসল নয় জাল। সে তর্কে আমাদের কোন কাজ নেই। আমাদের বক্তব্য এইটুকু যে জাল হলেও ঐ তারিখেই বা দুচার দিনের মধ্যেই হয়েছে। সুতরাং এ রোবকারী প্রায় একশো বছর আগেকার বাংলাকে বহন করছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঈশানমাণিক্যের গুরু ঐ সময় রাজ্য পরিচালনা করতেন। তিনি নাম সই করতেন না। লিখতেন শ্রীশ্রীসহী

২। রোবকারী স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। সন ১২৯৯ ত্রিং তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন কোন স্থানে সতীদাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয়প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সে মতে হুকুম হইল যে,— এতদ্বারা উল্লেখিত সতীদাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কেনোস্থানে উক্তক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোবকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

যখন শ্রীনাজাপ্পা ত্রিপুরার চীফ কমিশনার ছিলেন তখন (১৯৫৪ সালে) ভাষাচার্য

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্রিপুরায় এই রোবকারীগুলি দেখবার সুযোগ পেয়ে তাঁকে যা লেখেন তার কিছুটা উদ্ধৃত করলে এই প্রসঙ্গে অন্যায় হবে না।

'Tripura has been a state which has been using Bengali as the language of administration for quite a long number of years. In fact the Tripura ruling house switched on to Bengali at least from the middle of 14th century. They have developed a very vigorous and beautiful style of Bengali for transacting state business. সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের (যা তখন পূর্ব পাকিস্তান ছিল) রাষ্ট্রভাষা সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন—

We are trying to establish a kind of administrative or official Bengali and we are blundering onwards. So it is also being attempted for Hindi and other Indian languages and East Pakistan will eve long be trying to do the same thing for Bengali. I think if the Tripura State could publish a comprehensive volume of the state documents showing how Bengally has actually been in Administrations, it will be of inestimable value for the entire Bengali people whether of Pakistan or of India and for two adminisirtions—that of West Bengal and that of East Bengal in Pakistan.'

১৯৫৪ সালে সুনীতিকুমার যা আশা করেছিলেন ১৯৭১ সালের শেষভাগে সে আশাপূরণ করলেন ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষাবিভাগের সুযোগ্য অফিসার শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজের দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনিই বর্তমান ত্রিপুরার এ কাজ করবার যোগ্যতম লোক। ত্রিপুরার গুণকীর্তন করতে পঞ্চমুখ অনেককেই ত্রিপুরায় দেখেছি কিন্তু সত্যরঞ্জন বসু বা দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত যেমন করে বহু পুরাণো তথ্য বুকে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করে চলেছেন এমন আর বেশি দেখিনি। সরকারী চাকরীকে চাকরী বলেই দেখতে লোকে অভ্যস্ত হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজের মধ্যে শুধু চাকরী করেন নি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার প্রমাণ রেখেছেন।

Setton Karr-এর Selections from the Calcutta Gazette-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এই কাজে হাত দিয়েছেন। ১৯০৩ সাল থেকে ষ্টেট গেজেট মুদ্রণ সুরু হয় বাংলাতেই মাসিক, পাক্ষিক দু আকারেই এই গেজেট কোন না কোন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভূমিকায় এই গেজেটের উৎপত্তির একটি দীর্ঘ কাহিনী দিয়েছেন। ত্রিপুরার ইতিহাস, বাংলাভাষার ইতিহাস নিয়ে যাঁরাই কাজ করবেন এই অমূল্য ভূমিকাটি তাঁদের দেখতে হবে। ১৯১৭ সালের সেই অতি গুরুত্বপূর্ণ সার্কুলারটি এই সংকলনের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ত্রিপুরার রাজদরবার ঘোষণা করছেন যে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রকার্যে প্রয়োগ করতে হবে—মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম হচ্ছে তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মার স্বাক্ষরে প্রকাশিত এই আদেশে বলা হচ্ছে

'এ রাজ্যের অফিস ও আদালতসমূহের প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং সর্ববিধ রাজকার্যে

আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই নিয়ম অক্ষুণ্ণ রাখা স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুরগণের অভিপ্রেত ছিল। এই অভিপ্রায় সংশোধনোদ্দেশ্যে প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুর ১৮৮৪ ত্রিপুরাব্দে 'নিষ্পত্তি পত্রাদি লিখিবার আইন' শীর্ষক এক চিঠি প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রবল আছে। পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর লিখিত এবং বাচনিকরূপে এ বিষয়ে স্বীয় অভিমত বারংবার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহদভিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী মাত্রেরই কর্তব্য। কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য ঘটিতে দেখা যাইতেছে।

সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালাভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষ্যে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রীযুত মাণিক্য বাহাদুরেরও একান্ত অভিপ্রেত। অতএব পলিটিক্যাল বিভাগ সংস্পৃষ্ট বিষয় বা বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থল ভিন্ন, আদালত ও অফিস সমূহের কাগজপত্রে বাংলাভাষা ব্যতীত অন্য ভাষা ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে না।

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালাভাষা জানা না থাকিবার দরুণ অথবা উক্ত ভাষায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অক্ষমতা প্রযুক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরী ইত্যাদি অন্য ভাষায় লিপি করিতে বাধ্য হইলে, তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংস্পৃষ্ট কাগজের সঙ্গে রাখা এবং উক্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গানুবাদসহ প্রেরণ করা সঙ্গত হইবে।'

বাংলাভাষাকে শুধু রক্ষা করা নয়, তাকে পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা ত্রিপুরা রাজদরবারের ছিল এই থেকেই তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১৯০৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট থেকে যে সব সংকলন এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে সেগুলির শ্রেণীবিভাগ করে ভূমিকায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। প্রশাসন, শিক্ষা, সামাজিক বিবরণ, দরবার, পার্বত্য সমাজ, পূজা পার্বণ, রাজনৈতিক আন্দোলন, অর্থনৈতিক বিবরণ, বাজার দর ও বিবিধ সংবাদ—এই কটি ভাগে বিষয়বস্তু বিন্যাসের আলোচনা করেছেন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাভাষার প্রচলন সম্পর্কে এতকাল মহিমঠাকুরের 'দেশীয় রাজ্য', কয়েক সংখ্যা রবি পত্রিকা, কৈলাস সিংহ মহাশয়ের ইতিহাসই ছিল উৎসাহী পাঠকের আকর গ্রন্থ। 'ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট' সংকলন করে শ্রীহৃপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রিপুরবাসীদের বাংলাভাষা প্রীতির ইতিহাস রচনার কঠিন কাজ তথ্যযোগে শুরু করলেন।

যাঁরা ত্রিপুরাকে ভালবাসেন, যাঁরা বাংলাভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা এই ৫০০ পৃষ্ঠার বিরাট গ্রন্থটি অবশ্যই একবার প্রত্যক্ষ দেখবেন। ফরেষ্ট পারমিট, ত্রিপুরা ষ্টেট গেজেট, রসিদ ষ্ট্যাম্পের আলোকচিত্র এই গ্রন্থের প্রামাণিকতা বৃদ্ধি করেছে। ভাল ছাপা, ভাল বাঁধাই-য়ের কথাও বলতে হয়। আজকের বাংলাদেশ সরকারকে ত্রিপুরা সরকার যদি এই বই কিছু উপহার পাঠান তবে বাংলাভাষা প্রচলনে বাংলাদেশ সরকার একটি নির্দেশ লিপি পাবেন।

সোমেন্দ্রনাথ বসু

একবিংশ বর্ষ ২য় সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

ছোট গল্পের আত্মহত্যা

প্রমথনাথ বিশী

বাংলা ছোট গল্প আত্মহত্যা করতে উদ্যত। উদ্যত বললে কম বলা হয়, প্রক্রিয়াটা অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে এখন প্রায় অন্তিম মুহূর্ত। কেন এমন হল তা-ই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তার আগে একটা প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা সেরে নেওয়া যেতে পারে। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ছোট ছোট লিরিক কবিতা এবং ছোট গল্প। প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের কথা, বিশেষ চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের কথা বিস্মৃত না হয়েও বলা যায় যে বৈষ্ণব পদাবলীগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। আবার প্রাচীন সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা ভুলে না গিয়েও বলা যায় যে গীতবিতান ও সঞ্চয়িতায় নিবদ্ধ কবিতাগুলিই উজ্জ্বলতম রত্ন। এসব হল পদ্য। গদ্য সাহিত্যের বিস্তার অনেক বেশি, তাতে রত্নরাজিও সুপ্রচুর তৎসত্ত্বেও ছোট গল্পগুলি অতুলনীয়। উপন্যাস সৃষ্টির পরে ছোট গল্পের সূচনা হলেও উৎকর্ষে ছোটগল্প ছাড়িয়ে গিয়েছে উপন্যাসকে। ১৮৯০ সালে ছোট গল্পের সূত্রপাত রবীন্দ্রনাথের হাতে, ১৯৪০ সালে বোধ করি তাঁর শেষ ছোট গল্প লিখিত। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখায় সঞ্চারিত হয়ে ছোট গল্প একটা পরিণতিতে পৌঁছেছে। এই সময়ের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান ছোট গল্প লেখক দেখা দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র, প্রভাতকুমার, পরশুরাম, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবিতগণের নাম করলে তালিকা আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। বাঙালী কবির কণ্ঠে অনায়াসে যেমন গান আসে তেমনি তার কলমে সহজে আসে ছোট গল্প। এঁদের অনেকের ছোট গল্প বিদেশী লেখকদের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের সঙ্গে তুলনীয়। মাত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে এমন উন্নতি সম্ভব হয়েছে তার দুটো কারণ, ভাষার মর্জি আর লেখকের মেজাজ। এখন এহেন সম্পদের আত্মবিনাশ সাধন পরিতাপের বিষয় না হয়ে যায় না। এখন জিজ্ঞাস্য কেন

এমন হল? অর্থাৎ এ দায়িত্ব কার? দায়িত্ব সকলকেই ভাগ করে নিতে হবে আর তাতেই কেনর উত্তর পাওয়া যাবে।

এক সময় মাসিক পত্রাদিতে ছোট গল্পের আদর ছিল। এখন নেই এমন বলছি না তবে আগের মতো নয়। মাসিকে ছোট গল্পের আদর থাকলেও সেই সব ছোট গল্প যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন আর সে আদর থাকে না। যে কোন প্রকাশককে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যাবে যে ছোট গল্পের বই বিক্রি হতে চায় না অর্থাৎ পাঠক উদাসীন বা অনীহাযুক্ত। কাজেই বিচারটা পাঠকের দিক থেকে আরম্ভ করা যাক।

পাঠক অর্থাৎ খদ্দের বইয়ের দোকানে এসে বই হাতে নিয়ে শুধায় একটানা তো? অস্যার্থ কাটা কাটা ছোট গল্প চলবে না, একটানা উপন্যাস হওয়া চাই, তার উৎকর্ষ বা লেখক যেমনি হোক। প্রকাশক সরাসরি উত্তর না দিয়ে বল্‌ল দেখুন না। খদ্দেরের তাড়া আছে, বই কেনাই একমাত্র কাজ নয়, তাই সে একবার দ্রুত পাতাগুলো উল্টে গেল। পাতার উপরে নাম নেই, বোঝা যায় না উপন্যাস কি ছোট গল্প। পৃষ্ঠার মধ্যে মাঝে মাঝে ছোট গল্পের নামাঙ্ক থাকলেও ব্যস্ততায় চোখে পড়লো না। তার উপরে যখন বইখানা হাতে নিয়ে দেখল দামে ভারি, মনে মনে হয় তো কেদার চাটুজ্জের মতো ভাবলো বেশ দিব্যি পুরুষ্ট পাঁঠা, বল্‌ল আচ্ছা দিন। তারপরে বাড়ী গিয়ে যখন আবিষ্কার করলো একটানা নয়, কাটা কাটা তখন কি ভাবলো সেকথা অনুমান না করাই ভালো। তবু মূল প্রশ্নের সম্যক উত্তর পাওয়া গেল না। যে পাঠক মাসিকের পাতায় ছোট গল্প আগ্রহ করে পড়ে, গল্প সমষ্টিতে তার অনীহা কেন। মাসিকে হয় তো ২।৩ টা ছোট গল্প থাকে তা-ও আবার ভিন্ন হাতের রচনা এক রকম চলে যায়। তাছাড়া পত্রিকাখানায় নিশ্চয় গোটা দুই ক্রমশঃ একটানা আছে প্রধানত সেই লোভেই কেনা, কাজেই মৎস্যরসিক যে মনোভাবে মাছের কাঁটাগুলোকে সহ্য করে সেই মনোভাবেই ছোট গল্পগুলো সহনীয় হয়। কিন্তু গ্রন্থাকারের গল্প সমষ্টি অচল কেন? গল্প থেকে গল্পান্তরে যেতে রসের রূপের ঘটনার বদল হয়—সেই আবস্থিক ধাপ্পাটুকু অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে অসহ্য। রেলগাড়ী মন্থর গতিতে চলতে চলতে মাঝে মাঝে লাইন বদলাবার সময় ঝাকুনি দেয়, আরোহী চমকে ওঠে; তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে সেটা আবার প্রবলতর। অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর, (আর্থিক বিচারে নয়, শিক্ষাদীক্ষার বিচারে) তারা মনে মনে বিরক্ত হয়ে ওঠে, পয়সা খরচ করে এ ধাক্কা খাওয়া কেন! একটানা মসৃণ গতি তাদের কাম্য। আগেই বলেছি অধিকাংশ পাঠকের মন তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ অসাড় জড় ও রসের বাজারে আনাড়ি। কাজকর্মের অবকাশে তারা কিছুক্ষণের জন্য মসৃণ আরাম চায় তার বেশি দাবী পুস্তকের উপরে তাদের নেই। কাজেই তাদের বাজারে ছোট গল্পের রূপান্তর রসান্তর ঘটনান্তর অচল। চাই উপন্যাস। আরও উপন্যাস। দেখে ঠেকে ভুগে সম্পাদক ও প্রকাশক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে—কাজেই লেখকও।

এখানে দু' একটা কথা বলে নি; হয়তো একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন শুনি—বলি কি লিখছেন। চেয়ে দেখি মুখে তার অসীম প্রত্যাশা। হয় তো বল্‌লাম বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিম্বা গীতার অনুবাদ। আশাভঙ্গুর মুখে তিনি বললেন ওসব তো হল, বলি আসল কি লিখছেন? স্বীকার করতে হল 'আসল' এখন কিছু লিখছি না। প্রশ্নকর্তার নাটকীয়

পরিভাষায় 'সবেগে প্রস্থান'। আসল মানে উপন্যাস। এখানেই বাংলা সাহিত্যের সর্বনাশ ও ছোট গল্পের সমাধি। এদেশে যে লেখক উপন্যাস লেখেননি সে সাহিত্যিক বলে গণ্য নয়। এই বিচিত্র মাপকাঠি ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে প্রযুক্ত হলে বেকন বার্ক কার্লাইল রাস্কিন ম্যাথু আর্ণল্ড প্রভৃতি বাদ পড়ে যান। উপন্যাস লেখেননি যে। 'আসল' যখন আত্যন্তিক হয়ে ওঠে তখন তা যে ভেজালে ভরতি হয় এই অতি সরল সত্যটি বুঝতে এখনো কপালে অনেক দুঃখ আছে।

এবার সম্পাদক ও প্রকাশক। তাঁরা ব্যবসায়ী, পাঠকের মন জুগিয়ে না চললে কাগজ ও ব্যবসা চলে না। কাজেই তাঁরা লেখকের শরণাপন্ন হলেন, উপন্যাস লিখুন। লেখক দেখলেন এ মন্দ নয়। ছোট গল্প লিখে মাসিক থেকে টাকা পাওয়া যায়—গ্রন্থকারে প্রকাশিত হলে বিশেষ কিছু মেলে না। কাজেই পত্রিকায়, বিশেষ করে পূজা সংখ্যা, কিম্বা নববর্ষ সংখ্যা প্রভৃতিতে উপন্যাস লেখায় লাভ বই ক্ষতি নেই। প্রথমত পত্রিকা থেকে দক্ষিণা বেশি পাওয়া যায়—আবার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও রয়ালটি। কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকা যখন উপন্যাস ছাপতে শুরু করলো তখন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল। কোন পত্রিকা যদি পাঁচখানি 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাস ছাপলো, প্রতিযোগী ছাপলো সাতখানি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। তার পরে 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসের ঢল নামলো। এখন সহজেই অনুমেয় এই সব উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গতা নামে মাত্র, খুব বেশি হবে তো ৪।৫ ফর্মা। তারপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে আরও ২।৩ ফর্মা বাড়ানো, তাতেও না কুলোলে 'পাইকা' অক্ষর তো আছেই। ফলে দাঁড়ালো এ সব না ছোট গল্প না উপন্যাস। এরা রক্তপায়ী জোঁকের মতো স্ফীতোদর একটা প্রাণী। এতে না আছে ছোট গল্পের সূক্ষ্মকলা-কৌশল, না আছে উপন্যাসের জীবন বিস্তার, আছে স্ফীতোদর ব্যবসায়িতা। এ শ্রেণীর দায়িত্বহীন রচনার মতো সহজ কাজ আর নেই।

কপি রাইটের নিষেধ না থাকলে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণ, দুরাশা, কিম্বা রাসমণির ছেলের মতো গল্পকে অনায়াসে ৭।৮ ফর্মার উপন্যাসে পরিণত করা যায়, তাতে তাদের রস এক বিন্দুও বাড়বে কিনা সন্দেহ। আবার এ জাতীয় 'পূর্ণাঙ্গ' উপন্যাসকে কমিয়ে এনে এক ফর্মার ছোট গল্পে পরিণত করা চলে—এখানেও বাধা কপি রাইট, নতুবা দুই শ্রেণীর রচনার দুটি উদাহরণ তৈরি করে দেখাতে পারা যেতো। অনেকে বলতে পারেন বঙ্কিমচন্দ্র তো করেছেন, ছোট ইন্দিরা ও ছোট রাজসিংহকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে পরিণত করেছেন। আমার বিশ্বাস আরও কিছুকাল বাঁচলে হয় তো তিনি যুগলাঙ্গুরীয়কেও পূর্ণাঙ্গ করে তুলতেন। এ তিনখানাই বৃহৎ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত খসড়া, রাধারাণীও তাই। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেছেন পূর্ণাঙ্গ ইন্দিরা ও পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ। নাম সাম্যে ওদের এক মনে করা উচিত হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নূতন করে রক্তমাংস দিয়ে নূতন রচনা করেছেন—এ জৈবিক রূপান্তর। এখন যা চলছে তা টেনে লম্বা করা মাত্র তার মধ্যে জীবনীশক্তির ক্রিয়া নাই।

ছোট গল্পের বস্তুকে কৃত্রিম উপায়ে টেনে উপন্যাসে পরিণত করতে গেলে কৃত্রিম উপন্যাস হওয়া ছাড়া আর কি হবে। ছোট গল্প ও উপন্যাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের শিল্পকলা। ছোট গল্পে পাত্রপাত্রী আছে, আবার পরিণাম আছে—এর দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সংযোগ সাধনে ছোট গল্পের সার্থকতার রহস্য—এ অনেকটা সনেট জাতীয় রচনার সগোত্র। উপন্যাসেও এই স্বাভাবিক সংযোগসাধন আছে

তবে তা সরাসরি সরল পন্থায় নয়, নানা শাখাপ্রশাখায় বিস্তারিত জটিল বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে। ছোট গল্প জীবনখণ্ড, উপন্যাস জীবন বিস্তার। এ দুয়ে যে কখনো সংযোগ করা চলে না তা নয়, তবে বর্তমানে যে ভাবে হচ্ছে তেমন করে নয়, কেমন করে তার ক্লাসিক দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। ছোট গল্পের স্বকীয়তা রক্ষা করে ওর মধ্যে জীবনবিস্তার আনবার চেষ্টা আছে। এখনকার মাসিক পত্রের অধিকাংশ উপন্যাস ঘটনার বস্তাবন্দী রূপ। পাঠকে যদি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে তার কারণ অমার্জিত মনের অসারতা—খানিকটা একটানা দৈর্ঘ্য পেলেই খুশী। এর ফল হচ্ছে ছোট গল্পের প্রকৃতি ও উপন্যাসের প্রকৃতি দুই ব্যাহত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে যে অনবদ্য ছোট গল্প সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল কোথায় পরবর্তীগণ তার উন্নতিসাধন প্রয়াস করবে, না, তার বদলে করছে তার বিলোপসাধন চেষ্টা। এমন ভাবে চললে আর কিছু দিনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য থেকে ছোট গল্পের ধারা মুনাফা-শিকারী ব্যবসায়ীদের এবং মুনাফালোভী লেখকদের অশুভ যোগাযোগে লোপ পাবে—আর যা রচিত হয়ে উঠবে তাকে উপন্যাস বলা মনের সঙ্গে চোখঠারা মাত্র। লেখক সম্পাদক প্রকাশক সকলেরই সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে—আর পাঠক! পাঠক তৈরি করা এঁদের তিনজনেরই দায়িত্ব। কিন্তু হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত। অমার্জিত রুচি পাঠকের গল্পগ্রাসী ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে গিয়ে রস সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারাকে সকলে মিলে নিষ্ফলতার মরু বালুকার দিকে চালিত করছেন। অতএব সাধুগণ সাবধান। ছোট গল্পের আত্মহত্যার অস্ত্রে শাণ দেওয়া থেকে তারা এখনই নিবৃত্ত হোন।

রামমোহন মিশনারী বিতর্ক সম্বাদ

গোরাচাঁদ মিত্র

জ্ঞানের প্রদীপ্ত উজ্জ্বল আলোকে রাজা রামমোহন রায় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন এ দেশের প্রতিটি মানুষের চিত্তকে। তাঁর সমগ্র জীবন সমস্ত রকম অন্ধ গোঁড়ামি, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—কোন ধর্মকেই তিনি পরিপূর্ণভাবে বিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রত্যেক ধর্মেরই কোন না কোন কুসংস্কার তাঁর যুক্তিবাদী মনের কাছে ধরা পড়েছিল। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার মধ্যে তিনি দেখেছিলেন দেশবাসীর আর্থিক ও সামাজিক গ্লানির হেতু। প্রাচীন ভারতের শাশ্বত দর্শন অধ্যয়ন করে রামমোহন আঘাত হানলেন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে—যে পৌত্তলিকতা আমাদের একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের কোন গঠনমূলক কর্মে উদ্যোগী হতে বাধা দেয়—যে পৌত্তলিকতা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আমাদের প্ররোচিত করে। মুসলমান ধর্মের একেশ্বরবাদের প্রতি আপন প্রত্যয়ে অটল থেকেও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের অকথ্য অত্যাচারকে তিনি 'তুহফত-উল-মুয়াহিদ্দীন' বা 'একেশ্বরবাদীদিগের প্রতি উপহার' গ্রন্থে শাস্ত্রবিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন চিঠি পত্রাদিতে খৃষ্টানধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটলেও, খৃষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদের অসারত্ব প্রমাণে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন নি।

উনিশ শতকের প্রথম বৎসরগুলিতে বিভিন্ন কারণে কলকাতা যাতায়াতের সূত্রে রামমোহনের সঙ্গে অনেক বিদেশীর পরিচয় ঘটে। ১৮১৫ সালে রামমোহন যখন স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে আসেন তখন বেশ কয়েকজন খৃষ্টান পাদরীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠতা লাভ করে। তাঁদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক আলোচনায় রামমোহন বিশেষভাবে অংশ নিতেন। কলকাতায় এসেই হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে রামমোহন বিভিন্ন শাস্ত্রীয় বিতর্কে নামলেন। তাঁর এই মনোভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় রামমোহন প্রশংসিত হলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগের কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। অনেক মিশনারী অনুমান করলেন—রামমোহন বুঝি বা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি রামমোহনের প্রীতির বহিঃপ্রকাশ প্রথমে ঘটে এককালীন মনিব ও অকৃত্রিম সুহৃদ জন ডিগবীকে লেখা এক পত্রে। এই চিঠিতে রাজা লিখছেন—'ধর্মীয় সত্য অন্বেষণে আমার দীর্ঘ ও অবিচ্ছিন্ন গবেষণার পরিণতিতে আমি উপলব্ধি করলাম যে খৃষ্টীয় ধর্মশিক্ষা, অন্যান্য আমার দেখা ধর্মের শিক্ষাবলীর চাইতে নৈতিক সত্যের অনেক বেশী অনুকূল এবং বিদেশী মানুষের প্রয়োজনে অধিক উপযোগী' (অনুবাদ লেখককৃত)। কাজেই পাদরীদের অনুমান আপাতচক্ষে অমূলক ছিল না নিশ্চয়। কিন্তু রামমোহন-চরিত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচয় তাঁদের তখনও ঘটেনি। যীশুখৃষ্টের মহিমাময় জীবনের প্রতি আকৃষ্ট রামমোহন ১৮২০ সালে দেশের মানুষের মধ্যে যীশুর অমৃতময় বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন দি পারসেপ্টস্ অব্ জিসাস্—দি গাইড টু পীস্ এণ্ড হ্যাপীনেস' বা 'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ—সুখ ও শান্তির সহায়ক'। বইটি মুদ্রিত হয় ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেসে। বইটির ভূমিকা থেকে জানতে পারি রামমোহন 'যীশুর উপদেশ

সংগ্রহ' পুস্তকের বাংলা ও সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনুবাদগুলি পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে অনেকের অভিমত রামমোহনের মনে অনুবাদ প্রকাশের বাসনা থাকলেও পরবর্তীকালে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ফলে তা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। পূর্বাহ্নেই তিনি 'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ' পুস্তকের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন। এ অনুমান একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দুঃখের বিষয় যীশুর উপদেশ সংগ্রহ রাজার জীবনে সুখ ও শান্তি আনয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে নিয়ে এল মানসিক অশান্তি। প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়লেন রামমোহন। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত এল শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। এর কারণ রামমোহন তাঁর সংকলনে যীশুর অলৌকিকত্ব-বিষয়ক সমস্ত ঘটনা বাদ দিয়েছিলেন। কারণস্বরূপ রাজা ভূমিকায় লিখছেন—'আমি মনে করি যে নিউ টেষ্টামেন্টের অন্যান্য বিষয় থেকে নৈতিক চিন্তার বস্তুগুলি আলাদা করে বেছে নিলে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের মন ও হৃদয়ের উপর তার সুপ্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক এবং আরও কতকগুলি বিষয় স্বাধীনচেতা ও খ্রীষ্টধর্মবিরোধী লোকদের সন্দেহ ও বিতর্কের বস্তু হতে পারে। বিশেষ করে টেষ্টামেন্টের অত্যাশ্চর্য ঘটনাগুলি এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথাগুলির মতো চমকপ্রদ মোটেই নয়, সুতরাং তাদের প্রভাবও অতি সামান্য হতে বাধ্য। অপরপক্ষে নৈতিক শিক্ষাগুলি বিরাট মানব-সমাজের শান্তি ও সামঞ্জস্য রাখার অনুকূল, দার্শনিক চিন্তাবিকৃতির ভয়মুক্ত এবং শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে সমভাবে সহজবোধ্য। ধর্ম ও নীতির সাধারণ নিয়মগুলি মানুষের আদর্শকে ভগবানের উচ্চ ও উদার চিন্তায় উন্নীত করার পক্ষে এত অনুকূল, নিজের ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনের আচরণকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করে যে সেগুলি প্রচলনে ভালো ফল ফলবেই আমি আশা করি' (সোমেন্দ্রনাথ বসুকৃত অনুবাদ)। রামমোহনের এই উদার-নীতি মিশনারী সম্প্রদায় কিন্তু সমর্থন করলেন না।

১৮২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় 'একজন খৃষ্টান মিশনারী' যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকের একটি বিরুদ্ধ-সমালোচনা লিখলেন। রামমোহনের পুস্তিকা প্রকাশ ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত সমালোচনার মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত কম যে মনে হয় যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ প্রকাশের পূর্ব থেকেই মিশনারীরা মূল রচনার পাণ্ডুলিপি পাঠ করে বিতর্কের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। এই অনুমান দৃঢ় হওয়ার পেছনে আর একটি কারণ—বইটি ব্যাপাটিষ্ট মিশন প্রেস থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল। মিশনারী মতের বিরোধী পুস্তক মিশনারী প্রেস থেকে প্রকাশিত হওয়া সন্দেহ জনক বইকি। ছদ্মনামের আড়ালে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় সমালোচক ছিলেন Rev. Deocar Schmidt. কিন্তু পূর্বে Schmidt সাহেব রামমোহনের একজন উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় রামমোহন অনুদিত বেদান্ত গ্রন্থ পাঠ করে তিনি রামমোহনের সঙ্গে পত্রালাপে ইচ্ছুক হন। এবং ১৮১৯ সালের এপ্রিল মাসে এক পত্রে রামমোহনকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত এই চিঠিটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আগষ্ট মাসে লিখেছিলেন—'The careful perusal of the letter we would earnestly recommend to Rammohun Roy, whom we highly esteem, for his courageous opposition to error and corruption of manners, as far

as it has extended, and should rejoice to see him make the word of God the man of his Counsel…'অবস্থা ততদিনে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার সম্পাদক বস্তুয়া মার্শম্যান যীশুর উপদেশ-সংগ্রহ পুস্তকের সমালোচনার সঙ্গে কয়েকটি কটু মন্তব্যও ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। এই সমালোচনা সমগ্র মিশনারী সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট প্রতিবিম্ব। মার্শম্যানের মতে এই পুস্তিকার রচয়িতা জগতের উদ্ধারকর্তা যীশুখৃষ্টকে কনফুসিয়াস বা মহম্মদের সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন এবং মানুষের উদ্ধারকর্তা সর্বময় প্রভু হিসেবে সম্মানিত করার পরিবর্তে সংকলক তাঁকে শুধুমাত্র একটি শ্রেণীর প্রবর্তক ও শিক্ষকরূপে বিবেচনা করেছেন। ক্রোধে অন্ধ মার্শম্যান রামমোহনকে আখ্যায়িত করলেন—'একজন বুদ্ধিমান হিদেন যার মন পরমেশ্বরের মানবাকারে অবতীর্ণ হওয়ার মহৎ অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিরোধী'—বলে। এই সমালোচনায় রামমোহন দুঃখ পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু ১৮২০ সালে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি প্রকাশ করলেন ফার্ষ্ট আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক বা বা 'খৃষ্টান জনগণের প্রতি প্রথম আবেদন'। মার্শম্যানের কটুক্তিতে ব্যথিত রামমোহন প্রথম আবেদনের গোড়াতেই লিখলেন—'যীশুর উপদেশ সংগ্রহ পুস্তকের বিরুদ্ধে সমালোচকের মতামতের ভিত্তি কী—তা যাচাই করার পূর্বে সম্পাদকের অসভ্য ও খৃষ্টানবিরোধী চরিত্রের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সম্পাদক মহাশয় সংকলকের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁকে 'হিদেন' রূপে অভিহিত করেছেন। খৃষ্টানবিরোধী বললাম এই কারণেই যে সম্পাদক মহাশয় 'হিদেন' শব্দ ব্যবহার করে, আমার মতে সত্য, ঔদার্য্য ও বদান্যতা, যা খৃষ্টধর্মের মূল ভিত্তি, তা ভঙ্গ করেছেন'। কিন্তু গোঁড়ামির দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যদি সম্পাদক মহাশয় মুক্ত মনে বিচার করতেন, তাহলে দেখতেন 'সংকলক শুধুমাত্র একেশ্বরবাদেই নয় খৃষ্টান ধর্মের শাশ্বত সত্যের প্রতিও সমানভাবে বিশ্বাসী। সমালোচকের মত যাচাই করতে গিয়ে রামমোহন লিখছেন—'গোঁড়ামির বিভিন্ন ব্যাখ্যাই যীশুর অনুগামীদের মধ্যে এত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি করেছে। সেগুলি শুধুমাত্র খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যই নষ্ট করেনি, খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের মধ্যে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের চাইতেও ভীষণ আকারের অবিচ্ছিন্ন যুদ্ধ ও রক্তপাতের মূল কারণও এই ধর্মীয় গোঁড়ামিসকল। খৃষ্টান দেশগুলির ইতিহাসের দিকে সামান্য নজর দিলেই পাঠকগণ আমার উক্তির সত্যতা যাচাই করতে পারবেন। তদুপরি, যে স্থানে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বিগত বিশ বৎসরেরও অধিক সময় ধরে খৃষ্টীয় ধর্মের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত বাইবেলের অসংখ্য কপি নিষ্ফলভাবে বিলি করে চলেছেন, সংকলক সেখানকার অধিবাসী। কাজেই তাঁদের বিফল মনোরথ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। অবশ্য লেখক ধর্মপ্রচারকদের নিষ্ঠা কিংবা অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশে ব্যয়িত বিরাট অঙ্কের টাকার হিসেবের প্রতি বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছেন না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে ধর্মীয় চার্চে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গোঁড়ামি ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা এদেশীয়দের মনে প্রবিষ্ট করানোর চেষ্টা ধর্মপ্রচারকদের হিতৈষী আদর্শের পরিপন্থী'। কারণ এদেশের মানুষ এ সকল অত্যাশ্চর্য ঘটনা গ্রহণে মোটেই ইচ্ছুক নন। জ্ঞানালোকের দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষের মনের অন্ধকার দূর করতে ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টা এতই অসতর্ক এবং অবিবেচনাপ্রসূত যে দেখে মনে হয়

তাঁরা কোন খৃষ্টান দেশে আনীত মানুষের সঙ্গে তাঁদের নাবালকত্বপ্রসূত ধর্মীয় গোঁড়ামি বা অন্ধতা নিয়ে বিতর্কে রত' (অনুবাদ লেখককৃত)। ফলে এদেশবাসীর কোন ধর্মীয় উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়নি। তাই খৃষ্টীয় সত্যকে ভারতবাসীর মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামমোহন যীশুর উপদেশ সংগ্রহ সংকলনটি প্রকাশ করেছিলেন। অপ্রত্যাশিত বিরুদ্ধ-সমালোচনা স্মরণে রেখে রামমোহন 'প্রথম আবেদনের' উপসংহারে প্রার্থনা জানালেন—'May God render religion destructive differences and dislike between man and man and conducive to the peace and union of mankind—Amen.' মার্শম্যান সাহেবও প্রস্তুত ছিলেন। মাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় মে মাসে তিনি রামমোহনের 'প্রথম আবেদনের' ছয়পৃষ্ঠাব্যাপী সমালোচনা লিখলেন। মার্শম্যান তাঁর পূর্ব বক্তব্যে অটল থাকলেও, এই সমালোচনায় তাঁর সুর অনেক নরম, আচরণ সংযত। সমালোচনার উপসংহারে মার্শম্যান লিখছেন—'আলোচনাকালে আমরা অতি সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মত প্রকাশ করেছি যাতে তাঁর মনে সামান্যতম আঘাতও না লাগে। আমরা তাঁকে আশ্বাস দিচ্ছি যদি কোন কুইঙ্গিত তাঁর নজরে আসে তাহলে তা সম্পূর্ণ অনবধানতাবশতঃ এবং এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটীর জন্য যেন তিনি আমাদের ক্ষমা করেন, কারণ নির্মল সত্য প্রকাশই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্যে' (লেখককৃত অনুবাদ)। ১৮২১ সালে রামমোহন প্রকাশ করলেন 'সেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' বা 'খৃষ্টান জনগণের প্রতি দ্বিতীয় আবেদন'। মার্শম্যানের বক্তব্য উপস্থাপন রামমোহনের কাছে 'মাইল্ড' এবং 'ক্রিশ্চিয়ান লাইক' বলে মনে হল। কিন্তু তাতে মূল বিতর্কের বিন্দুমাত্র সুরাহা হল না। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দীর্ঘ আলোচনার পর রামমোহন লিখলেন—'যদি খৃষ্টধর্ম ত্রীশ্বরবাদ সমর্থন করে এবং কখনও ঈশ্বর মানুষের আকারে, কখনও বা পাখীর আকারে দেখা দেন—এরূপ উপদেশ দেয়, তাহলে আমার মতে যে সকল হিন্দু সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত তাঁরা হিন্দুধর্মের পরিবর্তে খৃষ্টধর্ম দ্বারা কোন প্রেরণা লাভ করবেন না। কারণ হিন্দুধর্ম এক পরমেশ্বরের উপাসনার বিধান দিলেও, আধুনিক হিন্দুধর্ম বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী। সেই কারণেই হিন্দুধর্মের আজ এই শোচনীয়য় অবস্থা। আমি কিন্তু মনে করি খৃষ্টানধর্ম সর্বরকম পৌত্তলিকতামুক্ত। তাই সুখ ও শান্তির সহায়করূপে এই ধর্মের নীতিগুলি প্রকাশের অনুমতি আমি আমার বিবেকের কাছ থেকে পেয়েছি'। বিরোধ চরমে উঠল। খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকগণ বিভিন্নভাবে হিন্দুধর্মের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ হানলেন। হিন্দুধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। সমাচার-দর্পণ পত্রিকার ১২ই জুলাই সংখ্যায় কোন বিজ্ঞব্যক্তি দ্বারা দূর দেশ থেকে প্রেরিত একখানি পত্র প্রকাশিত হল। পত্রটিতে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ-প্রাজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে ছয়টি প্রশ্ন পেশ করা হল। পত্রলেখকের অভিপ্রায় অনুযায়ী পত্রিকা সম্পাদক প্রশ্নগুলির সদুত্তর প্রত্যাশা করলেন। হিন্দুধর্মের প্রধান প্রধান সমাজপতিরা প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে কেউ এগিয়ে এলেন না। পরিবর্তে রামমোহন 'শিবপ্রসাদ শর্ম্মাঃ' নামে প্রশ্নগুলির দীর্ঘ উত্তর পাঠালেন। কিন্তু দর্পণ সম্পাদক সেই পত্র প্রকাশের সাহসিকতা প্রদর্শনে অক্ষম হলেন। ১লা সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হল সম্পাদকের বিবৃতি—'শ্রীযুত শিবপ্রসাদ শর্ম্মা প্রেরিত পত্র এখানে পৌছিয়াছে তাহা না ছাপাইবার কারণ এই যে সে পত্রে পূর্বপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে অনেক অজিজ্ঞাসিতাবিধান আছে। কিন্তু অজিজ্ঞাসিতাবিধান দোষ

বহিষ্কৃত করিয়া কেবল ষড়দর্শনের দোষোদ্ধার পত্র ছাপাইতে অনুমতি দেন তবে ছাপাইতে বাধা নাই, অন্যথা সর্বসমেত অন্যত্র ছাপাইতে বাসনা করেন তাহাতেও হানি নাই'। খৃষ্টান সমাজের এই মনোভাবে ক্ষুব্ধ রামমোহন ১৮২১ সালের শেষার্ধে প্রকাশ করলেন 'ব্রাহ্মণ ও মিসনরি সম্বাদ' বা Brahmunical Magazine নামে একটি দ্বিভাষী সাময়িক পত্র। এবং সেই পত্রিকায় দর্পণের প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। পত্রিকাটির এক পৃষ্ঠা বাংলা ও অপর পৃষ্ঠা ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত হতো। ব্রাহ্মণসেবধি বাংলা ভাষায় তৃতীয় সংখ্যা পর্যন্ত এবং ইংরেজী ভাষায় চতুর্থ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় এ দেশবাসীর ধর্মবিষয়ে ইংরেজ শাসকদের অনুসৃত নীতি প্রসঙ্গে রামমোহন লিখছেন—'শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তিরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন'। প্রথম প্রকার নানাবিধ পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করে তা এ দেশবাসীর মধ্যে বিলি করছেন এই মিশনারীরা। পুস্তক-পুস্তিকাগুলি শুধুমাত্র 'হিন্দুর ও মোছলমান ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ।' দ্বিতীয় প্রকার—মিশনারীরা বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে অথবা প্রকাশ্যে রাজপথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে খৃষ্টধর্মের উৎকর্ষতা এবং অন্যান্য ধর্মের অপকৃষ্টতা প্রমাণে ব্যস্ত। তৃতীয় প্রকার—অর্থের লোভ দেখিয়ে অন্য ধর্মের গরীব মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছেন। পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে রামমোহন দেখাচ্ছেন প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভিন্নধর্মাবলম্বী শাসকশ্রেণী শোষিতশ্রেণীর ধর্মের প্রতি উপহাসে মত্ত এবং শোষিতকে তাঁদের ধর্মগ্রহণে বাধ্য করেছেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিচার করলে ইংরেজ মিশনারীদের এই ধর্মঘটিত দৌরাত্ম্য ও উপহাস 'অসম্ভাবনীয়' নয়। 'কিন্তু ইংরেজরা সৌজন্য ও সুবিচারে উত্তমরূপে বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ন্যায় সেতুকে উল্লঙ্ঘন করেন না'। এ দেশবাসীর ঘাড়ে জোর করে খৃষ্টধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে মিশনারীরা যদি বিচার বলে তাঁদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারেন তাহলে অনেকেই তাঁদের ধর্ম গ্রহণ করবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আর্থিক দুর্বলতা দেখে মিশনারীরা যেন তাঁদের উপেক্ষা না করেন। কারণ 'সত্য ও ধর্ম সর্বদা ঐশ্বর্য ও অধিকারকে ও উচ্চ পদবী ও বৃহৎ অট্টালিকাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন এমত নিয়ম নহে'। ব্রাহ্মণ সেবধির প্রথম দুটি সংখ্যায় রামমোহন সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রশ্নগুলি সমেত তার উত্তর প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় সংখ্যায় খৃষ্টীয় ত্রীশ্বরবাদ প্রসঙ্গে তিনি মিশনারীদের কাছে পাল্টা প্রশ্ন রাখছেন—'যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র কহেন এবং সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিরূপে পুত্র সাক্ষাৎ পিতা হইতে পারেন। যীশুখ্রীষ্টকে কখন কখন মনুষ্যের পুত্র কহেন অথচ কহেন কোনো মনুষ্য তাঁহার পিতা ছিল না। ঈশ্বর এক কহেন অথচ কহেন পিতা ঈশ্বর পুত্র ঈশ্বর হোলি গোষ্ট ঈশ্বর। ঈশ্বরকে অপ্রপঞ্চভাবে আরাধনা করিবেক কহিয়া থাকেন অথচ প্রপঞ্চাত্মক

শরীরে যীশুখ্রীষ্টকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে আরাধনা করেন। কহিয়া থাকেন যে পুত্র অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট পিতা হইতে সর্বতোভাবে অভিন্ন অথচ কহেন তিনি পিতার তুল্য হয়েন কিন্তু পরস্পর ভিন্ন বস্তু ব্যতিরেকে তুল্যতা সম্ভবে না'। ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় ৩৮ সংখ্যায় প্রশ্নগুলির উত্তর প্রকাশিত হল। রামমোহন ব্রাহ্মণ সেবধির তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশ করে ধর্মপ্রচারকের সমস্ত যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করলেন। দীর্ঘকাল এর কোন উত্তর প্রকাশিত হল না।

ইতিমধ্যে ১৮২১ সালের শেষাশেষি মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের 'দ্বিতীয় আবেদনের' সমালোচনা ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় প্রকাশ করলেন। মার্শম্যানের মতে 'সেকেণ্ড আপীল' পুস্তকটি **'Contains no less than an entire rejection of the doctrines of the Atonement, the Deity of Christ and the ever blessed Trinity'.** সমালোচনার শেষে রামমোহনের কাছে সমগ্র বিষয়টি পুনর্বার বিবেচনা করতে এবং আদ্যোপান্ত মূল বাইবেল পাঠের সবিনয় অনুরোধ জানালেন মার্শম্যান। মার্শম্যানের প্রার্থনা—'মহানুভব ঈশ্বর যেন তাঁকে পরমেশ্বরকে অনুভব করার শক্তি যোগান'। মার্শম্যানের সঙ্গে বিতর্ককালে দেশীয় ভাষায় অনূদিত বাইবেলের অভাব রামমোহনকে বাইবেলের অনুবাদ কার্যে উৎসাহিত করল। রামমোহন শ্রীরামপুরের দুজন খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক রেভাঃ ইয়েটস ও রেভাঃ এডাম সাহেবকে নিয়ে বাইবেল অনুবাদে ব্রতী হলেন। কিন্তু ১৮২২ সালের মাঝামাঝি ইয়েটস অনুবাদ বিষয়ে রামমোহন সঙ্গ পরিত্যাগ করলেন। বাইবেলের চতুর্থ সুসমাচার অনুবাদের সময় 'dia' শব্দের অর্থ নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। শব্দটির দুটি অর্থ হয়—'দ্বারা' এবং 'মধ্য দিয়া'। আলোচিত বাক্যটির অনূদিত অর্থ হয়—'সমস্ত কিছু যীশুর দ্বারা সৃষ্টি' অথবা 'সমস্ত কিছু যীশুর মধ্য দিয়া সৃষ্টি'। পূর্ববর্তী অনুবাদ কার্যে প্রথম বাক্যটি গৃহীত হলেও, এঁরা সকলেই দ্বিতীয় বাক্যটিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ইয়েটস প্রথম অর্থ সমর্থন করলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিতীয় বাক্যটি গ্রহণ করলে খৃষ্টধর্মের বিরোধিতা করা হবে। বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হল। এডাম সাহেব কিন্তু রামমোহনের যুক্তিবাদী মন ও চরিত্রের পরিচয় পেয়ে ধীরে ধীরে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হলেন। খৃষ্টধর্মের ত্রীশ্বরবাদ বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিল এডামের মনে। হঠাৎ একদিন এডাম নিজেকে একেশ্বরবাদী বলে ঘোষণা করলেন। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় মিশনারী সম্প্রদায় চমকিত হলেন। ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি এডামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। বাইবেলের অনুবাদ কার্য পূর্বেই পরিত্যক্ত হয়েছিল।

'সেকেণ্ড আপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক' গ্রন্থের বিরুদ্ধে মার্শম্যান সাহেবের সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেওয়ার জন্য রামমোহন হিব্রুভাষায় মূল বাইবেল অধ্যয়ন সুরু করলেন। দীর্ঘ দু বছর পর প্রকাশ করলেন খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শেষ আবেদন বা **Final appeal to the Christian public'** রামমোহনের পূর্ববর্তী পুস্তকগুলি ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত হলেও 'শেষ আবেদন' তাঁরা প্রকাশ করতে রাজী হলেন না। বিপুল আত্মমর্যাদার অধিকারী রামমোহন নিজব্যয়ে প্রেস কিনে 'শেষ আবেদন' প্রকাশিত করলেন। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৭৯। রামমোহনের খৃষ্টিয় ধর্মবিষয়ক অদ্ভুত শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবত্তার আশ্চর্য পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। উপসংহারে রামমোহন লিখছেন—**'I tender my humble thanks for the Editors kind**

suggestion in inviting me to adopt the doctrine of the Holy Trinity; but I am sorry to find that I am unable to benefit by this advice. After I have long relinquished every idea of a plurality of Gods, or of the persons of the Godhead, taught under different system of modern Hindooism, I cannot conscientiously and consistently embrace one of a similar nature, though greatly refined by the religious reformations of modern times; since whatever arguments can be adduced against a Plurality of persons of the Godhead and, on the other hand, whatever excuse may be pleaded in favour of plurality of persons of the Deity can be offered with equal propriety in defence of Polytheism. ত্রৈমাসিক ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ার নবম ও একাদশ সংখ্যায় মার্শম্যান সাহেব রামমোহনের বক্তব্যের উত্তর দিতে চেষ্টা করলেও তা শুধুমাত্র গিলিত চর্বণ।

রামমোহন মার্শম্যান বিতর্ক দেশে প্রচণ্ড উৎসুকের সঞ্চার করেছিল। 'একজন খৃষ্টবিশ্বাসী' ১৮২১ সালে ক্যালকাটা জর্ণাল পত্রিকায় রামমোহন সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'Blessed with the light of Christianity he dedicates his time and his money not only to release his countrymen from the state of degradation in which they exist, but also to diffuse among the European masters of his country, the sole true religion—as it was promulagated by Christ, his apostles and disciples. ইণ্ডিয়া গেজেট পত্রিকার মতে রামমোহনের প্রতি খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ—'injudicious and weak.···The effect of that attack was to rouse up a most gigantic combatant in the Theological field—a combatant who, we are constrained to say has not met with his match here.' রামমোহনের সঙ্গে বিতর্ক চলাকালে একটি ব্যক্তিগত পত্রে মার্শম্যান সাহেব তাঁর নিজের লেখাগুলি সম্পর্কে বলছেন—'these are the only articles one Divinity. I have ever written, and some may be apt to think me, from the 'Friend of India,' more of a politician than a divine; yet the study of divinity is my highest delight (Life and times of Carey, Marshman and Ward—J. C. Marshman, Vol-11 Page—239).

রামমোহনের ধর্মীয় তত্ত্বজিজ্ঞাসু চিত্তের গতি প্রকৃতি নির্ণয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানোর আগে খৃষ্টীয় ধর্ম বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণসমূহ আমাদের সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে হবে।

আচার্য ভানুভক্ত

সলীল বিশ্বাস

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে চসারের মতনই রাবেলাঁ, সার্ভান্টে, দান্তে, পেত্রার্ক, বোক্কাচিও এবং মার্টিন লুথার—ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিস, ইতালি এবং জার্মান ভাষাও সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের সমান্তরাল গতিতে একটি স্বচ্ছ ছন্দময়তার সৌকর্য এনেছিলেন। আচার্য কবি ভানুভক্ত, ঠিক তেমনি-ই নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে, নতুন প্রাণের ছান্দসিক গতি-রণন এনেছেন। এই অর্থে-ই আচার্য ভানুভক্ত নেপালী সাহিত্যের ইতিহাস শিলাফলকে একটি শ্রদ্ধা উৎকীর্ণ নাম।

কিন্তু এই 'নাম—গ্রন্থনায়' আমি এ কথা বোঝাতে চাইছি নে যে, যে অর্থে চসার রাবেলাঁ প্রমুখ মাননীয়, ঠিক সেই 'অর্থ মানে'ই আচার্য ভানুভক্ত স্মরণীয়। তবে, নেপালী সাহিত্যের পঠন-পাঠন অনুশীলন এবং ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গেলে আচার্য ভানুভক্তের শৈল্পিক-মননার মনন প্রসঙ্গে এই শ্রদ্ধের নামগুলো স্বাভাবিক ভাবেই মনে এসে যায়।

নেপাল-ভূমির পশ্চিম উপত্যকার তেহুঁনের কথাকলি ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। এখানেই একদিন সেন রাজত্বের পাদভূমি গড়ে উঠেছিল। নেপালী শাসক শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ-প্রতিভূ ভীমসেন থাপাও এই তেহুঁনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তেহুঁন শুধু রাজকাহিনীতেই স্মরণীয় নয়,—এখানের আলো হাওয়ায় বাণী-পুত্রদেরও জীবনকথা ইথার-গাথা হয়ে আছে। খ্যাতকীর্তি সংস্কৃতজ্ঞ, বিখ্যাত 'বসুধাভরযানন্দ' রচয়িতা পণ্ডিত শিব শর্মা এখানেই জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর দিনে, এই তেহুঁনের-ই রাঘমা গ্রামের একটি পরিবারে ১৮১৪-র ১৩-ই জুন আচার্য ভানুভক্ত জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু বিশ্ব ইতিহাসের সেই বিবর্তিত দিনগুলোর অন্যান্য চরিত্রের মত আচার্য ভানুভক্তের জীবনকথাও একটি পরিজ্ঞাত সরলরেখায় গাঁথা নেই। কবির বিভিন্ন জীবনীকারদের গোছাল অগোছাল নানান প্রেক্ষিতের পরস্পর বিরোধী মন্তব্য মতবাদ থেকে তাঁর শৈশব দিনগুলোর অনেক প্রায়োজনিক তথ্য-ই উদ্ধার করা যায় না। আচার্যের খ্যাতিমান পৌত্র শ্রীকৃষ্ণ আচার্য কবি প্রসঙ্গে বলছেন যে,—কবি 'বারানসীধামে' শিক্ষা অর্জন এবং তাঁর প্রথম কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কবির অন্যতম জীবনীকার মতিরাম ভক্ত কবি-পৌত্রের এই বিবরণকে স্বীকার করেন নি। তাঁর ভাষ্য অনুসারে দেখতে পাই যে,—কবি তাঁর পিতামহের কাছেই সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্র চর্চা করেন। 'পুরান কবির কবিতা'-র সম্পাদক বাবুরাম আচার্য এবং বালকৃষ্ণ শর্মাও কবিজীবনের নানান ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন।

আগেই এ কথা বলেছি যে,—আচার্য ভানুভক্ত-ই নেপালী ভাষাও সাহিত্যে আন্তর-প্রকাশের একটি অনির্বাণ গতি এনেছেন,—তবুও এই সত্যি ঐতিহাসিক যে, তাঁর জীবন ও কবিতা বিকাশের পূর্বতন দিনে নেপাল ভূমিতে আরও কিছু খ্যাতিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। আচার্য ভানুভক্তের পূর্বসূরি শুভয়ানন্দ দাস, শক্তি বল্লভ, গুমনি পন্থ, উদয়ানন্দ, বসন্ত শর্মা, বিদ্যারণ্য কেশরী, যদুনাথ

এবং রঘুনাথ পোখরেল প্রমুখ কবিবৃন্দ সংস্কৃত, মাগধী, মৈথিলী এবং ভোজপুরীর সংমিশ্রণে গঠিত নেপালী ভাষাকেই তাঁদের সাহিত্যভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং এই গঠনশীল ভাষাকে একটি আধুনিক রূপ দিতে চেষ্টা করেন। আচার্য ভানুভক্ত সেই অনুশীলন প্রয়াসেরই সার্থক উত্তরণ বহন করে এনেছেন। তাঁর সাধনার ফলশ্রুতিতেই নেপালী ভাষা ধ্রুপদী সাহিত্যিক এবং জাতীয় ভাষার স্তরে উন্নীত হয়েছে। তিনি-ই তাঁর ভাষাকে সারস্বত কাব্যলোক থেকে লোকযানী কথামালার গ্রন্থন রেখায় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু নেপালী ভাষা প্রাথমিক স্তরে এই সকল সনাতন ভাষা ভাণ্ডার থেকেই মাত্র শরীরে উপাদান গ্রহণ করে নি ;—তামাং, নেওয়ার, গুরুং, মগর এবং রাই-দের ভাষা, আঞ্চলিক লোকযান ও লোক-লৌকিকতা থেকেও সে ভাষা উপাদান সমৃদ্ধ হয়েছে।

নেপালী ভাষার ইতিহাস অনুসৃতিতে দেখা যায় যে প্রায় ছ' শ' বছরের পেছন ভূমিতে তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেলেও ১৩৫৭ খ্রীষ্টাব্দের রাজা পৃথ্বিমল্লার 'যুমলা' তামার পাত প্রাপ্তির আগে নেপালী ভাষার আক্ষরিক রূপ ধরা পড়ে নি।

আচার্য ভানুভক্ত স্বচ্ছ সাবলীল গতিতে সাহিত্য সাধনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক জীবন-ধারা অনির্বাদ থাকলেও বিঘ্নহীন ছিল না। ১৮৪১ সালে আচার্য ভানুভক্ত তাঁর পাঁচ-সর্গে পরিকল্পিত বহু খ্যাত রচনা 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'-এর প্রথম সর্গ সমাপ্তকরেন, কিন্তু রচনাটি সামগ্রিক সম্পূর্ণতার পূর্বেই প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিবেশে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কারারুদ্ধ হন।

জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্য—এ কথা মেনে নিলেও কোন সাহিত্যব্রতীই জীবিকার প্রয়োজনীয়তা থেকে জীবনকে সরিয়ে আনতে পারেন না। আচার্য ভানুভক্তকেও তাই জীবিকার স্বাভাবিক সর্তগুলো মেনে চলতে হয়েছিল। তিনি সমকালীন নায়ক-নাগরিক কৃষ্ণ বাহাদুরের হিসেব রক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। কৃষ্ণ বাহাদুর ছিলেন সেকালীন নেপালের প্রধানমন্ত্রী, জং বাহাদুরের ভাই। ভানুভক্তের কবি-মন হিসেব রক্ষকের গত-দৈনিক জীবনধারার সঙ্গে আত্মিক মেলবন্ধন রচনা করতে পারে নি ;—ফলে, হিসেব ভ্রান্তির জন্যে অনতিবিলম্বেই তিনি অভিযুক্ত হলেন এবং এর ফলশ্রুতিতেই কারাবাস নির্দেশিত হলো।

কিন্তু তাঁর কারা জীবনের অভিশাপ আশীর্বাদের প্রশান্তিই বহন করে এনেছিল। এই কারা-অবকাশেই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতির সৃষ্টির সুযোগ পান। ১৮৫৩ সালের বন্দী কারার দিনগুলোতে তিনি তাঁর 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'এর অবশিষ্ট চারটি সর্গ রচনার কাজ সম্পূর্ণ করেন। তাঁর বহুখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' ছাড়া ভক্তমালা, প্রশ্নোত্তরী এবং বধূশিক্ষা অন্যতম। এ সমস্ত কাল-উত্তরী রচনা সম্পূর্ণ করেও আচার্য ভানুভক্ত আরও অনেক কবিতা পদ্য এবং গাথা রচনা করেন। এ সব রচনা নেপালের লোক জীবনকে ছুঁয়ে আছে।

আচার্য ভানুভক্তের রচনায় একটি স্বাভাবিক গতি স্বচ্ছন্দ দেখা যায়,—যা তাঁর জীবন অনুভূতির গহীন তল থেকেই উঠে এসেছে। তাঁর সৃষ্টি ঘিরে একটি সুকুমার লাবণির স্নিগ্ধতা বিরাজ করছে। তিনি তাঁর সৃষ্টি শক্তির প্রসাদে শার্দুলবিক্রীড়িত এবং শিখরিণীর মত কঠিন ছন্দকেও লোকপ্রিয় করে তুলেছেন।

নিবিড় অর্থে আচার্য ভানুভক্তের রচনা অধ্যাত্ম-বোধি নির্ভর। তাঁর আধ্যাত্মিকতা তত্ত্বমসি-বোধি চেতনা থেকেই উৎসারিত এবং তিনি 'জীব' ও 'ব্রহ্ম'-র অভেদাত্মতা স্বীকার করেন। কবি এই অধ্যাত্ম-রহস্য লোক থেকেই তাঁর রচনার প্রাণরস সঞ্চয় করেছেন ;—এবং অন্য কোটাতে, একটি গভীর আধ্যাত্মিক প্রবণতা তাঁকে অধ্যাত্ম রহস্যলোক মুখীন করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর এই আধ্যাত্মিক প্রবণতা পুরাণ নন্দিত চতুর্বর্গ লাভের ঐকান্তিক বাসনা-প্রসূত নয়। আচার্য ভানুভক্তের জীবন ধর্ম এবং নেপালের সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে কবির এই মানস প্রবণতার স্বাভাবিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়।

আঠার শতকের অনতি মধ্যভাগেই এশিয়া ভূমিতে ইংরাজ বণিকের 'মানদণ্ড' রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভাসকোদাগামার কালিকট তটভূমিতে অবতরণের ভেতর দিয়েই এই 'প্রতিষ্ঠা'র সূচনা সূচিত হয়। ইতিহাসের বিস্তৃত বিচরণ-চারণা না করেও বলা যায় যে, কালিকট থেকে হেসটিংস-সুজাউদ্দৌল্লার গোপন কাশী চুক্তির (১৭৭৩) সময় সংঘটনের মধ্যেই এই ইতিভাষ্য গ্রন্থিত রয়েছে।

সমকালীন ভারতীয় রাজপুরুষদের মধ্যে যখন ইংরাজ বিরোধিতার ঐক্য গড়ে তোলার সচেতনতা দেখা যায় নি, তখন নেপাল শাসক বর্গের প্রতিভূ পুরুষ ভীমসেন থাপা-ই প্রথম ভারত ও এশিয়ীয় রাষ্ট্রের মিলিত ঐক্য গড়ে তুলে ইংরাজ শক্তির মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন—এবং এশিয়ার মাটি থেকে তাদের নির্মূল করার পরিকল্পনাও করেছিলেন। এই পরিকল্পনা নিয়েই তিনি ভারতের মারাঠা শক্তি; রঞ্জিৎ সিংহ এবং বর্মার সমকালীন রাজশক্তির সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন। এই প্রয়াস ভীমসেন থাপার বাস্তব সচেতন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ঐতিহাসিক প্রমাণ বহন করছে।

যদিও ভীমসেন থাপার এই আন্তরিক শুভ প্রয়াসে কোন খাদ ছিল না, তবুও তিনি অন্তিম উত্তরণ অর্জন করতে পারেন নি। ইংরাজ শক্তির সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির সংঘর্ষের অনিবার্য মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো।

আচার্য ভানুভক্তের জন্ম বর্ষে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে নেপাল রাজশক্তির যুদ্ধ অনিবার্য হলো এবং এই যুদ্ধের ফলেই ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে আপাত শান্তির প্রস্তাব নিয়ে ইংরাজ ও নেপাল রাজশক্তির মধ্যে 'সগৌলি-সন্ধি' স্বাক্ষরিত হলো।—এই সন্ধি নেপাল জাতির প্রতি মর্যাদাপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এ সত্ত্বেও বণিক ইংরাজ তার প্রতিশ্রুতি রাখে নি ; ফলে ইংরাজ প্রবঞ্চনা প্রতিরোধী দৃঢ়-সংকল্প নেপাল জাতির সঙ্গে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ শক্তির আর এক রক্তক্ষয়া যুদ্ধ সংঘটিত হলো। অগণিত নেপালী শহীদের তাজা কলিজার খুনে খুনে লাল পিচ্ছিল পথ বেয়ে শক্তিদম্ভী ইংরাজ এগিয়ে এলো ; মৃত্যু-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিরোধের সামগ্রিক মুহূর্তে ভীমসেন থাপা রাজপ্রাসাদ রক্ষার চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মুক্তির অন্তিম পথ হিসেবেই তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন। রাজপ্রাসাদের পতন এবং ভীমসেন থাপার আত্মহত্যার যুগ্ম সংবাদ উৎকণ্ঠিত নেপাল জাতির জীবনে মৃত্যুর হিমবাহ নিয়ে এলো। তার পরের ইতিহাস শাসন এবং শোষণের রক্ত-নীল ধারার ইতিহাস।

এই পরিবেশ-প্রতিবেশে আচার্য কবি ভানুভক্ত অনুভব করেছিলেন যে, একমাত্র 'আধ্যাত্মিকতা'-র অনুচর্চা থেকেই জাতির হৃত শক্তি ও জনতার মানসিক চেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। ভানুভক্তের প্রখ্যাত 'অধ্যাত্মরামায়ণ' সমকালীন নেপালের অবস্থা প্রতিবেশের পূর্ণায়ত চিত্র-লিপি। তিনি তাঁর স্বচ্ছ-আন্তরিকতায় অনুভব করেছিলেন যে, 'রামচন্দ্র'-ই একমাত্র আরাধ্য হতে পারেন; কেননা, রামায়ণের এই মুখ্য-চরিত্র সামগ্রিক অন্যায়ের সংহারক এবং মানসিক মূল্যবোধের অনির্বাণ স্মারক। সমকালীন নেপাল মানসিকতায় এমনি একটি অপরাজেয় শক্তির উৎস থেকে প্রেরণা লাভের প্রয়োজন অনিবার্য ছিল। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনের প্রেরণাই আচার্য ভানুভক্তকে অধ্যাত্মবোধের রহস্যলোক মুখীন প্রবণতায় প্রাণিত করেছে। তাই তাঁর রচনাবলী নেপালী ভাষা ও সাহিত্যে কেবল আধুনিকতার সুরই রনিয়ে তোলে নি; নেপালের জাতীয় জীবনে একটি সচেতন রাজনৈতিক ঐক্যের ইস্পাতী কাঠিন্য ও সংহতি এনেছে।

আচার্য ভানুভক্তের সাধারণ রচনাগুলি তাঁর সমকালীন সমাজ-মানসিকতার পরিচয় বহন করে। সমকালীন সামাজিক অসাম্য সম্পর্কে তিনি ক্ষুরধার সমালোচক ছিলেন। তদানীন্তন 'রাণাশাহী'র সামান্যতম অপরাধকেও তিনি ক্ষমার চোখে দেখেন নি। তবে অন্যায়-সমালোচনার প্রবণতা তাঁর ছিল না। সামাজিক মানুষের কল্যাণ সাধনাই তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল। এই স্বার্থ-মুক্ত মানসিকতা তাঁর রচনার একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য এনেছে এবং রচনার এই গুণটি তাঁকে অন্যান্য রচনা থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে।

আলোচনার অন্তিমে আচার্য ভানুভক্তের রচিত একটি হাস্যরসাত্মক কবিতার বাংলা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। আমার শ্রদ্ধা পরম আচার্য শঙ্খ ঘোষ অনুবাদটির পরিমার্জনা করেছেন। 'উইট, হিউমার এবং সারকজমের' সংহত সমন্বয়ে কারাগারের নির্জন 'সেলে'র জাতক কবিতাটিতে কবি ভানুভক্তের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট চিত্র নিহিত আছে বলেই মনে করি,—

হে আমার বিধাতা,
প্রতিদিন আমি তোমার এমন
জীবন্ত স্পর্শ লাভ করি!
তাই এ-মন কখনও পীড়িত নয়।
কোন মূল্য না দিয়েই,—বিরামহীন,—
আমি এক নৃত্যের আনন্দের
প্রসাদ লাভ করি;—

মশা এবং মাছি এবং ছারপোকা
এরাই আমার রাত্রির সঙ্গিনী;—
মশার সঙ্গীত এবং
মাছির নাচ—
তার-ই আনন্দ
আমি অবিরাম উপভোগ করি।

(ইংরাজী থেকে অনূদিত)

আচার্য ভানুভক্তের কবি চারিত্র আমাদের এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, তিনি-ই আধুনিক নেপালের শ্রেষ্ঠ কবি এবং কেবলমাত্র পনের মিলিয়ন নেপালী ভাষাভাষী মানুষের জীবন সীমানায় তাঁর পাঠক-সীমা সীমিত নয়,—বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষী অগণিত কাব্য-রসপিপাসুদল নেপালের নব-জাগরণের অগ্রপথিক ও আধুনিক রূপকার আচার্য কবির কবিতার অনুরাগী পাঠক।

ন্যাশনাল থিয়েটার ও তার নেপথ্য-নায়ক মধুসূদন

পুলিন দাশ

নাট্যজগতে মধুসূদনের আবির্ভাব যেমন আপতিক, অন্তর্ধানও তেমনি আকস্মিক। এ অঙ্গনে তাঁর অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এই ক্ষণচর্চাতেই বাংলার নাট্যলোককে তিনি যা দিয়ে গেছেন তার মূল্য অপরিসীম। যে কখানি নাটক প্রহসন তিনি লিখে গেছেন তদানীন্তন বাংলা নাটকের সঙ্গে তুলনায় তারা অসাধারণ। ভাবীকালের বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পথিকৃতের।

মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই কি তাঁর হাতে বাংলা নাটকের এই অভাবিত সমৃদ্ধির একমাত্র কারণ? অনেকাংশে হয়তো তাই মনে হবে। কিন্তু পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত এই সাফল্যের অন্তরালে যে একটা সদাতৎপর নাট্যচিন্তার নেপথ্যলোকও বিরাজিত ছিল একথা ভোলা ঠিক হবে না। দেশবিদেশের নাট্যসাহিত্য মন্থনজাত একটা স্বতন্ত্র নাট্যবোধে উদ্বোধিত মনন অধিকার অর্জন এবং তার আলোকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন জাতীয় নাটক রচনার উপযোগী সৃষ্টিশীল নাট্যচিন্তানির্মাণ মধুসূদনের নাট্যকর্মের নেপথ্যবিধান। জাতীয় আশা বাসনার পরিপূরকরূপে নাটককে দেখতে চেয়েছিলেন মধুসূদন। স্বভাবত তাই 'ন্যাশনাল ড্রামা', 'ন্যাশনাল থিয়েটার' কথাগুলি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল মধু-কণ্ঠেই। উচ্চারণ মাত্র নয়,—তাঁর নাট্যচিন্তায় ও সৃষ্ট নাটকের মাধ্যমে মধুসূদন জাতীয় নাটক ও জাতীয় নাট্যশালার উপযোগী উপকরণ উপাদান সংগ্রহ করে দিয়ে গেলেন। যার সফল পরিণতি ঘটল ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠায়।

'রত্নাবলী'র অভিনয় দর্শনে তৎকালীন 'অলীক কুনাট্যের' প্রতি মধুসূদনের অনীহা এবং ভালো নাটক সৃষ্টি করে নাট্যরস-পিপাসা নিরাকরণের প্রেরণায় লেখেন 'শর্মিষ্ঠা নাটক'। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৮৫৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় মঞ্চস্থ হল শর্মিষ্ঠা। বেলগাছিয়া নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতাদের আমাদের উদীয়মান 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' আদি সংগঠক সুহৃদ বলে বর্ণনা করে শর্মিষ্ঠার অভিনয় প্রসঙ্গে মধুসূদন লিখলেন—'**Sarmistha is to be acted at the elegent private theatre attached to the Belgachia villa of the Raja of Paikpara. Should the drama ever again flourish in India, posterity will not forget these noble gentlemen—the earlist friends of our rising National Theatre.**'

দেখা যাচ্ছে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশের সেই আদি মুহূর্ত থেকেই ভারতবর্ষে নাটকের পুনরভ্যুদয় মধুসূদন মানসের অভিষ্ট। নাটকের উৎকর্ষ মঞ্চের উৎকর্ষের উপর যেহেতু নির্ভরশীল সেই জন্য জাতীয় নাটক জাতীয় নাট্যশালাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠতে পারে এই প্রত্যয় থেকে মধুসূদন জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের সূচনা যাঁরা করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই পাইকপাড়ার রাজাদের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

জাতীয় নাট্যশালা বা 'ন্যাশনাল থিয়েটার' সম্পর্কে মধুসূদনের প্রার্থনা পূর্ণতার পথে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল আহীরিটোলার রাধামাধব হালদার ও যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাধারণ রঙ্গালয়

প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে। ১৮৬০ সালের গোড়ার দিকে 'দি ক্যালকাটা পাবলিক থিয়েটার' নাম দিয়ে তাঁরা একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার জন্য অনুষ্ঠান পত্রও প্রচার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টা অবশ্য ফলপ্রদ হয়ে ওঠে নি। এই বিফল প্রয়াসকে সফল করে তোলার আহ্বান ঘোষিত হল সোমপ্রকাশ-এর পৃষ্ঠায়। ১৮৬২ সালের ১২ই মে সোমপ্রকাশে লেখা হল—'...আমাদের পূর্বতন অভিনয়াদি পুনরুজ্জীবিত হউক। ..শ্রীযুক্ত রাধামাধব হালদার প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তি সাধারণ রঙ্গভূমি করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু উৎসাহ বিরহে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় তাহাদের এ বিষয়ে চেষ্টাবান হওয়া উচিত।'

১৮৬৮ সালে আগষ্টের নব প্রবন্ধে এই আগ্রহেরই পুনরাবৃত্তি—

'আমরা অভিনয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে সবিশেষ অনুরোধ করি, যে তাঁহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া, কোন একটা প্রকাশ্য স্থানে নাট্যমন্দির প্রস্তুত করুন, বেতনভোগ নটনটী রাখুন, এবং নির্দিষ্ট টিকিট বিক্রয় করুন, তাহা দ্বারা অভিনয়ের সমুদায় ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে, উর্দ্ধতন হইয়া অভিনয় খাতায় জমা হইলে ক্রমশঃ অভিনয়ের উন্নতি হইতে পারিবে।'

পয়সার কথা উঠলেও অভিনয় প্রদর্শনের মাধ্যমে পয়সা রোজগারই জাতীয় নাট্যশালার লক্ষ্য এমন কথা নবপ্রবন্ধের লেখক নিশ্চয়ই বলতে চান নি। সখের নাট্যশালাগুলির অনিশ্চয় স্থিতিতে আতঙ্কিত লেখক প্রস্তাবিত নাট্যশালাগুলির স্থায়িত্বের কথা ভেবেই টিকিট বিক্রির প্রস্তাব দিয়েছিলেন। বাগবাজারের সেই স্মরণীয় যুবকগোষ্ঠী যাঁরা ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্য এই সব আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন নাটক দেখিয়ে নিছক পয়সা রোজগার তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। ১৯ নভেম্বর, ১৮৭২ সালের 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করলেন তাঁরা খুব স্পষ্ট ভাষায় সেখানে তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রতিফলিত—'সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর সম্মুখে মৃত মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে বঙ্গভূমির ও বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি। সেদিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে।' ইংলিশম্যান্ পত্রিকায় ১৮৭২ সালের ২০শে নভেম্বরে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে এর সমর্থন মিলবে—

'A far native gentleman, residents of Bagh Bazar, have established a Theatrical Society, their object being to improve the stage, as also to encourage native youths in the composition of new Bengali Dramas from the proceeds of sales of tickets. The attempt is laudable one, and is first of its kind.

১৮৭২ এর ৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নীলদর্পণের অভিনয় মাধ্যমে ন্যাশনাল থিয়েটার এর আত্মপ্রকাশকে আরো অনেকের সঙ্গে ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র স্বাগত জানালেন 'The event of National importance' বলে।

জাতীয় রঙ্গালয়ের পোষকতা জাতীয় জীবনের সঙ্গে সুগভীর আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে জাতীয় নাটক আর তার ফলে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার সমুন্নতি সাধিত হবে—মধুসূদনের

এই বাসনারই যেন রূপায়ণ ঘটল সেদিনের 'ন্যাশনাল থিয়েটারের' উদ্বোধনের ভিতর দিয়ে।

মধুসূদনই প্রথম বাস্তব ও কিঞ্চিৎ কটু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন জাতীয় নাট্যশালার আশ্রয় আনুকূল্য না পেলে জাতীয় নাটক কখনো রচিত হতে পারে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের রুচিকে তুষ্ট না করতে পারলে ধনীর গৃহের সখের থিয়েটারে নাটকের জায়গা মেলা কঠিন। অথচ গতানুগতিক রুচির তোষণেই নাটকের দায়িত্ব অবসিত হওয়া সমীচীন নয়। দর্শক-রুচিকে অভীষ্ট পথে নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্যেই নাটকের মুক্তি।

শর্মিষ্ঠা এই লক্ষ্যের পথে মধুসূদনকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে মধুসূদন যে মন্তব্য করেছেন'···first attempt in the Bengali language to produce a classical and regular Drama' তা ঠিকই। বাংলা ভাষায় ধ্রুপদী রীতির রীতিমত নাটক লেখার আদি প্রয়াস শর্মিষ্ঠা নাটক সন্দেহ নেই। কিন্তু ঝোঁকের মাথায় তৎক্ষণাৎ লিখে ফেলা এই নাটকে ওই প্রয়াস যে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। মধুসূদনও এ বিষয়ে সচেতন। শর্মিষ্ঠা শেষ করে প্রহসন দুখানি লেখার পরে রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছেন—

'You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound of classical Dramas to regulate the national taste···'জাতীয় রুচিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, গড়ে তুলতে পারে, এমন নাটকের অভাব অনুভব করেছে মধুসূদনের অতৃপ্ত শিল্পীচেতনা।

শর্মিষ্ঠাকে সংস্কৃতরীতি অনুসারে পুনর্লিখনের যে পরামর্শ পেয়েছিলেন রামনারায়ণের কাছ থেকে সরাসরি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন মধুসূদন। স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন সংস্কৃত রচনামাত্রেরই অন্ধ দাসত্ব তিনি করবেন না। তিনি নাটক রচনা করছেন সেই সব পাঠক দর্শকদের জন্য যারা মধুসূদনের অনুরূপমনস্ক, পাশ্চাত্যচিন্তা আর পাশ্চাত্যের ভাবধারায় যাদের মন পরিপুষ্ট। কাজেই তাঁর নাটকে মধুসূদন যাকে বলেছেন 'foreign air' সেই বিদেশী হাওয়া প্রবলভাবে প্রবাহিত হবে। হয়েছে তাই শর্মিষ্ঠায়। আবার এই বিদেশী হাওয়ার সঙ্গে শর্মিষ্ঠায় সংস্কৃত নাটকের রীতি পদ্ধতি বিবর্জিত হলেও সংস্কৃত নাটক, বিশেষ করে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের ছায়া মিশে গেছে।

আসলে মধুসূদনের নিজস্ব নাট্যচিন্তা একটা সুসংবদ্ধরূপে তখনো গড়ে উঠতে পারে নি। গ্রীক কাহিনীর ভারতীয় বেশে আশ্চর্য সুন্দর রূপান্তর সত্ত্বেও পরবর্তী নাটক পদ্মাবতীতেও তা হয় নি। তবে শর্মিষ্ঠা রচনার সময়েই মধুসূদন ঠিক করে নিয়েছিলেন যে পরিচ্ছন্ন প্রোজ্জ্বল নাট্যভাবনায় উদ্ভাসিত মোহনীয় প্লট, সুসমন্বিত চরিত্রচিত্রণ আর ব্যাকরণবিশুদ্ধ ভাষার সমাবেশে নাটককে সার্থক করে তোলা সম্ভব। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ নাটককে মডেল হিসেবে গ্রহণ করলেও তাদের কাছে নির্বিচার আত্মসমর্পণও যে অনুচিত একথাও সেই সময়ই তিনি ভেবেছিলেন। বিদেশের কাছ থেকে ঋণগ্রহণের বিষয়ে তাঁর মত—

'I may borrow a neck-tie, or even a waist coat, but not the whole suit.' মূল পরিচ্ছদটি রচনায় যদি বাইরে থেকে উপকরণ আহরণে স্পষ্ট অনিচ্ছা তাহলে কোন উপাদানে তাকে

নির্মাণ করা হবে ? এই প্রশ্নের জবাব খুঁজে বার করার জন্য মধুসূদনকে নাট্যাঙ্গিকের প্রত্যেকটি দিক সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয়েছে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সমসময়ে এই চিন্তায় গভীরভাবে নিমজ্জিত মধুসূদন। সেইকালে লেখা তাঁর চিঠিপত্রে ছড়িয়ে আছে এই চিন্তার ইতিবৃত্ত।

এই চিন্তাসূত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, অভিনেয়তা প্রভৃতি নাটকের প্রতিটি অঙ্গ সম্পর্কে গভীরভাবে ভেবেছেন তিনি এবং এদের প্রয়োগযোগ্য আদর্শরূপ নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। পাশ্চাত্য নাটকের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির প্রতি মধুসূদনের স্বাভাবিক আকর্ষণ। ভারতীয় নাটক সম্পর্কে তাঁর ধারণাও অযথার্থ নয়—যে ভারতীয় নাটক "dramatic poems" অর্থাৎ নাটকের আধারে কাব্য। কাব্যধর্মী প্রাচ্য নাটকের পুনরুজ্জীবন আদৌ সঙ্গত বলে তাঁর মনে হয় নি। নাটকের আলঙ্কারিক সূত্রাবলীকে পূর্বেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ নাটকের, তাঁর ভাষায়, 'stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment' তাঁকে মুগ্ধ করে প্রলুব্ধ করে। এই প্রলোভন সত্ত্বেও পাশ্চাত্য নাটক আর নাট্যসূত্রাবলীর হুবহু অনুসরণকেও অভিপ্রেত বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রতিটি পদক্ষেপে রাস্তা তাঁকে তৈরী করে চলতে হয়েছে।

ইউরোপীয় নাটকের প্যাসানের যে তীব্রতা দীপক রাগে বাজে তার প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে মধুসূদন মুসলমানী কাহিনী নিয়ে নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। মুসলমানরা তাঁর মতে 'fiercer race'। তাদের কাহিনীর নাট্যরূপে তিনি ইউরোপীয় নাটকের অনুরূপ 'heroism of sentiment'কে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ পাবেন। মধুসূদনের শিল্পী মানস উল্লাস ভোগ করতে আগ্রহী অনুরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু মধুসূদনের সামাজিক চেতনাও সতর্ক হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। ইউরোপের সঙ্গে আমাদের অবস্থার খুব একটা প্রভেদ তাঁর সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। ইউরোপের নাটকে যে হৃদয়াবেগের প্রবণতা, তীব্র দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ আর প্রলয় ঝড়ের গর্জন প্রতিধ্বনিত ওখানকার সমাজেই তার অস্তিত্ব ছিল। তাই ওখানে তা স্বাভাবিক। মধুসূদন দেখলেন তাঁর দেশ-কালের পরিস্থিতি এমন যে হৃদয়ধর্মে যদিও বা তাঁর দেশবাসী আর ইউরোপীয়দের মধ্যে ভেদ নেই তবু তার প্রকাশের ভঙ্গি উভয়ত পৃথক। কাজেই ইউরোপের নাটকের মতো করে বাংলা নাটক রচনা করতে যাওয়া অসঙ্গত, অসমীচীন। বাংলা নাটকের লেখককে দেশকাল আর তার সামাজিক অবস্থার স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। এই স্বীকৃতির বন্ধনে হয়তো মধুসূদনের শিল্পীসত্তা পীড়িত বোধ ক'রেছে কিন্তু এই বাঁধনই তাঁকে মুক্তি দিয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার আদর্শ আবিষ্কারের পথে। 'I write under very different circumstaces. Our social moral developments are of different charactor'. আমাদের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ইউরোপের থেকে স্বতন্ত্র এই সত্যকে অঙ্গীকার করে নিয়ে তিনি নিজের পথে অগ্রসর হয়ে গেছেন। বলেছেন—'I have certain dramatic notions of my own, which I follow invariably'। তাঁর একান্ত আপন নাট্যবোধ আর তাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা নাট্যসূত্রাবলী যাকে তিনি অতঃপর অনুসরণ করেছেন তাঁর ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালা।

কৃষ্ণকুমারী নাটককে উদ্দেশ্য করে মধুসূদন কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে জানান—'If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre.' আমাদের জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তি রচনা করে দেবে কৃষ্ণকুমারী এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি নাটকখানি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীতে তাই দেখা যাবে নাট্যকার প্রাচ্য পাশ্চাত্যের কোন বিশেষ দেশের বিশেষ নাটক নয়, জগতের শ্রেষ্ঠ নাটকের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যা তাকে ভারতীয় পরিবেশে স্বদেশ ও স্বসমাজের প্রকৃতি অনুযায়ী পুনর্নির্মাণ করে পরিবেশনের চেষ্টায় নিমগ্ন। সংস্কৃত নাটকের কাব্যময়তা যার অবশেষ তাঁর শর্মিষ্ঠা নাটকেও কিছুটা অনুপ্রবেশ করেছিল তার যত্নকৃত বিবর্জন ঘটেছে এখানে। পূর্ববর্তী নাট্যকারদের মতো পাশ্চাত্য নাটক বা নাট্যরীতির অলস আক্ষরিক অনুকরণের পরিবর্তে পাশ্চাত্য নাটকের মর্মাদর্শটুকুকে গ্রহণ করে জাতীয় জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বন্দ্বমূল একটা কঠিন বন্ধুর ভূমির উপর এনে নাটককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় নাট্যশালার দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে নাটক।

নাটকের প্রতিটি অঙ্ককে কেমন করে প্রসাধিত করেছে মধুসূদনের এই চিন্তা কৃষ্ণকুমারী নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। কৃষ্ণকুমারী রচনার সময়ে মধুসূদন মানসে এউরিপিদেস বা সেক্সপীয়র-এর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী নাটকের চরিত্র চিত্রণে ভারতীয় আদর্শেরই অনুবর্তন ঘটে। 'The position of European, both dramatically as well as socially are very different'—সামাজিক দিক থেকে এবং ফলত নাটকীয় দিকথেকে ইউরোপের সঙ্গে ভারতীয় নারীর এই প্রভেদ চেতনা নিয়ে তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের নারী চরিত্র চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। কৃষ্ণকুমারীর ভালোবাসা তাই উন্মাদনার অতিশায়িতায় গিয়ে পৌঁছোয় না। পরিবার পরিজনের মর্যাদা রক্ষার মহৎ প্রশ্নসংকটই তাকে মৃত্যুমুখী করে তোলে। অন্তর্দাহের অগ্নিগ্রাসী বিস্ফোরণের তীব্র জ্বালাময় পরিণামের পরিবর্তে কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু ঘনিয়ে তোলে একটা অশ্রুবিধৌত সংযত বিষাদ। ভারতীয় নারীত্বের আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতির সূত্রেই রাণী অহল্যাকে কোনোক্রমেই আগামেমনন জায়া ক্লাইটেমনেষ্ট্রার সমগোত্রীয় করে তোলেন নি মধুসূদন যদিও এউরিপিদেসের ইফিগেনিয়া নাটককে নানাভাবে স্মরণ করেছেন তিনি কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরিকল্পনায়। বিলাসবতীর আত্মীয়তা অনেকাংশে যদিও মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার সঙ্গে কিন্তু পুরোপুরি বসন্তসেনাও সে না। আর মদনিকা—মধুসূদনের 'ফেভরিট' ও ভারতীয় আদর্শেই সৃজিত। 'ধনদাস, আমি ভাই, সতী স্ত্রী নই বটে, কিন্তু আমার ত নারীর প্রাণ বটে—হাজার হউক, পরের দুঃখ দেখলে আমার মনে বেদনা হয়।'—প্রতিযোগিতায় পর্যুদস্ত ধূর্ত ধনদাসের প্রতি মদনিকার এই উক্তি ইয়াগো, শাইলক লেডি ম্যাকবেথ কাউকেই স্মরণ করায় না। মমতাময়ী নারীহৃদয়ের করুণাধারার অকপট প্রকাশই বরং সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় নাটকের ভিত্তির স্থপতি মধুসূদন তাঁর দায়িত্বের অপর অংশ সম্পর্কেও সমান সচেতন। দর্শকরুচির পোষকতা কেবলমাত্র নয়, অভীষ্টপথে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার দায়ও যে তাঁর। অতএব প্রচলিত আদর্শের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত আদর্শের বীজও তাঁকেই বপন করে দিতে হবে দর্শক পাঠক মনে। চিরন্তন নারীহৃদয়ের অস্তিত্ব মহিমায় ভাস্বর বারবণিতা মদনিকা হয়ে উঠেছে শ্রদ্ধার পাত্রী। ভারতীয় আদর্শকে আহত

না করে নারীর প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের অনুগামী নারীচরিত্রসৃষ্টির সূচনা করে দিয়ে গেছেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে মদনিকার চরিত্রে।

কৃষ্ণকুমারী নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলিও মধুসূদনের এই একান্ত নিজস্ব নাট্যচিন্তার ফল। তাই রাজা আগামেম্‌নন-এর প্রচণ্ড প্রতাপের অগ্ন্যুৎপাত বা লীয়রের নিষ্ফল পরিতাপের বিশাল বিক্ষোভ রাজা ভীমসিংহে অনুপস্থিত। বিপন্ন স্বাধীনতা স্বদেশের সংকটমোচনের চিন্তায় নিরুপায় রাজা নিয়তি নির্দিষ্ট অমোঘ পরিণামের দিকে অসহায়ভাবে এগিয়ে যান। সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের থেকে ধনদাস যেমন পৃথক, তেমনি সে আবার ইয়াগোও নয়। কিংজন নাটকের ব্যাষ্টার্ড-এর কথা ভেবে যদিও বলেন্দ্র সিংহ অঙ্কিত তবু ব্যাষ্টার্ড-এর সঙ্গে তার পার্থক্যও প্রচুর।

'অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনো এদেশে এত পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই, যে তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য যে আমাদের সুমিষ্ট মাতৃভাষায় রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি, অন্য কোন ভাষায় তদ্রূপ হওয়া সুকঠিন।' নাট্যসংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষরের সামর্থ্য আর অমিত্রাক্ষর রচনায় নিজের অর্জিত অধিকার সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া সত্ত্বেও কেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে অমিত্রাক্ষর সংলাপ রচনা করেন নি তা মধুসূদনের উপরে উদ্ধৃত উক্তি থেকে বোঝা যাবে। সেক্‌সপীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডির সংলাপ অমিত্রাক্ষরে রচিত। আর মেঘনাদবধ কাব্যকে নাট্যরূপ দেবার সময় গিরিশচন্দ্র এই অমিত্রাক্ষরকে ভেঙে নাট্যসংলাপের একটা বিশেষ রূপ দিয়েছিলেন বাংলা নাটকের সংলাপ রচনার মাধ্যমরূপে যার বহুল ব্যবহার ঘটেছে পরবর্তী সময়ে 'গৈরিশছন্দ' নামে। এসব সত্ত্বেও কৃষ্ণকুমারীর সংলাপ রচনায় মধুসূদনের চিন্তা স্বতন্ত্রপথবর্তী। প্রত্যেক জাতির প্রাত্যহিক জীবন আচরণে লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু স্বতন্ত্র নিজস্ব বুলি গড়ে ওঠে। তার উপরে ভিত্তি করে নাট্যসংলাপ রচনার আদর্শকে অনুসরণ করেছেন মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটকে।

সব থেকে লক্ষ্য করার বিষয় জাতীয় নাটক রচনা করতে বসে মধুসূদন কৃষ্ণকুমারীতেই প্রথম জাতীয় ভাবনার উৎসার ঘটিয়েছেন। স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটল প্রথম কৃষ্ণকুমারী নাটকে। 'ভগবতি, এ ভারতভূমিতে কি আর সে শ্রী আছে। পূর্বকালীন বৃত্তান্ত স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই তা বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি না। হায়, হায়। যেমন কোন লবণাম্বু তরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ করে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এদেশের সর্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হতে কখনও অব্যাহতি পাব না।' ভীমসিংহের এই উক্তিতে পরাধীনতার আপদ থেকে উদ্ধারের বাসনা প্রথম ব্যক্ত হয়েছিল নাটকে। জাতীয় বাসনার রূপায়নের পথে জাতীয় নাটকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে দিয়ে গেলেন মধুসূদন তাঁর নাটকে। এই জাতীয়-বাসনার সুস্পষ্ট উচ্চারণ অতঃপর বাংলা নাটকের অন্যতম লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায়। যার বিদ্রোহাত্মক নিনাদে ভীতচকিত ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী বাধ্য হয়েছিল অচিরেই আইন পাশ করে নাট্যশালার কণ্ঠরোধ করতে। স্বাধীন নাট্য-চিন্তায় আর তার সফল রূপায়ণে কৃষ্ণকুমারীতে মধুসূদন যে আদর্শের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তারই

উপরে ১৮৭২এ এসে রচিত হল জাতীয় নাট্যশালার সৌধ। আর তার চারবছরের মধ্যে ১৮৭৬ সালে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন সপারিষদ গভর্ণর পাশ করে নিলেন। আইনের ধারায় ঘোষিত হল সেই সব নাটকের প্রদর্শন দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হবে যে নাটক—'likely to excite feeling of disaffection to the Government established by law in British India [or British Burma']—The Dramatic Performance Act, 1876, cl 3 (c).

বাংলা নাটকের ইতিহাসে মধুসূদনই প্রথম মঞ্চসচেতন নাট্যশিল্পী সমসময় ও সমাজের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কী ভাবে তিনি তাঁর নাট্যাদর্শ রচনা করেছিলেন এবং তদনুসারে নাটক রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন কৃষ্ণকুমারীর আলোচনা প্রসঙ্গে তার কিছুটা পরিচয় আমরা পেয়েছি। অপরপক্ষে মঞ্চের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগের সূচনা বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কাল থেকে ক্রমশ তা নানাদিক থেকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সংযোগরক্ষাকারী সেতুস্বরূপ। কেশবচন্দ্রের নাট্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত মধুসূদন তাঁকে গ্যারিকের সমকক্ষ অভিনেতার মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন নি। আবার সেই কেশবচন্দ্রের কাছ থেকে যখন কৃষ্ণকুমারী নাটকে সাব-প্লট' সংযোজনের উপদেশ আসে মধুসূদন তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এই বলে যে 'it will require two more females.' স্ত্রীভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অতিরিক্ত দুজন অভিনেতা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠবে মঞ্চাধ্যক্ষের কাছে একথা বুঝেছিলেন।

বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য শরচ্চন্দ্র ঘোষ যে উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, উমেশচন্দ্র দত্ত ও পণ্ডিত সামশ্রমীকে নিয়ে মধুসূদন ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। স্থায়ী থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে মধুসূদন সেখানে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রী নেবার পরামর্শ দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও এই ব্যবস্থার প্রতিবাদে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কমিটির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিলেন তবু একথা উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের আগ্রহ অনুসারে সেদিন স্ত্রীলোকের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয়ের যে ব্যবস্থার পত্তন হয়েছিল এর পর থেকে অভিনেত্রী ব্যতীত পেশাদার মঞ্চ চলেনি।

মধুসূদন সব সময়ই চেয়েছিলেন তাঁর নাটকের মঞ্চায়ন ঘটুক। তাঁর প্রহসন দুখানি অভিনীত না হওয়াতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। অভিনেয়তা গুণ আর নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ মঞ্চনির্ভর একথা জানতেন তিনি। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর দ্বারোদ্ঘাটন মধুসূদনের নাটক দিয়ে হয় নি একথা ঠিক। তাঁর উপস্থিতিও সম্ভবপর হয়নি এই আয়োজনের মুহূর্তে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ন্যাশনাল থিয়েটার-এর জন্মের অব্যবহিত পরেই ন্যাশনাল আর হিন্দু-ন্যাশনালে দুভাগ হয়ে পড়ার পর পুনরায় যখন এই দুই দল সম্মিলিতভাবে অভিনয়ের আয়োজন করেন সেদিনের আকর্ষণ ছিল মধুসূদনেরই কৃষ্ণকুমারী নাটক। মধুসূদনের অনাথ সন্তানদের সাহায্যকল্পে ১৮৭৩ সালের ১৬ই জুলাই তারিখে কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার-এর নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল না। বেঙ্গল থিয়েটারই প্রথম রঙ্গমঞ্চ যার নিজস্ব মঞ্চগৃহ ছিল। মধুসূদনের মায়াকানন নাটক দিয়ে

বেঙ্গল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘটনের কথা ছিল কিন্তু মধুসূদনের অকালমৃত্যুতে তা আর হয়ে ওঠে নি। বেঙ্গল থিয়েটার-এর সূচনা হল শর্মিষ্ঠা নাটক দিয়ে ১৬ই আগষ্ট, ১৮৭৩ সালে।

মধুসূদনের স্বপ্ন ও সাধনা এই ভাবে একাত্ম হয়ে রইল জাতীয় নাটক আর জাতীয় নাট্যশালার সঙ্গে। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে লিখেছিলেন মধুসূদন—

'Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress may be associate my humble name with yours.'

জাতীয় নাটক ও নাট্যশালার ইতিহাস রচনায় ভাবী ঐতিহাসিকের দ্বারা কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তার নামও একই সঙ্গে উচ্চারিত হবে মধুসূদনের এই বিনীত প্রার্থনা জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পরে আজকের ঐতিহাসিক শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেবেন বলেই আশা করা যায়। নামটুকু উচ্চারণ করেই হয়ত তুষ্ট হতে পারবেন না; ঘোষণা করতে হবে মধুসূদনকে জাতীয় নাট্যশালার নেপথ্য নায়করূপে।

লোকবৃত্তের স্বপক্ষে

শঙ্কর সেনগুপ্ত

এক একজন পণ্ডিত এক একভাবে ইংরাজী 'ফোকলোর' শব্দের অনুবাদ করেছেন। কেউ বলেছেন লোকবিদ্যা, কেউ বলেছেন লোকযান, অন্যে বলেছেন লোকবার্তা। তাছাড়া লোকশ্রুতি, লোকচর্যা, লোকবিজ্ঞান, লোকায়ন, লোককৃতি, লোকলোর, লোকবাঙ্ময়, লোকতত্ত্ব, লোকায়ত, লোকপরিচয়, লোকসংস্কৃতি প্রভৃতি শব্দও ব্যবহৃত হচ্ছে 'ফোকলোর'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের প্রস্তাব লোকবৃত্ত এই শব্দটির সমর্থনে দু'একটি কথা নিবেদন করা যেতে পারে।

এই নিবেদনের উদ্দেশ্য সংজ্ঞা তৈরী নয়, বিষয় বা শব্দটিকে গভীরভাবে জানার উদ্দেশ্যে এর চারিত্র বিশ্লেষণে সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে যে কোন অনুবাদ বা সংজ্ঞা জোর করে কারুর উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না, জন প্রয়োগের মারফৎ আসে তাদের স্বীকৃতি। সে দিক থেকে 'লোকবার্তা' হিন্দী জগতে জনপ্রিয়, শব্দটি হিন্দী ভাষা-ভাষীদের মধ্যে টিকে গেল, বাংলায় লোকযান বেশ কিছু গুণীজনের সমর্থন পেয়েছে। তাই এখান থেকে এমন গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে যার নাম 'সীমান্ত বাংলার লোকযান।' এখান থেকে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের নাম 'ভারতীয় লোকযান'। এবং এ শব্দটির নির্মাতা এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় মনীষী যিনি আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজের মধ্যে বিদ্বত্তম। আমরা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছি, ডক্টর সুনীতিকুমার প্রবর্তিত শব্দটি এখনও সর্বজন স্বীকৃতি পায় নি। পায়নি বলেই নানাজন নানাভাবে শব্দটির অনুবাদ করে চলেছে। এবং এই নানাজনের এই ভীড়ে আমরাও একটি শব্দ নিয়ে দাঁড়িয়েছি জন স্বীকৃতি বা সমর্থনের আশায়, জনস্বীকৃতি বা জন প্রয়োগে টিঁকে না গেলে শব্দটি হারিয়ে যাবে। তখন আমরাও স্বীকৃত শব্দটিকে গ্রহণ করে প্রস্তাবিত শব্দ বর্জন করতে রাজী থাকব। কারণ, আমরা সামাজিক জীব। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদেরকে সংযুক্ত রাখতে ও মানিয়ে নিতে চাই বৈ কি!

'ফোকলোর' বা 'লোকবৃত্ত' বলতে আমরা কি বুঝি, শব্দটি কর্ণগোচর হবার সঙ্গে সঙ্গে কোন চিত্রকল্প আমাদের চোখের উপর ভেসে ওঠে, শব্দটির কোন মাধুর্য বা আকর্ষণ অথবা বৈজ্ঞানিক চারিত্র আমাদের নিজেদের হারিয়ে ফেলতে ক্ষ্যাপার পরশপাথর খোঁজার মত কিছু একটা খুঁজে বেড়াতে উৎসাহিত বা চালিত করে তা নিবেদন করার উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা, লোকবৃত্তের শাখা-প্রশাখা উপশাখা তথা কথা-ছড়া নাচ-গান, প্রবাদ, ধাঁধাঁ, ব্রত আচার, আচরণ, অনুষ্ঠান, শিল্প-কলা ক্রীড়াদির একটি তালিকা পেশ করলে পাঠক সহজেই বিষয়ের গভীরতা ও ব্যাপকত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন। কিন্তু এই মুহূর্তে এরূপ কোন তালিকা পেশ না করেও আমরা বিষয়টির ভাবনায় পাঠকদের একটু সময় কেড়ে নিতে পারি।

নতুন করে উচ্চারণের দরকার নেই যে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের নিঃসৃত সংহতিবোধ যে কোন জাতীয়তাবাদের ভিত্তি, শক্তির উৎস, জাতীয়সত্তার ঐতিহাসিকরূপ পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য, বিশ্বসমক্ষে তাকে উদ্ভাসিত করার জন্যই লোকবৃত্ত গবেষণা তথা সত্যানুসন্ধান। কারণ

লোকবৃত্ত ঐতিহ্যভিত্তিক সৃষ্টি বা কালের প্রবাহ অতিক্রম করে জীবিত ও বস্তুতে শিল্পে এবং সাহিত্যে প্রতিরূপিত, এবং মুখে মুখে সৃষ্ট, মুখে মুখে স্থিতিশীলতাপ্রাপ্ত, দেখে দেখে উত্তরাধিকার সূত্রে রচিত উপাদান। এই উপাদানের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে লোকজ্ঞান ও মনীষার সবকিছু। তাই আত্মপ্রচারের জন্য নয়—সত্য ন্যায় ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠাকল্পে, জনজীবন উপলব্ধিকল্পে লোকবৃত্ত চর্চা তথা গবেষণা, বৈজ্ঞানিক অনুশীলন, বিজ্ঞানের রাজ্যে কোন কল্পনা-বিলাস বা প্রচারধর্মী আচরণের অবকাশ নেই, সত্য কথন, বস্তু নিষ্ঠা তথ্য এবং বিচার বিশ্লেষণ লোকবৃত্ত চর্চার ভিত্তি। মানুষের চিন্তা, চেতনা কর্মপ্রয়াস, ক্রমবিকাশ ও সভ্যতা বিবর্তনের ধারা এবং মানব অভিব্যক্তির সবকিছু লোকবৃত্ত গবেষকের অধ্যয়নের বিষয়। তার মধ্যে আছে ইতিহাস তথা ইতিবৃত্ত, আছে বৃত্তি ও সমাজ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত।

মানব ইতিহাস সম্পর্কিত বর্তমান ধারণা বা চেতনা প্রাচীনযুগের মানুষের ছিল না। তাই তখন দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী, রাজ-রাজরাদের যুদ্ধ সন্ধি জয় পরাজয়ের বৃত্তান্তই ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এবং বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীর কথা, তাঁদের সুখ দুঃখ, আচার-আচরণ, অসন-বসন, কর্মকৃত্যাদি সেখানে স্থান পায় নি। সমাজ ও সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক মানুষের সামগ্রিক জীবন প্রবাহ তাঁদের চেতনায় অনুপস্থিত। অথচ মানুষকে বাদ দিয়ে যে মানুষের ইতিহাস রচনা করা যায় না এই সত্য উপলব্ধি করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতে হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাকে সম্বল করে আধুনিক মানুষ, শিক্ষিত মানুষ, উপলব্ধি করে যে লোকবৃত্ত অনুশীলন না করলে বৃহত্তর মানব গোষ্ঠীকে স্পর্শ করা যায় না, যায় না তাঁদের জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে ইতিহাস, সমাজ ও বিজ্ঞানের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা। জানা যায় না অতীতকে, জানা যায় না সমসাময়িক সমাজের পুরুষানুক্রমে লালিত-পালিত জীবনবেদকে, পরিবেশ পরিপ্রেক্ষিত অনুশীলনের দ্বারা, লোকবৃত্তের গবেষণার দ্বারা, সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা ও ইতিহাস অনুধাবন করা যায়।

অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ অথবা ফেলে আসা দিনের বাঁধা পথে চললে সত্যানুসন্ধানী হোঁচট খাবেনই। এগিয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করে তাঁদেরকে স্ব স্ব ঐতিহ্যানুযায়ী চালিত করার জন্য লোকবৃত্ত কি শিক্ষা দেয় তা অনুশীলন করতে হবে বিষয় অধ্যয়নকারীকে, কোন অনীহার সাময়িক নির্বাসন অথবা হুজুগ বা ফ্যাসানের আমেজে লোকবৃত্তের অনুশীলন নয় সত্যটি বুঝতে হবে। বৃহত্তর জন সমষ্টির কাছে থেকে আহৃত জ্ঞানের আলোকে নতুন নির্ভুল পথ তৈরীর সামর্থ অর্জনের জন্য এবং সমসাময়িক জন-জীবনকে অন্তরতর করে জানার জন্য, সুন্দরতর করে গড়ে তোলার জন্যই লোকবৃত্ত চর্চার প্রয়োজনীয়তা। মানবের জীবিকাগত ও রিপুগত দ্বন্দ্ব এবং সংঘাতের কারণ নিরূপণের মাধ্যমে মানব চরিত্র ও প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করে লোকবৃত্ত, সত্যে পৌঁছতেও সে সাহায্য করে। এ জন্যই এ যুগের জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধ সমাজের একাংশ লোকবৃত্তকে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করছেন এবং তারা লোকবৃত্তকে লোকসমাজকে জানার জ্ঞানশিক্ষা বা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা বলে গ্রহণ করার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

স্মরণীয় কোন অঞ্চলের লোকবৃত্ত গবেষণা বা আঞ্চলিক অধ্যয়ন আজকের বিশ্বজনীনতার যুগে বিচ্ছিন্ন তথ্যের সংগ্রহমাত্র নয়। মনে রাখতে হবে যে সংগৃহীত তথ্যের সামগ্রিক মূল্যায়ণের মধ্যেই স্থানীয় লোকবৃত্তের বিস্তার ও উপলব্ধি। তাই লোকবৃত্ত গবেষণায় শুধু অঞ্চল বিশেষথেকে সংগ্রহ

বা বিবিধ তথ্য ও ঘটনার মালখানা তৈরী করলে কর্তব্য পালন করা হয় না। রঙীণ জাতীয়তা বা উগ্রআঞ্চলিকতা বোধাহত বিশ্লেষণও লোকবৃত্ত গবেষকের উপজীব্য নয়। বিচার বিশ্লেষণ, পরিমিতিবোধ, প্রয়োগ ও সুনির্দিষ্ট উপাদান ব্যবহারের কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া প্রত্যেকটি লোকবৃত্ত কর্মীর প্রাথমিক দায়িত্ব।

অর্থাৎ, লোকবৃত্ত কর্মীর পক্ষে শুধু সংগ্রহ ও অনুসন্ধানই যথেষ্ট নয়, তাকে করতে হবে বৈজ্ঞানিক সর্তানুসারে সংগৃহীত তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস ও মর্মোদ্‌ঘাটন। তাকে হতে হবে একাধারে বিচারক ও তাত্ত্বিক, মেঠোকর্মী ও অভিজ্ঞ বিশ্লেষক। তথ্য সংগ্রহক তথা গবেষক ও বিশ্লেষকের থাকতে হবে দেশ কাল জাত, সামাজিক, ধর্মীয়, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সমাজ বিজ্ঞানীর জ্ঞান। দেশজ চিন্তা-চেতনা, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কার-কুসংস্কার, নাচ-গান, খাদ্য-পানীয়, পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রেম, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। অন্য কথায় তাকে অর্জন করতে হবে সমস্ত জ্ঞানশাখায় প্রয়োজনীয় ব্যুৎপত্তি। এক-কথায় মানুষের সামগ্রিক জীবন ধারার সঙ্গে তাঁকে সামিল হতে হবে। তবেই তিনি লোকসমাজের জীবনবৃত্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। তবেই তিনি সংগ্রহকে বিচার বিশ্লেষণান্তে বৃহৎ জনসমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবেন। এ কাজে প্রথমেই তাঁকে ঠিক করে নিতে হবে-কোনটা লোকবৃত্ত এবং কোনটা লোকবৃত্ত নয়। বলাবাহুল্য, এই লোকবৃত্ত বলতে আমরা লোকবৃত্তের উপাদানকে বোঝাতে চেয়েছি। লোকবৃত্তের উপাদান এবং লোকবৃত্ত উভয়কেই একই শব্দ দ্বারা চিহ্নিত করার দরুণ পাঠক সাধারণের বিষয় অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে। এই অসুবিধা দূরীকরণে ইংরেজী ভাষায় ফোকলোর এর উপাদানকে Folkloristics বলা হয়েছে। আমরা folkloristics এর বদলে folklorology শব্দ গ্রহণে অধিক আগ্রহী। অবশ্য ইংরেজী ভাষাভাষীদের কাছে আমাদের আগ্রহ কতটা সমর্থন পাবে জানি না, তথাপি প্রস্তাবিত শব্দটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক নয়। Sociology, Anthropology, Archaeology প্রভৃতির সঙ্গে Folklorology শব্দটি বেশ মানিয়ে যায়। আর ফোকলোর এর বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে পড়ে এই শব্দ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

লোকবৃত্ত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার এ স্বীকৃতি বেশী দিনের নয়। স্বীকৃতি পাবার পর থেকেই বিশ্বব্যাপী চলেছে কাঁচামাল সংগ্রহের অভিযান। সংগ্রহান্তে চলেছে শ্রেণী বিভক্তিকরণ, মর্মোদ্‌ঘাটন, ব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়া। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রসার ও প্রয়োগবাদী মনোভাবের বিস্তার। একই সঙ্গে চলেছে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ঠিক ঠিক কাজ করতে না দিয়ে বিপথে চালিত করার প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের জন্য সৎ গবেষক ও কর্মীরা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করেছেন লোকবৃত্তের চালিকা-শক্তি, এবং চালিকা-শক্তি খুজে বের করতে এসে বা পূর্ণায়ত মানুষের জীবনবৃত্তের সামিল হতে গিয়ে তাঁরা শব্দটির নানাবিধ সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন। এই সব সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত ও গবেষক মহলে সুপরিচিত। সাধারণ পাঠক তা নিয়ে মাথা ঘামান না, এবং অনেক সময় শাব্দিক কচকচানি তাঁদের উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এহ বাহ্য।

নগর সভ্যতা পত্তনের শুরু থেকেই নগর সংস্কৃতির পাশাপাশি আদিম-গ্রাম্য-পল্লী-লোক সংস্কৃতি সমান্তরালভাবে এগিয়ে চলেছে। সমান্তরালভাবে চললেও একটি সংস্কৃতি অপর সংস্কৃতি থেকে পৃথক।

একটি ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ এবং অপরটি কিছু ঐতিহ্য কিছু ধার করা সংস্কৃতিতে বলীয়ান। গ্রামীণ বা পশ্চাৎপদ বৃহৎ জনসমষ্টির মধ্যে লোকসংস্কৃতির সজীব অবস্থান ও সতেজ অভিব্যক্তি। প্রথমতঃ স্মরণীয় পশ্চাৎপদ অংশীদার হিসাবে আদিম তথা উপ-খণ্ড-বিযুক্ত-বন্য-জাতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা লোকসমাজভুক্ত হয়ে পড়ে বহু গবেষকের চোখে। পরে অবশ্য তাঁরা লোকসমাজের বাইরে আদিম সমাজ ও সংস্কৃতির আওতায় আসে, তখন আদিম সমাজ ও সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষের কোন কোন কৃত্য লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও সামগ্রিক ভাবে আদিম সংস্কৃতি একটি ভিন্ন চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, সুতরাং যা কিছু আদিম বা বন্য তা সবই লোকসংস্কৃতির অঙ্গ নয়। কিন্তু লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় প্রায়শই এমনভাবে উভয় সংস্কৃতিকে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয় যা দেখে নৃতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ ভ্রূ কুচকাচ্ছেন। লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতির পণ্ডিত গবেষকগণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টির অনুধাবন ও পর্যালোচনা করলে নৃতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের নিকট থেকে তাঁদের এই অবজ্ঞা সইতে হত না।

নগর-সংস্কৃতি-আদিম ও লোকসংস্কৃতির নির্যাসসিক্ত হলেও যতদূর সম্ভব তাদের ছোঁয়া পরিহার করে চলতে সচেষ্ট। যদিও সুদূর অতীত থেকে এরা নগর সভ্যতা, চিরায়ত শিল্প সাহিত্য অসন-বসন ও সৌন্দর্য-বিলাসের বৈভব প্রদান করে চলেছে, এত দিয়ে এবং এত অবজ্ঞা সয়েও ওরা অফুরন্ত। অপূর্ব প্রাণসুষমায়মণ্ডিত। পূর্বে সংস্কৃতির মধ্যে এত বিভাজন ছিল না। ক্রমাগ্রসরতার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে যেমন আদিম ও লোকসংস্কৃতি নিজস্ব চেহারা নিয়ে দাঁড়াল, তেমনি অপর দিকে নগর তথা শাসক সংস্কৃতি আরেকটি চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল। সংস্কৃতির বিভাজন তখন থেকে সুরু হল যখন পুঁজির দাপট সারাবিশ্বে পরিব্যাপ্ত, যখন বিনিময়ের বদলে টাকা আদান প্রদানের মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পেল। আর্থিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পালটাতে সুরু করল মানুষের জীবনবোধ। এই বোধ থেকে এসেছে প্রাচীন, আদিম, পল্লী, গ্রাম্য ও লোকসংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য। এসেছে লোকবৃত্তের পরিধি, ব্যাপ্তি ও অবয়ব নিয়ে নানা চিন্তাভাবনা ও জিজ্ঞাসা। ক্রমে প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও শিল্পকলাদির গবেষণার সঙ্গে নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, সমাজ-ভাষাতত্ত্ব, মনোবিদ্যা এবং আদিম জনজীবনের বৃত্তান্তের সঙ্গে লোকবৃত্ত গবেষণারও তফাৎ সূচিত হয়, তফাতের সূক্ষ্মতা গবেষকের চোখে ধরা না পড়লে সব জিনিসকে একাকার করে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব, অবশ্য, কোন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আহরণের জন্য শুধুমাত্র সেই বিষয়টি অধ্যয়নের মধ্যেই তা সম্ভব নয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার জন্য কাছাকাছি সব বিষয় সম্পর্কেই গবেষককে জানতে হবে। এছাড়া সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়া যায় না, তাই বিভাগীয় জ্ঞানসম্পন্ন অবসরপ্রাপ্ত কোন প্রচার কর্মী, 'পক্বকেশ' নিয়ে গবেষণা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রচার যন্ত্রের মহিমায় 'আজীবন গবেষক' ও 'শিক্ষক' বলে প্রচারিত হতে পারেন, কিন্তু বিষয় জ্ঞানের স্বল্পতা হেতু কিছুতেই বিশেষজ্ঞ হয়ে টিকতে পারেন না। তবুও তাঁদের কর্মে বাধা দেওয়া যায় না। কারণ লোকবৃত্তের মজুত ভাণ্ডারে হানা দেওয়া সকলের পক্ষেই সম্ভব, কারণ লোকবৃত্তের প্রবেশদ্বারে কোন দ্বাররক্ষী নেই, অথচ কে না জানে যে লোকবৃত্ত লোক-সমাজকে জানার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। সে হাতিয়ারের ব্যবহার তিনিই করতে পারেন যিনি বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত।

লোকবৃত্ত বংশ পরম্পরায় সঞ্চিত লোকসমাজের জ্ঞানভাণ্ডার। এই জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় লোকসমাজের শ্রমপ্রক্রিয়া অনুধাবনে। শ্রীঅরুণকুমার রায় 'লেখা ও রেখা' সাময়িক পত্রের শ্রাবণ আশ্বিন সংখ্যায় এতৎ সম্পর্কে একটি আলোচনা রেখেছেন তাঁর 'লোকায়ন চর্চার ভূমিকা' নিবন্ধে। তিনি একটি বিশেষ দার্শনিক মতবাদে দীক্ষিত হওয়ায় তাঁর আলোচনা সেই দার্শনিক মতবাদভিত্তিক হয়েছে, যার সঙ্গে হয়ত সকলে একমত হবেন না। একই দার্শনিক মতে আস্থাশীল সুনীল চক্রবর্তী তাঁর 'লোকায়ত বাংলা' (১৯৬৯) গ্রন্থে শ্রম-প্রক্রিয়ার জয়গান গেয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাভিত্তিক, সংজ্ঞা উত্থাপন করেছেন এবং ফোকলোর শব্দটির বঙ্গানুবাদ করেছেন, কয়েক বৎসর পূর্বে কোন একটি আলোচনা প্রসঙ্গে বর্তমান লেখক বলেছিলেন, যে বিদেশে ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের সংজ্ঞা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চললেও এদেশে লোকবৃত্তের এমন কোন সংজ্ঞা আমাদের লোকবৃত্তের পণ্ডিতগণ এযাবৎ উপস্থাপিত করতে পারেন নি যা বিশ্বের লোকবৃত্তের গবেষক ও পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। এই কথার জের টেনে শ্রীরায় লিখেছেন—'শঙ্কর সেনগুপ্তের উক্তি যদি সঠিক হয় তা হলে বর্তমান প্রবন্ধকারই (শ্রীরায়) সর্বপ্রথম ভারতে লোকায়নের (ফোকলোরের) সংজ্ঞা উপস্থাপনা করছেন।' শ্রীরায়ের এ দাবী সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, ভবিষ্যৎ তার উত্তর দেবে। তবে তাঁর মতে 'যে সজীব উপাদান সমূহ মানব সভ্যতার উষাকালে যৌথ প্রয়াসে সর্বজনগ্রাহ্য উপসৌধগুলির ভিত্তিভূমি রচনায় সহায়তা করেছিল এবং শ্রেণীভিত্তিক সমাজ অতিক্রম করে এর নব অভিজ্ঞতায় বলীয়ান হয়ে ভবিষ্যতের এক উচ্চতর সর্বজন গ্রাহ্য সাংস্কৃতিক উপসৌধ গড়ার চালিকা-শক্তিরূপে আমাদের যুগের সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে…রূপে দেখা দেয় তাকেই লোকায়ন (folklore) বলে।" শ্রীচক্রবর্তী বলেছেন 'মানবসভ্যতা তথা ইতিহাসের আদিম-স্তর থেকে সুরু করে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উত্থান-পতন বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ভাবীকালের শ্রেণীহীন সমাজে তার (লোক সংস্কৃতি) অপরাজেয় অভিযান…আরণ্যক, গ্রামীণ, নাগরিক সংস্থান নির্বিশেষে সর্বস্তরে লোকসংস্কৃতির দৃপ্ত পদসঞ্চার। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী সর্বপ্রকার অর্থনীতি, সামাজিক বিবর্তন পরিবর্তনের ধারায় বিবর্তনশীল লোকসংস্কৃতির ভিত্তি। অর্থনীতি নিশ্চয়ই মূলক অর্থনীতিই বনিয়াদ। লোকসংস্কৃতি চিরবহমান, অমর।…শ্রমপ্রক্রিয়া তথা মেহনতের উৎস থেকেই লোকসংস্কৃতির উদ্ভব।' উপরের বক্তব্যদ্বয় লোকবৃত্ত বিজ্ঞদের কাছে কতটা গ্রহণীয় লোকবৃত্তের কর্মী ও গবেষকগণ তা ঠিক করবেন, কিন্তু লোকবৃত্তের অন্যতম উৎসমুখ যে শ্রমপ্রক্রিয়া তা অস্বীকার করা যায় না। মানুষ ও সমাজ অবিচ্ছেদ্য। মানুষ সমাজ ছাড়া বসবাস করতে পারে না। শ্রমের প্রকৃতি সমষ্টিগত বা যৌথ। এই যৌথ প্রকৃতির গুণেই আদিম মানুষের সমাজে উৎপাদনী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এবং সমাজের ক্রমবিকাশের ফলস্বরূপ পরস্পরের সহযোগিতা সৃষ্টি হয়। এই সহযোগিতার মধ্যে সৃষ্টি হয় ফোকলোর তথা লোকবৃত্ত, এবং এই সহযোগিতা থেকেই আসে ঐতিহ্য-বোধ, বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা, আসে কর্মপ্রেরণা ও সুখী জীবন পরিচালনার চালিকাশক্তি। সৃষ্টি হয় গান আমোদ আহ্লাদ ও সময় কাটাবার জন্য লোকক্রিয়া আরও কত কি। তাই লোকবৃত্ত ও লোকজ্ঞান ব্যষ্টি নয় সমষ্টির জীবনাভ্যাসের জ্ঞান, জীবনাচরণের জ্ঞান—মহাজ্ঞান।

শব্দসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের গভীরতার দিকে নজর দেওয়া হয়। ফোকলোর অভিধানে

তাই ২১ জন মার্কিন পণ্ডিত গভীর মননশীলতার সঙ্গে ফোকলোর এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে যে ২১ রকম সংজ্ঞা উপস্থাপিত করেছেন তাতেই তার ব্যাপকত্ব ধরা পড়েছে, তারপর আরও নানাভাবে হামেশাই এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের গবেষক ও পণ্ডিতমহলে সুপরিচিত তাই তার পুনরাবৃত্তির কোন মানেই হয় না। ইতিমধ্যেই আমরা 'ফোকলোর' এর প্রতিশব্দ হিসাবে লোকবৃত্ত ব্যবহার করেছি। অন্যান্য গবেষক পণ্ডিতেরা যে সব কাজ উপহার দিয়েছেন তারও উল্লেখ করেছি আলোচনার সুরুতে। প্রায় সকলেই নিজ নিজ অনুবাদের সমর্থনে বক্তব্য রেখেছেন, পরম্পরাগতভাবে সকলের যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্যে ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সম্ভব। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় আমরা নানা কারণে এত বিশদ হতে পারব না, এখানে শুধু এতটুকুই বলার চেষ্টা করা হবে যে এতগুলো শব্দ থেকে কোন একটাকে গ্রহণ না করে কেন আমরা 'লেকবৃত্ত' শব্দটিকে 'ফোকলার' এর সার্থক অনুবাদ বলে মনে করি।

ডবলু জে, থমস সৃষ্ট ইংরেজী ফোকলোর ফোক এবং লোর এ দুয়ের সমন্বয়ে জন্ম হয় ১৮৪৬ সনে। সৃষ্টিলগ্নে শব্দদুটির পৃথক সত্তা বোঝাবার জন্য শব্দদ্বয়ের মধ্যে একটি হাইফেন (-) ব্যবহৃত হত পরবর্তীকালে মার্কিন প্রভাবে হাইফেন বিদায় নিয়ে একটি শব্দে রূপান্তরিত হয়। যখন শব্দদুটি এক হয়ে যায় তখন অনেকে একে অনুবাদ করেন লোকসংস্কৃতি হিসাবে। কিন্তু ১৮৬৬ সন থেকে যখন কালচার শব্দটি আমদানী করেন ই, বি, টাইলর তখন থেকে 'কালচার' শব্দের অনুবাদ হয়ে এসেছে সংস্কৃতি। মাঝখানে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির কৃপায় কিছুদিন 'কালচার' শব্দের বঙ্গানুবাদ সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু জন প্রয়োগে ও রবীন্দ্রনাথের সমর্থন না পাওয়ায় তা তেমন সমাদৃত হয় নি।

গণতন্ত্রের আদর্শে সমাজ ব্যবস্থা পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের প্রতি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টিয়ে যখন তা মানবমুখী হল তখন ঐতিহাসিকগণ সমাজের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকেন এবং সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। এরই ফলে সাধারণ মানুষ তাঁদের অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হয়। মানে লোকসমাজের শ্রম, কর্ম ইত্যাদি জানার দিকে তাঁদের ঝোঁক দেখা যায়, দেশে দেশে লোকবৃত্ত সংগ্রহ ও অধ্যয়নের সাড়া পড়ে যায়। লোকবৃত্তকে তখন নৃতত্ত্ব ও ভাষা তত্ত্ব অধ্যয়নের একটি অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করা হয়, ফলে প্রাচীন ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রতি ঝোঁক এসে পড়ে।

ফোকলোর শব্দটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সে বর্তমান চরিত্র পায় নি। 'ফোকলোর' এর 'ফোক' প্রথমে জাতি অর্থে ব্যবহৃত হত ক্রমে অর্থ সঙ্কোচ হয়ে এখন জনসাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। প্রিমিটিভ বা আদিম জাতি অর্থেও 'ফোক' শব্দের ব্যবহার হত। পরে বলা হল যে প্রাচীন চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের উপর যে সমাজ এখনো দাঁড়িয়ে আছে তাদের ঠিক 'প্রিমিটিভ' বা আদিম বলা যায় না। তখন থেকে হয়ে আসছে জনসাধারণ অর্থে এর ব্যবহার। ইংরেজী শব্দটিকে নিয়েও অনেক আলাপ আলোচনা চলে। অনেকে অনেক ভাবে এর ব্যাখ্যা করেন এবং উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেন। অনেকে দাবী করেন যে অ্যাংলো-স্যক্সন Folkore শব্দটি জার্মান volkskunda শব্দের অনুবাদ, এই জার্মান শব্দটি ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে জার্মান ভাষায় প্রচলিত।

ভারতীয় ভাষায় volk বা volks এর অনুবাদ করা হয়েছে 'লোক'। এই লোক শব্দটি সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দ। বৈদিক যুগ থেকে বিভিন্ন অর্থে হয়ে চলেছে এর প্রয়োগ প্রায় সমার্থক ও প্রাচীন শব্দ গণ। 'ফোক' এর অনুবাদ অনেকে করেছেন 'জন'। 'জন' প্রাচীন শব্দ। সংস্কৃত ও পালিগ্রন্থে 'জন' মানব সমাজকে বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এই দিক থেকে 'জন' ও লোক শব্দের সখ্যতা বিদ্যমান, কিন্তু ব্যবহার ও ঐতিহ্যের প্রচারে লোক শব্দটি বেশী জনপ্রিয়। টিউটনিক ভাষা থেকে আহৃত প্রাচীন ইংরেজী Lore-কে জ্ঞানদান বা জ্ঞান আহরণ করার অর্থে জার্মানরা বলতেনা Lehre এবং ডাচরা Leer, আরও পরে এর অর্থ হয় লোক জ্ঞান বা wisdom of the folk.

'লোক' সুপ্রাচীন ভারতীয় শব্দ তথাপি এর উৎপত্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত কোন তথ্য আমাদের জানা নেই। ঋগ্বেদের 'দেহি-লোকম' স্থান অর্থে ব্যবহৃত। ঋক্ এবং অথর্ববেদে 'লোক' দুভাবে অবস্থান করছে। কিন্তু ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৃহদারণ্যক ও বাজসেনীয় সংহিতায় এর কোন ভেদাত্মক স্থিতির উল্লেখ নেই। আর্য আগমন এবং আর্য-অন-আর্য সংঘর্ষের ফলস্বরূপ 'লোক' শব্দের অর্থ পাল্টে যায়। এবং বেদোত্তর সংস্কৃতির সীমিত অর্থ থেকে 'লোক' এর অর্থ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। গীতায় লোকশাস্ত্র এবং অলৌকিক আচারের গুরুত্ব দেওয়া হয়। অবশ্য এই 'লোকশাস্ত্র' লোকসমাজের শাস্ত্র নয়, অন্য মানে বহন করে। অশোক শিলালেখ-এ লোক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, প্রজা অর্থে ও প্রজার হিতার্থে। বৌদ্ধ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে লোক মানব অর্থে প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃত এবং অপভ্রংশ সাহিত্যে লোকজত্তা (লোকযাত্রা) লোকপুবায় (লোকপ্রবাদ) আদি শব্দ লৌকিক নিয়ম অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ঋগ্বেদে লোক (সমাজ) ব্যাপক অর্থে কল্পিত। যে পুরুষরূপী ঈশ্বর, যার হাজার হাজার মুখ, ততোধিক চক্ষু আর পদ সেই লোক বহুরূপে ব্যাপ্ত। অর্থাৎ লোক শব্দটি বর্গভেদ রহিত, এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠতত্ত্বে পূর্ণ অর্বাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির দ্যোতক। নগর ও গ্রাম তথা পল্লীসংস্কৃতির উভয় রাজ্যেই শব্দটির সমানাধিকার। সুতরাং 'ফোকলোর' এর 'ফোক' এর অনুবাদ নিয়ে তেমন কোন মতান্তর উপস্থিত হয় নি। হয়েছে 'lore' এর অনুবাদ নিয়ে। 'লোর' শব্দটিকে এক একজন এক এক দৃষ্টিতে অনুবাদ করতে গিয়ে 'ফোকলোর' এর বিভিন্ন অনুবাদ উপস্থাপিত করেছেন। 'লোর' শব্দের সার্থক অনুবাদ এখনও হয় নি। ইংরেজী 'লোর' বলতে জ্ঞান বা Knowledge gained through study of experience অথবা traditional knowledge or belief কে বোঝায়। লোক মানুষের জীবন সংগ্রাম, প্রকৃতির উপর তার অধিকার বিস্তার প্রয়াস, এবং জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে সৃষ্ট উপাদান সমূহ লোক সমাজের চালিকা শক্তি। এই চালিকাশক্তি জ্ঞানতত্ত্বের তালিকাভুক্ত। লোকসমাজের সবকিছু এর অন্তর্গত। যদিও ঢাকা বাঙলা একাডেমির বর্তমান ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ মযহারুল ইসলাম বলেছেন—"লোকবৃত্ত বলতে যা কিছু লোকজীবনের অন্তর্গত তার সব কিছুকেই বোঝায়। ফোকলোর লোকজীবনের একটি বিশেষ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরে—তার সাহিত্য, তার বিশ্বাস, তার আচার অনুষ্ঠান, তার দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহৃত কিছু কিছু জিনিষপত্র, তার শিল্প, তার যানবাহন ইত্যাদি। কিন্তু একজন ফোক বা লোক রাতে কি ভাবে ঘুমায়, কিংবা তার পুত্রের সঙ্গে কি ভাবে আচরণ করে, কিংবা তার প্রতিবেশীর সঙ্গে কি ভাষায় কথা

বলতে অথবা তার আত্মীয় এলে কি খেতে দেয় এসব নিশ্চয়ই ফোকলোরের অন্তর্গত হতে পারে না। এগুলো বৃহত্তর অর্থে Folk Civilization এবং আরও সীমিত অর্থে Folk Culture এর অন্তর্গত, সুতরাং লোকবৃত্ত দ্বারা ফোকলোর এর সার্থক দ্যোতনা ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়।" (পূর্ব বাঙলার লোক সংস্কৃতি) ডঃ ইসলাম আরও বলেছেন 'ফোকলোর এর সীমা এমন সর্বপরিব্যাপ্ত নয়···লোকবৃত্ত শব্দে লোকদের সামগ্রিক পরিচয়ের কথা বলা যেতে পারে—অন্যপক্ষে ফোকলোর সামগ্রিক পরিচয় দান করে না।' বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের এই উক্তির সঙ্গে সহমত হওয়া যায় না। লোকবৃত্তের মধ্যে যদি লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তবে ফোকলোর এর অনুবাদ হিসাবে লোকবৃত্তকে গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা দেখি না। আমরা ফোকলোর তথা লোকবৃত্তের মারফৎ লোকসমাজের সামগ্রিক পরিচয় পেতেই চাই। খণ্ডিত অংশকে আমরা লোকবৃত্তের অংশ বলে মনে করি। মনে করি লোকবৃত্ত তথা ফোকলোর থেকেই folk civilization বা লোকসভ্যতা এবং folk culture বা লোকসংস্কৃতির সৃষ্টি। ডঃ ইসলাম সাহেবের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্যের কারণ মৌল। তিনি গোটা জিনিষকে খণ্ডচিত্রের মারফৎ দেখতে চাইছেন আর আমরা গোটা জিনিষটাকে গোটারূপেই দেখতে চাই, চাই বলে তার যুক্তি মানতে না পারার জন্য দুঃখিত। অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর লোকায়ত বাংলা গ্রন্থে বলেছেন যে Folklore এর অনুবাদ হিসাবে 'অতিব্যাপ্ত' ও 'অব্যাপ্ত' এবং ব্যাসবাক্যের অন্যতম মুখ্যশব্দ 'জ্ঞান' সমাস নিষ্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে তিরস্কৃত···ফলে···লোকবৃত্ত শব্দটি প্রত্যাশিত অর্থবহনে অক্ষম ও অনর্থবাচক হয়ে পড়েছে।···বিনীতভাবে নিবেদন করতে হচ্ছে যে শ্রীচক্রবর্তী শব্দটির তথা বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপকত্ব অনুধাবনে সক্ষম হলে 'অতিব্যাপ্ত' এবং 'অব্যাপ্ত' একই সঙ্গে ব্যবহার করতেন না। তাছাড়া ব্যাসবাক্যের অন্যতম মুখ্যশব্দ 'জ্ঞান' সমাস নিষ্পন্ন সমস্তপদ লোকবৃত্ত থেকে তিরস্কৃত—লোকবৃত্তের আলোচনায় এ যুক্তি মোটেই প্রাসঙ্গিক নয়, কাজেই তাঁর খণ্ডন গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতে পারছি না। ডঃ দুলাল চৌধুরী তাঁর 'বাংলার লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বলেছেন 'বৃত্ত শব্দের দ্বারা একটি সীমার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ···হয়। লোকায়ত সংস্কৃতি যে প্রাণবানপ্রবাহে কালকালান্তরে প্রবাহিত হচ্ছে, গণ্ডী এঁকে তাকে পাওয়া যাবে না।' লোকবৃত্তের বৃত্ত একটি কেন্দ্র বিন্দু। এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে লোকজ্ঞান বিচ্ছুরিত দিকে দিকে সীমাহীন পথে। কাজেই গণ্ডী আঁকার প্রশ্ন এখানে আসতেই পারে না। আর সেজন্য তাঁর সঙ্গেও একমত হতে পারা যায় না। যতদিন না অন্যকোন উপযুক্ত গবেষক 'লোকবৃত্ত' শব্দটি গ্রহণের বিপক্ষে আরও গ্রাহ্য তথ্যাদি উপস্থিত করেন অথবা সর্বজন স্বীকৃত কোন শব্দ উপহার দেন ততদিন 'ফোকলোর' এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে লোকবৃত্ত গ্রহণে কোন বাধা দেখি না। তাছাড়া, ইতিবৃত্ত, পুরাবৃত্ত, মনোবৃত্ত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গেও লোকবৃত্তের একটি চমৎকার মিল লক্ষিত হয়। লোকসমাজকে বৃত্ত বা কেন্দ্রবিন্দু ধরে লোকসমাজ সম্পর্কিত সর্বপ্রকার জ্ঞানকে আমরা লোকবৃত্ত বলতে পারি। লোকবৃত্তের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। এটি প্রবহমান, ঐতিহ্যধারা প্রবাহের মুখে পড়ে নষ্ট হয় না বরঞ্চ নিত্য নবরূপে প্রকাশিত হয়। তাই এর মধ্যে গতানুগতিকতা থাকে, থাকে লোকসমাজের অপরিমিত শক্তি সাহস, মনোভাব, সিদ্ধান্ত, বিশ্বাস, রাগ, দ্বেষ, ঐতিহ্য বন্ধন তুকতাক অনুমান রীতিনীতি রেওয়াজ, গীতগল্প, বেশভূষা প্রভৃতি লোক চৈতন্যপূর্ণ

অস্তিত্বের ঘোষণা, শুধু প্রাচীনকে নিয়েই নয়—জীবিত লোকভাব, লোকবিভক্তি ও লোকবৃত্তের অধ্যয়নের বিষয় কারণ এটি নির্জীব বিজ্ঞান নয়। বাহ্যিক দিকের অপেক্ষা এর আন্তরিক দিকের অধ্যয়ন বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখতে হবে মানুষের মধ্যে উদ্ভূত কোনও শব্দ পরিপূর্ণ বা নির্দোষ নয়। অন্যান্য বস্তুর মত কোন ভাষাও ভাবপ্রকাশে এবং উচ্চারণ, লিখন ও বর্ণবিন্যাস বিষয়ে পূর্ণভাবে নিয়মানুবর্তিতায় ক্রুটীহীন নয়। দোষ, গুণ মিলিয়ে একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয় প্রকৃতি বা ধর্ম গড়ে ওঠে। যুগধর্ম অনুসারে ও ব্যবহারী মানুষদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক গতি অবলম্বনে ভাষা ও শব্দের প্রকৃতিতে ও ধর্মে পরিবর্তন আসে। কারণ সে বহতা নদী, বদ্ধ উদক নয়। স্বাভাবিক গতিতে সে চলে। এ গতি বিবর্তনমূলক, বিপ্লবাত্মক নয়, সুতরাং আবশ্যক মত 'লোকবৃত্ত' ও পাল্টাবে বা বদলে যাবে; কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন এ শব্দটিকে ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করি না

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সহজ রচনাশিক্ষা ॥

বঙ্কিমচন্দ্র রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল জানা যায় নি। 'দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯৪ (ডিসেম্বর), ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থের 'Advertisement' অংশের প্রথমে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে—'It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who reeeive only an elementary education in the Vernacular Schools than in the case of their more educated brethren turned out of the Colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect ; there exist no rules for his guidance, more at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on composition has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.'

গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় 'রচনা অভ্যাস'। মোট আটটি পাঠে উদ্দেশ্য, বিধেয়, ক্রিয়া, বিশেষণ প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা প্রাথমিক বাক্যরচনা শেখান হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের চারটি পাঠ যথাক্রমে—বিশুদ্ধি অর্থব্যক্তি, প্রাঞ্জলতা ও অলঙ্কার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পত্রলেখার কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির শেখানর ভঙ্গী একান্ত সহজ ও মনোরম।

সংযুক্তা (গদ্য পদ্য ও কবিঃ পুঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৮৪, পৃ, ৫২১-৫৩৩।

বাল্যকাল থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা ইতিহাসাশ্রয়ী ছিল। বিশেষভাবে টডের রাজস্থান গ্রন্থ তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল। পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার কাহিনী নানাভাবে নানারূপে বিবৃত হয়েছে। এখানে মহম্মদ ঘুরীর আক্রমণে পৃথ্বীরাজের মৃত্যু ও সংযুক্তার চিতারোহণ দীর্ঘ কবিতায় সাবলীল ছন্দে বর্ণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও দেশপ্রেমের প্রকাশ কবিতাটির মধ্যে রয়েছে। কবি শেষে লিখেছেন—

'কবি বলে মাতা কি কাজ করিলে
সন্তানে ফেলিয়া নিজে পলাইলে,
এ চিতা অনল কেন বা জ্বালিলে,
ভারতের চিতা পাঠান ডরে।
সেই চিতানাম, দেখিল সকলে
আর না নিবিল ভারতমণ্ডলে
দহিল ভারত তেমনি অনলে
শতাব্দী শতাব্দী শতাব্দী পরে॥

স্বজনপ্রীতি (ধর্মঃ/২৩)॥

প্রীতিই যে ঈশ্বরসেবার প্রকৃত উপায়, একথা বঙ্কিমচন্দ্র অনেকবার ব্যক্ত করেছেন। এখানেও গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে স্বজনপ্রীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্বজনপ্রীতির প্রধানতঃ দু'টি ধারা। একটি হল অপত্যপ্রীতি, অর্থাৎ পুত্র-কন্যাদের প্রতি ভালবাসা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। অন্যটি হল দাম্পত্যপ্রীতি, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কে। এছাড়া সংসারের অন্যান্য পরিজনের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করাও কর্তব্য।

স্বদেশপ্রীতি (ধর্ম/২৪)॥

আত্মপ্রীতি ও স্বজনপ্রীতি অপেক্ষা স্বদেশপ্রীতি যে অধিকতর কাম্য এখানে সেকথা বোঝান হয়েছে। কারণ দেশ শত্রুর দ্বারা পীড়িত হলে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা তথা ধর্মরক্ষা সম্ভব হবে না। এই স্বদেশপ্রীতি যে ইংরাজী প্যাট্রিয়টিজম-এর নকল নয় একথা বঙ্কিম বলেছেন। 'ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম না লিখেন।'

সাবিত্রী (গদ্য পদ্য বা কবিঃ পুঃ)

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', অগ্রহায়ণ ১২৭৯, পৃ, ৩৭১-৩৭৩।

'সাবিত্রী' কবিতায় সাবিত্রী সত্যবানের পৌরাণিক কাহিনীর অংশবিশেষকে রূপদান করা হয়েছে। নির্জন বনে সাবিত্রী মৃতস্বামীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এমন সময় যম এলেন সত্যবানের মৃতদেহ নিয়ে যেতে। কিন্তু সাবিত্রী দেহ ছাড়তে চাইলেন না। তখন যম সাবিত্রীকে সৃষ্টির নিয়ম বোঝাতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত সাবিত্রী বললেন—স্বামীকে যদি নিতে হয় তবে যেন এই সতীনারীর প্রাণও নেওয়া হয়। এইভাবে সাবিত্রী পতির জন্য প্রাণত্যাগ করলেন।

কবিতা, আরাম, বিরাম, সংগ্রাম

কবি বললেই একটা ছবি ফুটে ওঠে। একটা কেন অনেকগুলো। তবে একই ভাবে। শান্ত উদাস আর আপনভোলা। অবশ্য ভাবের রকমফেরে তাঁর দাড়ি শাদা হতে পারে, অথবা খোঁচা খোঁচা, নয়ত খাটো। বেশভূষা হতে পারে উত্তরীয় অথবা পাঞ্জাবী অথবা বর্ণাঢ্য উৎকট। তিনি পদাতিক ট্রাম-বাস-রিকশো-ট্যাক্সিচারী হতে পারেন আবার বিমানবিহারীও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের চোখে আমাদের অভ্যাসে কবি মানেই ভাবুক আর উদাসীন। এই জন্যেই কবিকে ব্যবসা করতে দেখলে চাকরি করতে দেখলে রাজনীতির মাঠে দেখলে অথবা সমরবাহিনীর শিবিরে যেতে দেখলে বলি কবিত্ব এবার গেল। নিটোল নির্ভাজ কবিমানুষটির এবার পঞ্চত্বের পালা।

কিন্তু ইংলণ্ড জর্মান ফরাসী রুশ স্পেন ইতালী চীন ও বিশ্বসংসারের আরো সাত সতের দেশে এমন ঢের ঢের কবি ছিলেন বা আছেন যাঁরা রাইফেল ঘাড়ে করেছেন, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবে পুলিশের সরকারের কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন, ফেরার হয়েছেন, কেউবা লাম্পট্য করেছেন, ঈশ্বর গীর্জা ও ঐতিহ্যের মুখে কালি লেপেছেন, ফেরার হয়েছেন (খুন করেছেন কিনা জানি না) অথচ যাঁরা কবি ও বেশ বড় কবি। ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয়। আমাদের নজরুল নিয়মভাঙ্গা অসামাজিক ; মুক্ত স্বাধীন প্রমিথিউস। সুকান্ত বাংলাকাব্যের তীব্র নিখাদ। এককালে দলমতবাদের সংকীর্ণতায় নিন্দিত। এই ব্যতিক্রমের, কবিমূর্তির এই বৈসাদৃশ্যের সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদনেই দেখি প্রথম। শুধু তাঁর সাহেবিয়ানায় নয় চলন-বলনে তিনি যেন পুরুষালী গদ্যের ভারী বুট পরে হাঁটছেন অথবা পুরুষকণ্ঠের খেদে বলেছেন—'রে প্রমত্ত মন মম কবে পোহাইবে রাতি !'

রবীন্দ্রনাথ আপাদমস্তক কবি। সুন্দরের কবি, আরামের কবি। স্পর্শকাতর তাঁর শব্দগুলি যেন কোন রূপকথার বাগানের ফুল। রাজশেখর কবি-সংসদে বোধহয় এই কবিয়ানাকেই খানিক কশাঘাত করেছেন।

কবিতা যে নির্জন, তার ভাবগংগায় যে শান্ত উদয় অস্তের বর্ণালীর আনাগোনা এটা অস্বীকার করা শক্ত। তার ছন্দ, তার রূপকল্প তার শব্দগুলি যেন অতি সূক্ষ্মভাবে আমাদের জৈব মানবিক দৈনন্দিন জীবন থেকে একটু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সরে সরে থাকতে চায়। তাকে যতই বাস্তব দায়িত্বে নিয়োগ করা হোক না কেন সে কেনা গোলাপের মত জোয়াল কাঁধে করতে নারাজ। ভিড়ের ভেতর তার জন্ম হলেও, ভিড় থেকে সে আলাদা। প্রয়োজনের সীমানায় তার কর্ম হলেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে।

এও অস্বীকার করা যায় না যে কবিতার সৃষ্টি মুহূর্তে একটা বিরতির প্রয়োজন। সে বিরতি কেবল কালের নয়, মানসিকতার ও কবি-স্বভাবের। আরাম কেবল বাইরের নয় ভিতরেরও। বরং

ভিতরটাই আগে। কবির জীবন বেশি নিশ্চিন্ত হলে, তাঁর পরিবেশ বেশি প্রশস্ত হলে তাঁকে নয় লোকে ঈর্ষা করে আর নয় বাবু বলে। তাঁর পোষাকে বেশি সুখের চিহ্ন থাকলে হয় লোকে ভাব গদ্‌গদ হয়ে প্রণাম করে আর নয় বড়লোক বলে দূরত্ব রক্ষা করে। তবু বাউল কবি, চারণ কবি, যাঁরা চাষবাসের কর্ম করলেও যন্ত্র নয়। কবি শব্দটাকে আর একটু লম্বা করে যদি চিত্রকর আর গীতকরদের কথায় আসি তা হলেও দেখি তাঁদের ঘাম-ঝরানো সাধনা ঠিক কল-শ্রমিকদের মত নয়। শিল্পকর্মের পেশী-সঞ্চালন ঠিক উৎপাদনকারী শ্রমিকের, মেহনতী মানুষের কর্মশক্তির মত এক জাতের নয়। এতো সকলেরই জানা কথা। আর তাই কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে যখন আরাম বিরাম পুঁজিবাদী ভোগের পরিসর অনেক সীমিত হয়ে আসবে তখন কবির দশা কি হবে, আদৌ কাব্য থাকবে কিনা এ নিয়ে অনেকে চিন্তান্বিত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কাব্য আছে, কবি আছে। সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক, ফ্যাসীভাবাপন্ন শোষণশীল সব দেশেই আছে। যেখানে কবি শুধু লেখেন, ফসল ফলান না, যেখানে কবি কারখানায় যান না, খামারে কাজ করেন না, সেখানকার কবিতা এক ধাঁচের আবার যেখানে কবি শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতারই একটি সক্রিয় অংশ সেখানকার কবিতার ধরণ আর একরকম। কিন্তু দুয়েরই মধ্যে কাব্য আছে, এটা আজ দুটি বিরোধী ভাবাপন্ন সমাজব্যবস্থাতেই মান্য হচ্ছে। অর্থাৎ আরাম-বিরাম-সংগ্রাম-কর্ম সব অবস্থানেই উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম। শুধু তাদের জাত আলাদা। ইংরেজি কবিতা রাশিয়ানরা পড়ছেন হয়ত চীনারাও। আবার রুশ চৈনিক কবিতা অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পড়া হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় কোথায় যেন সেই কবিয়ালি ঢংটা ঠিক বজায় আছে।

আমি মনে করি কবিতার কোনো শাশ্বত শাস্ত্র নেই, যেটা সর্বকালে দেশে অবস্থায় ব্রহ্মের মত এক অদ্বিতীয় আর অনড়। কবিতার প্রকারভেদ আছে। তার নিয়মের প্রকারভেদ আছে। শান্তির কবিতা আর অশান্তির কবিতা এক জাতের নয়। বিপ্লবের কবিতা আর স্থিতিশীল সমাজ-ব্যবস্থার কবিতা এক রকমের নয়। কোনো কোনো কবিতার জন্ম অতি তাৎক্ষণিক কোনো চিত্রে বা ঘটনায়, অথবা একটা তত্ত্বে। যেটাকে ইংরেজীতে 'Immediacy' বলা চলে। আবার কোনো কোনো কবিতা দূরায়ত, অথবা সর্বসাধারণ। কোনো কবিতায় একটা জনচিত্তগামী বিষয়ের অবতারণা করা হয়। একটা পাবলিক থীম নিয়ে লেখা হয়। তখন তার একটা নিদারুণ সাম্প্রতিক প্রয়োজন থাকে। হয়ত অতি দ্রুত, কবি ঘটনাচক্রের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে অথবা আতংকিত হতে হতে অথবা বিজয়োদ্ধত আশায় লড়তে লড়তে কাব্যভাষার গাঁথুনির বিন্যাসের দিকে অসতর্ক হয়ে লিখে ফেলে হাঁফ ছাড়েন আবার কোনো কবিতা সুচিন্তিত ধীর সুবিন্যস্ত অথবা সময় সাপেক্ষ এবং চিরায়তমানা বিলম্বিতা।

একই যুগে অতি নিকট কালে জীবনানন্দ ও সুকান্তের মধ্যে কী গভীর বৈষম্য। জীবনানন্দ আরাম-বিরামের কবি, সুকান্ত সংগ্রামের কবি। আরাম-বিরামটা নিন্দার্থক নয়। সংগ্রাম কথাটাও কমার্শিয়াল নয়। আমি সেদিক থেকে প্রয়োগ করছি না। জীবনানন্দ রোমান্টিক। কিন্তু রাবীন্দ্রিক নন। সুকান্ত বিদ্রোহী কিন্তু নজরুলীয় নন। সুকান্ত যেমন জনপ্রিয়, জীবনানন্দ তেমনই অন্তর্ভেদী। একজন যেমন স্পষ্ট ও উজ্জ্বল, আর একজন তেমনই ছায়াঘন ও অতীন্দ্রিয়। আধুনিক

বাংলা কবিতা, মানে পঞ্চাশ ষাট দশকে মূলত মননশীল বুদ্ধিদীপ্ত অলস আরামমুখী ও নিতান্তরকম তির্যক। তার দুর্বোধ্যতা যেমন সাধনলব্ধ তার সুবোধ্যতা তেমনই সাবেকী বলে পরিহার্য। আধুনিক কবিতা অথবা সাম্প্রতিক কবিতা এই জন্য নিতান্ত আরাম-বিরাম-মুখী হয়েও যন্ত্রণাজর্জর ও ক্ষেত্র-বিশেষে বর্তমান ভঙ্গুর জীবনাদর্শে ক্ষতবিক্ষত জনসংগ্রামের আশ্বাস, উন্নততর সমাজব্যবস্থার আশা যেমন কবিকে আজ আর তেমন উৎফুল্ল করে না, তিনি যেমন গুপ্ত সুড়ংগের চিন্তসরণি দিয়ে একলা চলেছেন স্মৃতিরবোঝায় ঝুঁকে পড়ে তেমনই আতংকে কাঁপছেন, যদি বুলেটের আঘাতে তিনিও মাটিতে পড়ে যান। এই দ্বিধাদীর্ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে এখন কবিরা চলেছেন। তাঁদের মধ্যে বেকার আছেন, শিক্ষক আছেন, সংবাদপত্রসেবী আছেন, রাষ্ট্রপুরস্কার ধন্য, বুর্জোয়া পারিতোষিক ধন্য অলস সমাজবাদী আছেন, নিরপেক্ষ উদাসীন আছেন, আবার ভবিষ্যদ্রষ্টা স্থিতধীও আছেন।

আরাম, বিরাম, সংগ্রাম—কবিতা এই বিপরীত আলোকমালার ঐতিহ্য। যেমন দেখছি আলেকজান্দার ব্লক মায়গকভস্কি য়েটুসের কবিতায় রুশ ও য়েয়োপীয় নির্যাতিত অভিশপ্ত মানবাত্মার মুক্তির গান সংগ্রামী ভাষায় অথচ প্রচারবিমুখ আশ্চর্য প্রতীকীদ্যোতনা। তেমনই আবার একালের নেরুদার কবিতায় জটিল নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদ ও শৃংখলমোচনের তীব্র অভিলাষ। অপর পক্ষে শান্তির প্রত্যাশায় বিরামের সন্ধ্যায় কবিতা মানুষের তপ্ত ললাটে শীতল প্রলেপ দিচ্ছে মাখিয়ে।

যে রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন একদিন, যিনি তাঁর জীবনদেবতাকে খুঁজেছেন নিভৃত মন্দিরের নিশীথের একান্তে ও আলোকিত প্রান্তরের অরুণিমায় তিনিই আবার দীর্ঘবিশ্বাসে রাজনৈতিক আন্দোলনক্ষুব্ধ য়োরোপের দিকে চেয়ে তাঁর ভাষা ভংগী ও ব্যক্তিত্বের ভোল বদলে লিখলেন, 'রৌদ্রীরাগিণীর দীক্ষা নিয়ে যাক মোর শেষ গান।'

যদি কোনদিন আরাম-বিরাম-ধ্বংসী বঞ্চিত জনতা সুবিধাবাদীশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তবে সেদিন কবি তাঁর অদৃষ্টকে ধিক্‌কার দিয়ে বলতে পারেন—

'তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অংগ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।'

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : জিজ্ঞাসা, ১এ কলেজ রো, কলকাতা-৯।

উনিশ শতকের প্রথমাবধি লিখ্য ভাষা রূপে বাংলাগদ্যের জন্ম ; তারপরে ধীরে ধীরে ঘটেছে তার সাহিত্যিক চরিত্রের বিকাশ ও বিস্তার। গদ্যে প্রথম এসেছিল মননশীল রচনার পরিণতি ; তারপরে দেখা দেয় সৃজনমূলক সাহিত্য। এদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধ বাংলা কথাসাহিত্যের চেয়ে বয়ঃপ্রবীণ। এমন কি সামগ্রিক বিচারেও রেনেসাঁস প্রসূত বাঙালি মানসিকতার ফসল আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের ভূমিকাই অগ্রজের। রামমোহন যখন বিচার-বরিষ্ঠ মননে দৃঢ়বদ্ধ ভাষায় প্রবন্ধ লিখেছেন— সেই ধারায় যখন বাক্‌রীতির সাবলীলতা এবং চিন্তনেরও অনায়াসগতি আয়ত্ত হয়েছে অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে—পদ্য সাহিত্যে তখনো ঈশ্বর গুপ্তের একাধিপত্য। অতএব উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের যে সর্বাঙ্গীণ নবজাগরণ লেখা দিয়েছিল, নিছক কালের হিসেবে দেখলেও তার উৎসার গদ্য প্রবন্ধকে নিয়ে, ধারাক্রমে তারপরে জন্মেছে কাব্য নাটক এবং কথাসাহিত্য। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে প্রাসঙ্গিক মননশীলতাই সেদিন সাহিত্যের দৃঢ়বদ্ধ সর্বাত্মক অগ্রগতির ধ্রুবপদটি বেঁধে দিয়েছিল। উনিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাঙালি কবিধর্মের প্রতি বিরূপতা সূত্রেই অনুভব করেছিলেন, 'যে দেশে অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব…।' মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের হাতে গড়া বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্পর্কেও এই অনুভব অশেষ মূল্যবহ।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যে সর্বাভিমুখী মুক্তির স্বর্ণযুগ যখন ধীরে ধীরে এল, প্রবন্ধের চরিত্রও তখন হয়েছে বিচিত্র বিশিষ্ট। সেদিক থেকে বাংলা প্রবন্ধের তিনটি স্বতন্ত্র মুখ্য ধারার কথা মনে আসে—(১) জ্ঞানমূলক প্রবন্ধ, (২) সাহিত্য সমালোচনমূলক প্রবন্ধ এবং (৩) গবেষণা প্রবন্ধ। সকল যথার্থ প্রবন্ধই জ্ঞান মূলক, লিটারেচার অব নলেজ ; সমৃদ্ধ অধ্যয়নের মার্জনাবশে পরিশীলিত মননের ফসল। তাহলেও চিন্তার আলম্বন ও প্রযুক্তির পার্থক্যহেতু প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক চরিত্রের তারতম্য ঘটে। সেই অনুসারে বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ইত্যাদি বিশুদ্ধ জ্ঞানগর্ভ বিষয় অবলম্বনে মৌলিক চিন্তার প্রসার সূত্রে লেখা প্রবন্ধকেই বিশেষভাবে প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব :—রামমোহনের 'বেদান্ত দর্শন', অক্ষয়কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র অনেক লেখা, রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষ' কিংবা 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলী অথবা একেবারে শেষের দিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী অনুরূপ প্রবন্ধ-চরিত্রের কয়েকটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অন্যপক্ষে সমকালীন সাহিত্য সমালোচনার রাজপথ উৎসারিত হয়ে গিয়েছিল বঙ্কিম প্রবর্তিত বঙ্গদর্শনের কাল থেকে বিশেষ করে। সার্থক গ্রন্থ সমালোচনাও যে অধিবিদ্যাগত কর্ষণের অপেক্ষা রাখে বঙ্গদর্শন-এ বঙ্কিম তার নিঃসংশয় স্বাক্ষর রেখেছেন। আর

বাংলা সাহিত্যের উপাদান অবলম্বনে গবেষণা-অনুসন্ধান ঈশ্বর গুপ্তই সূচিত করেছিলেন 'সংবাদ-প্রভাকর'-এর পৃষ্ঠায়, তাঁর সংকলিত 'কবিজীবনী' কেবল পথিকৃৎ নয়, এ বিষয়ে উল্লেখ্য আদর্শও। পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর প্রতিষ্ঠা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা পঠন পাঠনের ব্যবস্থা এবং আরো বিভিন্ন কারণ ও প্রেরণাবশে এই শাখার বিস্তার আর সমৃদ্ধি ঘটেছিল।

এ-সবই বিশ শতকের প্রথম দুই শতকের কথা। অর্থাৎ উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে নানা সূত্রে নানা ধাপে বাংলা প্রবন্ধের যে বৈচিত্র্য ও পুষ্টি সাধিত হয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তার রূপান্তর এবং সঙ্কুচন সাধিত হয়েছে ক্রমশ। জ্ঞানের চেয়ে রসের দিকে ঝোঁক গিয়েছে বাঙালী সাহিত্যপাঠকের বেশি করে, এবং সেখানেও আন্তরিক জীবন সন্ধানের চেয়ে বাইরে থেকে সংগ্রহের উৎসাহ গেল বেড়ে। ফলে আত্মমন্থন যেমন সৃজনশীল সাহিত্যে তারও চেয়ে বেশি পরিমাণে মননমূলক রচনায় উপযোগী আত্মকর্ষণের প্রবণতা গেল কমে। ত্রিশের দশকেও ঝড় ঝাপটা অনেক গেছে,—কিন্তু চল্লিশের দশকে পৌঁছে দিল অবক্ষয়ের সীমান্ত ধাপে। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলা প্রবন্ধের ভূমিকা ব্যাপক সাহিত্যমোচনের দরবারে কোণঠাসা হয়ে গেল। সাময়িক সাহিত্য পত্রে সাহিত্য সমালোচনার নামে স্বজনের পৃষ্ঠ কণ্ডুয়ন সূত্রে ক্রমে এই শেষ ধারাটিরও অপমৃত্যু অবধারিত হল। কিন্তু ঐ সঙ্গেই প্রবন্ধ-চর্চার এক নূতন পটভূমিও গড়ে উঠল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রবন্ধ সাহিত্য নয়, সাহিত্যের অনুসন্ধান ভিত্তিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখার 'উপাধি' লোভাতুর প্রয়াস। স্বাধীনতা উত্তর দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও পেটের ভাত জোটেনা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার জন্যেও বুঝি একটা 'ডক্টরেট' ডিগ্রী হলে ভালো,—অন্তত সদ্য স্বাধীন যুগে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধির তাড়নায় যত্রতত্র গজিয়ে চলা কলেজের জলাভূমিতে অধ্যাপনা জীবির পক্ষে তো সে নিম্নতম গুণ! জীবিকার দায়, অতএব নূতন যুগের ছাত্রবাৎসল্য দীনতারণের ভূমিকা নিলে। তাতে কম ভালো হয়নি; কিন্তু সবটাই যাঁরা মন্দ হয়েছে বলেন তাঁরাও স্বভাব-নিন্দুক। পরিমাণের তুলনায় গুণের পরিসর হয়ত কম, কিন্তু বাংলা সাহিত্য, সমাজ, বাঙালীর জীবন ও ইতিহাস নিয়ে যা কিছু তথ্য উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তা অকিঞ্চিৎকর নয় কিছুতেই; তার সঙ্গে চিন্তা যেটুকু অন্বিত হল তার মান হয়ত খুব উঁচু নয়,—সর্বত্র তো নয়ই। তা হলেও ঋণাত্মক দিকটি নিয়ে আক্ষেপ যতই করা হোক এই সীমিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাভূমিতেও গবেষণা-প্রবন্ধের উৎকর্ষ বিধানের সম্ভাবনার কথা যথোচিত পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত।

এই কথাটি মনে করিয়ে দিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট' উপাধির স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি গবেষণা নিবন্ধ; ডঃ নবেন্দু সেন কৃত 'গদ্যশিল্পী অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' [পৃঃ ২৩+৩৫৫; প্রকাশক 'জিজ্ঞাসা,' ১-এ কলেজ রো, কলকাতা-৯, মূল্য সতের টাকা]। অভ্যস্ত গতানুগতিকতার অর্ধমনস্ক পরিবেশে এই সচেতনতার সঞ্চার ডঃ নবেন্দু সেনের এক শ্রেষ্ঠ দান; বাংলা গবেষণা নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব তাই সবিশেষ সংবর্ধনাযোগ্য।

বিষয়ের দিক থেকেও এই তরুণ গবেষকের নির্বাচন বিশেষ মূল্যবহ; বাংলা গদ্য প্রবন্ধের প্রথম স্বচ্ছতা প্রাপ্তির যুগে যুগন্ধর দুই শ্রেষ্ঠ লেখককে তিনি গ্রহণ করেছেন অনুসন্ধানের বিষয়রূপে।

এঁদের মধ্যে নৈকট্য যত নিবিড়, স্বভাব-দূরত্বও তেমনি আন্তরিক এবং দুস্তর ; দুই বিপরীত কোটিতে অবস্থিত। অথচ পরস্পর সন্নিহিত এই দুই ব্যক্তিত্ব নানা দিক থেকেই পরস্পরের পরিপূরক। নির্বাচকের অন্তর্দৃষ্টি প্রথমাবধি একথা অনুধাবন করেছে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রাচুর্যের মধ্যে জাত, বর্ধিত, অফুরন্ত সমৃদ্ধিতেই তার অবস্থান। তাঁর সম্পর্কে অনুসন্ধান আলোচনাও হয়ে আছে গুণে ও পরিমাণে অমেয়। অক্ষয়কুমার তার বিপরীত। দরিদ্রের সন্তান, প্রাচ্য পরিবেশে জাত এবং লালিত; উন্নয়নের সূত্রে গ্রাম-শহরের পার্থক্য তখনো ছিল একান্ত দুস্তর। অবিরাম যুদ্ধ করে ভাগ্যের সঙ্গে আমৃত্যু ছিল তাঁর হারজিতের খেলা। উত্তর সূরীদের হাতেও তাঁর মূল্যায়ন সুসম্পূর্ণ হয়নি। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা দুজনেরই লেখক সত্তার প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, স্বত্বাধিকারী ; অক্ষয়কুমার বেতনভুক্ত প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। অক্ষয়কুমার ইতিহাস-ও বিজ্ঞান-দর্শন-ভিত্তিক বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপাসক ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ মনস্বী-ধর্মসাধক, তাঁর দার্শনিক মনন ও যৌক্তিক চিন্তা কবি-মনস্বতার অনতিপ্রখর সহজ দীপ্তিবশে লাবণ্যযুক্ত। প্রথমজন বাংলা গদ্য প্রবন্ধে রামমোহনের ধারার সার্থক উত্তর সাধক ; দ্বিতীয় জন রবীন্দ্রপন্থার পূর্বসূরী ধ্রুবতারা। বরং এমন কথাও হয়ত বলা চলে অক্ষয়কুমার ও দেবেন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক সত্তার রাসায়নিক সমন্বয়-পরিণামই হয়ত 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বঙ্কিম। বিষয় নির্বাচনের মূলে এই পারস্পরিক বৈচিত্র্য-উদ্ভাসিত সাযুজ্যের চরিত্রটি নির্বাচকের দৃষ্টি এড়ায় নি, গ্রন্থ মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে যথেষ্ট।

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, যথাক্রমে স্বল্প ও বহুল আলোচিত এই দুই ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের রচনার মূল্যায়নে লেখক অভিন্ন মান প্রয়োগ করেছেন, বাংলা গদ্য বিচারের ইতিহাসে যা অভিনব। আর এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে পর্যবসিত হয়নি, অক্ষয়কুমারের মূল্যায়নের মত এখানেও তিনি সমপরিমাণে মৌলিক।

বাংলা সাহিত্যে হঠাৎ যখন স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন আরম্ভ হল, তারপরে এই দীর্ঘ উপেক্ষিত সাহিত্যের একটা মোটামুটি হলেও সামগ্রিক মূল্যায়নের আগ্রহ তথা প্রয়োজন প্রবল হয়েছিল। তাই ব্যাপক পরিচয় রচনার ব্যস্ততায় অনেক সময়েই অনুপুঙ্খ সন্ধান ও তার যথামূল্য বিচারের দায়িত্ব পরিহার করে চলা হয়েছে। তাই ছিল স্বাভাবিকও। যে-কোন বিষয়ের ব্যাপক চৌহদ্দি টুকুর জরিপ শেষ করে তবেই তার গভীরে প্রবেশ করতে হয় আভ্যান্তরীণ খুঁটিনাটির সন্ধানে। এই দ্বিতীয়োক্ত দাবীর তাগিদ ডঃ নবেন্দু সেন বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। পূর্বসূরীদের গতানুগতিক অনুকরণের অভ্যস্ত পথ ছেড়ে। এই কারণেও তিনি বিশেষ প্রশংসারযোগ্য।

নূতন মূল্যায়নের নূতন মানদণ্ডও তিনি প্রয়োগ করেছেন। গ্রন্থনাম থেকেও বুঝি অক্ষয়কুমারও দেবেন্দ্রনাথকে প্রধানত ডঃ সেন গদ্যশিল্পী হিসেবেই পরিমাপ করে দেখতে চেয়েছেন ; এঁদের গদ্যরীতি বা 'স্টাইল'-ই তাঁর বিশেষ আলোচ্য ; সেই সূত্রে আধুনিক পরিসংখ্যানমূলক 'স্টাইলিকটিকস' বা প্রতীচ্য রীতিশাস্ত্রের মূল্যবান বাংলা গ্রন্থে ডঃ সেন এই প্রথম প্রয়োগ করলেন। এখানেও তাঁর ভূমিকা প্রথম যাত্রীর। পথের সূচনা করেছিলেন ডঃ শিশিরকুমার দাশ ইংরাজী ভাষায় লেখা তাঁর Bengali Prose Carey to Vidysaagar নামক গবেষণা গ্রন্থে। তিনিই ছিলেন ডঃ নবেন্দু

সেনের গবেষণা নিয়ামক অধ্যাপক। ডক্টর দাশের তুলনায় ডক্টর সেনের আলোচনার পরিধি আরো হ্রস্ব, মূল্যায়নের গভীরতা তাই আরো অনুপুঙ্খ হতে পেরেছে।

এক সময়ে বিভিন্ন লেখকের বিচ্ছিন্ন রচনাংশ থেকে যদৃষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করে বিভিন্ন লেখকের রচনারীতির মূল্যায়ন করতে চাওয়া হত। এদিক থেকে বত্রিশ সিংহাসনের উদ্ধৃতি সহযোগে মৃত্যুঞ্জয়কে সাবলীল গদ্যের রচয়িতা প্রতিপন্ন করলে কেবল মাত্র প্রবোধ-চন্দ্রিকার ভাষাংশ উদ্ধার করেই তাঁকে একাধারে চলিত রীতি কিংবা অবোধ্য প্রায় পণ্ডিতী কীর্তির লেখক বলে যুগপৎ প্রতিভাত করা যেতে পারে। ডঃ সেন তার বদলে নতুন পরিসংখ্যান সমর্থিত রীতির মাধ্যমে যে-কোনো একজন লেখকের বাক্প্রকরণ বা 'স্টাইল'-এর সম্পূর্ণ পরিচয় সংগ্রহ করতে চেয়েছেন। লেখকের রচনার বিভিন্ন অংশ থেকে যথেচ্ছ উদাহরণ (sample) নিয়ে তারই মধ্য থেকে প্রযুক্ত শব্দগুচ্ছ, শব্দক্রম বা শব্দসজ্জা, বাক্য বিন্যাস, যতি চিহ্ন, অনুচ্ছেদ প্রভৃতির নির্মাণ ও ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যের আনুপাতিক হার কষে যথাসম্ভব গাণিতিক যাথাযাথ্যের সঙ্গে তাঁর 'স্টাইল'-এর পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া হয়েছে। এই ধারানুসরণে 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা'র একটি নামহীন রচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে সনাক্তও করা হয়েছে। এই প্রযুক্তি ও নিরীক্ষণ শক্তি অভিনব, কিন্তু নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হয়, এক সময়ে ব্যক্তিমুখ্য ব্যাপকতা প্রত্যাশী মূল্যায়ণ বাংলা-গদ্যের সকল সাফল্যের একমাত্র আকর রূপে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকাকেই একচ্ছত্র করেছিল। বিশুদ্ধ গদ্যরীতির জন্মদান, তাতে ছান্দসিক লালিত্য সঞ্চার, নির্ভুল লয় ঝংকৃত বিরতি চিহ্নের প্রয়োগ, ইত্যাদি সকল কীর্তিরই উৎস নির্দেশ করা হয়েছিল বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিদ্যাসাগর 'তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক মণ্ডলীতে দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়কুমারের সঙ্গী ছিলেন; পত্রিকায় তাঁর রচনাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ভাষা-শিল্পী রূপে তাঁর প্রথম নির্ধারিত আত্মপ্রকাশ আরো পরবর্তী কালের ঘটনা,—'বেতালপঞ্চ বিংশতি' (১৮৪৭) তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কীর্তি বিন্দুমাত্র খর্ব না করেও বাংলা যতিচিহ্নের ব্যবহারে অক্ষয়কুমার, কিংবা কাব্যস্বাদী গদ্য রচনায় দেবেন্দ্রনাথের, তথা ভাষা নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের মৌলিক মহিমার প্রসঙ্গ ডঃ সেন গাণিতিক তথ্যচিত্র (chart) এবং নকশা (Graph) এঁকে পরিচ্ছন্ন প্রামাণ্য সহযোগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তথ্যচিত্রাদি প্রয়োগের প্রকরণ নিছক বিবৃতির চেয়ে কত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আবেদনসহ হতে পারে তার চমকপ্রদ নিদর্শন আছে দেবেন্দ্রনাথ এবং অক্ষয়কুমারের ব্যক্তি-বিশ্বাসের পার্থক্য নির্দেশে (পৃ. ৩৬), অক্ষয়কুমারের রচনার বিষয়পরিচয়নে (পৃ. ৫৪) কিংবা 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' এবং উইলসন কৃত 'Religious seets of the Hindus' গ্রন্থ দুটির বিষয় পার্থক্য প্রদর্শনে (পৃ. ১০৬, ১০৭)। ব্যবহারের দক্ষতায় লেখক তাঁর প্রকরণকে নিঃসন্দেহে স্বীকৃতির আসন দান করতে পেরেছেন।

তথ্য নির্ণয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি অক্লান্তকর্মা। বিশেষভাবে অক্ষকুমারের রচনাবলী সম্পর্কে অনেক অপরিচ্ছন্ন সংস্কার তাতে দূরীভূত হতে পেরেছে। 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র আলোচনা পরিধি যে 'Religious seets of the Hindus'-এর চেয়ে অনেক ব্যাপক তার গাণিতিক প্রমাণ উদ্ধৃত হয়েছে। কিংবা, বাহ্যবস্তুর উপর কুমের প্রভাব সম্পর্কে এটুকু বলা যায় যে, চিন্তার দিক

থেকে উভয়ের কিছু মিল আছে সত্য ; কিন্তু অক্ষয়কুমার সোজাসুজি কুমের গ্রন্থের প্রভাবে 'বাহ্যবস্তু' রচনা করেন নি।—এই ধরণের স্পষ্টোক্তি গ্রন্থে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই সবকিছু মিলিয়ে অকুণ্ঠ ভাবেই স্বীকার করতে হয় যে, বাংলা গদ্য শিল্পের আলোচনায় ডঃ নবেন্দু সেন রীতি-বিজ্ঞানের ভাষাতত্ত্ব সম্মত আধুনিক মূল্যমান বাংলা গবেষণা গ্রন্থে প্রথম কৃতিত্বই নয় কেবল, সেই সঙ্গে তার সার্থক প্রয়োগের গরিমাও অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে গবেষণা মূলক প্রবন্ধের ক্ষেত্রে গভীর অনুপুঙ্খ তথ্য-অন্বীকারও এক নতুন মান স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে কিছু কিছু সংশয়ও মনে দেখা দিয়েছে, লেখকের সামর্থ্য গরিমার পাশে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। তবু এই সমৃদ্ধ প্রথম প্রয়াসকে সব দিক থেকেই নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা দেবার দায়িত্বটুকুও এই তরুণ পথিকৃতদেরই গ্রহণ করতে হবে ; ডঃ সেন এবং ডঃ দাশ, যাঁরা রীতি বিজ্ঞানের আধুনিক প্রকরণটি আমাদের ভাষা বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োগের সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। ভাষা বিচারের এই প্রকরণটি বিজ্ঞান সমর্থিত, এবং পরিসংখ্যান যতটা নিখুঁত হতে পারে ততটা পরিমাণে নির্ভুলও নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বিচ্ছেদ-বিশ্লেষণমূলক আলোচনার পরেও শিল্পের সামগ্রিক স্বরূপটি আয়ত্ত করতে পারার পিপাসা থেকেই যায়। ফুলের নির্ভুল পরিচয় সংগ্রহে তার বোঁটা পাঁপড়ি থেকে বীজ কোষ পর্যন্ত সর্বাবয়বের পরিচয়টি বিচ্ছিন্ন করে নির্ভুলভাবে পেতেই হবে ; কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য তো তদারিক্ত কিছু। দীর্ঘ আলোচনা শেষে একটি সংক্ষিপ্ত 'উপসংহারে' এই সামগ্রিক শিল্প রূপের সন্ধান লেখক করতে চেয়েছেন ; নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি অতন্দ্র। তাহলেও অত দীর্ঘ বিশ্লষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণের পরে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি মন্তব্যে প্রয়োজনীয় প্রত্যাশা পরিপূরিত হয় না। লেখক নিজে বলেছেন, অক্ষয় আনলেন বিজ্ঞান সাধনার সাহিত্যিক রূপ এবং দেবেন্দ্রনাথ আনলেন ধর্মসাধনার সাহিত্যিক সৌন্দর্য। (পৃ-৩০৯১)। কিন্তু 'সাহিত্যিক রূপ' 'সাহিত্যিক সৌন্দর্যটি' কি সে কথা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হলো না তেমন, যেমন হয়েছিল এই তথ্য চিত্রাদির গাণিতিক উপস্থাপনা।

ডঃ শিশিরকুমার দাশ গ্রন্থের মুখবন্ধে নির্দেশ করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ধর্মীয় গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা। (পৃ-১৩)। এই 'ধর্মীয় গদ্য'র স্বরূপটির পূর্ণ উদঘাটন মূল গ্রন্থে প্রত্যাশিত ছিল। রাজনারায়ণ বসুর কথা মনে পড়ে। 'বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যিক বিষয়ক বক্তৃতা'তে দেবেন্দ্রনাথকে তিনি বক্তৃতার ভাষায় প্রবর্তক বলেছিলেন। এবং গীর্জার খ্রীষ্টীয় পুরোহিতদের ধর্মপ্রচারের বক্তৃতামূলক রীতির সঙ্গ সাদৃশ্য সন্ধান করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সমাজের প্রদত্ত বক্তৃতার ভাষায়। তাঁর সিদ্ধান্তের গ্রহণীয়তা যাই হোক, বক্তব্যকে তিনি প্রাঞ্জল করেছেন। ইচ্ছে করলে ডঃ সেনও পূর্বসূরীর এই মূল্যায়ন পরীক্ষা করে দেখতে পারতেন হয়ত। কিংবা ঐ 'বক্তৃতা'-তেই রাজনারায়ণ দাবি করেছিলেন অক্ষয়কুমারের 'বাহ্যবস্তু' ও 'ধর্মনীতি' প্রভৃতি অনেক পরিমাণে ইংরাজীর অনুবাদ-মূলক রচনার তুলনায় 'তত্ত্ববোধিনী'র পৃষ্ঠায় ধৃত তাঁর স্বকপোল রচিত প্রস্তাবই তাঁহার সর্বোত্তম রচনা। কয়েকটি রচনার নামোল্লেখও করেছিলেন রাজনারায়ণ। ডঃ সেন তাঁর অবলম্বিত প্রকরণের মানদণ্ডে 'তত্ত্ববোধিনীর' একটি রচনা অক্ষয়কুমারের লেখা বলে নির্দেশ করেছেন ; এই সূত্রে পূর্বসূরীর মূল্যায়নও পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারত। এসব কথা ত্রুটি নির্দেশের

সূত্রে নয়; কেবল অনুসন্ধানের আনুপূর্বিকতা হয়ত আরো সম্পূর্ণ হতে পারত। সবচেয়ে বড় কথা বিশ্লেষণের সকল প্রয়াস নিখুঁত হয়ে যাবার পরেও আশ্লেষমূলক একটি প্রত্যাশা সৌন্দর্যসন্ধানের ক্ষেত্রে দুর্মর হয়ে থাকেই; এ দুয়ের সমন্বয় সাধনের পথ তরুণ সন্ধানীরা খুঁজবেন, এই প্রার্থনার সঙ্গে ডঃ নবেন্দু সেনের অভিনব প্রথম প্রয়াসকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

ভূদেব চৌধুরী

ভারত ইতিহাস অভিধান (সিন্ধু সভ্যতা থেকে স্বাধীনতা) ॥ যোগনাথ মুখোপাধ্যায়; পনেরো টাকা; এম্. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২।

৩৫৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই মূল্যবান বইখানির ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে সিন্ধু সভ্যতা থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক বিভাগ বা রাষ্ট্রসীমার আয়তন নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে—'কখনো উত্তর-পশ্চিমে আফগানিস্তান, কখনো বা পূর্বে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত ভারতের সীমানা বিস্তৃত হয়েছে। নেপাল ও ভারতের মধ্যেও দীর্ঘকাল কোন সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় সীমানা ছিল না। কিন্তু এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের এক্তিয়ার ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে সৃষ্ট ভারতের সীমানায় সীমিত রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা সম্পূর্ণরূপে আফগানিস্তান, নেপাল ও বাংলাদেশ প্রভৃতি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির নিজস্ব ব্যাপার তা এই গ্রন্থে স্থান পায়নি। তবে সিন্ধু সভ্যতা এই নীতির উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম, কারণ সিন্ধু সভ্যতার পীঠভূমি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাকে বাদ দিয়ে ভারতের ইতিহাস শুরু করা যায় না। একই কারণে সিন্ধুতে আরব অভিযানও এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু। তারপর আফগান যুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ, নেপাল যুদ্ধ প্রভৃতিও এই গ্রন্থের বিষয়, কারণ ভারত ইতিহাসের পরম্পরায় তারা অপরিহার্য।' পাকিস্তান ও 'বাংলাদেশ'ও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আবার লেখকের কথায়—'এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত তত্ত্ববিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্ঘাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।' পাকিস্তান ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসেছে বটে, কিন্তু—'সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ অথবা করাচি, পেশোয়ার, ঢাকায় ভারতের ইতিহাসে একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় শুধু বঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, যুক্ত প্রদেশ, অথবা কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতীয় প্রদেশ ও শহরগুলি।' বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন কাব্য-পুরাণাদির কিছু কিছু প্রসঙ্গও তিনি নিয়েছেন এ বইয়ে।

বাংলায় এই ধরণের অভিধান যে বিশেষ স্মরণীয় প্রবর্তনা, তাতে সন্দেহ নেই। অভিনব গুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, সেলিউকস, সারজন শোর, যাস্ক, বিবেকানন্দ ইত্যাদি ব্যক্তি প্রসঙ্গের বিচিত্রতা যেমন, তেমনিআবার নীল-বিদ্রোহ, খিলাফৎ আন্দোলন, ওয়াহাবি আন্দোলন—বা দ্রাবিড়, পালবংশ, ফা-হিয়েন, মগধ ইত্যাদি অন্যান্য প্রসঙ্গও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিচিত্র জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি ঘটাবে।

কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি ইত্যাদি আছে, কিন্তু 'হিন্দু মহাসভা' নেই কেন? সে কি ১৯৪৭ এর আগস্টের পরের ঘটনা? 'হিন্দু উপনিবেশ'-এর পরে এই প্রসঙ্গটি পাওয়া যাবে বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু অনুল্লেখের কোনো সংগত কারণ বোঝা গেল না। বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রসঙ্গে হিন্দু মহাসভার উল্লেখ আছে যখন, তখন লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার ফলেই বোধ হয় এরকম কোনো কোনো প্রসঙ্গ বাদ গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভৃতি এই অভিধানে জায়গা পেয়েছেন, এবং তা খুবই প্রত্যাশিত; দীনবন্ধু মিত্র বাদ গেছেন,—এরকম অনুল্লেখ সম্বন্ধেও পরবর্তী সংস্করণে লেখক পুনর্বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। নীহাররঞ্জন রায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি আমাদের মধ্যে এখনো বর্তমান আছেন বলেই কি তাঁদের অনুল্লেখ ঘটেছে? ভূমিকায় লেখক অবশ্য এ বিষয়ে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটির আগেই উল্লেখ করা হয়েছে,—'এই গ্রন্থে শুধু সেইসব ভারত-তত্ত্ববিদ্ স্থান পেয়েছেন যাঁরা ভারতে এসে ভারত ইতিহাসের রহস্য উদ্‌ঘাটনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন',—কিন্তু এ কৈফিয়ৎ ও পুনর্বিবেচনার বিষয়। তাছাড়া আরো অনেক প্রসঙ্গ আছে যা বাদ গেছে।

শ্রীযুক্ত যোগনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন—'গ্রন্থের বিষয়বস্তু বাছাই করা, বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো, প্রুফ-সংশোধন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ এক হাতে সাজ করতে হয়েছে।' এ যে গুরুতর অসুবিধার ব্যাপার, তাতে সকলেই একমত হবেন। এই অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি যে প্রভূত অধ্যবসায় ও দৃঢ় সংকল্প সহযোগে এই বইখানি প্রকাশকের হাতে দিতে পেরেছেন এবং প্রকাশক যে সমুচিত প্রযত্নে এটি প্রকাশ করেছেন, সেজন্য উভয় পক্ষই অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বেদ, উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা আছে, কিন্তু সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক সম্বন্ধে তাহলে সংক্ষেপে পৃথক পৃথক প্রসঙ্গ হিসেবে কয়েকটি কথা থাকবে না কেন? চৈতন্যদেব সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু পরিচিতি থাকা উচিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবশ্যই ভারত ইতিহাসের স্মরণীয় ব্যক্তি। এরকম প্রসঙ্গ আরো কিছু কিছু ধরা পড়বে। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় হয়তো ইতিমধ্যে নিজেই এরকম অনুল্লেখের তালিকা তৈরী করেছেন! পরবর্তী সংস্করণ ত্বরান্বিত হোক্—এটিই বিশেষ কামনা। তাঁকে পুনরায় অভিনন্দন জানাই।

হরপ্রসাদ মিত্র

একবিংশ বর্ষ ৩য় সংখ্যা

আষাঢ় তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

পট

বিমলেন্দু চক্রবর্তী

পট ও পটুয়ার আবির্ভাব আজকের কথা নয়। তবে মানব সভ্যতার কোন স্তরে পটুয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল তা বলা যায় না। ধর্ম প্রচার এবং লোকশিক্ষার এই বাহনটির আবির্ভাব সমাজের তাগিদেই ঘটেছিল। ভারতবর্ষের প্রায় সব এলাকাতেই পটুয়ার অস্তিত্ব ছিল।

কালিদাস ও ভবভূতির নাটকে পট আঁকা এবং পট দেখানোর উল্লেখ আছে। পটের বাস্তব উল্লেখ বিশাখা দত্তের মুদ্রারাক্ষসে আছে। মুদ্রারাক্ষসে পটুয়াদের 'যম পট্টিক' বলা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষসের রচনাকাল নিয়ে মতান্তর থাকলেও খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে 'যম পট্টিক' বলে বিশেষ এক শ্রেণীর পটুয়ারা ছিল একথা সর্বজন স্বীকৃত। বাণভট্ট তার 'হর্ষচরিতে' 'যম পট্টিক'দের পট প্রদর্শন নিয়ে একটি সুন্দর দৃশ্য চিত্রের অবতারণা করেছেন।

পটিদারদের ভিতর থেকেই কুম্ভকার জাতির উদ্ভব। বাংলা দেশে পটিদারদের যেমন কুম্ভকারের কাজ করতে দেখা যায় তেমনি কোন কোন কুম্ভকার পটিদারের কাজ করে। অবশ্য এ হ'ল এক রকম ব্যতিক্রম। পট যারা করে তারাইতো পটিদার। জাতিতত্ত্বে পটিদারদের সঙ্গে কুম্ভকার জাতি সংশ্লিষ্ট। মধ্যে সন্ধি রূপে গোপকন্যার অবস্থান। ভার্গবরাম মতে

'পট্টিকোৎ গোপকন্যায়াং কুলালো জায়তে ততঃ',

মতান্তরে—'পট্টকারচ্চ তৈলক্যাং কুম্ভকারো বভূব হ',

গুজরাট অঞ্চলে এক রকম পট আছে যাকে বলা হয় 'চিত্রকথী', এরাও বাংলার পটুয়াদের মত পট দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং একথা বলতেই হয় পট এবং পটুয়া বাংলা দেশে অভিনব নয়। সারা ভারতবর্ষে পটুয়াদের অস্তিত্ব ছিল। এই পটুয়ারা লোক শিক্ষার বিরাট এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

দীর্ঘ দিন ধরে পালন করে এসেছে।

বাংলার সমাজে কোন সময় পটুয়ার আবির্ভাব হয়েছিল তা নির্ণয় করার মত কোন তথ্য নেই। বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে এদের আবির্ভাব এমন কল্পনা করার সুযোগ নেই। বাংলার সাঁওতালদের ভিতরেও পট আঁকা এবং প্রদর্শন রীতি আছে। বাংলার পটের সর্বপ্রধান সাহিত্যমূলক সাক্ষী 'কবি চণ্ডী'র পাতায়। 'কবি চণ্ডী'তে পটের উল্লেখ আছে।

বাংলায় প্রচলিত পটকে বলা হয় 'যমপট' বা যাদু পট। 'যমপট' নাম হবার কারণ বোধ হয় পটের শেষে যমরাজের রাজ্য দেখবার রীতি থেকে। পটের শেষে যমের রাজ্য দেখানো বোধ হয় খুব প্রাচীন রীতি। জীবনের অনিত্যতা প্রকাশ করার জন্যই পটের ব্যাপকতর প্রসার ঘটেছিল। বৌদ্ধযুগেই এমন হয়ে ওঠার সম্ভাবনা বেশী। 'যম পট্রিক' নাম এভাবেই তারা পেয়েছিল।

বাংলায় পট আঁকিয়েদের 'পটিদার', 'পটুয়া' বলা হয়। আদিবাসী সমাজে এরা 'পাটকিরি' নামে পরিচিত। পটুয়ারা পট আঁকাকে বলে পট লেখা। 'লেখা' ভাষার ব্যবহার থেকে পটুয়াদের সঙ্গে চিত্রলেখকদের সংযোগ অনুমান করা যায়। 'চিত্রলেখা' কথা অর্বাচীন নয়। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে আঁকা ছবি এবং ভাস্কর্য শিল্প দু'ই-ই বোঝাত। তুলি দিয়ে আঁকা ছবিকে আলাদা করার জন্য 'লেখ্য' চিত্র বলা হ'ত। ছবি আঁকাকে বলা হ'ত 'চিত্র লেখন'। বাংলার পটুয়ারা যেন তার স্মৃতি রক্ষা করতেই পট আঁকা না বলে 'পট লেখা' বলে থাকে।

বাংলার পটুয়াদের সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে রেখে গেছেন গুরুসদয় দত্ত। পটুয়ারা ব্যবহারিক জীবনে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এক বিচিত্র সম্মিলন। নামাজ পড়ে আবার বিশ্বকর্মার সন্তান বলে বিশ্বাস করে। হিন্দু মুসলমানের অনাবিল সমীকরণ যদি হয়ে থাকে তবে সে গৌরব বাংলার পটুয়াদেরই প্রাপ্য। অবশ্য বাউলরা আর এক জাতীয় সমীকরণের অপরূপ ইতিহাস তৈরি করেছে। তা হ'ল অন্য প্রসঙ্গের কথা।

'পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণঞ্চ কোপতঃ'

বাংলার চিত্রকরদের এই হল নিয়তি!

বিনয় ঘোষের অনুমান বাংলার পটুয়ারা নিষাদ জাতির শাখা। অবশ্য কোন কোন লক্ষণ দেখে তিনি এদের নিষাদ জাতির শাখা বলে অনুমান করেছেন তা স্পষ্ট করেন নি। অবশ্য এ হ'ল নৃতত্ত্বের কথা।

পটুয়ারাই বাংলার একমাত্র চিত্রশিল্পী বলে সত্যি তারা এক কৌতূহলের বিষয়। সমাজের বহু নির্যাতন, অবহেলা, অর্থনৈতিক উপেক্ষার মধ্যে থেকেও এরা শতাব্দীর পর শতাব্দী চিত্রনির্ভর জীবন যাত্রা নির্বাহ করে এসেছে।

পটুয়ারাই আদিমতর চিত্রকরদের বংশধর এ কথা বলা যায় কি না তা ভেবে দেখা উচিত। দেখা যায় অনেক পটুয়া ছবি আঁকার সঙ্গে পুতুল নির্মাণ করে থাকে। বিনয় ঘোষ এদের তক্ষণ শিল্পের কাজ করতে দেখেছেন। গুরুসদয় দত্ত পটীদার সূত্রধরের পট সংগ্রহ করেছেন। চিত্রকরেরা এক সময় সমাজের শ্রদ্ধার আসনে ছিল। পরবর্তীকালেও মানুষের পারলৌকিক ও দার্শনিক প্রত্যয়ের সুযোগ নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সমাজের ধর্ম আন্দোলনগুলোর সুযোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ ধর্মের

অনুকূলে প্রচারের এক সরস মাধ্যম ছিল এদের হাতে। এদের হাত ধরেই বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রচার সম্ভব হয়েছিল।

বাংলার ইতিহাসের অনেক গভীর গোপন খবর পটুয়াদের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। পণ্ডিতজনদের ব্যাপক প্রয়াসে তা আবিষ্কৃত হতে পারে। লোক শিল্পের শিল্পীদের প্রতি ব্রহ্মণ্য ধর্মের আচরণ কোন স্তরে ছিল তা পটুয়াদের—

ব্যতিক্রমেন চিত্রানাং সদ্যশ্চিত্রকরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ॥

এ' কথার ভিতর স্পষ্ট হয়ে আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ত্রয়োদশ শতকের রচনা।

অনুমান করা যায় লোক শিল্পের এই সবল নাটকীয় রূপের সামনে ব্রহ্মণ্য ধর্ম নিজেকে খুব অসহায় মনে করতো। বৌদ্ধ যুগের অবসানে চিত্রকর পটুয়া সমাজ অসহায় এবং আশ্রয়হীন হয়ে পরে। এই সুযোগ আভিজাত্যভিমানীরা পুরো ব্যবহার করেছে। এরপরে মুসলমানরা এদের ধর্মপ্রচারে ব্যবহার করে। এরা সামাজিক সংঘর্ষের পথে পা না দিয়ে আত্মরক্ষার সহজ পথ বেছে নেয়। ধর্মে মুসলমান হয়ে যেমন আত্মরক্ষা করে তেমনি জীবিকার জন্য অনুসরণ করে হিন্দু কাহিনী। এটা খুব বাস্তব কথা যে, "এই পটীদারদের পূর্ব পুরুষরা বৌদ্ধ ছিলেন। ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য মুসলমান হ'লেও ঐতিহ্যের দিক থেকে তারা হিন্দুই থেকে গেছে।' (লোক শিল্প রবীন্দ্র মজুমদার) এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় রাজশক্তি যখন মুসলমানদের করায়ত্ব ঠিক তেমন এক সময় এ রূপান্তর ঘটেছে। অন্যথায় এরা ধর্মে মুসলমান হবার কথা ভাববে কেন? অনেকে অনুমান করেন বিজয়ীদের আবির্ভাবের আগেই পর্দাপণ ঘটেছিল মুসলমান প্রচারকদের। 'মুসলমানেরা যখন বাংলা আক্রমণ করে তখন এখানকার হিন্দু ধর্ম অত্যন্ত শিথিল ও দুর্বল ছিল।···নিম্ন বর্ণের লোকদের গোলামে পরিণত করা হয়েছিল।······ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ অত্যাচার প্রয়োজন হয় নি।' প্রবোধচন্দ্র ঘোষ (বাঙালী) তারা সম্ভাব্য সব রকম মাধ্যমই দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছে। অনেক পটুয়া তাদের প্রচারে বাস্তব সাহায্য দিয়েছে। 'এমন কি এই সব পটে খোদ মহম্মদের আলেখ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মের কাহিনী চিত্রিত করা হ'ত।' (সুধাংশুকুমার রায়)

ব্রহ্মণ্য ধর্মের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে প্রতিশোধ নেবার আকাঙ্খা এর পিছনে কাজ করতে আবার জাত ব্যবসায়ী বলে ধর্ম বিশ্বাস সব সময় বাঁচিয়ে চলা যায় না এটা বুঝতো। এরাইগাজীর পট আঁকিয়ে পটুয়া রূপে পরিচিত।

মুসলমান ধর্মালম্বীদের কাছে পট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। পট ছিল তাদের কাছে প্রচারের প্রয়োজনের মাধ্যম। তার উপযোগিতা ক্রমশই কমতে থাকে। বাধ্য হয়ে পটুয়ারা হিন্দু দেব দেবীর কাহনীর জগতে ফিরে আসে।

বাংলা দেশের পটুয়াদের মত ডোকরা শিল্পীদেরও দুর্ভাগ্য বহন করতে হয়েছে। তাদের প্রতি সমাজের এ অবিচার কেন তার বাস্তব কোন ব্যাখ্যা অনুপস্থিত। এরাও পটুয়াদের মত লাঞ্ছিত শিল্পী।

কোথা হইতে বুড়ো এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোকে একি অলক্ষণ॥ ভারতচন্দ্র

পটের দৃশ্য একের পর এক এঁকে চোখের সামনে নাটকীয় ভাবে উত্থাপন করা হয়। বিক্রমপুরে এর জন্যই প্রচলিত ভাষায় 'পট নাচানো' বলা হয়। পটে কতগুলি পর পর দৃশ্য গেঁথে তোলা হয়। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয় না। ঘটনার বিশেষ মুহূর্ত শিল্পী তার কাহিনী অনুযায়ী বেছে সাজিয়ে নেয়। করুণ, কোমল, হাস্য, মিলনাত্মক, দাস্য প্রভৃতি রসের উপাদান এগুলোতে আছে।

পটের উপাদান ধর্মের বিভিন্ন কাহিনী। এগুলো মানুষের নীতি বোধকে জাগ্রত করে রাখে এবং ধর্ম প্রচারে বাস্তব ভূমিকা আছে। ধর্ম শিক্ষার তাগিদ থেকেই পটের প্রসার। জাতকের গল্পগুলো গভীর ভাবে দেখলে গল্পগুলো যেন পটের জন্য তৈরী বলে মনে হয়। অজন্তার ছবিগুলি দেখলে সন্দেহের অবসান ঘটতে পারে। শিল্পীরা যে জাতক কাহিনী আঁকায় দক্ষ এতো প্রমাণিত। সাঁচী ও ভারুত স্তূপে পটের মত করে দৃশ্য পট উত্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে 'গাজীর পটের' মিলটা খুব কাছাকাছি।

পটের কাহিনীর মধ্যে জনপ্রিয় হল রামায়ণ, চাঁদ সদাগর, কৃষ্ণলীলা, শ্রীচৈতন্য, বেহুলা, নরমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি। সতীর সতীত্বকে করা হয়েছে মহিমময়। সন্তানের পিতৃভক্তি কৃচ্ছ্রতায় কৃতজ্ঞতায় নম্র। রাজায় প্রজায় বাৎসল্য রসের স্রোত অবগাহন করে। 'একটা বিরাট মনুষ্য-সমাজ, যারা বাস করে পল্লীর শান্ত পরিবেশের মধ্যে বিশ্বাস করে অসংখ্য দেব-দেবীতে, জীবনের আদর্শের সন্ধান নেয় পৌরাণিক গল্প ও উপখ্যানের মধ্যে .... তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন সব কিছুরই নিখুঁত চিত্র।'

এ আদর্শ এ সমাজ বাঙালীর নিজস্ব। পটুয়ার ধ্যানে দেবতারা বাঙালী রূপ নিয়ে জাতির আত্মাকে গৌরবান্বিত করেছে। 'পটুয়া শিল্পীর বৃন্দাবন বাঙলা দেশে, অযোধ্যা বাঙলা দেশে, শিবের কৈলাস বাঙলা দেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালী। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলঙ্কার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশী।' —গুরুসদয় দত্ত

আট থেকে দশ হাত এমন কি আঠারো উনিশ হাত লম্বা পট দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় পটে বহু চিত্রের ভিড়। দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজানো। দু' পাশে দু'টি কাঠি লাগিয়ে জড়িয়ে রাখা হয় বলে একে জড়ানো পট বলা হয়। পট দেখবার সময় পটুয়া জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোট বার পায়ার উপর রেখে বাঁ হাত দিয়ে উপরের কাঠি ঘুরিয়ে পট খুলতে থাকে। ডান হাত দিয়ে ছবির চরিত্রগুলো দেখিয়ে সুর সহযোগে কাহিনী বর্ণনা করে। ছবি দেখাবার এ অভিনব রীতি তা স্বীকার করতেই হয়।

পটের পিছনে পুতুল নাচের সুদূর স্মৃতির যোগাযোগ আবিষ্কৃত হয়ে পড়লে অবাক হবার কিছু নেই। পট দেখতে দেখতে পুতুল নাচের কথাই মনে আসে। চরিত্রগুলি পুতুল নাচের পুতুলের আঙ্গিকে আঁকা। চরিত্রগুলো মাটির উপর দাঁড়িয়ে থাকে না। পটের চরিত্রগুলো দেখলে মনে হয় এরা যেন পটের পটভূমিতে ঝুলে আছে। এ যেন নাচের পুতুলগুলি সুতোর টানের আশায় স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে। অন্য দিকে পটের নাক চোখের ফাঁদ, মুখের সুডোল রঙের বিন্যাস যেন

পুতুলের মত করে—একথা বলার সুযোগ আছে। 'ইলামবাজারের গালার পুতুলের চোখ, বর্ণ পটধৃত মূর্তির আত্মার আত্মীয়।' (লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়) পটচিত্র আর পটুয়া সঙ্গীত পরস্পরের পরিপূরক। গানগুলোতে যথাযথ ভাবে পটের বর্ণনা থাকে না। পটে যা আঁকা নেই তাই গান গেয়ে অদেখা দৃশ্যের ব্যঞ্জনা আরোপ কথা হয়। তাই পট চিত্রের পট সঙ্গীতের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার গণ সাহিত্যে পটুয়া সঙ্গীতে স্থান কম গৌরবের নয়। বস্তুত পক্ষে পটুয়াদের সাহিত্যে বা পটুয়া সঙ্গীতে বাঙালার আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ আছে। এর একটা আলাদা মূর্তি আছে। কিন্তু পটুয়ার কাছে উভয়ের মিলনেই পূর্ণতা। দর্শকের কল্পনা উদ্দীপ্ত করে তোলার এক সুচতুর কৌশল। তাই পটুয়ার শুধু পট লিখেই দায় মেটে না। তাকে সহজ কবির ভূমিকাও পালন করতে হয়। পটুয়া সঙ্গীত বাদ দিলে পটের সরসতা কমে একথা মানতেই হয়। সঙ্গীতহীন পট অনড় আচল, পট অলঙ্কার হীন গৃহবধুর রূপ নেয়।

লক্ষ্য করার মত পটুয়া সঙ্গীতের ভাষায় মধ্য যুগীয় প্রভাব আছে। এতে এটা বোঝা যায় পটে উল্লেখ করার মত কোন পালা বদলের অধ্যায় আসে নি। বংশানুক্রমে লোক শিল্পের চরিত্র অনুযায়ী পট ও পটুয়ার সঙ্গীত এক রকমেই থেকে গেছে। কাহিনী, দৃশ্য, ভাব, অঙ্কন কৌশল এক থাকাতে নতুন নতুন সঙ্গীত তৈরী করার তেমন কোন উৎসাহ সঞ্চার হয় নি। তাই তারা আজো পট মেলে গান ধরে—

মনসা জগৎগৌরী জয় বিষহরি।
অষ্টম নাগের মাথায় পরমা সুন্দরী ॥
নাগের হোলো ঘাটপাট নাগের সিংহাসন।
মঙ্গলে বেড়ায় পৃষ্ঠে দেবীর আসন ॥

পট আঁকায় জমি, তুলি রং এসব পটুয়ার নিজের হাতে তৈরী। লোক শিল্পে ব্যবহার করা উপাদান লোক শিল্পীদের সংগ্রহ করাই রীতি। দেশজ নীল, মেটে সিঁদুর এলামাটি। গেরিমাটি, খড়িমাটি হরিতাল প্রভৃতি ধাতব এবং উদ্ভিদ রংয়ের সাহায্যে পটুয়ারা পটের অপরূপ জগৎ গড়ে তোলে। প্রদীপের কালি থেকে আসে কালো রং। তেতুল বীচি বেলের আঠা আর এক উপাদান। নারিকেলের মালা হল রং গোলার পাত্র। ছাগলের ঘাড়ের এবং তল পেটের লোম হ'ল তুলি তৈরীর উপাদান।

কাপড় পরবর্তী সময়ে কাগজের উপর পটচিত্র আঁকা হত। কাগজের উপর কাগজ আটকে কাগজখানাকে মজবুত করে নিত। আঁকার খড়িমাটির প্রলেপ দিয়ে জমি তৈরী করে নিয়ে লাল রেখায় বহিঃ রেখা এঁকে নিত। তারপর শুরু হত অন্য রংয়ের কাজ। একের পর এক রং লাগিয়ে জায়গাগুলোকে ভড়াট করে জমজমাট করে তোলা হ'ত। রংয়ে আঠা ব্যবহার করা হয় বলে একে টেম্পরা রীতির ছবিও বলা যায়।

অতি সাধারণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে এরা যুগের পর যুগ সমাজের চাহিদা মিটিয়ে এসেছে। কি করে জনগণকে খুশী করা যায় শিল্পীর সামনে খুব বড় একটা সমস্যা। অথচ এই পটুয়ারা সহজেই এ সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। এত সহজ উপাদানের মাধ্যমে কি করে অসাধারণ দায়িত্ব

অনায়াসলব্ধভাবে চালিয়ে এসেছে ; কেন না পট মাত্রেই উচ্চাঙ্গ শিল্প নয়। অনেক কাঁচা হাতের রেখা, ত্রুটিপূর্ণ বর্ণ বিন্যাস, রচনার পর ভাব ভাঙ্গীতে বাস্তববোধের অভাব আছে। অথচ পুরো পটখানি যখন চোখের উপর সচল গতিতে যাত্রা করে তখন রসভঙ্গের কারণ ঘটে না। সুতরাং বলতেই হয় গভীর ভাব ও সরল রচনাভঙ্গী পটের প্রাণ। বর্ণবিন্যাসের সরলতা এর ঐশ্বর্য। সহজ অনাবিলতার এক অপরূপ রস আছে। সেই রস পটের অবয়বে বিধৃত। দর্শকের দলও যে সহজে খুশী হ'তে পারে একথা মানতে হয়। শিশুর অনাবিল রসে বাংলার পট চিত্র আগাগোড়া মোড়া আছে।

দর্শক মাত্রেই পটে আঁকা বিষয়বস্তু সত্য বলে বিশ্বাস করে। একটা দেশের বিরাট মানব সমাজের বিশ্বাস পটে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়—পটের জনপ্রিয়তার এটাও একটা কারণ হতে পারে। সরল মানুষগুলির কাছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—একথা বলতেই হয়।

পটের সহজ সারল্য এবং বিশ্বাসই এর প্রাণধর্ম। তাই পটকে বলা যায় সরলগণ মানসের সহজ সুন্দরী। গৃহবধূ যেমন সংসারে সহজরূপে অনাড়ম্বর জীবন যাত্রায় অপরূপের ইশারা দেয় পটও তেমনি। তাই পট চিরন্তনের সম্পদ। দর্শকের কাছে পট নিত্য-নবীন, চির সত্যের প্রতিভাস মাত্র।

পট আঁকার রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার জোরালো রেখা। অজন্তায় এবং কালীঘাটের পটে আমরা যে রেখা দেখি, রেখার যে স্বভাব, জড়ানো পটের রেখায় তা নেই। অজন্তা বা কালীঘাটের রেখা দেহের ডৌল এবং ওজনের স্পষ্ট ধারণা দেয়। দেহের উঁচু নীচু বোধ দর্শকের মনে সৃষ্টি করতে পারে। পটের রেখায় এ গুণ একেবারেই অনুপস্থিত। জড়ান পটের রেখা ঘুরে ঘুরে কখনো তরঙ্গায়িত হয়ে ছবির অবয়বে আশ্চর্য ভারসাম্য সৃষ্টি করে।

সম-চরিত্রের রেখা পুঁথির পাতায় দেখার কোন দৃষ্টান্ত নেই। পুঁথির পাতায় আমরা যে রেখা দেখি তার স্বভাব তীক্ষ্ণ এবং কোনালো হয়ে ওঠা। গুজরাট থেকে উড়িষ্যা হয়ে এরকম রেখা ব্রহ্মের প্রাচীর চিত্রে পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তালপাতাই কোনালো তীক্ষ্ণ রেখা সৃষ্টির কারণ। নয়তো রেখার এমন ধাতব প্রলেবতা আবিষ্কারের অন্য কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পটের রেখা স্বতন্ত্র। খুব দৃঢ়তার সঙ্গে জোরালো টানে রেখাগুলো টানা। রেখা অবলীলায় গড়িয়ে যায়।

"এই সব জড়ানো পটের সঙ্গে মুঘল রীতির বিন্দুমাত্র মিল ছিল না। মিল ছিল দাক্ষিণাত্য ও উড়িষ্যার প্রাচীন রীতির। সে ছিল মূলত চিত্র রীতির, অর্থাৎ সমান ফ্লাট জমিতে দুই মাত্রিক অলঙ্কারময় চিত্রণের, যাতে ভল্যুম, ম্যাস, পারস্পেকৃটিভ্ থাকতো না। (অশোক মিত্র। ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস)

একথা স্বীকার করতেই হয় পটের রেখার সহোদর রেখার ব্যবহার ভারতবর্ষের অন্যত্র আছে। কিন্তু সে সব রেখার সঙ্গে পটুয়াদের পটের রেখার সমধর্মীতা নেই। এ রেখার উৎস অজ্ঞাত তেমনি এরেখা যে অপরের ধার করা অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি তা বলার সুযোগ নেই। এ রেখা বাঙ্গালীর নিজস্ব সম্পদ।

ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে পটুয়ারা পট অবিকৃত কেমন করে রাখলো। বাংলাদেশের শিল্পে স্থাপত্যে ইসলামী প্রভাব আছে দেখতে পাওয়া যায়। "মুসলমানেরাই পোড়ামাটির অলঙ্করণের রীতি এবং নকশা সম্পর্কে পরিচয় ঘটায় এবং পরে তা মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়।" (ম্যাক্‌কাচ্চন) অথচ লোকশিল্পের মাধ্যমগুলি দীর্ঘদিন মুসলিম ধর্মবিশ্বাসের আওতায় থেকেও বিশুদ্ধতা রক্ষা করেছে। পটুয়ারাতো মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করেছে। তাদের জীবনযাত্রায় মুসলমানী প্রভাব স্পষ্ট। অথচ তার বিন্দুমাত্র ছাপ তাদের পটে পড়েনি। আশ্চর্য এক মমতায় মাতার মত মুসলমানী শিল্পের ছোঁয়াচ থেকে পটকে নির্ভেজাল অবস্থায় রক্ষা করেছে।

পটের রেখা এবং ফ্লাট দেহাবয়বের মধ্যে আমরা শিল্পের এমন এক পরিণতি দেখি যা ব্যাপক আলোচনার বিষয়। একথা বলতে হয় পটে চোখে দেখার অভিজ্ঞতার মূল্য নেই। জোর দেওয়া হয়েছে 'ভাবের দেখা' রূপের লীলায়। ব্যাঞ্জনাই প্রধান, কল্পনাই মূল ধর্ম, অপার্থিব রহস্য-এর কেন্দ্র-বিন্দুতে রসমূর্তিতে তরঙ্গিত।

রঙ ব্যবহারের অভিনবতা আর এক কথা। রঙ আসে আলোর হাত ধরে। পটের আলো পটের পশ্চাতে। তাই পটুয়ার আলোর কোন সমস্যা নেই। পটের রঙ চরিত্র বর্ণনা করে না শুধু রঙের মায়া অঞ্জন চোখে লাগিয়ে দেয়। রঙ কখনো উজ্জ্বল কখনো সদ্য পরিণীতার মত নম্র।

সীমা থেকে অসীমের রহস্যময়তার পথে যাত্রাই হচ্ছে পটচিত্র। তার অনেক অনেক বিপরীত জিনিষ এবং অসংলগ্নতা আছে। সেটাই বড় কথা নয়। পটই একমাত্র চিত্র যা বাঙলার চিত্রকলার বাস্তব দৃষ্টান্ত।

পটুয়ার পটচিত্রের দোসর খুঁজতে হলে খুঁজতে হবে বাঙলার মাটীতে। বাস্তবিক পটের দোসর বাংলাদেশে আছে। পটের সাদৃশ্য লভ্য একমাত্র বাংলার মৃৎফলকগুলিতে। পাহাড়পুরের এবং ময়নামতীতে যে পোড়ামাটির টালিগুলি দেখি তার সঙ্গে পটের সম্পর্ক বড় নিকটের। "বহিঃসীমা নির্দেশ করার জন্য রেখার সাহায্যে মূর্তির নকশা৷ তৈরী পুরাকালে একটি বিশিষ্ট শিল্প বলে গণ্য হত। ...পটচিত্রকে ভিন্ন উপাদানে মৃৎশিল্পের ধারাবাহী বলে বর্ণনা করা যায়, কারণ প্রান্তরেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ হচ্ছে পটশিল্পের বিশেষত্ব, আর বাংলার মৃৎশিল্পেও বহিত্রস্থ রেখাঙ্কণ শিল্পীর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করত। এইরূপে বাংলার পটশিল্প পোড়ামাটির টালির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত, এমন কি প্রান্ত রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি মৃৎশিল্প থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।" (অজিত ঘোষ)

পটচিত্রে আঞ্চলিকতা আছে। আঞ্চলিক ইতিহাস অর্থনৈতিক পট আগে না পোড়ামাটির মৃৎফলকগুলো আগে তা নির্ণয় করার মত কোন প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। পটকে যদি মৃৎফলকগুলি অনুসরণ করতে থাকে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আবার উল্টোটাও যে ঘটতে পারে না এমন নয়। সুতরাং কে কাকে অনুসরণ করেছে তা নির্ণয় না করা গেলেও এটা খুব বাস্তব সত্য—"পটের ছবির ছাঁদ গঠন ডৌল প্রভৃতির সঙ্গে মন্দিরের পোড়ামাটির ইটের অলঙ্করণ তার রূপ, আকৃতি টান, রেখা ভঙ্গ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলীর বাহ্য মিল যতটা না তারো বেশী অন্তরের মিল।" (লোকশিল্পের নানা প্রসঙ্গ, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পট আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময়। আঞ্চলিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং প্রকৃতি পরিবেশের প্রভাব এ বৈচিত্র্যের উৎসভূমি। পার্থক্য যা তা একটি বৃক্ষের বহুবর্ণের পল্লবের মত। এগুলোকে আঞ্চলিক রীতিও বলা যেতে পারে। পরিবেশ পরিস্থিতির প্রভাব জনিত ব্যতিক্রম। তার ফলে কোন কোন অঞ্চলে রং ও কাহিনীর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছে। 'প্রতিভাবান শিল্পী বা পরিবারের চেষ্টায় হয়তো কোন এক গ্রামে একটি ঘরানা বা সকুল গড়ে উঠেছিল দেখতে পাই পাশাপাশি অন্যান্য অনেক গ্রামের পটুয়ারা তারই নকল করে চলছেন। (সুধাংশুকুমার রায়)

আশুতোষ মিউজিয়ম ও গুরুসদয় মিউজিয়মে কয়েকটি পট আছে যা ইণ্ডিয়ান রেডের জমির উপর নীল সবুজের ব্যবহারে সজীব হয়ে উঠেছে। রংয়ের উজ্জ্বলতাই এর প্রাণ। মাঝে মাঝে সাদা রংয়ের ব্যবহার চরিত্র গুলিকে যেন নাড়াচাড়া দিয়ে সজীব করে তোলে। বাহুল্য বর্জিত রংয়ে রেখায় গভীর ব্যঞ্জনা এনে দেয়। ধ্রুপদী রসে পটগুলির সারা অবয়ব মণ্ডিত হয়ে আছে। এ পট আহমদপুর আয়সে এর পটুয়াদের আঁকা।

মেদিনীপুরের পটুয়ারা লোকমুখী। প্রচলিত কাহিনী এঁকে তোলার দিকেই তাদের ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। পটের গল্পগুলি একটু অদ্ভুত জাতের একথা বলতেই হয়। গল্পের পত্র পল্লবের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে অতীত বাংলার হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি আভাস। একদা সুমেরীয় মিশরীয় জন পদের সঙ্গে বাঙলার ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষীও আজ আর অলভ্য নয়। মেদিনীপুরের পটে আছে তার ছায়া। মেদিনীপুরের পটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার দীর্ঘায়ত অবয়ব এবং একাধিক চরিত্রের সমাবেশে। একই পটভূমিতে একাধিক চরিত্র সমাবেশ আনে পটুয়ারা অকৃপণ হাতে। প্রশস্ত ললাট আর আয়ত চক্ষু আর এক বৈশিষ্ট্য।

পটের রং উজ্জ্বল নীল। নীলের পটে দরাজ হাতে সাদা বুটির অলঙ্করণ। লাল ব্যবহার করা হয় ঘন করে।

ঠেকুয়া চকের পট ব্যতিক্রমের লক্ষণে উজ্জ্বল। বাংলার ঠেকুয়া চকের শিল্পীরা জাপানী শিল্পীর যেন দোসর। জাপানী শিল্পীর মত হাল্কা হাতের তুলির ছোঁয়া কেমন করে এল বাংলায়! পটের জমির রং হাল্কা। তার উপর হাল্কা হাতে তুলির টানে পটের চরিত্র। ফিকে নীল রং। প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকার দিকে ঝোঁক। সকালে শিউলি ঝরার আমেজে যেন পটে আগা গোড়া মোড়া। অনেকের মতে এ চিত্র রীতি নবীন। এবং পটের এ রীতিই সর্বাধুনিক শুধু নয় শেষ রীতিও বোধহয়।

ইওরোপে কিউবিজিমের জন্ম বিংশ শতাব্দীতে। তার পূর্বসূরী পাওয়া যাবে বাংলাদেশের পটে। বাস্তবিক বংলার পটে কিউবিজিমের বাস্তব উপস্থিতি আছে। জন্ম নিয়েছে সূত্রধর পটুয়ার হাতে। মেরতলা গ্রাম থেকে এ রকম পটের নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন গুরুসদয় দত্ত। এগুলো উনবিংশ শতাব্দীর ফসল। 'আমরা এ রকম পট দেখেছি যার সঙ্গে কিউবিজমের এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে অনেকে হয়ত এ ছবিতে ইউরোপীয় শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করবেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই বিশেষ পটটি কিউবিক শিল্পের আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের বহু পূর্বের আঁকা হয়।' (অজিত ঘোষ)

উনবিংশ শতাব্দিতে কাঠের পালঙ্কে গ্রীক ভাস্কর্যের নকল এক জনপ্রিয় রীতি। গ্রীক ভাস্কর্যের

ড্রেপারীর কাজ লীলায়িত ভঙ্গীমায় নয়। এই বিলেতী পুতুল দিয়ে কাঠের পালঙ্ক তৈরী করার অভিজ্ঞতাই বাংলার কিউবিজিমের জন্মের ভিত্তিভূমি। ড্রেপারির ভাঁজ থেকেই বের হয়েছে কিউবিজিয়মের রেখা। রেখায় কি পটের আঙ্গিকে বিদেশী প্রভাব না থাকলেও এগুলোর নেপথ্যে নায়ক যে বিদেশীয় মূর্তি একথা মানতেই হয়।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ হল এক ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত। কারণ এ রীতির অন্য কোন পটের নিদর্শন আর পাওয়া যায় নি। তাই এর আকস্মিকতাকে অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তীকালে কোন পটুয়া এ রীতি ব্যবহার করে নি। নব্য কিউবিজিমের রীতি তাদের অনুপ্রাণিত করে নি বলেই বুঝতে হবে।

বিষ্ণুপুরের পটের মর্মটুকু আলাদা ধাঁচের। তারা যেন অতীত বাংলার চিত্রশিল্পের ঐতিহ্যের এক বাস্তব ঈশারা তুলে ধরে। একদা বাঙালী শিল্পীরা বৃহৎ ফ্রেস্কোচিত্র আঁকায় দক্ষতা অর্জন করেছিল। বিষ্ণুপুরের পট যেন তার স্মৃতি পরম মমতায় লালন করে চলছে। এ মমতা স্পষ্ট নয় বরং গোপনচারী। বিষ্ণুপুরের পটে চরিত্র রূপায়নের ভঙ্গীতে ফ্রেস্কো আঁকার স্মৃতি ধরা আছে।

পটুয়াদের ছবি নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরাই একমাত্র শিল্পী যারা বাংলার চিত্রশিল্পীর জীবিকা বহন করে এসেছে। তাই এদের প্রসঙ্গে ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। দুর্ভাগ্য পটের আলোচনায় আজ পর্যন্ত যথার্থ গবেষকের আবির্ভাব ঘটেনি। তার ফলে পটের রহস্য আজো আমাদের কাছে ছায়াময় জগতের সামগ্রী হয়ে আছে। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, ভারতবর্ষে উনবিংশ শতাব্দীর থেকে পুরানো কোন পটের সংগ্রহ নেই।

প্রাচীন বাংলার একটি বন্দর

ত্রিপুরা বসু

বর্ধমান হাওড়া সেকসানের ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন থেকে মাত্র মাইল তিনেক দূরে মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর তীরে ছোটগ্রাম সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁ। নিকটস্থ রেল ষ্টেশনটির নাম আদি সপ্তগ্রাম। গ্রামের বুক চিরে বেরিয়ে গেছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। দূরে কাছে কয়েকটা ছোট বড় কলকারখানা। কিন্তু নগরজীবনের উন্মত্ত কোলাহল এই চিরনিদ্রিত প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের নিস্তব্ধ জীবনের ধারে কাছেও আসতে পারে নি। প্রাচীন বাংলার বিখ্যাত বন্দর সপ্তগ্রাম। আর সবকিছুর ছোঁয়া বাঁচিয়ে সে একাকী, একপ্রকার পরিত্যক্ত। ইতিহাসের অনুসন্ধান প্রচেষ্টা সপ্তগ্রামের বিবর্ণ অধ্যায়ে এসে ভিন্ন পথ ধরেছে।

একটু পুরোনো দিনের কথায় যাওয়া যাক। মহাভারতে সুহ্মদেশের বর্ণনা বা অবস্থিতি পরবর্তীকালে স্পষ্ট ইতিহাস সাদরে গ্রহণ করেছে। গ্রীক পণ্ডিত টলেমী তাকেই বলেছেন 'গঙ্গারিডি'। এর রাজধানী ছিল 'গঙ্গেশ রিজিয়া' যার পরবর্তী নাম 'সপ্তগ্রাম' বা সাতগাঁ। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে এসে বিপাশা নদীতীরে অবস্থানকালে (৩২৭ খ্রীঃ পূঃ) আর্যাবর্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত দুটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্ব জানতে পারেন। তন্মধ্যে একটি হোল 'গঙ্গারিডি' বা রাঢ়দেশ। এর রাজধানী ছিল গঙ্গাবন্দর। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক ও প্লিনির তথ্য অনুসারে জানা যায় 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের অধিপতির ছিল ষাট হাজার পদাতিক ও দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। **Diodorus Siculus** এর মতে ঐ সময় ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে গঙ্গারিডিই ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী।

হিউয়েন সাঙ্, ইৎসিং, মেগাস্থিনিস প্রমুখ বৈদেশিক পর্যটকগণ বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলির সম্পর্কে সম্যক বর্ণনা দিয়েছেন। হিউয়েন সাঙ্ তাম্রলিপ্তিতে অবস্থান করে তাম্রলিপ্তি ও কর্মসুবর্ণের (শশাঙ্কের রাজধানী রাঙ্গামাটি) প্রশংসা করলেও গঙ্গারিডির রাজধানী 'সপ্তগ্রাম' বা সাতগাঁ বন্দরটির নামমাত্র উল্লেখ কেন করলেন না কে জানে! তবে কি তিনি সপ্তগ্রামকেই তাম্রলিপ্তি বলে চালিয়ে দিয়েছেন? তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্মসুবর্ণ সম্পর্কে অনেক কিছুই বললেন অথচ 'গঙ্গেশ রিজিয়া' বা সপ্তগ্রাম সম্পর্কে নীরব থাকলেন কেন? এ প্রশ্ন আজ বহুপ্রশ্নজড়িত।

সপ্তগ্রাম ঠিক কতদিন আগে সস্থানে অবস্থিত ছিল তা বলা নিতান্ত শক্ত ব্যাপার। তবে তার অবস্থান ছিলো বঙ্গোপসাগরের তীরে। দুহাজার বছরে সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে। সে হিসাবে সপ্তগ্রাম তাম্রলিপ্তির চেয়েও প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার এই পরাক্রান্ত বন্দর বা রাজধানীটির খবর পেয়েছিলেন (**Mccrindle's Ancient India, its invasion by Alexander the Great**)।

অতি প্রাচীন কাল থেকেই সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও প্রভৃতির সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক

সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠে। তবে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণদানে কালের সাক্ষী ইতিহাস নিতান্ত নীরব। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর জেলার ওরগাঁদা, সিলদা, অটজুড়ি, সাহারি, ভাঙাবাঁধ, পান্না, কুকড়াঘুপী, গিদনি, চিলকিগড়, বাঁকুড়া জেলার কালা লালবাজার, মনোহর, বন আসুরিয়া, শহরজোড়া, কাঁকড়াঝার, বাউরিডাঙ্গা, কাসিন্দা এবং বর্ধমান জেলার গোপালপুর, সাতঘেনী, সাগরভাঙ্গা, আড়া প্রভৃতি প্রায় বাইশটি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গ প্রায় নীরব।

পরবর্তীকালে মাধবাচার্যের চণ্ডী (১৫৭৯), দ্বাদশ শতকের শেষভাগে রচিত লক্ষ্মণসেনের সভাকবির কাব্য, মুকুন্দরামের 'অভয়ামঙ্গল' বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' ও সর্বোপরি কবি কৃষ্ণরামদাসের 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্যে সপ্তগ্রাম নামক প্রাচীনবন্দরটির অবলুপ্ত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা পাওয়া গেলেও এর অধিক পূর্বের ইতিহাস অজ্ঞাত। অর্থাৎ এক হিসেবে ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের সপ্তগ্রামের ঐতিহ্য আমাদের অনুমান করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা লক্ষণসেনের আমলে পাঠান সেনাপতি ইখতিয়ার-উদ্দীন-বক্তিয়ারখলজী বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম মুসলমান দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন এই সপ্তগ্রামে। এত জায়গা থাকতে সপ্তগ্রাম বন্দরটাই খলজী সাহেবের কেন পছন্দ হোল তার নানাপ্রকার কারণ আছে। তখন অবশ্য বঙ্গোপসাগর অনেক দূরে সরে গেছে। সপ্তগ্রাম তখন সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর, সমুদ্রবন্দর নয়। এটি একহিসেবে ভূখণ্ডের মধ্যভাগে। যাতায়াতে সুবিধা, সবচেয়ে বড় কথা স্বীয় শত্রু লক্ষ্মণসেনকে লক্ষ্য রেখে গোপনে তার সর্বনাশের জাল বিস্তারের জন্য এখানটি উপযুক্ত বলে খাঁ সাহেব অনেক আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলেন।

এরপর ইতিহাস বলে, বাদশাহ মুহম্মদ তুঘলক কর্তৃক দ্বিধা বিভক্ত বঙ্গদেশের একাংশের রাজধানী হোল সপ্তগ্রাম। সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের মধ্যমপুত্র রুকুনুদ্দিন শাহের রাজ্যের শেষের দিকে সপ্তগ্রাম মুসলমানগণ কর্তৃক পুরোপুরিভাবে বিজিত হয়। কিন্তু তা কবে? গঙ্গা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে একটি পাথরের দেবমন্দির ছিল—এটি ঠিক মন্দির নয়। জাফর খাঁর সমাধি। এখানে পূর্বে অনেক হিন্দু বৌদ্ধ মন্দিরও ছিল। সে সমস্ত পাথর ও ইঁট নিয়ে পরবর্তীকালে আদি সপ্তগ্রামে জি, টি, রোডের ধারে একটি বড় মসজিদ তৈরী হয়। এতে একটি প্রাচীন আরবী শিলালিপি বসানো হয়। তার পাঠোদ্ধার করে স্বর্গত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মন্তব্য করেন, '৬৯৮ হিজরায় (১২৯৮ খ্রীঃ) একটি মসজিদ নির্মিত হইয়াছিল এবং নির্মাতা বাকর খাঁ হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া মুসলমানদিগকে ধনরত্ন দান করিয়াছিলেন Journal of the Asiatic Society—1870) কিন্তু এই শিলালিপি এখন অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে রাজার নাম ছিল কিন্তু সেই স্থান ভাঙিয়া গিয়াছে। সুতরাং সপ্তগ্রাম রুকনুদ্দিন শাহের রাজ্যকালে বিজিত হইয়াছিল কি ফিরোজ শাহের রাজ্যকালে—তা বলা শক্ত।' সুতরাং সপ্তগ্রাম বা দক্ষিণবঙ্গের এই এলাকার প্রথম শাসনকর্তার নাম আজও অজ্ঞাত। এরপর ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্ সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন ও ইজুদ্দিন কর্তৃক পরাজিত হন।

এর পরবর্তীকালে সপ্তগ্রামে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক টাঁকশাল নির্মিত হয় ও বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন অধিকর্তা স্ব স্ব নামে মুদ্রা অঙ্কন করেন। বর্তমানকালে বিশেষ ঘটনা বা পর্বোপলক্ষে সরকার প্রচলিত ডাকটিকিট ব্যবস্থার ন্যায় মুদ্রাঙ্কন একটি প্রাচীন পদ্ধতি।

সম্রাট প্রথম মুহাম্মদশাহের আমলে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে জানা যায়, ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে রুকনুদ্দিন বরবকশাহ সপ্তগ্রামের শাসক ছিলেন। বিখ্যাত পর্য্যটক ইবন্ বতুতা বঙ্গদেশের এই প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সপ্তগ্রামের চতুষ্পার্শে মুসলমান আমলে অনেক সৌধ নির্মিত হয়। যেমন শেখ জামালউদ্দিন ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এর দুবছর পরে জামালউদ্দিনের সমাধি নির্মিত হয়। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় 'কদম রসুল'। বর্তমানে এসব পুরাবস্তু প্রায় অবলুপ্ত। তবে ধ্বংসস্তূপের নীচেই বোধ হয় এই সৌধগুলি অন্তিমনিদ্রায় শায়িত। যে কয়েকটি অবস্থিত আছে তন্মধ্যে পথিপার্শে ছাদহীন একটি ভগ্ন মসজিদ, সৈয়দ ফকরুদ্দিনের সমাধি ও পীরের দরগা—এগুলি সপ্তগ্রামের মুসলমান আধিপত্যের খণ্ডক্ষুদ্র প্রমাণ।

হুশেন শাহের বাংশধর মুহম্মদ শাহকে পরাজিত করে শেরশাহ ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ অধিকার করে সারা দেশকে কয়েকটি সরকারে বিভক্ত করেন ও প্রতি সরকারে একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত হয়। এমন একটি মূল ফৌজদারী কেন্দ্র হোলো সপ্তগ্রাম। ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম টাকশাল থেকে সপ্তগ্রামের পরবর্তী শাসক সামসুদ্দিন মহম্মদ শাহ্ গাজীর নামে মুদ্রা তৈরী হয়। কিছুদিন পর বিহারের শাসনকর্তা সোলেমান কররাণী বঙ্গদেশ জয় করলে সামসুদ্দিনের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হয়।

আকবরের শাসনকালে বাদশাহী সড়ক সপ্তগ্রাম থেকে জাহানাবাদের মান্দারণ পর্যন্ত টেনে আনা হয়। এ সময় আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে তখন দক্ষিণবঙ্গে সরকার সুলেমানাবাদ, সরকার মান্দারণ ও সরকার সাঁতগাঁও নামে তিনটি জেলার অস্তিত্ব ছিল। সরকার সাতগাঁও এর পঞ্চাশটি মহালের উপসত্ব ছিল চার লক্ষাধিক টাকা। পরে সাতগাঁও-এর উপকণ্ঠে 'হাভেলী' মহল গঠিত হয়। এটিই বোধ হয় বর্তমানের হালিশহর।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের তৃতীয় দশকে যখন পর্তুগীজদের আবির্ভাব ঘটেছে তখন চট্টগ্রাম সুবর্ণ-গ্রামের চেয়ে সপ্তগ্রাম বন্দরের খ্যাতি কোন অংশে কম নয়। তবে এটি তখন 'A fair citie for a citie of Mores (Musalmans) and very plentiful and Sometimes Subject to patnas' অর্থাৎ কখনও কখনও বিহারের অধীন।

বঙ্গদেশে বাণিজ্যের অধিকার লাভের আশায় পর্তুগীজ জল দস্যুরা সপ্তগ্রামের সুলতান ৩য় মুহাম্মদের সঙ্গে দেখা করতে এল অজস্র উপহার নিয়ে। কিন্তু সুলতান উল্টে রেগে গেলেন? তাদের দস্যুবৃত্তি ও অত্যাচারের সংবাদ আগেই পেয়েছিলেন। তাই এবার তাদের সমস্ত জাহাজ ও মাল বাজেয়াপ্ত করলেন। তখন সরস্বতী নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলতো। বড় বড় জাহাজ হুগলী দিয়ে এখানে আসতো। ইতিমধ্যে শেরশাহের বঙ্গদেশ আক্রমণকালে অবশ্য পর্তুগীজদের কাছ থেকে সুলতান যথেষ্ট সাহায্যও পেয়েছিলেন।

ষোড়শ শতকের মধ্যভাগের কথা। এ সময় থেকে আর বড় বড় জাহাজ সরস্বতী নদী দিয়ে আসতে পারলো না। সুলতানও দেহরক্ষা করেছেন। পর্তুগীজদের সঙ্গে গোলও মিটে গেছে। কিন্তু

ব্যবসাবাণিজ্যের ধারা সপ্তগ্রামে তখনও জোর কদমেই চলেছে, যদিও পলিগ্রস্ত বন্দরে জাহাজ যাতায়াতের অসুবিধার কথা জানা যায় 'দ্য এশিয়া' থেকে, 'Satgaw is a great and noble citie though less frequented than Chittagong on account of the post being not so Convinient for the entrance and departure of ships'

এরপর থেকে দেখা যাচ্ছে, ক্রমান্বয়ে পর্তুগীজ বোম্বেটেদের অত্যাচারের ফলে যখন নদী বা সমুদ্রপথ বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠলো, ছোট ছোট জাহাজ আর তখন সপ্তগ্রামে আসতে পারলো না। বড় জাহাজ তো আর এলোই না। সম্রাট শাহজাহান পর্তুগীজদের আক্রমণ ও অত্যাচার থেকে সদর দপ্তর সুরক্ষার জন্য সপ্তগ্রাম থেকে সরকারী দপ্তর হুগলীতে সরানোর নির্দেশ দিলেন ও বাংলার তৎকালিক নবাব নাসিম খাঁকে পর্তুগীজ দমনের আদেশ দিলেন। হুগলী থেকে পর্তুগীজরা অনতি বিলম্বেই বিতাড়িত হয়। এরপর থেকেই সপ্তগ্রামের জৌলুষ কমতির দিকে। ধনাঢ্য বণিকেরা উঠে এলেন নতুন বন্দর হুগলীতে। অবশ্য এরপর ক্ষীণভাবে স্থলপথের সঙ্গে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য চলেছিলো। কিন্তু মুর্শীদকুলীখাঁর সময়ে সপ্তগ্রাম বা সাঁতগা নামটাই বদলে গেল। আজ কোথায় সেই কোলাহল মুখর অবলুপ্ত বন্দর সপ্তগ্রাম। এখানেই একদিন বিদেশী স্বদেশী ধনাঢ্য বণিকদের আনাগোনা ছিল। ঘাটে বাঁধা থাকতে ছোট বড় অজস্র বাণিজ্যপোত। অসংখ্য রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাক্ষী সেই সপ্তগ্রাম কবে কিভাবে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে, কেউ তার হিসেব রাখে না। আজকের সপ্তগ্রামের ঝোপঝাড়, খালবিল, বন-বাদাড়, পরিত্যক্ত ঢিপিগুলোর মধ্যে ও মৃতপ্রায় নদী সরস্বতীর বালিয়াড়ির গহ্বরে সপ্তগ্রামের ঐতিহ্যের জীর্ণতম অংশকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন

শৈলেনকুমার দত্ত

বাংলাদেশে বহু বিবাহ এবং গৌরীদান প্রথার অনিবার্য ফল হিসেবে বৃদ্ধের মৃত্যুর পর তরুণী ভার্যার দুর্গতি বেড়েছিল চরম। তারই একটা বীভৎস সমাধান হিসেবে শেষপর্যন্ত শুরু হয়েছিল সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালিকা পত্নীদের সহমরণে চাপিয়ে তাদের জীবনের ছেদ এনে সে-যুগের একটি কুসংস্কার রাজত্ব করে এসেছে বহু বছর ধরে। সে-যুগের মানুষের এই সংস্কার এমনই বিকৃত ছিল যে, তারা কখনও এইসব অবলাদের কথা একবারও চিন্তা করেনি। সে যুগের মানুষের মনোভাবটি আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে গেলে—'পুরুষ ষাট বৎসরের বুড়ো হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শব্দটিও করে না। কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন, ভ্রাতার সংসারে আধাদাসী হইয়া কাল যাপন করুন……।'

কিন্তু অত্যাচার অনাচার যখন দানা বেঁধে স্ফটিকে পরিণত হয়, তখনই সাধারণত তার শেষপর্ব ঘনিয়ে আসে। যুগগুরু রামমোহনের হাতে তাই তার সমাপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ দিনের শিকড় বসা এই প্রথা বিলুপ্ত করতে রামমোহন রায়কে যতই বেগ পেতে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত উইলিয়ম বেন্টিকের সাহচর্যে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি সম্ভব হয়। সেই ঐতিহাসিক দিনটি হল ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

সতীদাহ বন্ধ হতে সমাজে নাবালিকা কিশোরী বিধবাদের অত্যাচার বন্ধ হয় ঠিকই এবং বাংলাদেশে একটি বীভৎস অমানুষিক সামাজিক বিধির ছেদ পড়ে, একথাও সত্য ; কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়। দারিদ্র্য বা কুলরক্ষার অজুহাতে যেসব কিশোরীদের যৌবন উৎসর্গ করতে হয়েছিল বৃদ্ধ স্বামীর কাছে—তাদের জীবন রক্ষা পেলেও, জীবন সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়নি। তাই কার্যকারণ সম্বন্ধেই তাদের ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পুনর্বার বিবাহ প্রদানের প্রশ্নটি প্রগতিশীল সমাজে প্রকটিত হয়ে উঠতে থাকে।

অবশ্য বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন একটি কুপ্রথা বিলুপ্তির অনিবার্য ফল হিসেবে প্রকটিত হলেও, আন্দোলনটি কিন্তু অতি প্রাচীন। বিদ্যাসাগরের সক্ষম প্রচেষ্টা এবং উদ্যোগে এটি ফলপ্রসূ হলেও এ আন্দোলন শুরু হয় তাঁর বহু আগে। বিদ্যাসাগরের দেড়শত বৎসর আগে ঢাকার রাজা রাজবল্লভ বিধবা বিবাহ চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য তিনি সফল হতে পারেন নি। দেওয়ান কার্তিক, চন্দ্র রায় সঙ্কলিত 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে' জানা যায় যে, বিদ্যাসাগর পরাশর সংহিতার যে বচন নির্ভর করে এই আন্দোলন শুরু করেন, নবদ্বীপের রাজা শ্রীশচীন্দ্র বহু পূর্বেই সেই বচন নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করেন। সে পর্ব ছাড়াও সতীদাহ প্রথা বিলুপ্তির পরও যে নতুন পর্যায়ের আন্দোলন হয়, তারও সূত্রপাত বিদ্যাসাগর করেননি। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন—'১৮৪২ সাল হইতে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ

ডিরোজিও শিষ্যগণ যে বেঙ্গল স্পেক্টেটার নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন তাহাতে তাঁহারা বিধবা বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক মাস ধরিয়া ঐ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে' ইত্যাদি যে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্বপ্রথমে উক্ত পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধৃত করা হয়।'

সে যাক, সূচনা যেখানেই হোক, সূত্রপাত যাঁর হাতেই হোক না কেন, বিধবা বিবাহের সত্যিকারের উদ্গাতা বিদ্যাসাগরই। তাঁরই হাতে এ আন্দোলনের সার্থক পরিণতি। এটি শুধু বাংলা দেশের জাতীয় ইতিহাসেই নয়, বিদ্যাসাগরের জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অনুজ শম্ভূচন্দ্রকে লিখিত একটি পত্রে (৩১ শ্রাবণ ১২৭৭) বিদ্যাসাগর নিজেও স্বীকার করেছেন—'বিধবা বিবাহ আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম।'

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ সম্পর্কে তাঁর জীবনীকার শম্ভূচন্দ্র লিখেছেন—'এক দিবস, কোন আত্মীয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া দুহিতা বিধবা হইলে, তদ্দর্শনে জননীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অগ্রজ জননীকে সান্ত্বনা করিলে পর, জননী ও পিতৃদেব বলিলেন যে, বিধবা বালিকার পুনর্বার বিবাহ বিধি কি ধর্মশাস্ত্রের কোনও স্থলে কিছু লেখা নাই? শাস্ত্রকারেরা কি এতই নির্দয় ছিলেন? জনক জননীর মুখ নিঃসৃত এই বাক্য তাঁহার হৃদয়ে প্রোথিত হইয়া রহিল।'

এরপর থেকেই বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। বহু পুঁথির পাতায় মনোনিবেশ করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি পরাশরের রচনাটি উদ্ধার করেন। এই বচনটিই হয় তাঁর এ আন্দোলনের একমাত্র শাস্ত্রীয় হাতিয়ার—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যুমুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয় তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।

এই অমোঘ অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৪ সালের ২৮শে জানুয়ারী 'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা' পুস্তিকা প্রচার করেন। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই বাংলাদেশে পক্ষ বিপক্ষের দুটি শিবির নির্মিত হয়। বাংলা দেশের সে সময়ের অবস্থাটি রাজনারায়ণ বসুর ভাষায় বলতে গেলে—'শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'বিধবা বিবাহ উচিত কিনা' একটি ক্ষুদ্র চটী প্রকাশ করাতে এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। হিন্দু সমাজ রূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ স্থির ছিল, এই চটী বাহির হওয়াতে মহাবাত্যান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠে ও ভয়ানক তরঙ্গ সকল উঠাইতে থাকে।'

এই আন্দোলনে বিদ্যাসাগরের পক্ষে এলেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। 'সংবাদ প্রভাকর' পক্ষ সমর্থন করলেও ঘোষণা করলেন—'বিধবা মাত্রেই বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। তিনি একমাত্র অক্ষত-যোনিদিগের বিবাহের পক্ষপাতী।' ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিবাহের পূর্বে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি এ বিবাহ সম্পর্কে সংবাদ প্রভাকরের (১লা মাঘ ১২৬৩) সম্পাদকীয়

প্রবন্ধে লিখলেন—'অগ্রে সোপান নির্মাণ না করিয়াই উপরে ঘর করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঘোড়ার সঙ্গতি না করিয়াই চাবুক কিনিতেছেন। খাল খননের পূর্বেই সেতু বন্ধনের আড়ম্বর হইতেছে। এখনো ভাতের হাঁড়িতে জল চড়েনি, কিন্তু ঠাঁই করিয়া পাতুনির আঁটুনি বিলক্ষণ হইতেছে। ফলে প্রণিধান করুন স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ ইহার কোন্ বিষয়টি অগ্রে করা বিধেয় হইতেছে? আমার বোধে প্রথম ব্যাপারেই উপযুক্তরূপ যত্ন করা উচিত।' রাজা রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল তর্কলঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিরাও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন।

কিন্তু উৎসাহিত করারও লোক মিলল। এলেন পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, তারানাথ বাচস্পতি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রমুখ পণ্ডিতেরা। শ্রীরামপুরের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' আরও উৎসাহিত করলেন—'হিন্দুগণ বিধবার বিবাহ নিমিত্ত কেবল কথায় ধুমধাম না করিয়া যদ্যপী কার্যে দেখাইতে মনোযোগী হয়েন তবে অতি উত্তম হয়।'

ধনকুবের মতিলাল শীল, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিলেন—যিনি বিধবা বিবাহ করবেন তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হবে। দশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘোষণা করা হল। প্রভাবশালী গ্রাণ্টসাহেব বললেন—যখন সতীদাহ নিবারণ করা হইয়াছে তখন বিধবা বিবাহ হইতে দেওয়া উচিত। চিরকাল বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা একেবারে পুড়িয়া মরা ভাল।

গুপ্তকবি মতামত প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ রসিকতাও করতে শুরু করলেন—

শুনিয়া বিয়ের নাম 'কোনে' সেজে বুড়ি।
কেমনে বলিবে মুখে 'থুড়ি থুড়ি থুড়ি?'
পোড়া মুখ পোড়াইয়া কোন পোড়ামুখী।
'দুঃখী' 'সুখী' মেয়ে কেলে কেঁচে হবে খুকী?

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিদ্যাসাগর ক্রমশই শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন। বিপক্ষ শিবির থেকে প্রচারিত পুস্তিকার জবাব দিলেন তাঁর বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কিনা পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ডে। বিপক্ষ শিবির থেকে তার জবাব মিলল না। বিদ্যাসাগর প্রমুখ আরও উৎসাহিত বোধ করে ভারতের বড়লাটের কাছে পেশ করলেন এক আর্জি। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গ্রাণ্ট সাহেবের সুপারিশে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার কলভিনের সমর্থনে পাশ হল বিধবা বিবাহ আইন। গুপ্তকবি লিখলেন—

গ্রাণ্ট করি গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কাল বিল কাল বিল করিলেন পাশ॥

প্রতিপক্ষের বাধা তবুও কমল না। আইন পাশ হলেও তার প্রয়োগ করা সম্ভব হল না। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে কলকাতার সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে এ বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। বর হলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কনে অখ্যাত হলেও বর অখ্যাত সাধারণ নন। দীনবন্ধু মিত্রের ভাষায় 'সাহিত্য সবিতা শ্রীশ' সেই বিদ্যারত্ন মহাশয় ছিলেন বিদ্যাসাগরের সুহৃৎ। মনীষী রাজনারায়ণ বসু তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—'তিনি প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েন।'

এ হেন বর, তারপর এ হেন বিবাহ !

রীতিমত বর সেজে বিয়ে করতে এলেন শ্রীশচন্দ্র। বরানুগমন করলেন রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ বাঙালী মনীষীরা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন শ্রীশচন্দ্রও বিপত্নীক ছিলেন।

বাংলা দেশে প্রথম বিধবা বিবাহ নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হল। দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ হল ঠিক পরের দিন। রাজনারায়ণ বসু এ সম্পর্কে লিখেছেন—'দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ করেন পানিহাটির মধুসূদন ঘোষ। তৃতীয় বিধবা বিবাহ ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ আমার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণ ও সহোদর মদনমোহন বসু করেন।'

কিন্তু প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলেও বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তা কোনদিনই হয় নি। বিধবাবিবাহ বিধিসম্মত এবং অনুষ্ঠিত হবার পাঁচ বছর পরেও সংবাদ প্রভাকরে যে সব কবিতা প্রকাশিত হয় তাতে ব্যঙ্গের প্রকট মূর্তিটিই প্রকাশিত দেখা যায়। একজন কেরানীর বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি কবিতা তার সাক্ষ্য—

শ্রুত মাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার খালিরুম হইল ফিলাপ ॥
ভাল ধর্ম, সুখরাজ্য, কার্য বটে পাকা।
কেরানীর কর্ম নয়, রুম খালি রাখা ॥
ধামধুম টামধুম অন্ধকারে আলো।
ভুম কোরে, উম পেয়ে, ঘুম হবে ভালো ॥
জয় জয় কালধর্ম, আর কারে ভয়।
কাঁকু মন্ত্রে, মাকুদেবী হোলেন সদয় ॥

শুধু কি তাই, বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বহু টাকা ঋণ করতে হয়। এমন কি বীরসিংহ গ্রামে এজন্যে তিনি শেষ জীবনে একবার গ্রামবাসীর হাতে নিগৃহীতও হন। তবু বিদ্যাসাগর যে এ প্রথাকে মনেপ্রাণে কতটা শ্রদ্ধা করতেন, তা তাঁর শেষ জীবনের একটি পত্র থেকে জানা যায়। পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন তাঁর সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন; তখনও তিনি নারায়ণের বিধবাবিবাহ হয়েছে শুনে অনুজ শম্ভুচন্দ্রকে পত্র (৩১শে শ্রাবণ, ১২৭৭) লেখেন—'নারায়ণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেক, তাহার পথ করিয়াছে।'

এ থেকে বোঝা যায় এ আন্দোলনকে কার্যকরী করতে তাঁর আন্তরিকতা কতটা গভীর ছিল। অবশ্য সহায়ের মধ্যে ছিল সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কয়েক ব্যক্তির সহযোগিতা এবং সাহচর্য।

কিন্তু সমাজে সহানুভূতি কম ছিল বলে বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরই প্রায় এ আন্দোলন বন্ধ হয়। বিধবা বিবাহের সমর্থক হিসেবে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, আশুতোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি মনীষীকে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল এ প্রথা সমর্থন করলেও তাদের সমর্থন উদার ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া

কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।' (বঙ্কিমজীবনী, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

তবে তাঁর সহানুভূতি যে ছিল তার প্রমাণ আছে অন্য উক্তিতে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দ সম্পর্কে তিনি একস্থানে বলেছেন—'তার অপরাধ থাকুক বা না থাকুক, আমি কুন্দকে মারিতে পারিব না। সে বালবিধবার আমি সবে বিবাহ দিয়াছি; সূর্যমুখীর স্থানে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে চিরসুখী করিয়া সমাজকে দেখাইব বিধবাবিবাহে অধর্ম নাই, অশান্তি নাই।' (ঐ)

দ্বিজেন্দ্রলালের বঙ্গনারী নাটকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেও এ প্রসঙ্গে তাঁর সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—'যদি কুমারীরা ব্রহ্মচর্য করতে পারে না এই তোমার মত হয়ত বালবিধবারাও পারে না। তবে বিধবা বিবাহ প্রচলন কর।'

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যে এ প্রশ্নটি আস্তে আস্তে আবার বিচার বিতর্কের বিষয় হতে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রর কুন্দনন্দিনী, রোহিনী, রবীন্দ্রনাথের বিনোদিনী, শরৎচন্দ্রের মাধবী, সাবিত্রী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি নারী চরিত্রগুলি এ প্রশ্নটিই তুলে ধরেছে সমাজ এবং সাহিত্যের সামনে।

কিন্তু সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকটি পরিবার ভিন্ন এ বিবাহ সাধারণ জন সমাজে খুব বেশি অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এ থেকেই বোঝা যায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে এ আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সার্থকতা লাভ করলেও বাংলা দেশের মানুষ প্রাণ দিয়ে এটি সমর্থন করে নি। পরবর্তীকালে যে কয়টি বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রথমা পত্নী জ্ঞানদাসুন্দরীর মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা পত্নী মহারাণী বসন্তকুমারীর বিবাহ উল্লেখনীয়।

সহানুভূতি এবং সমর্থন থাকা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের পরিবারে বিধবাবিবাহ অনুষ্ঠিত হয় বহু পরে। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নিজের বিবাহকে তাঁদের পরিবারের প্রথম বিধবাবিবাহ বলে উল্লেখ করেছেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন—'বাবা আমায় কলকাতায় ডেকে পাঠিয়ে জ্ঞাতিভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে আমার বিবাহের প্রস্তাব করলেন। বিবাহ হল ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে—আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।'

কালের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে। আজকের বাঙালী সমাজে বিবাহ সম্পর্কে কুসংস্কার জনিত বিধিনিষেধ যে আজ অনেক দূরীভূত হয়েছে তার মূলে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের অনেক অবদান আছে। একথা স্মরণ করলে আজও এ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে শ্রদ্ধা জানাতে হয়।•

বাঙলার লৌকিক নৃত্যধারা

অজিতকুমার মিত্র

বাঙলার লৌকিক চিত্রাংকণ রীতি মৌখিক সাহিত্য আর নানাপ্রকার সংস্কারের মতই লৌকিক নৃত্য ধারার বিবর্তনের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করলে ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। সমবায়িক সংগীতের গীতরীতি গাথা গীতিকার রচনা, যৌথ লোক শিল্প ও লোক চিত্রের মতই লৌকিক নৃত্যধারা একান্তভাবেই গোষ্ঠী নির্ভর। এই নাচ সর্বাংশে অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক। লোকদেবতার পূজাকে কেন্দ্র করে প্রায়শ ক্ষেত্রে এই নৃত্যরীতি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। নাচই অনেক পূজার বিশেষ অংগ। গান, নাচ বাদ দিয়ে লোকদেবতার অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না।

অংকুরের ফুটে ওঠা আর প্রজননের কেলিক্রীড়ার মধ্যে যে আঘাত তার ভিতর আদিম ছন্দের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। প্রকাশের উন্মাদনায়, ব্যাকুলতায় নৃত্যরীতি বিকাশের সূত্র খুঁজে পায়। অন্বেষণের বিক্ষিপ্ত পদপাতের মধ্যে বাঙালীর নৃত্যধারা ছন্দোবদ্ধ হয়। সম্ভাবনার মধ্যে যে আলোড়ন তাই বাঙালীর নৃত্যভাবনা। ধর্মজিজ্ঞাসার আকুলি ব্যাকুলিতে নৃত্যের স্পন্দন সৃষ্টি হয়। শস্য আর সন্তানের কামনা নৃত্যের ছন্দে ছন্দে দোলায়িত হয়ে ওঠে। বাঙালীর আদিম জীবনের গহনে এর সূত্র সন্ধান করতে হবে। লৌকিক নৃত্যে তাই জীবনের যৌনানুভূতি—দৈহিক ক্ষুধার লিপ্সা প্রজননের অভীপ্সা হয়ে দেখা দেয়। কেন না নাচের প্রতিটি মুদ্রায় দেহের আকর্ষণ প্রতি পদপাতে যেন কার জন্য কার টান আর এই নাচে কারু-কৃতির স্থূলতা সম্ভোগের বাসনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাই নাচের ছন্দে বাঙালী জীবন বিকাশ লাভ করে।

অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক বলে এই নৃত্যরীতি বিবর্তনহীন। প্রথম ক্ষেত্রে গোষ্ঠী পরম্পরাগত বলে কখনও বংশানুক্রমিক বা কখনও গুরু মুখাপেক্ষী তাই লৌকিক নৃত্যরীতির রূপ কল্পনা গণ্ডী নির্ভর। এই নাচের মধ্যে বাজনা নাচ আর গান পরস্পর সাযুজ্যবদ্ধ। নাচ গানের মধ্যে বাঙলার ঋতুর মর্মার্থ উপলব্ধি করা যায়। অনুষ্ঠান কেন্দ্রিক নাচগুলি নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বলে প্রত্যেক নাচের সংগে প্রকৃতির সংযোগ রাখতে এবং প্রকৃতির ধারা অনুযায়ী এই নাচের গতিভংগী ছন্দায়িত। বর্ষার নাচে বৃষ্টির রূপায়ণ জলধারার সুর বজায় রাখবার চেষ্টা করে। শরতের নাচে সাদা কাশফুলের আর স্তিমিত তরংগ নদীর স্বচ্ছতার সুর জাগে! শীতের নাচের মধ্যে থরথরানি স্পষ্ট অনুভূত হয়। বসন্তের নাচে ফুলদোল অনুভব করা যায়। গ্রীষ্মের নাচে রুদ্রতার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

চৈত্র বৈশাখ হতে গাজনের ভক্ত্যারা 'বেত' হাতে নৃত্য করে। মুখে তাদের ব্যোম ব্যোম ধ্বনি। নৃত্যের তালে তালে ঘন ঘন বেত সঞ্চালনের ছন্দে প্রকৃতির রুক্ষতা প্রকাশ পায়। আগুনের মাঝে নৃত্য করতে হয় ভক্ত্যাদের। নাচতে নাচতে পায়ে পায়ে আগুন নিভিয়ে ফেলার রীতি আছে। না হলে দেবতার রোষ গ্রামের অমংগল ডেকে আনবে। দুটী গরুর গাড়ী মুখোমুখী বেঁধে চার চাকার গাড়ী তৈরী করে সেই গাড়ীতে চার কাঠের ফ্রেম বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ঐ ফ্রেমের মাথার কাঠে পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় নীচু মুখে দুলতে থাকে ভক্ত্যা। হাতে বেলপাতা নিয়ে দুলাতে

ডুলাতে জলন্ত আগুন পেরিয়ে শিব শিলার মাথায় পুষ্প দিয়ে আসে বার বার। দেবপূজার কৃচ্ছতা থমথম করে চৈত্র শেষের আকাশে। এই দোলেরও ছন্দ আছে। গ্রামের মানুষ অনুষ্ঠানটিকে একরকমের নাচ বলে। বর্ষার আগমনের সাথে সাথে মনসার ঘট-বারি মাথায় নিয়ে ভর-নৃত্য করতে করতে দেয়াশী গ্রাম পরিক্রমা শেষে পূজা বেদীতে দেবীর ঘট বা দেবী বিগ্রহ স্থাপন করে। ভর-নৃত্যে নাকি দেবত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয় ঐ দেয়াশীটীর মধ্যে। বর্ষার শেষে রাধা অষ্টমীর দিনে সাত ভাইদের পূজায় ভর-নৃত্যের মধ্যে বাঘ মহিষ আর রাখাল নাচ অপূর্ব লৌকিক নৃত্যধারা সঞ্জীবিত রাখে। মনসার ভর-নাচে বর্ষার বিহ্বলতা প্রকাশ পায় আর বর্ষার শেষে ফসল রক্ষার আকুলতা দেখা যায় বাঘ মহিষ আর রাখাল নৃত্যে। লোক-দেবতারা উপোসী ভক্ত্যাদের মধ্যে ভর করে। কেউ বাঘের প্রেতাত্মায় উদ্দীপিত হয়। কেউ মৃত রাখালের ভূতে নেচে ওঠে। মহিষ ভূতের প্রেতাত্মা ভর করে অন্যদের। বাঘ খেতে চায় মহিষদের। রাখাল রক্ষা করতে চেষ্টা করে। আর মহিষরা বাঁচতে চায়। কৃষি নির্ভর আদিম জীবন হতে এই নৃত্যধারা বিকশিত। এই নাচের তালে তালে গান হয়।

সাত ভাইরা বাণাসিং
সতের শয়তান হয়ে
সাত বেগুণ জালির বন
সাতভাই খেলে জিয়ান সাত।
ছোট মুট জিয়ান কাঠি ভুমে লুটে যায়।
তাহারই তলে সাতভাই ঠাকুর খেলে
সাতভাই খেলে জিয়ান সাত॥

বলি দেওয়া ভেড়া ছাগলের রক্ত খেয়ে এই নাচ শেষ হয়। বর্ষার শেষে নৌকা বাইচের নাচেও অপূর্ব ছন্দ জাগায়। ভরা ভাদ্রে আদিবাসীদের 'ছাতা' পরবের যৌথ নৃত্যে কাশফুলের মেলায় ছন্দ জাগে। হাত ধরাধরি করে নাচে মেয়েরা পায়ের তালে তালে শরীরের অংগ সঞ্চালনে কচি শস্যের নাচন জাগে কুমারী মেয়েদের যৌবনের তটে তটে। বাউলের নাচে উদাসী মনের হৃদয়পটে যেন অধর আকাশের নব রূপায়ণ। কোথায় পাবো তারে—ছন্দ এ নাচে। মংগলগান গায়কের গানের সংগে চামর হাতে নাচ অপূর্ব ব্যঞ্জনার সঞ্চার করে। বাঙলাদেশের অনেক জেলায় যাযাবর জাতের কয়েক রকমের পূজারী নানা রূপের আভাষ এক ধারায় মাতৃমূর্তি নিয়ে দুয়ারেদুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়ায়। তাদের গানের সাথে নাচের ছন্দ আছে। শরতের আকাশের মতই তা মধুর। মেয়েদের শস্য রোপন উৎসবে নাচ ও পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শীতের আগমনের সূচনায় হরিনাম সংকীর্তনের আসরে, চব্বিশপ্রহর কীর্তনে, অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে গৌরনিতাই নাচ বাঙালীজীবনে নাচের উন্মাদনা জাগায়। খোলের তালে তালে রাধাকৃষ্ণ নাচ অপূর্ব ভক্তিরসের সঞ্চার করে। হরিনাম সংকীর্তনে দুটী কিশোরকে রাধাকৃষ্ণ সাজিয়ে হরিনামের দলের মাঝে নাচিয়ে বেড়ায়।

সেদিন যেমন গোপিনীর ঘরে
খেয়েছিলে হরি ননী চুরি করে!
তেমনি করে ও কালাচাঁদ
আর কি ননী খাবে না॥

একতাল খোলের বাজনা। এক তালেরই নাচ। নাচন জাগায় ধর্মপ্রাণ বাঙালীর মনে। শীতের প্রথমে পাল্কী বাহকের নাচ লৌকিক নৃত্যধারার অপূর্ব সংযোজন। প্রাচীন বাঙলায় ডাকাতের কালিপূজায় বলিদানের নৃত্য থেকে এক রকমের নৃত্য ধারার সৃষ্টি হয়। তার থেকে বলিদানের পর দেবী প্রদক্ষিণের নাচ এখনও অনেক স্থানে প্রচলিত আছে। শীতের শেষে বাঙালী আদিবাসীদের মধ্যে পূজা অনুষ্ঠানে সমবায় নৃত্যরীতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাদনা পরবে দিনের পর দিন যৌথ আদিবাসী নৃত্য মানুষকে পাগল করে তোলে। আদিবাসীদের 'এক্কেণ' দিয়ে নববর্ষের নাচে তাদের উদ্দাম করে তোলে। বসন্তের ফুল্ল প্রভাতে বাঙালীদের বিয়ের নাচ বিশেষ বৈশিষ্ট্যময়। দু পংক্তি গানের সংগে বাউরীদের বিয়ের নাচ মানুষকে মাতিয়ে তোলে।

সাঁইতের সরানে রাঙা ধুলোরে
সাঁইতের সরানে রাঙাধুলো।
যৈবুনবতীর পানে তাকায়
ওপাড়ার বাবুগুলোরে
ওপাড়ার বাবুগুলো ॥

বিবাহ আসরে রাইবেশে নাচের রেওয়াজ আজও লুপ্ত হয়ে যায় নি। এই নৃত্য ধারাকে বাঙলার জমিদাররা এককালে লালন করে এসেছে।

প্রতি পূজায় নানা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাচের রীতি বাঙালীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পূজার ঢাকীর ঢাক সমেত নৃত্য, মৃদংগ বাদকের বাজনা বাজাতে বাজাতে নৃত্য, খোল বাদকের বোলের তালে তালে নৃত্য অপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করে। দেবী বিসর্জনের নাচ হয় প্রত্যেক গ্রামে। পুরুলিয়ার ছৌ-নাচ আজ পৃথিবী বিখ্যাত। পুতুল নাচ নাচাতে নাচাতে এক রকমের নৃত্য করতে হয় সূত্রধরকে। পূজা অনুষ্ঠানে আসর রাখবার জন্য ঝুমুর নৃত্য গানের তালে তালে মেয়েদের মধ্যে অপূর্ব নৃত্য ভংগীমার সৃষ্টি করতো। ভাদু গানে কুমারী নৃত্য একক নাচের অপূর্ব নিদর্শন। বোলান গানে মেয়ে বেশী পুরুষের গান গাইতে গাইতে নৃত্য লৌকিক নৃত্য ধারাকে বেগবান রাখে। গুলঞ্চ ফুলের মালার সজ্জায় সজ্জিত পুরুষদের পোষাকে অপূর্ব চাঞ্চল্য জাগায়। এমন কি ছাদ পিটুনিদের নৃত্যের তালে তালে নৃত্যের ছন্দ আনে একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাঙলাদেশে একরকমের যাযাবর জাত কোন্ প্রাচীন কাল হতে জীবিকার সন্ধানে গ্রামে গ্রামে ঢুকে পড়ে। পুরুষদের পাখী মারা ব্যবসা। যুবতী মেয়েরা গ্রামের মধ্যে নাচে গানে উন্মাদনা জাগায়। লাস্যময়ী এই রমণীরা অনেক সময় যাদু দেখাবার জন্য গৃহস্থের দুয়ারে এসে উপস্থিত হয়। গানে গানে মাতিয়ে তোলে গ্রামীণ জনজীবনকে। বাংলাভাষী যাযাবর বাস্তুচ্যুত এই জনগোষ্ঠী জনজীবনে হাসি আনন্দের খোরাক জোগায়।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি অঞ্চলে গলিত শব নিয়ে এক রকমের বীভৎস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। শকুনের ডানা ঝাপটানোর রীতি সে নাচে আদিমতার নকারজনক পরিবেশ। এই নাচের সংগে গানও গাওয়া হয়। কখনও কখনও একে কালকে পাতার নাচ বলা হয়।

রাঢ় বাঙলার বহু গ্রামে জিতাষষ্ঠীর অনুষ্ঠান হয় অত্যন্ত আড়ম্বরের সংগে। এই ষষ্ঠী পূজার

অনুষ্ঠানে ছোলা ভিজিয়ে রেখে অংকুরের কামনায় মহুয়া পাতা হাতে মেয়েরা ষষ্ঠীকথা শোনে। কথা শুনতে শুনতে মহুয়া পাতা সমেত হাতটী কখনও মাটিতে রাখতে হয় কখনও উপরে তুলতে হয়। তাই হস্ত সঞ্চালনেরও তাল আছে। এই অনুষ্ঠানে জংগলে ফুল তুলতে যাওয়ার সময় কুমারী মেয়েদের হাত ধরাধরি করে যাওয়া ও রীতি বদ্ধ চলার গতি লৌকিক নৃত্যর রূপায়ণ ছাড়া আর কিছু না। বহু ব্রত পালনে মেয়েদের এমনি নাচ আছে। বিভিন্ন ব্রতে বিভিন্ন নাচ। এমন কি শিশুদের খেলায়ও নাচ আছে। স্বাভাবিক নিয়মে এই নাচে ছেলেরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। কাউকে শিক্ষা দিতে হয় না।

বৃষ্টির প্রার্থনায় বাঙালী জীবনে লৌকিক নৃত্যধারা বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল তা ভাবতে অবাক লাগে। বীরভূম জেলায় মতে নাচ বলে একরকম নাচ প্রচলিত আছে। এই নাচ মূলতঃ বাঙালী জীবনে বৃষ্টির প্রার্থনা। বৃষ্টির অভাবে ব্যাপক শস্যহানির আশংকা দেখা দিলে অন্ত্যজ জাতির কুমারী মেয়েরা নিশুতি রাতে উলংগ অবস্থায় দল বেঁধে গ্রাম পরিক্রমা করে।

এই গ্রাম পরিক্রমারও এক রকম ছন্দ আছে। যাদু ইন্দ্রজালের উপর মানুষের আদিম বিশ্বাস এই অনুষ্ঠানে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লা ম্যাঘ দে পানি দের কাতর অনুনয় এই অন্ত্যজ কুমারীদের নাচে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই শোভাযাত্রার সম্মুখে থাকে একজন বর্ষীয়সী বৃদ্ধা উলংগ মহিলা। ঝাঁটা আর গোবর গোলা জলের হাঁড়ি হাতে ঐ বৃদ্ধা পথ চলে। পথে অকস্মাৎ কোন পুরুষের দেখা পেলে অকস্মাৎ গালাগালি দেবার রীতি আছে। ঐ গোবর গোলা জলও পুরুষের মাথায় ঢেলে দেওয়া হয়। এই নাচের অনুষ্ঠান করলে নাকি বৃষ্টি হবেই হবে। কৃষি কেন্দ্রিক বাঙালী জীবনে ইন্দ্রজাল চিন্তা ও যাদু বিশ্বাসের প্রতি মোহ এইসব নাচে এখনও বেঁচে আছে। গ্রাম বাঙলায় প্রচলিত মাদার নাচও নাকি বৃষ্টির প্রার্থনা। চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে বৈশাখ মাসের পনেরোর মধ্যে যে রবিবার পড়বে, সেই রবিবারের রাত্রে জলন্ত কুল কাঠের অঙ্গারের উপর নৃত্য করতে করতে ঐ আগুন নিভিয়ে ফেলার পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মুসলমান ফকিররাই এই নাচের ধারা বাঁচিয়ে রেখেছে। কোথাও একটি বাঁশ ঝাড়ে যদি কোন বাঁশ মাটি থেকে উঠে দুটি হয়ে যায় তাহলে মাদার নাচের জন্য ঐ বাঁশ দুটীকে সংগ্রহ করা হয়। একটি বাঁশকে রেখে দিয়ে অন্য বাঁশটিকে পোষাক পরিয়ে মাথায় নানারকম সাজ সজ্জা দেওয়া হয়। একমাসের উপর মাদার নৃত্য করতে করতে যে চাল পয়সা আদায় হয় তা দিয়ে অনুষ্ঠানের শেষ দিকে লোক খাওয়ানো হয়। এই গানে বাজনার বোল একই তালে বাজতে থাকে।

ধুম ধুম ধুম মাদার—
চেধুমাধুম ধুম ॥

একটি ঢোল আর কাঁসির বৈচিত্র্যহীন এক তাল বাজনা। বীরভূম জেলায় দাতাসাহেবের মেলায় উরাস মাদার নাচ দেখালে মেলা কর্তৃপক্ষ মাদারের সম্মানে চাদর দান করে। এই নাচ একক নৃত্য হলেও দু'তিন জন মাদার নাচিয়ের যৌথ নৃত্য প্রয়াস বিশেষ আনন্দের হুল্লোড় তোলে। বিরাট আকাশমুখী বংশ দণ্ডটি কখনও নাকের ডগায়, কখনও মাথায়, কাঁধে, কনুইয়ে, হাতের তালুতে দাঁড় করিয়ে রেখে মাদার নাচিয়ে ঢোলের তালে তালে নাচতে থাকে। অপূর্ব লৌকিক নৃত্যের অনবদ্য

নিদর্শন এই মাদার নাচ। আকাশমুখী প্রার্থনা যেন তপস্যা করে নানা কৃচ্ছ্রতায়। অনেকে বলে মাদার বক্স বলে একজন পীর নাকি এই নাচের প্রবর্তন করেন। তা ছাড়া মাদার পীর বলে বাঙলাদেশে এক লৌকিক দেবতা আছেন। আগুনের রোষ থেকে তিনি মানুষকে রক্ষা করেন হয়তো বৃষ্টির অমৃত বর্ষণে। এখনও অনেক গ্রামে গ্রামবাসী মানুষেরা মাদার পীরের উপাসনার ব্যয় নির্বাহের জন্য ধানীজমি উৎসর্গ করে।

লোক-সংগীতের মতই লৌকিক নিত্য ধারার নিজস্ব একটা সুর আছে যেন। আদিম কালের কোন প্রভাতে এই নাচগুলির প্রবর্তন হয়েছিল কেন না গোষ্ঠী নির্ভর সমাজে একক জীবনের অসহায়তা যখন মানুষকে বিপদসংকুল করে তোলে তখনই সমাজ-বিন্যাসের প্রথম স্তরেই যৌথ-নৃত্যের প্রবর্তন হয়। তাই এই নাচগুলির বৈচিত্র্যহীনতা কোন অভাব সৃষ্টি করেনি। প্রত্যেকটি নাচে বিভিন্ন বাজনা আছে। এই সব লৌকিক নাচে সাধারণতঃ ঢোল, খোল, কাঁসি, ঢাক, মৃদংগ বাজনা বাজে। কাঠির তালে তালেও অনেক নাচ দেখানো হয়। গ্রামকে জানতে হলে, মানুষের জীবনধারা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে হলে এই নৃত্যধারার জ্ঞানলাভ করা বিশেষ প্রয়োজন। নাচে নাচে প্রাচীন বাঙলা মুখর ছিল। নাচের আনন্দে প্রাণের জোয়ার উছল গতি-তরংগে লৌকিক জীবনধারাকে গতিশীল রেখেছিল।

মতে নাচ—১৩৭৮ সালের আষাঢ় মাসে বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে সংঘটিত হয়। বৃষ্টির প্রার্থনায় মতে নাচের অনুষ্ঠান হয়েছিল।

মাদার নাচ—রাঢ় বাঙলার অনেক গ্রামে মাদারের থান আছে। বীরভূম জেলায় অনেক গ্রামে মাদার নাচ দেখানো হয়। বীরভূম জেলায় সেকেড্ডা-মকদমনগরে মহম্মদ আলি একজন মাদার নাচিয়ে।

সাতভাইয়ের নাচ—বীরভূম, সাঁওতাল পরগণায় রাধা অষ্টমীর আগের দিনরাত্রি হতে সাতভাই পূজা বা ভূতপূজা অনুষ্ঠিত হয় অনেক ঝোপঝাড়ে ঘেরা ভূতুরে থানে।

বৈষ্ণব-কবির নিসর্গ-কল্পনা

দেবনাথ দাঁ

নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্য-মাধুর্য একালের কবিদের যতখানি মুগ্ধ ও প্রভাবিত করেছে, সেকালের কবিদের তেমন নয়। আমাদের সেকালের বাংলা সাহিত্য ছিল ধর্মভিত্তিক ও দেবতানির্ভর। পুরোনো ও মধ্যযুগের বাঙালী কবিরা ধর্ম-চিন্তায় ও দেবতার অনুধ্যানে এতখানি নিমগ্ন ছিলেন যে, মানব-মনের সুখদুঃখের আলোছায়া এবং প্রকৃতি-জগতের বিচিত্র শোভা-সৌন্দর্য তাঁদের চিত্তলোকে সেভাবে ছায়াপাত করতে পারেনি। মঙ্গলকাব্য বা বৈষ্ণব পদাবলীর এখানে ওখানে দু'চার চরণ প্রকৃতির ছবি আছে অনস্বীকার্য, কিন্তু বিশিষ্ট কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যেখানে প্রকৃতি-বর্ণনা স্থানলাভ করেছে। দেবতার কর্তৃত্ব স্বীকার না করলে মানুষের ভাগ্যে কি নিদারুণ সর্বনাশ নেমে অসে তা দেখবার জন্য মঙ্গলকাব্যের কবিরা প্রলয়ংকর ঝড়বৃষ্টির অবতারণা করেছেন। তাছাড়া মানুষের জগতকে যেহেতু ঘিরে রয়েছে প্রকৃতি, সেই কারণে সাহিত্য থেকে প্রকৃতিকে একেবারে বাদ দেওয়া অসম্ভব। শ্রীরাম যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য গোদাবরী তীরের পঞ্চবটী অরণ্যে সীতা ও লক্ষ্মণের সঙ্গে বনবাস জীবন অতিবাহিত করেছেন, তখন অরণ্যের গাছপালা পশুপক্ষীর অল্পস্বল্প কথা আপনি কাব্যে এসে যায়।

কিন্তু আরো পুরানো সংস্কৃত সাহিত্যে নিসর্গ-সংসারের স্থান এতখানি সঙ্কুচিত ছিল না। প্রকৃতি মানুষের স্বভাব-চরিত্রে কি অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করে, কালিদাসের শকুন্তলা নাটক তার আশ্চর্য নিদর্শন। তা ছাড়া কেবল প্রকৃতি নিয়েই যে কাব্য লেখা চলে ঋতুসংহারে কালিদাস তা দেখিয়েছেন। পুরানো বাংলা সাহিত্যের কবিরা কালিদাসের কাব্য ও নাটক থেকে অনেক কাহিনী, অনেক অলঙ্কার নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর নিঃসীম প্রকৃতি-অনুরাগকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। তবু আমাদের পুরাতন সাহিত্য, বলছিলাম, একেবারে প্রকৃতি-চিত্র বর্জিত নয়। আবার প্রকারে ও পরিমাণে বৈষ্ণব কবিতাই এ বিষয়ে উৎকৃষ্ট ও উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণব কবিতার কাব্যকুঞ্জে কত যে কোকিলের কলকণ্ঠ শুনেছি তা স্মরণ করা কঠিন। সেখানে একদিকে আছেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, অন্যদিকে কে জানে কতো নামহীন খ্যাতিহীন কবি। সুতরাং বৈষ্ণব পদাবলীতে সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে পল্লবগ্রাহিতা ও গতানুগতিকতা। বৈষ্ণব কবিতাতে প্রকৃতির স্থান নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা প্রথমোক্ত কবিদের কাব্য থেকেই চরণ চয়ন করব। তাতে নিসর্গচিত্রণে উৎকর্ষের দিকটা চোখে পড়বে। যেখানে কেবল পল্লবগ্রাহিতা ও গতানুগতিকতা তার কেবল ঐতিহাসিক মূল্যটুকুই স্মরণীয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে মেঘমেদুর বাদল-প্রকৃতির পাগল ছবি একটু বেশী চোখে পড়ে। বর্ষা অবশ্য কেবল বৈষ্ণব সাহিত্যে নয়, ঋগ্বেদের কাল থেকে ভারতীয় কবিমানসে গভীরভাবে ছায়াপাত করে আসছে। বর্ষা ভারতবর্ষের বিশিষ্টতম ঋতু। বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার এবং মাথুর পদে কবিরা নিবিড় বর্ষাপ্রকৃতির দুরন্ত উল্লাস ও অফুরন্ত সমারোহকে রূপায়িত করেছেন। মেঘান্ধকার বর্ষানিশীথের ভীষণ রমণীয়তাকে বিদ্যাপতি নীচের পংক্তিগুলিতে কি অপূর্ব নিপুণতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন :

রয়নি কাজর বম ভীম ভুজঙ্গম
কুলিস পরত্র দুরবার।
গরজ তরজ মন রোস বরিস ঘন
সংসঅ পড় অভিসার ॥

বর্ষারাত্রির সূচিভেদ্য অন্ধকার, তার প্রচণ্ড মেঘগর্জন ও মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ কবিতাটির শব্দ-চয়নে ছন্দ-বিন্যাসে ও চিত্রাঙ্কণে কি ভাবে না ধরা পড়েছে। অভিসারের একটি পদে গোবিন্দদাস লিখেছেন :

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥

সেই পথে অভিসারিকা শ্রীরাধা পা দিতেই বর্ষার দিগন্ত ব্যাপী সুদীর্ঘ ঝটিকা-প্রবাহ তাঁকে লুপ্ত করে নিল :

তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥

ঝড়ের বেগে উৎক্ষিপ্ত সেই বৃষ্টিধারার প্রচণ্ডতা সরে যেতে কবি বললেন :

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার ॥

কিন্তু বলতে না বলতেই :

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত ॥

অভিসারের পদে বর্ষাপ্রকৃতির এই মনোরম চিত্রসৌন্দর্য কিন্তু কবিদের বিশুদ্ধ প্রকৃতি অনুরাগের বসে আসে নি, এসেছে শ্রীরাধার দুঃখজয়ী প্রেমের অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্য। অবাধ্য সন্তানের শতসহস্র অত্যাচারকে জননী যখন হাসিমুখে সহ্য করে, সেইখানেই তার গৌরব। উতলা মাধবী রাত্রে কিংবা শরতের জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দয়িতের জন্য পথে নামা এমন কঠিন নয়, কিন্তু প্রেমের জন্য যে শ্রাবণের দুর্যোগকে উপেক্ষা করতে পারে, বজ্র-বৃষ্টি সর্পভীতি যার গতিকে রোধ করতে পারে না, তার প্রেমের তুলনা কোথায় ?

মাথুর পদে বর্ষা-বর্ণনা এসেছে প্রধানতঃ, সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের পরিভাষায়, উদ্দীপন বিভাব রূপে। ষড়ঋতু আপন পুষ্পপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়কে নানা রঙে রাঙিয়ে তোলে। বর্ষার ঝড়-জল-অন্ধকারের এমন একটা আবেদন আছে যা আমাদের বিরহবেদনার গোপন উৎসটিকে এক মুহূর্তে অবারিত করে দেয়। মেঘদূতের কবি লিখেছেন :

মেঘলোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
কণ্ঠাশ্লেষ প্রণয়িণিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥

প্রাকৃতে-অপভ্রংশে লেখা প্রকীর্ণ কবিতাতেও আমরা মেঘ দেখে বিরহী নায়িকাকে অশ্রুমোচন করতে দেখেছি :

ফুল্লা নীবা ভম ভমরা
দিট্‌ঠা মেহা জলে সমলা।
নচ্চে বিজ্জু পিঅ সহিআ
আবে কংতা কহু কহিআ ॥

বিদ্যাপতির 'এ ভর বাদর মাহ ভাদর' নামক বিশ্রুত পদটি ভারতীয় কবিতার এই ধারা অনুসরণ করেই বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখা দিয়েছে। রূপময়ী প্রকৃতির শোভাসৌন্দর্যের পানে তাকিয়ে শ্রীরাধার দীর্ঘশ্বাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও আছে :

ফুটিল কদম ফুল ভরে নোঁআইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বাল গোপাল ॥

বর্ষা মানুষকে কেন কাঁদায় তার চমৎকার ব্যাখ্যা আছে রবীন্দ্রনাথের নববর্ষা, কেকাধ্বনি, শ্রাবণ-সন্ধ্যা ইত্যাদি রচনাতে। বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাকে স্বীকার করলে বলতে হয়, যদিও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলার অলৌকিক মহিমা বর্ণনার জন্যই কবিরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তবু তাঁদের মনোলোকে প্রকৃতি—সামান্য হলেও—নিজের মায়াময় প্রভাব বিস্তার করতে একেবারে ছাড়ে নি।

বৈষ্ণব পদাবলীতে কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে কোথাও কোথাও প্রকৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণের স্বপ্নসুন্দর নর্মলীলার পটভূমিকাতে রয়েছে যমুনা-তীরের মধুময় নিসর্গসংসার —কোথাও তার নিবিড় তমাল অরণ্য, কোথাও বিকশিত কদম্বকুঞ্জ। বর্ষার মেঘকজ্জল রাত্রে সে অরণ্য শ্রীরাধাকে অভিসারে ডাক দেয়, শরতের জ্যোৎস্নামাখা স্বপ্ন-যামিনী আভীর কন্যাদের পাগল করে তোলে। প্রকৃতির রূপমাধুরীকে প্রকাশ করার যে অবকাশ আছে বৈষ্ণবপদাবলীতে, সকল কবি কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। অধিকাংশ স্থলেই প্রকৃতি-বর্ণনা কৃত্রিম এবং গতানুগতিক। রাসলীলা পদে শরতের বর্ণনায় নরোত্তম লিখেছেন :

কদম্ব তরুর ডাল ভূমে নামিয়াছে ভাল
ফুল ফুটিয়াছে সারি সারি।
পরিমলে ভরল সকল বৃন্দাবন
কেলি করে ভ্রমরা-ভ্রমরী ॥

পটভূমি হিসেবে প্রকৃতির বর্ণনা বৈষ্ণব কবিতা ব্যতীত মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্যেও পাওয়া যাবে। কিন্তু বৈষ্ণব কবিতার সব বর্ণনা গতানুগতিক নয়। শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় মাঝে মাঝে এমন দু'চার ছত্র পাওয়া যায় যা এক মুহূর্তে আমাদের অন্তরে বর্ণময় সৌন্দর্যের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই রাসলীলারই পদে গোবিন্দদাসের চরণ স্মরণ করুন :

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরিল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতি যুথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।

রাসলীলার অন্য একটি পদে গোবিন্দ দাস লিখছেন :

কিয়ে শরদ চান্দনি রাতি।
নিকুঞ্জে ভরল কুসুম পাঁতি ॥

এই রকম পংক্তি রচনা করা আজকের দিনের কোনো কবির পক্ষেও গর্বের বিষয়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রকৃতিকে আর পাওয়া যায় অলঙ্করণের ক্ষেত্রে। ঘরের নিশ্চিন্ত সুখ ছেড়ে পথে নামার দুঃখ বোঝাতে গিয়ে চণ্ডীদাস বলেছেন :

গুরুজন জ্বালা　　জলের শিহালা
পড়সী জিয়ল মাঝে।
কুল পানি ফল　　কাঁটায় সকল
সলিল লাগিয়া আছে ॥

এখানে শ্যাপলা-পানায় ভরা নিত্য পরিচিত পল্লী পুষ্করিণীর ছবি আমাদের চোখের ওপর ভেসে উঠে। সন্ধ্যার কালো অন্ধকারের পটে গৌরবর্ণা শ্রীরাধার উজ্জ্বল রজতকান্তি লক্ষ্য করে বিদ্যাপতি লিখেছেন :

যব গোধুলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহার গেলি
নব জলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারি গেলি।

উপমান হিসেবে প্রকৃতি চিত্রণও আমাদের সাহিত্যে প্রথানুগত পদ্ধতি।

সে যাক, পুরোণো বাংলা সাহিত্যে যেখানে প্রকৃতির স্থান নিতান্তই সঙ্কুচিত, সেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃতি বর্ণনাকে উপেক্ষা করার নয়। সেকালের বাঙালী কবিরা হয়তো একালের কবিদের মতো সাক্ষাৎভাবে নিসর্গ সৌন্দর্যের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন নি, কিন্তু অধ্যাত্মরস নিমগ্ন অন্তরেও যে কখনো কখনো প্রকৃতি তার মায়াময় যাদুস্পর্শ অন্ততঃ কিছুটাও বিস্তার করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ কী? আবার এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার দাবী মঙ্গলকাব্য ও অনুবাদ সাহিত্য অপেক্ষা কিছু বেশী।

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

সামঞ্জস্য (ধর্মঃ/৬) ॥

অনুশীলন বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যসাধনের কথা এখানে বলা হয়েছে। সামঞ্জস্য বলতে সবগুলি বৃত্তিরই একপ্রকার বৃদ্ধি নয়। যে বৃত্তিগুলির যে পরিমাণ বৃদ্ধির দরকার সেগুলিকে সেইপ্রকার সুযোগ দান করা। ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে উচ্ছেদ করা উচিত বলে মনে হয়। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রোধেরও প্রয়োজন। তাই ক্রোধেরও সীমিত অনুশীলন দরকার। তবে এগুলি নিকৃষ্ট বৃত্তি। ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তিগুলিরই সম্যক অনুশীলন করা উচিত।

সামঞ্জস্য ও সুখ (ধর্মঃ/৭) ॥

সামঞ্জস্যসাধনের আলোচনায় দেখা গেছে যে কতকগুলি চিত্তবৃত্তির যেমন অধিক অনুশীলন দরকার, তেমনি কতকগুলি আবার অল্প অনুশীলন প্রয়োজন। কিন্তু কোনগুলি অধিক এবং কোনগুলি অল্প প্রাধান্য পাবে তা বিচার করা একটি সমস্যার বিষয়। এই বিচারের মাপকাঠি হল সুখ। সুখদায়িনী ক্ষমতাই হল বৃত্তিগুলির সার্থকতা। কিন্তু সুখও আছে তিনপ্রকার—স্থায়ী, ক্ষণিক কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য, ক্ষণিক—কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ। শেষোক্ত সুখটিকে সুখই বলা যায় না। প্রথমটিই শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ বৃদ্ধি হয় সেগুলিরই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

সাংখ্যদর্শন (বিঃ প্রঃ/১ম) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—১২৭৯ সালের পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন সংখ্যা এবং ১২৮০ সালের বৈশাখ ও আষাঢ় সংখ্যা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে কপিলের সাংখ্যদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য বঙ্কিম প্রবন্ধমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন—'সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের স্থূল উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার যত্ন করিব। আমরা যাহা কিছু বলিতেছি, তাহাই যে সাহিত্যের মত, এমত বিবেচনা কেহ না করেন। যাহা কিছু বলিলে সাংখ্যের মত ভাল করিয়া বুঝা যায়, আমরা তাহাই বলিব।'

সাংখ্যদর্শন বহু প্রাচীন। বৌদ্ধধর্মের পূর্বে ইহা রচিত এবং এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রগুলি নিহিত রয়েছে। বেদে অবজ্ঞা, নির্বাণ এবং নিরীশ্বরতা বৌদ্ধধর্মের বিষয় এবং এগুলিও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি কিভাবে সাংখ্যদর্শনকার উপস্থিত করেছেন, বঙ্কিম তার বর্ণনা দেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের পার্থক্যের আলোচনাটি উল্লেখযোগ্য—'ইউরোপীয়েরা শক্তি অনুসারী, ইহাই তাঁহাদিগের উন্নতির মূল। আমরা শক্তির প্রতি যত্নহীন, ইহাই আমাদিগের অবনতির মূল। ইউরোপীয়দিগের উদ্দেশ্য ঐহিক; তাঁহারা ইহকালে জয়ী। আমাদের উদ্দেশ্য পারত্রিক—তাই ইহকালে আমরা জয়ী হইলাম না পরকালে হইব কি না,

তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে।'

সাংখ্যদর্শন যে অনেকাংশে বাস্তবভিত্তিক, একথা স্বীকার করতেই হবে।

সুখ কি ? (ধর্মঃ/২) ॥

সুখের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে অনুশীলনী বৃত্তিগুলির সম্যক বিকাশই সুখ, অপরপক্ষে বলা যেতে পারে যে সুখেই অনুশীলন ধর্মের সার্থকতা। প্রসঙ্গক্রমে অনুশীলন ও অভ্যাসের পার্থক্য সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। অনুশীলন হল স্বাভাবিক শক্তির অনুগামী, কিন্তু অভ্যাস অনেকক্ষেত্রে স্বাভাবিক শক্তির বিপরীত। আবার সাধারণ দৃষ্টিতে সুখের স্বরূপ ভেদও আছে। একজনের কাছে যে জিনিষটি সুখের আর একজনের কাছে তা সুখের নাও হতে পারে।

সুবর্ণগোলক (লোকরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন', চৈত্র ১২৭৯, পৃ. ৪২০—২২।

'সুবর্ণগোলক' রচনাটিতে একটি কাহিনীর মাধ্যমে হাস্যরস পরিবেশন করা হয়েছে। কৈলাসশিখরে একদিন হর-পার্বতী একটি স্বর্ণগোলক বাজী রেখে পাশা খেলতে আরম্ভ করেন। পার্বতী সুবর্ণগোলকটি জিতে নিয়ে পৃথিবীতে ফেলে দেন—মনুষ্যসমাজে এটির কি ক্রিয়া হয় দেখার জন্যে। মহাদেব বললেন—এর ফলে তাঁদের সৃষ্ট নিয়মের রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটবে।

এদিকে মর্ত্যে—কালীকান্ত বসু, রামা চাকরকে সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলেছে। কালীকান্তবাবু পথে সুবর্ণগোলকটি পেয়ে রামাকে লুকিয়ে রাখতে বললে। তার ফলে কালীকান্তবাবুর বৈশিষ্ট্য রামাতে সঞ্চারিত হল এবং রামাচাকর হয়ে গেল কালীকান্তবাবু। শ্বশুরবাড়ীতে এসে উভয়ের বিপরীত আচরণে বিশৃঙ্খলার সঞ্চার হল। এদিকে আবার রামার কাপড় থেকে গোলকটি পড়ে গেলে বাড়ীর কর্তা নীলরতনবাবুর হাতে সেটি দিল তরঙ্গ ঝি। অমনি নীলরতনবাবু কোঁচার খুঁটটি মাথায় দিয়ে স্ত্রীসুলভ লজ্জা প্রকাশ করতে লাগল। এমনিভাবে যখন চরম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে তখন মহাদেব গোলকটির বিশেষ গুণ সম্বরণ করলেন।

এই গল্পের মাধ্যমে বঙ্কিম মানুষের প্রকৃত স্বরূপও আমাদের কিছুটা দর্শন করিয়েছেন। তাই মহাদেব পার্বতীকে বলেছেন—'হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে। কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে, স্ত্রীলোক পুরুষের মত ব্যবহার করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক, তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রতীক্ষভূত করাইলাম।'

সুভদ্রাহরণ (কৃঃ চঃ ৪) ॥

মহাভারতে আছে অর্জুন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করে নিয়ে যান এবং তাতে কৃষ্ণের পরোক্ষ সম্মতি ছিল। এই ঘটনাটির দ্বারা অনেকে কৃষ্ণকে অন্যায়কারী বলে মনে করেন। কারণ বর্তমান দৃষ্টিতে জোর করে কন্যাহরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা ও তাকে সমর্থন করা অত্যন্ত অসামাজিক কাজ। কিন্তু প্রথমে দেখতে হবে যে বিবাহের এইসমস্ত আচরণবিধি নির্ণয়ের কারণ হল সমাজের

শৃঙ্খলা রক্ষা করা। কৃষ্ণ যেহেতু জানেন যে অর্জুন ও সুভদ্রার মিলনে মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল নেই তখন তিনি সেই কাজে সম্মতি দান করেছেন। তবে অনেকে বলতে পারেন যে বিবাহটি অন্যায় নয়, বিবাহের পদ্ধতিটিই অন্যায়। কিন্তু এ বিষয়ে দেখা যায় বিবাহের বহু পদ্ধতি প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। বর্তমানেও অনেকরকমের বিবাহ পদ্ধতি আছে। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে আবার রাক্ষসবিবাহ অর্থাৎ কন্যাকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা গৌরবের। সেদিক থেকে অর্জুন বীরোচিত কার্য করেছেন। ফলে সুভদ্রাহরণজনিত ঘটনায় কৃষ্ণের কোন দোষই ঘটে নি।

সূচনা [প্রচার] (পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'প্রচার' শ্রাবণ ১২৯১, পৃ.—১-৬।

'প্রচার' পত্রিকার প্রথমে সম্পাদকের নাম না থাকলেও এটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগিতায় প্রকাশিত পত্রিকা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; অন্যত্র তিনি লিখেছেন—'নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়।' (আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়)। এই পত্রিকা প্রকাশের সময় তিনি সূচনাংশে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। প্রচার একটি ছোট পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করবে। কারণ তাঁর মতে বড় পত্রিকা সকলে সবটা পড়ে না। এই পত্রিকার নামকরণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—'সত্য, ধর্ম' এবং 'আনন্দের' প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম। এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'।' এই পত্রিকায় বঙ্কিমের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সূচনাংশে বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িকপত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও মূল্যবান দু'চারকথা বলেছেন।

স্ত্রীলোকের রূপ (কঃ দঃ/৮ম সংখ্যা) ॥

'স্ত্রীলোকের রূপ' রচনাটি ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয়। বঙ্কিমগোষ্ঠীর লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা।

রচনাটি কমলাকান্তের নামসাদৃশ্যে দপ্তরে স্থান পেলেও, ভাবসাদৃশ্যে বঙ্কিমমানসের সঙ্গে পার্থক্য আছে।

লেখক এখানে স্ত্রীলোকের রূপের গরবের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি প্রকৃতিজগতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সৌন্দর্যের বিভিন্ন প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। যেমন ময়ূর ময়ূরী অপেক্ষা সুন্দর, সিংহ সিংহী অপেক্ষা সুন্দর, বৃষ গাভী অপেক্ষা সুন্দর। সবশেষে তিনি রূপের অসারত্বের কথা চিন্তা করে, প্রকৃত রূপ দেহে নয় গুণে—এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র দপ্তরের রচনার অনেকক্ষেত্রেই হয়তো গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি রচনাভঙ্গীতে যে সাবলীলতা ও লঘুতা সঞ্চারিত করতে পেরেছেন, এই রচনাটিতে তা দুর্লভ। লেখক এখানে যেন গুরুতর প্রবন্ধের মতই প্রতিপাদ্য বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

হনূমদ্বাবুসংবাদ (লোকরহস্য) ॥

প্রঃ প্রকাশ—'বঙ্গদর্শন'—মাঘ, ১২৮৯, পৃ. ৪৭১—৭৫।

এদেশে ইংরেজীয়ানায় দক্ষ বাবু সমাজের সার্থক প্রতিচ্ছবি আছে রচনাটিতে। এইসমস্ত বাবুরা মাতৃভাষা ভুলে গিয়ে ইংরেজী ভাষাতেই কথাবার্তা বলাকে গৌরবের বলে মনে করেন।

এঁদের কাছে ইংরেজ আগমন—স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ। ইংরেজের কাছে পরাধীনতা ভোগ করেও এঁদের ধারণা তাঁরা ইংরাজের কাছেই স্বাধীনতার আস্বাদ লাভ করেছে। হনূমান এবং এক বাবুর কথোপকথনের দ্বারা রচনাটি পরিচালিত হয়েছে।

হরিবংশ (কৃঃ চঃ ১/১৬) ॥

হরিবংশে আছে যে এই গ্রন্থ মহাভারতের পরবর্তীকালে রচিত। কিন্তু কত পরবর্তীকালে রচিত সে বিষয়ে কোন নিঃসংশায়িত প্রমাণ নাই। গ্রন্থমধ্যবর্তী অনেক ঘটনাও পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে হয়। তাই মহাভারতের ঘটনাবলীর বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ণয়ে হরিবংশের সাক্ষ্য না দেওয়াই ভাল।

হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস (কৃঃ চঃ ৫/৭) ॥

শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনায় এসে বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করলেন। পরদিন তিনি কৌরব রাজসভায় গিয়ে দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হবার জন্যে বললেন। কিন্তু দুর্যোধন সেকথা না শুনে কৃষ্ণকে আক্রমণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কৃষ্ণ সেকথা জানতে পেরে ধৃতরাষ্ট্রকে জানালেন যে তিনি ইচ্ছা করলে একাই দুর্যোধনের শাস্তিবিধান করতে পারেন, কিন্তু তা করবেন না। তবে দুর্যোধন যেন সাবধান হয়। এখানে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখানর ঘটনা যে বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র। এটি প্রক্ষিপ্ত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা

পৃথিবীর কাব্য ও কবিতা-চর্চার ইতিহাস যতদূর জেনেছি আমরা, দেখেছি তাতে অধিকাংশ কবিই সিদ্ধির পথটিকে চিনে নিয়ে একবার সেই পথেই জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমতার শেষ পরমাণুটি উজার করে দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের ভাষায় কবি রবীন্দ্রনাথ কদাচিৎ সেই একই সিদ্ধির পথে চিরকাল দিগন্তভ্রমণে উৎসাহবোধ করেছেন। একমাত্র তাঁরই কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে আমরা সবিস্ময়ে দেখছি পরীক্ষা নিরীক্ষার নব নব প্রয়াস ও প্রেরণা, যার ফলে তাঁর কাব্য প্রৌঢ় বয়সের প্রান্তে এসেও যৌবনের স্বপ্নে বিভোর, তারুণ্য ও দুঃসাহসিকতার দীপ্তিতে প্রাণবন্ত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার বিষয়টি যার সূচনা জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর, আমার মনে হয়, যেন মনোলোকের অরণ্যেরই কমল। নূতন সৃষ্টির আনন্দময়, রসঘন বিরল অভিব্যক্তি। এও একধরণের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ বা কোন অজানা অচেনা কাব্য ভূগোলের সীমান্ত আবিষ্কার।

নবসীমান্তেরই আবিষ্কার। সন্দেহ নেই। কিন্তু কোদালের মুখে হঠাৎ গুপ্তধন বেরিয়ে যাবার মতন দৈবিক ব্যাপার এ নয়। নয় হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্তের কোন রোমাঞ্চকর অনুভূতি। কোন আকস্মিকতার আলপথ বেয়ে আসেনি এই প্রেরণা ও প্রচেষ্টা। হয়তো এসেছে সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে যাকে কবি দীর্ঘকালের সাধনায় করেছেন পরিতৃপ্ত। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্বতীপরমেশ্বর মিল সংঘটন, সুখী সহবাসের সম্ভাবনা ও সুযোগ আনয়ন, বলাবাহুল্য কবির কোন আকস্মিক খেয়ালমাত্র নয়। পরন্তু এ হলো তাঁর দীর্ঘদিনের পরীক্ষার পরিণতি। প্রচেষ্টার প্রাণময় উদ্যোগ পরিচালিত কর্মকাণ্ড যা তিনি দিয়ে গেলেন সমকালীনদের হাতে। সমকালীনদের ভত নয়, উত্তরসূরীদেরই দিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার।

কবি অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলেন, কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুদৃঢ় অবয়বের মধ্যে চিন্তাধারায় একটা স্বাভাবিক সরল প্রবাহ আনবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। প্রয়োজনীয়তা হয়েছে ছন্দের প্রাচীর প্রান্তরে গণ্ডীবদ্ধ সীতারূপী কাব্যলক্ষ্মীকে মুক্ত করে অনন্ত আকাশের তলে, অনুভূতির অনাবিল বাতাসে অবারিত করে দেবার। অশোকবনের অমোঘ প্রহরা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসবার যদিও ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ নানা ছন্দের সমারোহকে লঙ্কাদ্বীপের অনার্যসম্ভূত চেরীদল বলে মনে করতেন না কখনো। কখনোই ছিল না তাঁর ছন্দ সম্পর্কে তেমন অতৃপ্তি অগ্রজ মধুসূদন যাকে প্রকাশ করেছেন মিত্রাক্ষর নামক দুর্লভ সনেটটিতে, যার প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়া থেকে প্রবর্তন করেছেন অমিত্রাক্ষর। বিদ্রোহ আছে মধুসূদনের সামগ্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী নন। অতৃপ্তিবশে, প্রতিক্রিয়ার প্রেরণায় নয় কাব্যে তাঁর গদ্য ছন্দের প্রবর্তন। আমারতো মনে হয়, চিরনতুনত্বের প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথের এ আরেক আবির্ভাব। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রণয়িনী কবিতাকে আরেক আবির্ভাবে সম্মোহিত করেছেন।

কিন্তু এই সম্মোহন পদ্ধতিকে আয়ত্ব করার প্রচেষ্টা অনেকদিন থেকেই। যদিও রঙ্গমঞ্চের যাদুকরের যাদুদণ্ডের স্পর্শে অভাবিত ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ড ঘটে যায় সহসাই তবু ভুললে চলবে না যে ঐ সহসা উদ্ভাসেরও নেপথ্যে রয়েছে এক সুদীর্ঘকালেরই সঞ্চয়, অনেক দিন ও রাত্রি পরিশ্রমের দাদন। কাব্যে গন্তছন্দের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথের ছন্দকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল বলাকা পর্ব থেকেই। বলাকাতে প্রথম তিনি ছন্দ স্বাতন্ত্র্যের প্রবর্তন করেন। এখানেই তাঁর চিন্তার প্রথম মৌলত্ব, স্বকীয়তার সমারোহে অনিবার্য কাব্যমূর্ছনায় ধরা দিয়েছে। কিন্তু দ্বিধাহীন এখানেও হতে পারেন নি কবি তেমন দুঃসাহসিকরূপে। ভেঙে ফেলতে পারেন নি ছন্দের গঠন সম্পূর্ণভাবে। এখানেও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে অন্তমিল ও ছন্দের ফল্গুপ্রবাহ। রয়ে গেছে অন্তর্লীন হয়ে। রুদ্র আবির্ভাবও অন্ত্যমিলের রুদ্ধতাতেই হয়েছে অভিব্যক্ত—

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধতারা, মুগ্ধতারা, হয়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সংগোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁদ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

পুরবী ও মহুয়াতে—১৯২৫ ও ১৯২৯-তে যাদের রচনা—সেখানেও কবিগুরু পুনরায় ছন্দের কৌলীন্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অর্থাৎ নূতনকে আহ্বানের লগ্ন তখনো অনাগত হয় নি তাঁর কাছে। প্রস্তুতির আরও কিছু বাকী তখন পর্যন্ত।

তারপর ১৯৩২ সাল। কবি প্রকাশ করেলেন তাঁর পুনশ্চ। পুনশ্চতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যক্ষেত্রে পুনরাবির্ভাব—বাংলাকাব্যে এ এক যুগান্তর বলেই মনে হয় আমার। বিষয় নির্বাচন, ছন্দবিন্যাস—এই দু'দিক দিয়েই পুরাতনের সঙ্গে সবপাট চুকিয়ে দিয়ে, খুলে ফেলে দিয়ে পুরাতনের জীর্ণ নির্মোক বেরিয়ে এলেন নবীন রবীন্দ্রনাথ; আরেক মেঘের পর্দা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন তরুণ সূর্য। দেখা দিল আলোক। 'সঙ্গীতের আবেগমুক্ত' নির্মোক, 'বক্তব্য বিষয়ের গৌরবের উপর নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান। নিরাভরণ পৌরুষের প্রতীক।' এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের কবিতাকে তিনি উপহার দিলেন তাঁর পাঠক-পাঠিকা, অনুরাগী-অনুরাগিণীর কাছে।

পুনশ্চর ভূমিকাতে লিখলেন 'গন্তছন্দের সুস্পষ্ট অঙ্কর না রেখে······বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা' এটাই তাঁর পরীক্ষাধীন বিষয়। তাছাড়া 'পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটা সঙ্কচ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাকে দূর করে গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে কবিতার সঞ্চরন স্বাভাবিক করাও তাঁর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের কথা পুনশ্চর কয়েকটি কবিতাতেও অভিব্যক্তি পেয়েছে। পুনশ্চর প্রথম কবিতা কোপাই-এ তিনি কোপাইর 'জলে স্থলে, তরুণে শ্যামলে' গ্রন্থিবদ্ধ গতিছন্দে তাঁর নবপ্রবর্তিত কাব্যছন্দের প্রতীক আবিষ্কার করেছেন। কবির মতে, এখানে "ভাষার গান" ও "ভাষার গৃহস্থালী" সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের সান্নিধ্য স্বীকার করে নিয়েছে অনায়াসে। এর জন্য কী চাই, তা-ও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই নিম্নলিখিত ছত্রগুলিতে—

একে অধিকার যে করবে
তার চাই রাজপ্রতাপ ;
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানারকমের গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে,
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ,
গুরু লঘু নানাভঙ্গীতে।

ভাবীকালের ইচ্ছে ও রুচির দিকে দৃকপাত করেই অন্তঃপুরবাসিনী কাব্যলক্ষ্মীকে পথিকবধূর ধূলি-ধূসর বেশ পরিয়েছেন কবি। শেষ সপ্তকের ২০, ২৪ ও ২৫ সংখ্যক কবিতাতে তিনি নূতন কাব্যাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। নবযুগের কবি 'কঠিন চিত্ত' 'উদাসীনের' গান গাইবেন। ছন্দবদ্ধ কবিতাতে রয়েছে আভিজাত্যের সুখাসনে সংহত হৃদয়াবেগ। মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ নয়। তা যেন টবের গাছ। আর ছন্দহীন কাব্য হলো মাটির সঙ্গে দৃঢ়মূল। যথেচ্ছ বিস্তৃত। এ যেন বনের আসল সম্পদ ঐশ্বর্যে এবং সৌন্দর্যের স্বাভাবিক স্বতস্ফূর্ত রসে ভরপুর। কবি মনে করেন, 'অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস……' এই বিশ্বাসে ভর করেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৩) ও শ্যামলী (১৯৩৬) যার মধ্যে তাঁর গদ্যকবিতার অধিকাংশ সংগৃহীত।

পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলী কাব্যের প্রায় সব কবিতাই গদ্যাশ্রিত। যথার্থ গদ্যকবিতার লক্ষণ হলো বিষমাত্রিক যতি, অসমছন্দ সম্পদ এবং গদ্যোচিত বাগভঙ্গি। এইসব এসব সংকলনের কবিতায় এসেছে। গদ্যের সঙ্গে গদ্যকবিতার তফাৎ পংক্তি সাজাবার ভঙ্গিতে নয়, প্রধানত ছন্দের দোলে এবং অপ্রধানত বাগভঙ্গিতে। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে গদ্যকবিতার ছন্দ। গদ্যছন্দ বাক্যার্থকে অনুসরণ করে। তার যতি পড়ে বাক্যের পর্বে যেখানে অর্থের সঙ্গে শ্বাসবায়ুর সাময়িক বিরাম। এতে পর্বের মধ্যে তাল বা মাত্রার সমতার প্রশ্নই ওঠে না। গদ্যছন্দ অনুসরণ করে মাত্রার বা তালের সমতাকে, যেখানে বিরাম আছে নির্দিষ্ট মাত্রার বা তাল পরিমাপের পর। সুদৃঢ় মাত্রা সমতা না থাকলেও পর্বের মধ্যে তালের রেশ অনুভূত হয়। অর্থাৎ গদ্যছন্দ অতিতাল, পদ্যছন্দ সমতাল এবং গদ্যকবিতার ছন্দ হলো বিষমতাল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা রচনার প্রথম প্রচেষ্টায় পরিচয় রয়েছে লিপিকার প্রথম অংশে। পদ্যের মত পংক্তি ভেঙে ছাপা না হলেও এগুলির মধ্যেই যে গদ্যকবিতার ঝংকার রয়েছে, তাতে কোন সন্দেহই থাকা উচিত নয়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতায় বাংলা গদ্যকলার শক্তি দূর প্রসারিত হয়েছে। পুনশ্চর গদ্যকবিতাগুলিতে রেখাচিত্রের যে সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও ভাবের যে বলিষ্ঠ প্রভাব ফুটে উঠেছে তা' গদ্যকবিতাতে হলে ছন্দের বর্ণবহুল ঐশ্বর্যে ভাষায় পেলবতায় ও হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসে অনেকটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়তো। কিন্তু গদ্যকবিতাতে বলে তেমনটি হয় নি।

এবারে দেখা যেতে পারে এই গদ্য কবিতার কত রকমের শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। সুবিধাজনক শর্তে আমরা রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গদ্য কবিতাকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম শ্রেণীতে

যে কবিতাগুলিকে ফেলা যায় তার মধ্যে রয়েছে আখ্যায়িকা জাতীয় ব্যালে ধর্মী কবিতা। তার লক্ষণ সুরের হাল্কাভাব ও কল্পনার অর্ধসক্রিয়তা। কতকগুলি আবার মনের ক্ষণিক আবেগ ও আকস্মিক খেয়ালকেই ধরতে সচেষ্ট। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতাগুলি কল্পনার উচ্চস্তরে বাঁধা। গদ্যের বিশ্বব্যাপী প্রসার দার্শনিকতার উচ্চবেদীতে প্রতিষ্ঠিত। এগুলিতে আছে বিশ্বপ্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য, গ্রহনক্ষত্রাদির অমোঘ নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ কক্ষ পরিক্রমণ ইত্যাদির কথা। তৃতীয় শ্রেণীতে যে কবিতাগুলিকে ফেলেছি তাতে ধ্বনিত হয়েছে চিরন্তন সুর। সীমা অসীম, খণ্ড অখণ্ড, রূপ অরূপের উপলব্ধি সঙ্গত কবিতা। চতুর্থ শ্রেণীতে আছে প্রেমের চিরন্তন রহস্য সম্পর্কে কবির মনোভাবের কবিতা। আর পঞ্চতম শ্রেণীতে আছে আর্ট ও জীবন সমস্যার উপর কবির প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার কথা। এই সাধারণ শ্রেণী বিভাগ থেকেই আমরা বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার বিষয় বৈচিত্র্যকে।

পুনশ্চর—অপরাধী, ছেলেটা, সহযাত্রী, শেষচিঠি, বালক, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, ক্যামেলিয়া, সাধারণ মেয়ে ও প্রথম পূজা ; শেষ সপ্তকের—রঘু ডাকাত, নেহাল সিং-এর আত্মদান ; শ্যামলীতে —কবি, দুর্বোধ, অমৃত ও বঞ্চিত মূলতঃ ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরস মেশানো গল্পবিবৃতি। শ্যামলীর— বিদায় বরণ ও হারানো মন মেঘখণ্ডের মত লঘু, ভাসমান মুহূর্তের ভাব—ঝলকের প্রতিচ্ছবি। এক সুদুর্লভ স্বর্ণালোক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'গদ্যকাব্যে কোমলে কঠিনে মিলে একটা সংযত রীতি আপনা আপনি উদ্ভূত হয়···। গদ্য বলেই এর ভিতরে অতি মাধুর্য, অতি লালিত্যের মাদকতা থাকতে পারে না।' কবি অনুভব করেছেন যে তাঁর গদ্য কাব্যের বিষয়বস্তু তিনি অপর কোনরূপে প্রকাশ করতে পারতেন না। অলংকৃত গদ্যরীতির মাধ্যমে উচ্চতম কাব্যোৎকর্ষে পৌঁছানো যায়। তার প্রমাণস্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদে সত্যকামের গল্প, বাইবেলের অনুবাদ, যজুর্বেদের উদাত্ত গদ্যমন্ত্র ও গীতাঞ্জলির গদ্যঅনুবাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন।

ভালো কথা। কিন্তু কোমলে কঠিনে মিলে যে এক নূতন, সংযতরীতির উদ্ভব তিনি প্রত্যাশা করেছেন বস্তুত তা' উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে সিদ্ধির সীমান্তে গিয়ে সম্ভবতঃ পৌঁছায় নি। তারপর রবীন্দ্রনাথের তীব্র মননশীলতা ও দর্শনপ্রবণতাও মনে হয় তাঁর কাব্যছন্দেই অনেক স্বতোৎসারিত এবং পরিস্ফুট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতির স্বপক্ষে ওকালতি করে যে সব কথা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন সেগুলি সম্পর্কে একথাই বলতে পারি যে সেগুলি যে সময়ের রচনা তখন গদ্যপদ্যের মূলগত ব্যবধান এভাবে ধরা দেয় নি। বাইবেলের মধ্যে গদ্য থাকা সত্ত্বেও তুচ্ছতম আখ্যায়িকার মধ্যেও গম্ভীর মৃদঙ্গনাদের মত একটা সঙ্গত ধারা প্রবাহিত। গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের মধ্যেও আছে এমন একটি গতিছন্দ একটি অচল প্রবাহমানতা।

ছন্দই হলো কবিতার প্রাণ-তার নিয়ত হৃদস্পন্দন। তাকে ভেঙ্গে ফেলে যথেচ্ছভাবে বৈচিত্র্যপ্রয়াস দেখানো চলতে পারে। কিন্তু হৃদস্পন্দন বন্ধ হলে যেমন দেহ টেঁকে না, মৃত্যুই হয় তার অনিবার্য নিয়তি তেমনি একবারে ছন্দকে পরিহার করে কাব্যচর্চার কথা চিন্তা করাও বাতুলতামাত্র। যার প্রমাণ যত্রতত্র নজর করা যায় অত্যাধুনিকদের কাব্যচর্চায়।

পুরোপুরি ছন্দবর্জিত কবিতায় ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্যর্থ। ব্যর্থ ডান। ব্রাউনিং। রবীন্দ্রনাথের

অনাভরণ কাব্যও যে খুব সার্থক হয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তাঁর গদ্যকবিতার মধ্যেও যেগুলি সার্থক হয়েছে যথা—শ্যামলীর—ছুটি, গানের বাসা ও পয়লা আশ্বিন ; পুনশ্চর—শিশুতীর্থ ইত্যাদি তাদের মধ্যে আমরা একটা ছন্দ প্রবাহ অনুভব করে ধন্য হই এবং প্রধানতঃ এইজন্যই তাদের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য গড়ে উঠেছে। এই কবিতাগুলিতে চিত্রের সমাবেশ ও ভাবব্যঞ্জনা একটি কেন্দ্রস্থ রসকে ফুটিয়ে তুলেছে। অনাবশ্যকের প্রক্ষেপে কবি অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেন নি তাদের। "ছন্দ যে শক্তিশালী কল্পনার পদক্ষেপের প্রতিধ্বনি—তা সে যতই ক্ষীণ ও দুর্নিরীক্ষ্য হউক"—তা' এইসব কবিতাগুলি পড়লেই ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশ্বজনীনতা, কালজয়ীতা, শাশ্বতনবীনতা যে কাব্যে সবচেয়ে বেশী সংবৃত্ত, সম্বোধিত, যূথচারী তা' হলো তাঁর ছন্দবদ্ধ কাবতাতেই। সংযমের সম্ভ্রমে রবীন্দ্রকাব্য সেখানে মনোমুগ্ধকারী। গদ্যকবিতাতে যেখানে ছন্দের বন্ধন রয়েছে প্রায়শই সেখানেই তাঁর কবিতার সুদীর্ঘসঞ্চারী প্রভাব বিস্তারিত হয়েছে আমাদের রসিক মনে এবং/অথবা আমরা ভালোবেসেছি ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথকেই যিনি আমাদের ভূতকালের, বর্তমানের এবং অনাগত ভবিষ্যতের যাবতীয় ছন্দকে আপন প্রতিভার আসনে সংযত সবল করে দিয়েছেন তাঁর বহুকথিত অনিত্যতার কপালে নিত্যতারই জয়তিলক পরিয়ে ॥

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যানাস্ক্রিপ্ট পেণ্টিং ॥ রজতানন্দ দাশগুপ্ত। ডি. বি তারাপোরেবালা সন্স এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, বোম্বাই, ১৯৭২, [ইংরাজী] মূল্য: ৮০৲ টাকা।

কোম্পানী ড্রয়িংস্ ইন্ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ॥ মিলড্রেড্ আর্চর। হার ম্যাজেষ্টিস ষ্টেশনারি অফিস, লণ্ডন, ১৯৭২ [ইংরাজী]

বীরভূমের যম-পট ও পটুয়া ॥ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সুবর্ণরেখা, কলিকাতা; ১৯৭২, মূল্য: ৪৲ টাকা ॥

ভারতের চিত্রকলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ব্যাপক স্বীকৃতি ও সাধারণ পরিচিতি ভিত্তিচিত্রের সম্পর্কে। এর মধ্যে অজন্তার চিত্রকলা, বাঘ গুহাচিত্র প্রভৃতি নানারূপ পদ্ধতির মাধ্যমে বহুল প্রচারিত। ক্রমশঃ মধ্যযুগীয় ভারতীয় চিত্রধারা, বিশেষতঃ পশ্চিমভারতের রাজস্থান ও গুজরাটের ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থালেখ্য, মুঘল ও দখ্‌নী চিত্রধারা ও বর্ণসমুজ্জল পাহাড়ী ধারার সম্পর্কে চিত্ররসিকের দৃষ্টি পড়েছে।

সুদূর দক্ষিণের ভিত্তিচিত্র ও পুঁথিচিত্রণ বিষয়টি আলোচিত হতে চলেছে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে। ইতিমধ্যে ভারতীয় গ্রন্থালেখ্য অবলম্বন করে কয়েকটি সুপ্রচলিত বক্তব্যের একাধিক পথসৃষ্টি হয়েছে। একপথের পথিকজন চিত্ররচনার ভাবাদর্শ ও ভাবগত রূপায়নের বিশ্লেষণ করে থাকেন। ভারতীয়ত্বের আবরণে চিত্রায়ন হয়ে ওঠে সাহিত্য বিচারের পর্যায়ভুক্ত। যেখানে চিত্রকর থাকেন প্রচ্ছন্ন ও শিল্পকর্মের অন্তরালে সেখানে অনেক সময়ে রঙ ও রেখার ও সংস্থাপনের দ্বারা আঞ্চলিক শৈলী বা পৃথকীকৃত কলমের অনুসন্ধানে সময় ব্যয়িত হয়। এর স্বাভাবিক ফললাভ হয় হাতেনাতে। প্রবহমান ধারাপথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি গাছ পাথরের আড়ালে অথবা শুষ্ক পথরেখার জরাজীর্ণ ঘাটে-আঘাটায় স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পশৈলীর অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বকে মানসিক স্বীকৃতি দান করা হয় মাত্র। মুঘল প্রভৃতি এবং রাজদরবারের জানিত ও প্রমাণিত শিল্পীদের আশ্রয় করে চিত্রালোচনা কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন তর্কের মল্লশালায় পরিণত হয়। চিত্রকে রসসৃষ্টিরূপে দেখা হয় না আলোচনার অরণ্যে। সাংস্কৃতিক সম্পদরূপে গণ্য হয় না চিত্রের অবদান।

পূর্বভারতীয় চিত্রকল্প ও চিত্রায়ণের সামগ্রিক মূল্য নির্দেশ উপরে বর্ণিত প্রথাসমূহের প্রাবল্যে অপেক্ষাকৃত অবহেলিত। নিদর্শনের অপ্রতুলতা, কালগত ধারাবাহিকতার অভাব বিচ্ছিন্ন নিদর্শনের উপস্থিতি ও শিল্পকর্মের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য এ বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে ও এক সাধারণ পটভূমিতে রক্ষিত মূল্যায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

ঠিক এ অবস্থায় অধ্যাপক রজতানন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের গ্রন্থটি একটি ব্যতিক্রম। একটি অনাদৃত ও অনালোচিত বিষয়ে আলোকপাতের সম্ভাবনার জন্য এই রচনাটি সুরসিক পাঠককে উৎসাহিত করতে সক্ষম। এতে প্রধানতঃ বৃহৎ ভিত্তিচিত্রকে বাদ দিতে হয়েছে। কারণ ক্ষুদ্রায়তন

গ্রন্থালেখ্যই পূর্ব ভারতে মধ্যকালীন ও মধ্যপর্বের অন্তিম যুগের অধিকাংশ সময়ে সাংস্কৃতিক পটভূমিকে প্রায় অধিকৃত করেছিল। পূর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে এ ধারার চিত্রের অবদান কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। ভূমিকা ও প্রাক্‌কথনের প্রসঙ্গ অতিক্রম করে লেখক তাঁর সমগ্র বক্তব্য বিষয়ের বর্গীকৃত উপস্থাপন করেছেন বঙ্গদেশ, আসাম, বিহার, কোচবিহার, ওড়িশা—এই চারটি অধ্যায়ে। এর 'বিহার' অধ্যায়টি বিশেষিত 'বৌদ্ধ উত্তরাধিকার' দ্বারা। আসামের পর্বটি আঞ্চলিক চিত্রশৈলীর দ্বারা এবং ওড়িশার অংশটি রীতিগত মিশ্রণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত ও চিহ্নিত। গ্রন্থের শেষ দুটি অধ্যায়ে চিত্ররচনা পদ্ধতির বর্ণনা ও পূর্ব-ভারতীয় রাগচিত্রের প্রকৃতিগত ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা প্রকাশিত।

পালযুগের প্রাচীন চিত্রধারা যে ভৌগোলিক প্রাঙ্গনে উত্থিত ও প্রসারিত হয়েছিল সেটি প্রাচীন পূর্বভারতের বা প্রাচ্যের বর্তমানকালীন বঙ্গীয় ভূভাগ, বিহার ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে গ্রথিত করেছে একসূত্রে। এ সময়ের চিত্রনিদর্শন এসেছে কাগজ ও তালপত্রের পুঁথির প্রত্যক্ষ নিদর্শনের দ্বারা এবং আশুতোষ চিত্রশালার বিখ্যাত তাম্রপট্টের অগভীর অঙ্কনের সূক্ষ্ম রেখানির্দেশের আসনাসীন বিষ্ণু মূর্তির পরোক্ষলব্ধ উপাদানে। পালযুগীয় যে চিত্রকলা বৌদ্ধ মানসিকতা তথা মহাযান-বজ্রযান প্রভৃতিকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে সেটি সঙ্গত কারণেই সমগ্র অঞ্চলটির সম্পদ এবং নেপালস্থিত কাঠমাণ্ডু উপত্যকার অবদান ও উত্তরাধিকার থেকে এটিকে আলাদা করার প্রয়াস প্রথাসিদ্ধ গতানুগতিকতার নামান্তর মাত্র। অষ্টসহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, পঞ্চরক্ষা প্রভৃতি পুঁথির চিত্রকলায় একটি বিশিষ্টভাব ফুটে উঠেছে অলঙ্কৃত 'রঞ্জনাক্ষর' দ্বারা বিভিন্ন পার্শ্বস্থ ও মধ্যবর্তী স্থানকে আবৃত করে চিত্রসংস্থাপনের পদ্ধতির সাহায্যে। রেখা এখানে ঐতিহ্যগতভাবে 'ক্লাসিকাল' কিন্তু প্রকাশগতরূপে ছান্দসিক ও প্রসঙ্গ অনুসারে সংস্থাপনের তাল ও মিল অন্বেষণ করতে রত। এতে একই সময়ে বিষয়ঘটনানুগ চিত্রায়ণের স্বাভাবিক প্রয়াস এবং মধ্যযুগীয় রীতির চিত্রানুবাদ সূক্ষ্ম অঙ্কন ও অনুপাতের সাহায্যে নিখুঁতভাবে প্রকাশিত।

বিহার অঞ্চলে ও বঙ্গীয় প্রেক্ষাপটে স্থানীয় চিত্রধর্মের বিকাশ মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্ধের সাম্রাজ্যিক ব্যবস্থার উত্তরভারতীয় রাজনৈতিক সামাজিক যোগসূত্রের দ্বারা পুঁথির পাটায় ও পত্রস্থিত চিত্রাবলীতে মূলতঃ পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতের যমুনাতটবর্তী অঞ্চল এবং পূর্ব ও মধ্যপূর্ব রাজস্থানের প্রভাব কোথাও স্তিমিত কোথাও অবদমিত, কোথাও বা সোচ্চার ও প্রকটিত ছাপ রেখেছে পূর্বভারতের চিত্রকলায়। এটি মূলতঃ সম্ভবপর হয়েছিল দুটি কারণে। তীর্থ পরিক্রমণ চক্রের দ্বারা উৎপন্ন জন সংযোগ ও সংস্কৃতি সমন্বয় এর মধ্যে অন্যতম। চিত্ররূপের প্রত্যক্ষ অবদানের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসককুলের অনুগৃহীত যমুনাতীরবর্তী সওদাগর সম্প্রদায় এবং রাজপুত সৈনিক রাজকর্মচারীদের প্রাচ্যমুখী অভিযাত্রী হয়ে ক্রমশঃ বসতিকারী ও পরে ভূম্যধিকারীতে পরিণত হবার ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব-ভারতের চিত্রকলায় পশ্চিমী ধারার ছাপ এনে দিতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একটু গভীরে খতিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে প্রাচ্যদেশের চিত্রকলার স্বকীয়তার উৎস স্থানীয় লোকযানের মধ্য দিয়ে।

আশুতোষ চিত্রশালা ছাড়া বিষ্ণুপুরের একাধিক পুঁথির পাটায় এই সমর্থন লাভ করা যাবে। আবার অন্যদিকে পার্শ্বাগত এবং তীক্ষ্ণযমক সমন্বিত মুখভঙ্গি মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের

পাটায় ধরা পড়েছে ওড়িশার একটি চিত্রপ্রভাব। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ চিত্রশালার পাটাগুলি অধিকতর ব্যবহৃত। তবে বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের নিদর্শনসমূহ আরও গভীরতর মূল্যনির্ণয় করার যে যোগ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্তিম অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের পূর্বীয় চিত্রের ক্ষেত্রটি জটিল। মধ্যযুগের শেষপাদের মুর্শিদাবাদ শৈলী, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের নানান পর্যায়ের পাটা, কাগজে আঁকা পট, রথের ফলকের ছবি, পূজা দালানের বা ইমারতের দেয়ালে আঁকা ছবি, মুঘলধারার অপভ্রংশ ইউরোপীয় প্রথায় মিশ্রিত ও প্রভাবিত ছবি এবং লোকচিত্র এ সমস্তই আলোচনার যোগ্য। এ ছাড়া আছে হাতীর দাঁতের পাত, অভ্রের পাত এসবের ওপর আঁকা ছবি, পাটনার চিত্র শৈলী, দেশজ ভাব প্রকাশক কিন্তু ইউরোপীয় চিত্র পদ্ধতির প্রচলনের কথা।

অধ্যাপক দাশগুপ্ত অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোচবিহারের যে চিত্রসম্ভার আমাদের সম্মুখে এনে দিয়েছেন তার পর্যালোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। অসমীয় চিত্রধারার সঙ্গে এই চিত্রের রীতিগত প্রভাব প্রকটিত হয়েছে সাধারণ দেহ সংস্থানের সাদৃশ্যযুক্ত রূপায়ন পদ্ধতিতে। তবে এই ধারার ভূষণ ও ভঙ্গি পশ্চিম ভারতের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয় অল্পাধিক পরিমাণে। যদিও বিষ্ণুপুরস্থ পাটাচিত্রের অনুশীলন ও রূপায়নের সূক্ষ্ম কলা বিন্যাস এতে খানিকটা পরিমাণে অনুপস্থিত।

শঙ্করদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবীয় রূপকল্পনায় প্রস্ফুটিত বৈষ্ণব ধর্ম পুস্তকের অভ্যন্তরে ও আবরণীতে অসমীয় চিত্রকলা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের অসমীয় ক্ষুদ্রায়তন চিত্রকলার অধ্যায়টি সুলিখিত এবং কোচবিহারের মতই চিত্রালোচনার জগতে এখনও উপেক্ষিত। অষ্টমঙ্গলা, গোবিন্দস্তুতি, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অসমীয় চিত্রের পরিচয় লাভ করা যায়। এর মধ্যে স্বকীয়তায় ও বৈশিষ্ট্যে 'হস্তিবিদ্যার্ণব' পুঁথি এবং অহোম শাসনের প্রথম যুগের পঞ্চদশ শতকস্থ 'ফুং চিন' গ্রন্থের চিত্রকলা অন্যতম। অসমীয়া চিত্রকলার কয়েকটি বিশেষিত লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় বিশিষ্ট দেহরেখ কলায় বিকাশে এবং উত্তর পূর্বের সংযোগ পথে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন চিত্রধারার প্রভাবেও সংযোগে। এই অঞ্চলের চিত্রে একদিকে যেমন পূর্বভারতীয় পুঁথি চিত্রণের তরঙ্গভঙ্গের খিলানকে প্রয়োজনমত প্রসারিত করে নিয়ে নিয়ে দেহরূপায়ণের সাহায্যে চিত্রকল্প রচিত হয়েছে তেমনই অন্যদিকে চিত্র-মাধ্যমের উত্তর-পূর্বের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিতে একটি যথেষ্ট সহজে বোধ্য ও আদিম উপজাতীয় সারল্য-মণ্ডিত প্রাণশক্তির সবলতা দর্শনীয়। এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনার সম্ভাবনা থেকে আজকের চিত্র দর্শককে দূরে সরিয়ে রাখা উচিত হবে না। কারণ উত্তর পূর্বের বিশিষ্ট পটভূমিতে উপজাতিদের উপস্থিতির সাংস্কৃতিক বিচার আজও সম্পূর্ণ নয়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় চিত্রে বিশেষ করে 'আসাম রাজ্য সংগ্রহশালার' ভাগবত, গীতগোবিন্দ ও অল্পাধিক 'লব-কুশর যুদ্ধ' পুঁথিটিতে লক্ষণীয়ভাবে পূর্বভারত তথা নেপালের ঐতিহ্য প্রকাশক ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায় পশ্চিম ভারতীয় বেশভূষা ও আদবের। কিন্তু অন্যভাবে আসাম সরকারের 'ঐতিহাসিক ও প্রাচীনকালীন অধ্যয়ন বিষয়ক বিভাগে'র 'তীর্থ কৌমুদী'র সম্বরণকারীদের চিত্রে স্থানীয় আদিমতার সৌন্দর্য্য অনেকাংশে অমিশ্রিত এবং অমলিন থেকেছে। আবার সবুজাভ পটভূমিতে শ্বেত অক্ষরে লিখিত ভাগবত গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ের চিত্রটিতে ছাপ পড়েছে মধ্যযুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ভারতপ্রাচ্যের ও নেপালের বিশিষ্ট রীতির।

লেখক পূর্বভারতীয় চিত্ররচনার ক্ষেত্রে কোচবিহার ও আসাম অঞ্চলের যে সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন এবং যে ধরণের নূতন নিদর্শনাদি আমাদের রসিকজনের দৃষ্টির সম্মুখে আনয়ন করেছেন সেটি অশেষ ধন্যবাদের যোগ্য। কিন্তু বিহারের পুঁথিচিত্রের বিবরণে ও ওড়িশী চিত্রের কথায় তাঁর সেই পারদর্শিতা সমপর্যায়ের দক্ষতায় উত্তীর্ণ হতে অসমর্থ থেকেছে। এর মধ্যে বিহারের মধ্যযুগীয় ও তার শেষপাদের চিত্রকলার অধিকাংশ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায় অবহেলিত ভাবে পড়ে আছে। আবার উত্তর বিহারের নেপাল সংলগ্ন ও তৎপার্শ্ববর্তী মৈথিল অঞ্চলের পুথি চিত্রকীর্তি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত। ওড়িশার চিত্রকলার প্রাচীনতর নিদর্শন সমূহ কেবলমাত্র স্থানীয় সংগ্রহে নয় অন্ধ্রদেশ সংলগ্ন বিভিন্ন পুস্তকভাণ্ডারে লক্ষণীয় বলে অনুমান করতে বাধা নেই। তালপত্রে খোদিত রেখাপাতের দ্বারা সৃষ্ট ছবি কখনও অনলঙ্কৃত রৈখিক কুশলতায় কখনও রেখার সাহায্যে নির্মিত কক্ষাবলীতে রঙের আরোপে বর্ণাঢ্য।

প্রাচ্য ভারতের চিত্ররচনা পদ্ধতির বিবরণে নিয়োজিত গ্রন্থশেষের অধ্যায়টি লেখকের পরিশ্রম নিষ্ঠা ও সততার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। কাঠের পুথির মলাট, আসামের 'অগর' বৃক্ষের বল্কল 'সাঞ্চীপাত', বিভিন্ন প্রকারের কাগজ, তুলট কাগজ, তালপত্র, মুগার কাপড় প্রভৃতির বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। 'সাঞ্চীপাত' প্রণয়ন পদ্ধতি, হরিতালরঞ্জন ও গন্ধক ধূপায়ন বা 'ফিউমিগেশন' এর প্রথা, বাঁশের পাত ব্যবহার, নাগেশ্বর বা 'নাহর' বৃক্ষের পাতা বা 'অলপাত' প্রভৃতির ব্যবহার ও শিবসাগরে ব্রহ্মদেশীয় পুথি সদৃশ অধিক লাক্ষা আরোপিত পুথির উল্লেখ প্রশংসাযোগ্য। কালি তৈয়ারীর রীতি, রঙ ও রঞ্জকদ্রব্য তৈয়ারী করার পদ্ধতি ও স্বর্ণাভ রঙ উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায় সংগ্রহকারী ও সংরক্ষণবিদদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। 'কাপ ঢেকিয়া' লেখনী, ভূটানে লভ্য 'হেমশিলা'র খড়ি, বাঁশের ভিতরে রক্ষিত মাটি পোড়ান পোড়ামাটির লেখনী এসব লেখকের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত।

পুস্তকে চারটি, বহুবর্ণরঞ্জিত ছবির পৃষ্ঠায় প্রধানতঃ অসমীয় চিত্রকলার নিদর্শন আছে। এক বর্ণ ছবির সংখ্যা প্রায় একশত। লিখিতাংশের ব্যাখ্যামূলক রেখাচিত্র একাদশটি। এক কথায় চিত্রনিদর্শনের ক্ষেত্রে পুস্তকটি সংগ্রহ করে রাখার যোগ্য।

পূর্বভারতীয় চিত্ররীতি নিয়ে সামগ্রিকভাবে বিষয়টিকে প্রকাশ করার উপযুক্ত প্রয়াস এতদিন হয়নি। সেদিক থেকে অধ্যাপক দাশগুপ্ত নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। আশা করব যে তিনি যেন শিল্পরসিক মহলে স্বীকৃতি লাভ করে অবিলম্বে পূর্বভারতীয় চিত্রের আরও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ও উপলব্ধিসহ বর্তমান পুস্তকের আর একটি সংস্করণ প্রকাশার্থ প্রস্তুত হতে সমর্থ হবেন।

ইতিপূর্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ওড়িশা এবং প্রাচীন বাংলার চিত্রকলার পূর্বভারতীয় রীতি ও অবদান সম্পর্কে নান্দনিক ও শিল্পশৈলীগত সুন্দর আলোচনার সূত্রপাত করে বিশিষ্ট স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। তাঁর নিকট পূর্বভারতীয় চিত্রের পরিণত নির্বাচক, সংগ্রাহক, কালনির্ণয়কারী শিল্পরসিক ও চিত্ররসবেত্তা রূপে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক আশা করলে অন্যায় হবে না।

আর্চর দম্পতি কালিঘাটের পট, পাটনার চিত্রশৈলী, শিখশৈলী, য়ুরোপীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট জীবজগৎ ও উদ্ভিদ জীবনের দেশীয় শিল্পীদের চিত্রাবলী প্রভৃতি সম্পর্কে একাধিক পুস্তকের রচয়িতা। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে' রক্ষিত চিত্রাবলী সম্পর্কে আলোচ্য পুস্তকটির বিষয়

কোম্পানীর আমলের চিত্রকলা। সহজ কথায় অষ্টাদশ শতক ও উনবিংশ শতকের এই চিত্রসম্ভার আমাদের কাছে মূল্যবান একাধিক কারণে। এই দুই শতকের পূর্বতন ভারতীয় চিত্রধারা ও চিত্ররচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ঐতিহাসিক কারণে মুঘল, রাজপুত, দখনী, ওড়িশী, চোলমণ্ডলীয় ও গুজরাট সমেত পশ্চিম অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল অথবা হিমালয়াশ্রিত শৈলভূমিতে ও তৎসন্নিহিত সানুদেশের প্রাণস্পন্দনে বিকশিত হয়েছিল সেই চিত্র ও চিত্রী স্বদেশীয় ও বৈদেশিক অনুপ্রেরণা, উপকরণ ও প্রকাশরীতিকে আত্মস্থ করে একান্ত ভারতীয়তায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আর্চর দম্পতির আলোচিত সময় পর্যায় দেশজ রীতি ও য়ুরোপীয় ভাবনা ও প্রয়োজনের এক অভূতপূর্ব মিশ্রণের কাল। কাজেই সঙ্গত কারণেই এই সময়ের চিত্রধারায় আছে সেই বিষয়রীতির ছাপ যেটি পরবর্তীকালে আধুনিক বা সাম্প্রতিক ভারতীয় রূপকল্পনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

আমাদের দেশের চিত্র সম্পর্কিত আলোচনায় এই প্রসঙ্গের অনুপস্থিতি পীড়াদায়ক। কারণ আমাদের সমস্ত চিত্র অলঙ্করণের নক্সা, মুদ্রিত ছবি ও মুদ্রিত পুস্তকের চিত্রসম্ভার একাধিকভাবে অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের অবহেলিত ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতীয় চিত্রকরদের অন্তিম প্রচেষ্টার ফল।

আলোচ্য পুস্তকটি একটি বিবরণমূলক বর্গীকৃত তালিকার আকারে গ্রথিত। এতে কোম্পানী আমলের চিত্রকলাকে দক্ষিণভারত, অযোধ্যা সমেত পূর্বভারত, কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও দেহলী আগ্রা সমেত উত্তরভারত, পশ্চিমভারত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, ক্যান্টন এই সাতটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে দেওয়া হয়েছে কোম্পানী আমলের ছবিতে উৎকীর্ণ শব্দাবলীর অর্থ নির্দেশক তালিকা এবং আগ্রা দেহলী এলাকার ঐতিহাসিক সৌধ সম্পর্কিত চিত্রাদির জন্য প্রয়োজনীয় টীকা। প্রধান পর্যায়সমূহের মধ্যে সাধারণতঃ একাধিক শহরকেন্দ্রিক চিত্র প্রয়াসকে একত্রিত করা হয়েছে।

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মাদ্রাজ সমেত দক্ষিণ ভারতের কোম্পানী চিত্র। এই শ্রেণীর চিত্রকলা বিভিন্ন সংগ্রহশালায় থাকলেও এর সম্পর্কে নির্দেশযুক্ত আলোচনা আমাদের নিকট আসেনি। দক্ষিণী চিত্রাবলীর মধ্যে 'তাঞ্জোরের' কাঠের রথের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৬), তাঞ্জোরের রাজ শোভাযাত্রা (৫) নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ (১৬) যথাক্রমে বর্তমান ভারতের কাষ্ঠরথ সংরক্ষক প্রদর্শক, ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিদকে উৎসাহিত করার মত তথ্য প্রদানে সক্ষম। পাটনা শৈলীর এ প্রকারের চিত্রের কথা অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত। সেটি আর্চর যুগলের প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। মাদ্রাজ, তাঞ্জোর, ভেলোর, কুর্গের পর আছে মুর্শিদাবাদ, কটক, পাটনা, কলিকাতার ছবি। এর মধ্যে পাটনা, কলিকাতার ছবি বহুদর্শিত ও আলোচিত। কিন্তু ছাপ্‌রা, আরা, বেনারসের চিত্র, যেমন রাম ও গুহকের ছবি (চিত্র সংখ্যা ৪৩) প্রভৃতির মধ্যে একটি অনাস্বাদিত দেশজভাব ও য়ুরোপীয়রীতির স্তিমিত মিশ্রণ দেখা যায়। লক্ষ্ণৌ বা অযোধ্যার হাতীর দাঁতের ছবি, কাগজে আঁকা ছবি প্রভৃতি আমাদের বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে একাধিকবার কিন্তু আগ্রা দেহলীর জাঁকজমক দেখানো শোভাযাত্রাদির ছবি কিংবা দেশী কায়দায় বিদেশীয় 'নাবোব'দের নাচ দেখার ছবি (চিত্র সংখ্যা ৫৮ ও ৫৯) পূর্বতন রীতিতে হঠাৎ কর্তা হয়ে ওঠার পর ভারতীয় রাজা রাজড়ার অনুকরণকারী কোম্পানীর কর্মচারীদের সামাজিক অবস্থানের ও জীবন যাপনের নির্ভরযোগ্য দলিল। অন্যদিকে কাশ্মীরের তেলের ঘানি (চিত্র সংখ্যা ৭০) কচ্ছের মেসেড়া (চিত্র সংখ্যা ৭৩) পাটনার দুই হাতে

'কাঠপুত্তলী'র খেলা দেখানোর কথক অভিনেতা, পথের শিল্পী (চিত্র সংখ্যা ৩৯), ত্রিচিনাপল্লীর পাখীধরা ব্যাধ দম্পতি (চিত্র সংখ্যা ১১) ভারতীয় জন জীবনের যে চিত্র আমাদের সামনে এনে দেয় সেটা ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে ও নৃতাত্ত্বিক মহলে আলোচিত 'মেটিরিয়াল কালচার' বা তৈজস নির্ভর বাস্তবিক জীবনযাত্রার অমূল্য উপাদান। এটা আশ্চর্যজনক যে জনসংখ্যা ও কারুশিল্প বিন্যাস নির্দেশক আদমসুমারি, বিভিন্ন ধরণের ক্ষেত্রজ বিবরণ সংগ্রহ পদ্ধতিতে পূর্ণ সমসাময়িক ভারতে এই অমূল্য উপাদানের সুষ্ঠু ব্যবহার আজও হয় নি।

শিল্প পদ্ধতিতে এই সময়ের অধিকাংশ ছবি প্রধানতঃ জলরঙে আঁকা। একশ্রেণীর ছবিতে য়ুরোপীয় নিসর্গচিত্রের ক্ষয়বৃদ্ধি উপস্থিত। আর এক বর্গের চিত্র মূলতঃ স্থাপত্যের কাঠামোতে ধরে রাখা দরবারী দৃশ্যের ছবি যাতে পার্শ্বাগত ভঙ্গির পূর্বী রীতি আলোছায়ার পশ্চিমী রীতির সঙ্গে মিশ্রিত। ভারতের বিভিন্ন বৃত্তির শ্রমজীবিদের ছবি—সাদামাটা পশ্চাদপটের উপরে রক্ষিত তাদের বিশেষ হাতিয়ার বা উপকরণসহ একই কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলোচ্য গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে বিভিন্ন নির্ঘণ্টের সাহায্যে কোম্পানী আমলের শিল্পী-চিত্রকর, প্রত্নসৌধ ও প্রাসাদসমূহ এবং বিভিন্ন বৃত্তির কর্মীদের চিত্র কোথায় পাওয়া যাবে তার স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। বিবরণমূলক তালিকায় চিত্র কোন চিত্ররক্ষণী বা 'অ্যালবামে' আছে, চিত্রের শিল্পী, আনুমানিক বা উৎকীর্ণ সময় অঙ্কন পদ্ধতি, কোন সংগ্রহের নিদর্শন ও মূল সংগ্রহকারীর বিবরণ প্রভৃতি তথ্য প্রদর্শিত। গ্রন্থে ৭৪টি সাদা কাল ছবি ও চারটি বহুবর্ণ ছবি আছে।

কলকাতার কড়েয়া (?) অঞ্চলের শেখ মুহম্মদ আমির, বেনারসের গোপালচাঁদও দক্ষিণের কয়েকজন শিল্পীদের চিত্র এই পুস্তকের চিত্র সম্ভারের মধ্যে কৌতূহলজনক। এসব ছবি অনেকাংশে য়ুরোপীয় কর্মচারী, সৈনিক, ভ্রমণকারী ও ভাগ্যশিকারীদের দ্বারা বা তাদের ব্যক্তির পরিপার্শ্বের আদেশে প্রভাবে অঙ্কিত। কিন্তু কালের ও ইতিহাসের নিয়মে এতে ধরা আছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের বিবরণ। আলোচ্য গ্রন্থের সমশ্রেণীর চিত্র প্রধানতঃ কলকাতার 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে' ও অন্যান্য কয়েকটি সুপরিচিত সংগ্রহশালায় আছে। 'ইণ্ডিয়া অফিস' গ্রন্থাগারের অমূল্য সংগ্রহের এই তালিকা ও চয়নিকা যদি আমাদের কলকাতার এই প্রতিষ্ঠানসমূহে একাধিকবার পরিভ্রমণের উৎসাহকে জাগরিত করে তাহলে এই গ্রন্থ রচয়িত্রীর যথার্থ উদ্যম কলকাতার নাগরিকদের পক্ষে সার্থক হয়ে উঠবে। দেশীয় শিল্পীর পরিশ্রমে সৃষ্ট দেশজ জনজীবনের এই রূপ নিবিড়ভাবে দেখার প্রয়োজন আছে ও থাকবে।

আর্চর দম্পতি য়ুরোপীয় পেশাদার ও অপেশাদার চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলী নিয়ে ইণ্ডিয়া অফিসের সংগ্রহ থেকে আরও কাজ করেছেন।

পট ও পটুয়ার কথা আজ একটি সাধারণভাবে আলোচিত বিষয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মত কয়েকটি বিবরণে একপ্রকার ভাববাদী আধিক্য ও চিরাচরিত শিল্পরসচর্চা করা হয়ে থাকে। ফলে শিল্পপদ্ধতি, শিল্পায়নের ঐতিহ্য আগত উপাদান এবং শিল্পীসমাজের সংবাদ অন্তরালে চলে যায়। শ্রীমান দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের যমপট ও পটুয়াদের অবলম্বন করে রচিত পুস্তিকাটি এই ঐতিহ্যবাহী

লোকশিল্পের প্রথাগত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম। পটের বিষয়ানুগ শ্রেণীবিন্যাসে, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠতর শিল্পীদের উল্লেখে ও শিল্পনৈতিক রূপায়নের প্রাথমিক বর্ণনার সহায়তায় বীরভূমের পটভূমিকে উপযুক্তভাবে উদ্ভাসিত করে তোলার প্রয়াসটি সুন্দর। এটা আনন্দের কথা যে লেখক চমকপ্রদ কথা বা ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত না হয়ে পটের অঙ্কনমাধ্যম, পটের কাগজ ও কাপড়, রঙ-তুলি, পটের গান, পটুয়ার জীবিকা প্রভৃতি বিষয়কে ছেঁদো ভদ্রতার ঠেলায় পড়ে কোন রকমেই উপেক্ষা করেন নি। পটুয়ারা আদতে আর্য কিনা একথা আমাদের দৃষ্টিতে ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে যমের দেহ রূপায়নের রীতি মধ্যযুগের অন্তর্গত ও মধ্যযুগ পরবর্তী রাজ রাজড়ার আদর্শে রচিত কিনা সেটি ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে। যমের ছবিতে দৃষ্ট শিরস্ত্রাণ, বেশভূষা, জুতা, জামা, কাপড় খুঁটিয়ে দেখলে বঙ্গীয় পটরীতির অধুনামন্থর স্রোতধারায় বা প্রবাহে সমসাময়িক কালের ভূমিকা হৃদয়ঙ্গম করার কাজটি সরল হয়ে উঠবে। অবশ্য বহুদিনব্যাপী প্রচলিত লৌকিক আচরণে প্রাচীন রীতিও নবীন ভঙ্গিমার সহাবস্থান হওয়াতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই। পুস্তিকার মধ্য অংশে আলোচিত বৌদ্ধ, পৌরাণিক এ লৌকিক কামনা মণ্ডিত পরলোক-স্বর্গ-নরক জন্মান্তরের কাহিনীটি সুন্দরভাবে প্রসারিত করা হয়েছে। কিন্তু জীবনকেন্দ্রিক কোন সামাজিক পরিবেশে স্বর্গ-নরক ও যমপুরীর রূপকল্পনা পটুয়াসম্প্রদায়কে প্রভাবিত করেছিল শিল্পী কথক-গায়ক-দর্শক শ্রোতা প্রভৃতিকে নিয়ে সেই বিবরণটি আরও বিস্তারিত হলে কৌতূহলজনক ও শিক্ষাপ্রদ হত। গ্রামাঞ্চলের শ্রমজীবি, চাষী শিল্পীকে লোকজীবনের প্রসারতার মধ্যে প্রত্যক্ষ করার কাজটি সময় সাপেক্ষ। এই কারণে শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তিকাটিতে সিউড়ির নিকটস্থ ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন পটুয়া ও সরধার বাঁকু চিত্রকর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিবরণ দুটি একটি প্রয়োজনীয় অভাব মিটিয়েছে। এই দুই শিল্পীর বৃত্তান্তে পট পটুয়া সমাজের এমন অনেক সাদামাটা তথ্য আছে যেটা উন্নাসিক ও পেশাদার লোকশিল্প-চর্চাকারীরা অগ্রাহ্য করেন। বিশেষ করে লেখক পটুয়া চিত্রকরদের কাঠের রথের ছবি, মাটির পুতুল, প্রতিমা নির্মাণ করার কথাটি তুলে ধরে শিল্প ক্ষেত্রে এক ধরণের সমাজবদ্ধ প্রথা ও শিল্প মাধ্যম অতিক্রান্ত সঞ্চরণের সংবাদ দিয়েছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এই তথ্যের ভিত্তিতে দেশজ কলা সম্পর্কে একটি সর্বব্যাপী ও স্থায়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রচেষ্টা করবেন বলে আশা রাখা অন্যায় নয়।

যমপটে দৃষ্ট রাজসভা বিষয়ক চিত্রের মধ্যে এক প্রকারের দেহ সংস্থাপন সংক্রান্ত ধারা আছে যেটি রাজকীয় চিত্রাবলীর স্বদেশীয় রূপকল্পনার দ্বারা কতটা প্রভাবিত অথবা কতটা অনুপ্রাণিত সমসাময়িক নবাব জমিদার অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চলের চিত্রভাবনা ও চিত্রকল্পের দ্বারা সেই তথ্য দর্শক পাঠকের নিকট যথাযথভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস থাকলে বইটি অধিকতর কার্যকরী হত। যমপুরীতে দৈহিক নির্যাতনের চিত্র কাহিনীর অবশ্যই একটা সমাজভিত্তিক কার্যকারণ এবং পটভূমিকা আছে। এই পশ্চাতপটের বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সামাজিক মূল্য অপরিসীম। দণ্ডনীতির প্রকৃতি-পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য স্বভাবজ রূপে এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন মাত্র। এর সঙ্গে আছে ঐতিহ্যবাহী প্রবাহে ভাসমান ভারতীয় শিল্পীকুলের অদ্ভুত রস ও ভয়ানক রসের আলেখ্য রচনার কুশলতার কালক্রমিক, অঞ্চল নির্দিষ্ট ও তুলনা নির্ভর বিচার। এই সামাজিক ও শিল্পকৌশলগত বক্তব্য বর্তমানে সুপরিচিত ও স্বল্প পরিচিত পট পটুয়া সম্পর্কিত পুস্তকাদিতে অনুপস্থিত।

শ্রীমান্ দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রয়াসে গ্রথিত এই পুস্তকে লোকান্তরিত পটুয়াদের নাম ও কর্মস্থানের তালিকা বর্তমানে বীরভূমের পটুয়া অধ্যুষিত গ্রামের নাম, রঙ ও মিশ্রণ মাধ্যমের সংবাদাদি চিত্রাবলী প্রভৃতি মূল লেখার বিষয়কে উপযুক্তভাবে প্রস্ফুটিত করতে সাহায্য করবে।

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত তারাপদ সাঁতরা ও তাঁদের সহযোগীগণ বাংলার লোক শিল্প আলোচনায় পর্যালোচনায় যে সবল ও সুস্থ বক্তব্য, সাদামাটা প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে তথ্য প্রদানের রীতি আনয়নের প্রয়াস করেছেন সেই ধারায় শ্রীমান্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত বিবরণাদি যুক্ত হলে আমরা আনন্দিত হব।

চিত্র রয়েছে ঘটে, পটে, পাটায়, পাতায়, বস্ত্রাঞ্চলে, কাগজ কাপড়ের টানা পাড়ে। কখনও সে চিত্র প্রতীকী, কখনও আলঙ্কারিক কখনও বিষয় বা ভাব বর্ণনে নিয়োজিত। একরঙা রৈখিক ভঙ্গে সম্পূর্ণ অথবা রঙীন আরোপন, অনুলেপনে ভাব ও বিষয়ব্যঞ্জক। সূক্ষ্মতায় মনোমুগ্ধকর ও রেখারঙের কারিগরীতে রসোত্তীর্ণ অথবা সহজ লোকলীলার ছন্দে স্পন্দিত। চিত্র ও চিত্রায়ন ইতিহাসের— সমাজের ও সমাজমানসের দর্শনযোগ্য তথ্যভাণ্ডার। ভারতীয় চিত্রকলার এই সম্পদ সাধারণের আয়ত্তাধীন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় আছে। উপরে বর্ণিত চিত্র সম্ভার ও তার সমশ্রেণীর সংগ্রহ গুরুসদয় সংগ্রহালয়, আশুতোষ মিউজিয়ম, বারাণসীর ভারতকলা ভবন, গৌহাটির আসাম রাজ্য সংগ্রহশালা, পাটনা মিউজিয়ম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত হয়ে আছে সুরসিক পাঠক দর্শকের অপেক্ষায়।

সন্তোষকুমার বসু

একবিংশ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

শ্রাবণ তেরশ' আশী

সমকালীন ॥ প্রবন্ধের মাসিক পত্রিকা

সূচীপত্র

সম্পাদক ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত

আধুনিক সংগ্রহশালায় খনিপ্রযুক্তিবিদ্যা

সমরকুমার বাগচী

ভারতের বিচিত্র অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনপটে চাক্ষুষ শিক্ষার ও প্রত্যক্ষ দর্শন এবং অভিজ্ঞতালাভের বিশেষ প্রয়োজন আছে। ঐতিহাসিক কারণে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক সমাজের স্তর-বিন্যাসের ফলে উচ্চশিক্ষা ভারতে যুগযুগান্তরে কেবলমাত্র তথাকথিত উচ্চ জাতি ও গোষ্ঠীর ভূম্যধিকারী ও তাদের সহযোগীদের করায়ত্ত ছিল। এর ফলে পরবর্তীকালের কারুশিল্পের বিভাজনও গোষ্ঠীভিত্তিক হয়ে কয়েকটি বিশেষিত শ্রেণীর-জীবিকা-অর্জনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ফলিতজ্ঞান বা প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন দিক এইভাবে একাধিক বদ্ধ সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ পড়েছিল রুদ্ধ হয়ে। বিভিন্ন সময়ে দেশজ ও বহিরাগত নানা কারণে উনিশ শতকে চিরাচরিত জাতিভিত্তিক তাত্বিক বিদ্যা ও প্রযুক্তি পদ্ধতির একচেটে অধিকারের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়তে থাকে। সেই ভাঙনের ভাল ও মন্দ নানান দিক মিলিয়ে ভারত এসে পড়ে আধুনিক যান্ত্রিকতায় মগ্ন ও যন্ত্রজ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে থাকা আধুনিক যুগের দ্বারপ্রান্তে।

সাম্রাজ্যিক বাঁধনের ফলে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তোরণের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষীয় জনগোষ্ঠী বা সমাজ সরাসরিভাবে সগর্বে প্রবেশ করতে পারেনি। মানবিক প্রতিভা ও প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব না থাকলেও ক্রমে ক্রমে ভারত য়ুরোপ পরিচালিত যন্ত্রবিজ্ঞানের আধুনিক জগতে পিছিয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তিনটি প্রধান কারণে ভারতের এই ঐতিহাসিক পিছনে পড়ে থাকার অবস্থাকে অতিক্রম করতে হবে। প্রথমতঃ যন্ত্র ও দ্রুত উৎপাদনক্ষম যান্ত্রিক পদ্ধতিকে আয়ত্ত করা দরকার দেশের অধিবাসীদের সামান্যতম সুস্থ-জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তৈজস ও সামগ্রী এবং পদ্ধতিকে করায়ত্ত করার জন্য। দ্বিতীয়তঃ সর্বব্যাপী গণতন্ত্রের সফলতার জন্য দেশের সব অংশের মানুষদের আধুনিক

বিজ্ঞান ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বুদ্ধিদীপ্ত বিচার-বুদ্ধি ও জ্ঞান না থাকলে মানুষ আপন সামাজিক অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধকে যাচিয়ে নেওয়ার সুযোগলাভে বঞ্চিত হয়ে থেকে যায়। তৃতীয় স্তরে আমাদের ফলিত বিজ্ঞান বা প্রয়োগবিদ্যাকে যাতে সহজে দেশের সব অংশের জনশ্রেণীর নিকট অল্প সময়ের মধ্যে প্রচার করা যায় তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদানের মাধ্যম নির্বাচনের দ্বারা অনেকদিন পিছনে থাকার অসুবিধাও প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রথম সারিতে দেশকে নিয়ে যেতে হবে।

মিউজিয়ামের বা সংগ্রহশালার চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের বহু পরীক্ষিত পদ্ধতিই উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্যকে দ্রুততালে কাজে পরিণত করতে সক্ষম। সংগ্রহশালার আবেদন সর্বসাধারণের জন্য—গ্রাম্য পরিবেশ ও পটভূমি থেকে আগত কৃষক ও কৃষিকর্মী থেকে অর্থনৈতিক কারণে শিল্পশ্রমিকে পরিণত মানুষ, আদিবাসী সমাজের সন্তান, শহরের পটভূমিতে লালিত শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের দল, নিম্ন, মধ্য ও উচ্চমানের ছাত্র, কুশলী কারিগর, এমন কি সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা চালিত হয়ে অকালে বিদ্যালয়ের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হওয়া ছাত্রকুল—এরা সকলেই সংগ্রহশালায় এসে সরাসরিভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারেন, তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন অথবা আধুনিকতম প্রযুক্তি পদ্ধতি বা যন্ত্রভিত্তিক ব্যবস্থাকে সমস্ত রকমের পরোক্ষ ও অনাবশ্যক শব্দসম্ভারের প্রতিবন্ধতাকে বাদ দিয়ে বা প্রয়োজনমত অতিক্রম করে গিয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের কার্য-কারণের মৌল সংবাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন।

বহু খনিজ পদার্থ, আকর ও খনিজ দ্রব্যে সমৃদ্ধ আমাদের দেশ। খনিজের আহরণ পদ্ধতি খনি-বিজ্ঞান বা খনিজপ্রযুক্তি পদ্ধতির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শাখা। খনিজ পদার্থের ভূতাত্ত্বিক অবস্থান বিশেষ জ্ঞান বা পদ্ধতিযুক্ত অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ সমীক্ষার সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। খনিজের নির্দিষ্ট অবস্থান নিরূপণের পরবর্তী অধ্যায়ে হাতে কলমে খনিজ আহরণের উপায় ঠিক করার ব্যবস্থা হয়। অবস্থিত খনিজভাণ্ডারের আকার বা পরিমাণ অর্থনৈতিক দিক হতে বিচার করে সুবিধাজনক হলে তবেই খনিজ উত্তোলনকারী সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়ে ওঠে। ভূতাত্ত্বিক স্তর বিভাজনের প্রকৃতি, খনিজ আকরের স্তর উচ্চতা, বেধ ও ঘনত্ব, উপরের উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠ হতে খনিজ আকরের দূরত্ব ও খনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানসম্মত বাতাস চলাচলের উপায়, খনি-সুড়ঙ্গ, খনককক্ষ এবং ভারবাহী স্তম্ভ নির্মাণের সমস্যা ও প্রাচীর সংস্থানের সুবিধা অসুবিধা এই সব কয়েকটি সাধারণ ও প্রাথমিক বিষয় খনিবিষয়ক প্রযুক্তিবিদকে নির্ণয় করতে হয়। খনিমুখের প্রবেশপথের সুড়ঙ্গখনন ও রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থাদি প্রভৃতি ব্যাপারও পূর্বপরিকল্পিত প্রযুক্তিবিদ্যাসম্মতভাবে নির্ণয় করার পরই খনির কাজ আরম্ভ করা চলে।

খনিজ আহরণ পদ্ধতি যে কোন উন্নতিকামী দেশের পক্ষে একটি সম্ভাবনাময় বিষয়। উপযুক্ত খনিজ জাতীয় শিল্পায়নের মূল শাখাগুলিকে জ্বালানী সরবরাহ করে অর্থনৈতিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে। অন্যভাবে; ধাতবখনিজ আকর প্রাথমিক ও মৌল যান্ত্রিক অগ্রগতির ভিত্তিমূলক উপাদানরূপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারতা ও বৈচিত্র্যকে সুষ্ঠু অগ্রগতির পথে নিয়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র শিল্পায়নের অর্থকরী বিবেচনার দিক থেকে নয়; মানবিক ও বৃহত্তর অর্থে সামাজিক প্রয়োজনের একাধিক সমস্যাও খনি-প্রযুক্তি-বিদ্যার

পঠন-পাঠন ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে দেখলে ক্রমশঃ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে খনিপ্রযুক্তি বিদ্যার অনুশাসন ও স্বতঃসিদ্ধসমূহকে অস্বীকার করলে ভূগর্ভস্থ খনি শ্রমিক ও খনক কর্মীদের জীবন সহজেই বিপন্ন হতে পারে। বাতাসের অনুপস্থিতি অপ্রতুলতা ও অভাব, খনিকক্ষ বা সুড়ঙ্গের আকস্মিক নিম্নাভিমুখী ধ্বস্ এ সবই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হতে সক্ষম। আহরণকর্মে নিযুক্ত খনক আকরস্তর হতে খনিজখণ্ড সংগ্রহ করছেন সেই কর্মরত অবস্থায়ও বহু প্রকারের দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। কয়লার ধূলি এবং বিষাক্ত খনিজ গ্যাসের বিস্ফোরণ বা ভূমিনিম্নস্থ জল-স্রোতের আকস্মিক, অপ্রতিরোধ্য অনুপ্রবেশ খনি ও খননকার্যের পক্ষে বিপদজনক।

কোনও কোনও দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করে দেখলে খনিপ্রযুক্তি বিজ্ঞানকে মূলত দ্রব্য আহরণ, আহরিত দ্রব্য সম্ভারের বৈজ্ঞানিক বহনকার্য ও স্থানান্তর করার কাজ বলে মনে করা যায়। পূর্ব প্রচলিত খনিসমূহে দৈহিক পেশীবলের সাহায্যেই আকরস্তর হতে আকরপ্রস্তরখণ্ড আহরিত হত। দৈহিক শ্রমে বা ভারবহনকারী পশুকুলের সাহায্যে আহরিত আকরসম্ভার প্রথমে স্থানান্তরিত করা হত একাধিক আহরক সুড়ঙ্গ-মুখের দ্বারদেশে। সেস্থান থেকে শেষ পর্যন্ত মূলখনি প্রবেশকারী প্রলম্ব অথবা চালু পথ বেয়ে উপরের দিক হতে নিম্নে অবতরণের প্রধান সুড়ঙ্গ পথের সাহায্যে খনিজ আকর নিম্ন হতে উপরে খনি মুখের বাহিরে আনীত হত। বর্তমানের খনিজ আহরণোপযোগী একাধিক শ্রেণীর শ্রম লাঘবকারী যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হচ্ছে প্রযুক্তিবিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলিতে। কিন্তু ঐতিহাসিক কারণাদির দ্বারা অপেক্ষাকৃত পশ্চাদবর্তী দেশে আধুনিক খনক যন্ত্রের ব্যবহার ক্রমশঃ বিলীয়মান দৈহিক শ্রম নির্ভর আহরণ পদ্ধতির সঙ্গে সহাবস্থান করছে। ভারত উপমহাদেশের বর্তমান খনি ও খননাঞ্চলে এই আধুনিক ও পিছিয়ে থাকা পদ্ধতি দুটিকে পাশাপাশি দেখা যায়। এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যন্ত্রবিজ্ঞানের ব্যবহারে সমৃদ্ধ দেশ ও খনিপ্রযুক্তি বিদ্যাকে চাক্ষুষ মাধ্যমে উপস্থাপিত করে যথেষ্ট উপকৃত হতে পারে। কায়িক শ্রমের দ্বারা খনিজ আহরণের শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর ও ধীরগতি উৎপাদন রীতিকে পরিবর্তন করে খনির কাজকে দ্রুত যন্ত্রনির্ভর করতে উদ্যত ভারত উপ-মহাদেশের মত অঞ্চলে খনিজ আহরণে আধুনিকতম ও উন্নততম পদ্ধতিকে যথাযোগ্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখার সুযোগের কার্যকারীতা ও উপযোগীতা খনিজ আহরণ বিজ্ঞানের ছাত্র, শিক্ষক, খনকযন্ত্র সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ যন্ত্রবিদ্, খনি কর্মী ও সাধারণ দর্শকের পক্ষে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আরও দু' একটি কারণও খনিপ্রকরণের সহজে দর্শনীয় উপস্থাপনকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় করে তুলেছে আমাদের বর্তমান পরিবেশে। প্রথমতঃ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যথেচ্ছাচারী খনন বা আহরণ পদ্ধতির ফলে আকর স্তরকে আহরণের অযোগ্য করে তোলার ঘোর বিপক্ষে। খননের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য খনিজ সংরক্ষণও আজ অগ্রসরমানের খনি-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়। খনিজ আকর নিঃশেষিত খনিগর্ভকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভরাট করে ভূপৃষ্ঠের শস্যশ্যামল দৃশ্যপটকে ধ্বস্ নামা থেকে রক্ষা করা, চাষযোগ্য জমি বা জাতীয় যানবাহন পথকে সুরক্ষিত করা প্রভৃতিও এই বিশেষ বিদ্যা অথবা বিজ্ঞানের চর্চার মধ্যে পড়ে। আকর নিঃশেষিত খনিকে ফেলে আসা কোন রকমের সংরক্ষণের কাজ না করে আজকের সামাজিক দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যায় ও দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে নির্দেশিত।

যেসব খনন ও আকর-বহনকারী যন্ত্র ভূগর্ভে ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে ব্যবহৃত

মৃত্তিকা অপসারণ ও খনকযন্ত্রের অনেকাংশে মিল আছে। এ মিল বা সাদৃশ্য মোটামুটিভাবে মৃত্তিকা কর্তন, খনিত মৃত্তিকাস্তূপ সৃষ্টি ও খনক যন্ত্রের কর্তনকারী অংশে সীমাবদ্ধ। ভূগর্ভে ব্যবহৃত যন্ত্র সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত আঁটো-সাটো গড়নের, অনেক কম পরিত্যক্ত দূষিত সত্ত্ব ত্যাগকারী এবং স্বল্প বায়ু ব্যবহারকারী। এ সমস্ত যন্ত্র চালনার জন্য অগ্নি-নিরোধক মুখ্য চালক উপাদান বা চালক শক্তিই ব্যবহার করা হয় ভূর্গস্থে খনিতে। এছাড়া এই শ্রেণীর যন্ত্রপাতি এমনভাবে তৈয়ারী করা হয়, যাতে ক্ষুদ্র আকারের হাতে বহন করার মত নির্মিত যন্ত্রাংশ খনির নিয়ে নিয়ে গিয়ে সম্পূর্ণ যন্ত্রটিকে সামগ্রিকভাবে জুড়ে ফেলা যায় অথবা পুরাতন যন্ত্রাংশ খুলে উপরে আনয়নকরে সারানো যায় ও প্রয়োজনে বদলি করেও দেওয়া যায়। এভাবে দেখলে বোঝা যাবে আধুনিক খনিতে কার্যক্ষম যন্ত্রাদির আকার ও গঠন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন কেন এত অধিক হয়ে পড়েছে।

ভূগর্ভে ব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে 'কনটিনিউয়াস মাইনার' বা নিরবচ্ছিন্ন খনকযন্ত্র, 'অগার বা 'ভোমর যন্ত্র', 'কোল প্লাউ' বা কয়লা লাঙ্গল এবং 'কাটার' বা 'আকরকর্তন যন্ত্র' উল্লেখনীয়। এসব যন্ত্রের মধ্যে প্রথমটিতে যন্ত্রের আগা'র বা ডগা'র দিকের বা মুখেরদিকের থেকে কয়লা খণ্ডিত করে নিয়ে টুকরো করে ফেলা হয়। এখন এই আগার দিক বা কাটবার মুখের দিকটায় শক্তধাতুর কাটবার ফলাসহ গাঁইতির সারি চড়ান থাকে বার বার ঘুরে আসা যাওয়া করা ঘুর্ণায়মান 'রিভলভিং' শৃঙ্খলের সাহায্যে। এই যন্ত্রের দ্বারা উপরে নীচে প্রলম্বভাবে অথবা আড়ে-পাশে আনুভূমিক বা সমান্তরালরূপে আকরস্তর কেটে ফেলবার মত যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা আছে। যন্ত্রটির 'ক্যাটারপিলার ট্রিড' ও 'কনভেয়র', অর্থাৎ দাঁতওয়ালা চাকায় চড়ান বার বার ঘুরে আসা পরিবেষ্টনকারী চওড়া ফিতা ও যান্ত্রিক বহনকারী সাহায্যে খণ্ডিত আকররাশি পিছনের দিকে এসে পড়ে জমা হতে থাকে। 'অগার' বা ভোমর যন্ত্রটি খোলা খনি আহরণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

মৃত্তিকানিম্নস্থ খনিতে কাটার কাজ করার জন্য 'কোল কাটার' নামক কর্তনযন্ত্র আছে। এ যন্ত্রের কাজ চালান হয় 'ডিস্ক' বা গোলাকার, 'বার' বা দণ্ড এবং যন্ত্রসংশ্লিষ্ট 'চেইন' খনক প্রভৃতির সাহায্যে। কর্তনী যন্ত্রের খনন বা কর্তনকারী অগ্রভাগ অথবা 'জিব্' সাধারণতঃ ১৮০° পরিমাণে বাঁকান সম্ভব এবং দরকার মত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উপরে নীচে কেটে খনিতে কাজ করা পদ্ধতি সুপ্রচলিত।

কয়লা বা অন্যান্য খনিজ আকরস্তর খণ্ডিতাকারে আহরিত হবার পরে সে সমস্তকে বোঝাই করার সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য ব্যবহৃত হয় 'কনটিনিউয়াস লোডার' বা নিরবচ্ছিন্ন বোঝাই কল, 'স্ক্রেপার লোডার' বা চেঁছে তোলার বোঝাই কল, 'রিভলভিং' ও 'ওভারকাষ্ট শভেল' বা ঘুর্ণায়মান ও উপর দিক দিয়ে রসদ ফেলা যান্ত্রিক বেল্চাকল ইত্যাদি। এর মধ্যে না থামা বোঝাই কলে একটি আকর জড়ো করার কাঠামো থাকে যন্ত্রের সামনের দিক বা মাথার দিকটিতে। এই কাঠামো বা অবতল হাতা বা চামচের মত যন্ত্রাংশ খণ্ডবিখণ্ড আকরের জড়োকরা স্তূপ অথবা স্তূপিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জড়ো করবার যান্ত্রিক হাত বা বাহু দিয়ে কন্‌ভেয়র বা বহনকারী ফিতার উপরে রেখে মাল টেনে নেবার যান্ত্রিক ব্যবস্থা বা 'হলেজ সিষ্টেমে'র মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হয়। চেঁচে তোলার বোঝাই কল কাজ করে কোদালসদৃশ যন্ত্রাংশের সাহায্যে ও বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের দ্বারা। উপর দিয়ে রসদ (খণ্ডিত আকর) ফেলবার বোঝাই কলের কাজ চলে বড় আকারের ভূগর্ভস্থ খনিতে এবং সাধারণতঃ লোহার

লাইন অথবা দাঁতযুক্ত ঘূরন্তচাকার শৃঙ্খলযুক্ত ফিতা বা 'ক্যাটার পিলার' চালনার উপযোগী যন্ত্রাংশের সাহায্যে।

এখন আমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে কষ্ট হবে না যে একটি কাজে অগ্রসর হবার জন্য একটি সুপরিকল্পিত পর্যায়ক্রমের প্রয়োজন কতখানি। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক দিগ্‌বলয়ে প্রাকৃতিক মৃত্তিকাস্তার বিতরণের স্বাভাবিক পদ্ধতি খুটিয়ে দেখে এবং খনির সুড়ঙ্গ ও প্রবেশখাত খনন করে ফেলার ফলে সৃষ্ট মৃত্তিকাস্তার কৃত্রিম পদ্ধতিতে পুনরায় বিতরণের ব্যবস্থা করাই খনিপ্রযুক্তিবিদ্‌ বা খনি বিশেষজ্ঞের মূল কাজ। একটি খনি কয়েকটি তলের বা স্তরায়িত ঘনাংশকে ('ব্লক অব লেভেলস') ক্রমান্বয়ে খনন করে উপযুক্তভাবে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থাসহ, খনিজ আহরণের ও খনন পরবর্তী অবস্থায় খনিজ আকর অপসারণ করা ও খনিমধ্যস্থ সুড়ঙ্গ, চলাচলের পথ ও খনিমুখের প্রবেশকূপকে যথোচিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা খনি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রধানতম অঙ্গরূপে পরিগণিত হবার যোগ্য। সমতল ও সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত কয়লার আকরস্তর অবস্থানের কেন্দ্রগুলিতে সাধারণতঃ 'লঙওয়ল' পদ্ধতিতে খননের কাজ চালান হয়। অন্য উপায়ে সমমাপের ভূগর্ভস্থ কক্ষাবলীর সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরের খনিবিন্যাস করা হয়। 'লঙওয়ল' কার্যক্রমে একরেখার আনুভূমিক অগ্রগতিতে ক্রমশঃ খনিজ কয়লার স্তরে প্রবেশ করে যায়।

ভারতীয় কয়লার খনিতে সাধারণভাবে সুড়ঙ্গ ও পদ্ধতিকে স্তরের সাহায্যে রক্ষণ করা হয়। এটি 'বোর্ড এণ্ড পিলার' পদ্ধতি নামে পরিচিত। আগম নির্গম সুড়ঙ্গকে খনিপ্রযুক্তি-বিজ্ঞানে বলে 'গ্যালারী'। এই সুড়ঙ্গ আকরের মধ্য দিয়ে যায় এবং একাধিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত আকর-স্তরকে অতিক্রম করে। আকর স্তরের ঢাল অভিমুখীন গ্যালারীকে 'ডিপ গ্যালারী' বা ঢুকে যাওয়া সুড়ঙ্গ অথবা অবতরণকারী সুড়ঙ্গ এবং আকরস্তরের সহিত সমান্তরাল সুড়ঙ্গকে সমতল সুড়ঙ্গ বলা চলে। যে সমস্ত সুড়ঙ্গ আকরকে বহন করার কাজে ব্যবহার করা হয় তার নাম 'মূল সুড়ঙ্গ' বা 'মেইন গ্যালারী'।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পূর্বভারতের রাণীগঞ্জ অঞ্চলে জে. সম্‌নার (J. Sumner) এবং এস জি (S. G. Heatly) নামক দুইজন য়ুরোপীয় সীতারামপুরের নিকট একটি খনির পত্তন করেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে খনিশিল্প ধীরে ধীরে প্রসারতা অর্জন করে। উনবিংশ শতকের পঞ্চম দশকের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্বভারতীয় রেলপথ স্থাপনের পর থেকে কয়লা খনির প্রসার ক্রমশঃ ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই ব্যাপক আহরণের যুগের সূচনা হয় এবং বিংশ শতকের প্রাকালে খনির কাজে অল্পবিস্তর যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে থাকে। বর্তমানে ভারতে বিচূর্ণিত আকর বহনোপযোগী কয়েক প্রকার যন্ত্র এবং কয়লা ও অন্যান্য খনিজকে মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত ভূতাত্ত্বিক স্তরাদি থেকে আহরণ করার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের উৎপাদনের প্রয়াস দৃষ্ট হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আধুনিক খনি প্রযুক্তিবিদ্যার স্থান নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রদের নিকট অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভারতের বেশ কয়েকটি স্থানে ; যেমন শিবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ, ধানবাদের স্কুল অব মাইন্‌সে, খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইন্সটিট্যুট অব টেকনোলজিতে ও যোধপুরে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, খনি প্রযুক্তিবিদ্যা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। ক্রমবর্দ্ধমান খনিজ

উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে সর্বাধুনিক খনিতে ব্যবহারের উপযুক্ত যন্ত্র ও যন্ত্রাংশের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কাম্য। কিন্তু এটা আশ্চর্যের কথা যে খনি প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রেরা এই সমস্ত যান্ত্রিক খনিজ আহরকের কার্যপদ্ধতির পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট সুযোগলাভে বঞ্চিত। একাধিক আনুষঙ্গিক কারণ ছাড়াও ভারতীয় খনিসমূহে যন্ত্রের অনুপস্থিতিই ঐ প্রকার অবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। অন্যদিকে সামগ্রিকভাবে খনিজ আহরণের শিল্প উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ ভারতীয়কে সচেতন করাও একটি অবশ্যকাম্য কাজ বলে গণ্য হবার যোগ্য।

সাধারণ সংগ্রহশালায় মূল প্রদর্শকে বা 'একসিবিট'কে প্রদর্শনীতে বিশেষ প্রয়োজনে একাধিক সহযোগী দর্শনযোগ্য মাধ্যমের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। পূর্ণাঙ্গরূপে একটি মস্ত বড় খনিকে বা বৃহদাকার খনিজকর্তন যন্ত্রকে হয়ত সরাসরি সংগ্রহশালার কক্ষে এনে দেখান সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সাধারণতঃ মূল খনিবিন্যাস বা বিপুলাকার যন্ত্রকে সহজে বোধগম্য করে তোলা যায় রঙে ও আকারে নিখুঁত ক্ষুদ্র আয়তনের সঠিক অনুপাতযুক্ত প্রতিরূপ অথবা 'স্কেল-মডেল' এর সাহায্যে। খনিপ্রযুক্তি-বিদ্যা সম্পর্কীয় সংগ্রহশালার কক্ষে এই প্রকারের ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপের প্রদর্শন বাঞ্ছনীয়। প্রতিরূপ সচল ও নিয়ন্ত্রিত সঞ্চালকের সাহায্যে কার্যরত অবস্থায় দর্শকের কাছে উপস্থিত করলে যন্ত্রবিদ্যার অনেক মূল প্রশ্ন বোধগম্য হয়ে ওঠে এবং চাক্ষুষ অবলোকনের শিক্ষাগত প্রয়োজনীয়তাকে প্রমাণিত করে।

খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রদর্শনকক্ষে জ্বালানী ও শক্তিউৎপাদক রসদরূপে কয়লার খননপদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই সর্বাধিক প্রদর্শন স্থান অধিকার করতে পারে। খনি সমীক্ষা, খনির প্রবেশ-কূপের উৎখনন, খনিমুখ ও খনি অভ্যন্তরস্থ যানবাহন ব্যবস্থা, যান্ত্রিক জল উত্তোলন, মৃত্তিকাভারবাহক ও ভারবহন পদ্ধতি, বায়ুসঞ্চালন সহজদাহ্য গ্যাস, আলোকন এবং খনি দুর্ঘটনা নিরোধক পদ্ধতি—এই সমস্ত পরস্পরযুক্ত ও পরস্পর নির্ভরশীল বিষয় সমূহের সামগ্রিক প্রদর্শনী যে কোন সংগ্রহশালার নিকট একাধিক সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে।

দর্শনীয় দ্রব্য বা তার প্রতিরূপকে উপস্থাপিত করার সময়ে প্রথমেই প্রদর্শনকক্ষে প্রবেশকারী দর্শকদের আগমন-নির্গমন পথ অনুসারে প্রদর্শনদ্রব্যকে রাখা হয়। এখানে এমন কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় না যাতে দর্শককুল সহজেই শ্রান্ত হয়ে পড়েন। দর্শক চলাচলের পথ বা 'ভিজিটর সারকুলেশন পাথ' ঠিক হবার পরে একটি 'প্লান' বা নক্সার ভিত্তিতে ও কাগজ ও কাডবোর্ডের পরীক্ষামূলক প্রতিরূপের মাধ্যমে খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার সংগ্রহশালায় প্রদর্শ রক্ষণের স্থান সঠিকরূপে নির্দ্ধারণ করা হয়।

যে কোন প্রযুক্তিবিজ্ঞান, শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে। এধরণের সংগ্রহশালায় প্রদর্শন দ্রব্যকে দর্শনযোগ্যরূপে প্রত্নক্ষেত্রে বা প্রাকৃতিক সংগ্রহকেন্দ্র থেকে আনয়ন করা হয় না। প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রদর্শশালায় প্রতিরূপ নির্মিত হয় সংগ্রহশালাস্থিত কারিগরীকেন্দ্রে বা 'ওয়র্কশপে'।

প্রতিরূপ নির্মাণের প্রাথমিক স্তরে বিভিন্ন উৎপাদক সংস্থাকে বিভিন্ন খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের নক্সা, আলোকচিত্র এবং সম্ভাব্যক্ষেত্রে আনুপাতিক প্রতিরূপের জন্য অনুরোধ করা হয়ে থাকে। যেহেতু

কর্মরত ও চলন্ত অবস্থায় যন্ত্রের ব্যবহার সহজে বোঝা যায় সেই জন্য আধুনিক কারিগরী প্রদর্শনীতে এই শ্রেণীর যন্ত্রের গুরুত্ব সর্বাধিক। 'মিউজিয়ম' বা সংগ্রহশালা কর্মক্ষম বা চলন্ত প্রতিরূপের একটি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। প্রথমতঃ কর্মরত প্রতিরূপকে যথেষ্ট পরিমাণে সবল শক্তকরে তৈয়ারী করা উচিত কারণ এই রকম প্রতিরূপকে দৈনিক দুই বা তিনশত বার কর্মরত অবস্থায় দর্শক সাধারণের জন্য দেখান হয়। প্রযুক্তিবিদ্যার পদ্ধতিসম্মত নক্সার ভিত্তিতে সংগ্রহশালার কারিগরী কেন্দ্র ধাতব উপাদানে প্রদর্শনযোগ্য প্রতিরূপ উৎপাদিত হয়। আলোকচিত্রের সাহায্যে স্থান বা অচল প্রতিরূপ তৈরী করার কাজটি অভিজ্ঞ শিল্পী প্রতিরূপ নির্মাণবিদ বা 'আর্টিষ্ট মডেলার'-এর।

নিষ্ঠাবান প্রদর্শনবিদ্ ও মিউজিয়মকর্মী কখনই তাঁর আয়োজিত প্রদর্শনকক্ষে ত্রুটিপূর্ণ কোন প্রদর্শনদ্রব্য রাখবেন না। সুতরাং উপযুক্ত করিগরী প্রক্রিয়ায় নিখুঁত প্রতিরূপ প্রভৃতি তৈয়ারী করার সঙ্গে সঙ্গেই মূল প্রদর্শকে রাখার মত সংগ্রহশালার প্রদর্শাধার বা 'ডিসপ্লেক্যাবিনেট' 'পেডেষ্টাল' বা পাদপীঠ অথবা পাত্তাগরক্ষক এবং অন্যান্য প্রদর্শন সামগ্রী ও আসবাবেরও ব্যবস্থা করার কাজ চলতে থাকে।

প্রদর্শের আকারে আয়তন ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে পূর্বকল্পিত ও সাবধানে যথাযুক্ত বিজ্ঞপ্তি বা প্রদর্শ-পরিচিতি সরল ও অলঙ্কারবিহীন অক্ষরমালার সাহায্যে দর্শককে প্রদর্শিত বস্তুসমূহ সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলা হয়। খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রদর্শন কক্ষে বৈজ্ঞানিক খবরাখবর সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বিজ্ঞান-চেতনাবিহীন সাধারণ আগন্তুকের জন্য বিশেষভাবে অভিজ্ঞ প্রদর্শক-ব্যবস্থা বা 'গাইড-সার্ভিস্' থাকে। ভারতের সংগ্রহশালা অনেক সময়েই পুরাতন বসবাসের বাড়িতে বা প্রাসাদে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে নীচু জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের আলো ঢুকে প্রদর্শাধারের কাচের আবরণীতে প্রদর্শিত বস্তুকে দেখার পক্ষে প্রতিবন্ধকস্বরূপ অযাচিত ও অকাম্য প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলন সৃষ্টি করে। এই প্রতিফলন কেবলমাত্র প্রদর্শাধারের ভিতরে উজ্জ্বলতর আলোকন পদ্ধতি দ্বারা বা নীচু জানালাকে কাঠের পাত দিয়ে ঢেকে দিয়ে সঠিকভাবে রোধ করার চেষ্টা করা যায়। মূল প্রদর্শ ছাড়াও খনি-প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে যুক্ত বিষয়কে একাধিক ভাবে সাজান যায়। তবে ছাত্রদের পক্ষে খনিপ্রযুক্তি-বিজ্ঞানের পাঠ্য পুস্তকে পড়া বা খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার তাত্ত্বিক পড়াশুনায় পরোক্ষরূপে আহরিত জ্ঞান-ভাণ্ডারকে উদাহরণ সহযোগে সুস্পষ্ট করে তোলাই এই প্রকারের কারিগরী প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত। খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার অধুনা প্রচলিত শিক্ষাক্রমের দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ছাত্রদের প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষের দুইমাস কাল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের জন্য দুইটি কার্যরত খনিতে হাতেকলমে কাজে যোগদান করতে হয়। এছাড়া ছাত্রদের নিকট চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় খনিপ্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত কারিগরী পদ্ধতিকে আয়ত্ত করার অন্য কোন সুযোগ নাই। ছাত্রদের মাঝে মাঝে শিক্ষণীয় ও বিষয়নির্দিষ্ট চলচ্চিত্র দেখান হয় বটে কিন্তু কার্যরত খনিতে গমন করার পর কোন কোন বিষয়সমূহকে বিশেষভাবে দেখতে ও মনে রাখতে হবে এব্যাপারেও তাদের কোন পূর্বপরিচিতি বা প্রারম্ভিক জ্ঞান থাকে না। এর ফলে শুধু উদ্দেশ্যহীন ও প্রক্ষিপ্তভাবে কার্যরত খনিতে যাতায়াতই সার হয় মাত্র। ভারতে প্রচলিত খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাক্রমে আধুনিক খনিবিজ্ঞানের অধুনাতম পদ্ধতি পড়ান হলেও সে সমস্ত দেখে শেখার কোন উপায় নেই।

খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার মিউজিয়াম প্রদর্শনীতে বহুপ্রকারের খনিপদ্ধতি ও আকর আহরণ, বিচূর্নিত আকর বহন, মুক্তপ্রাঙ্গন খনি পদ্ধতি, খনিপ্রবেশকূপের সমস্যা খনিমুখের নিকটস্থ ব্যবস্থাদি, ভাররক্ষণ প্রক্রিয়া প্রভৃতির বিভিন্ন উপায় ও মাধ্যমকে একসঙ্গে দেখার ও প্রয়োজনে বিবর্তিত বিষয়ানুক্রমে ও তুলনামূলক বিচারে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

সংগ্রহশালাস্থিত খনি প্রযুক্তিবিদ্যার বা খনিপদ্ধতির কক্ষে একই স্থানে সমগ্র খনির কাজ দেখা সম্ভব। খনির প্রবেশকূপ সংরক্ষণের ইষ্টকনির্মিত প্রাচীর স্থাপন, জমান কংক্রীট প্রক্রিয়া, শীতায়ন ও 'সিমেণ্টেশন' কার্যকৌশল খনিবিদ্যার শিক্ষাক্রমে পড়ান হলেও এই সমস্ত বিভিন্ন কর্মকৌশলকে একই স্থানে অবলোকনের সুযোগ ছাত্রদের নিকট সহজলভ্য নয়। খনিকূপ খননের যান্ত্রিক কৌশল সংগ্রহশালার সচল মডেল বা প্রতিরূপ প্রভৃতির সাহায্যে সহজে বোঝান যায়। 'সুড়ঙ্গ ও স্তম্ভের' ভারবিতরণী পদ্ধতি ও 'লঙ্ ওয়াল' খনিখননের পার্থক্য মিউজিয়মবিদের পক্ষে কার্যকরী করে দেখান শক্ত নয়। ভারতের অপেক্ষাকৃত চওড়া ও মাটির নিকটস্থ কয়লার আকরস্তরে 'সুড়ঙ্গ ও স্তম্ভ' স্থাপনের পদ্ধতি অধিকতর প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে অধিকতর উৎপাদনের জন্য উচ্চ বা যথেষ্ট গমনাগমন বা চলাচলের ক্ষমতাসম্পন্ন 'কনটিনিউয়াস মাইনার' বা নিরবচ্ছিন্ন খনক যন্ত্র অথবা, 'টায়ারে' চডান কয়লা আকর কর্তন যন্ত্র সংগ্রহশালায় নিখুঁত প্রতিরূপের সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের আলোকচিত্র থেকে খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান হয় না। কারণ চিত্রায়ণের দ্বারা যন্ত্রের একপাশের দৃশ্যই সাধারণতঃ দেখা যায়। অন্যদিকে সুষ্ঠ ত্রৈমাত্রিক প্রতিরূপ সমগ্র যন্ত্র ও তাতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশকে সকল অবস্থায় কি ভাবে কাজ করা হয় সেটিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে সমর্থ। ইতিপূর্বেই আমরা জানি যে খনিখননের 'লঙ্ ওয়াল' পদ্ধতি ভারতের ক্ষেত্রে দেখার সুযোগ কম এমতাবস্থায় এই পদ্ধতিতে নিয়োজিত কয়লাকাটার যন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় ভারবহনকারী ব্যবস্থা, সাঁড়াশি বেল্ডবাহক বা 'প্যানজার কনভেয়র' এবং দূর হতে চালনার মত করে তৈরী 'রিপিং মেশিন' বা ছেদককল দীর্ঘাকার আকর প্রাচীরে বা 'লঙ্ ওয়াল ফেস' এ কিভাবে কাজ করে তার অতুলনীয় প্রদর্শন করতে সক্ষম কেবলমাত্র সফল সংগ্রহশালার কর্মীকুল।

কয়লার উৎপাদন অধিক হলেই প্রায় সাথে সাথে কয়লার বহনব্যবস্থাকে উন্নত ও যান্ত্রিক করে তোলা ছাড়া উপায় থাকে না। মিউজিয়মের প্রশস্ত 'ডায়োরামা' বা ত্রৈমাত্রিক দৃশাধার পূর্বতন অযান্ত্রিক খনিমুখের ব্যবস্থা, 'শাণ্ট ব্যাক্' বা 'ট্রাভারসার' খনিমুখ পদ্ধতির ব্যবস্থাও আরও উন্নত, 'লফকো' পদ্ধতির খনিমুখ বিন্যাসকে সার্থকভাবে দেখাতে পারে।

খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্রেরা বিভিন্ন 'পিটটপ লে আউট' বা খনিমুখের ব্যবস্থাদির নক্সা আঁকে পরীক্ষা পাশের জন্য। কিন্তু মিউজিয়ম প্রদর্শনীতে প্রত্যক্ষভাবে না দেখলে ঐ বিভিন্ন খনিমুখের বিন্যাসসম্বন্ধীয় নক্সার উপযোগীতা বোঝা যায় না। খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষাক্রমে খনি অভ্যন্তরস্থ বায়ু সঞ্চালনের স্বাভাবিক উৎসমুখ হতে আগত বা নির্গত বায়ুপ্রবাহ, উচ্চারোহী ও অবরোহনকারী বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুবিতরণের প্রক্রিয়া নিয়ে পড়াশুনা করে থাকেন। কিন্তু আদর্শিত ও অদৃশ বায়ুস্রোত কেবলমাত্র মিউজিয়মে প্রদর্শিত সরলীকৃত ও চলন্ত প্রদর্শন সামগ্রীর মাধ্যমেই দেখান যায়।

খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক সংগ্রহশালাতে আধুনিক খনি অভ্যন্তরকে দেখান হয়। এর জন্য

মিউজিয়ম গৃহের নিম্নের ভিত্তিসংস্থানকে কাজে লাগান হয়। বর্তমানে পশ্চিম জর্মনীর 'রূঢ়' অঞ্চলের বেগরাউ মিউজিয়ম (বোখুস), 'ডায়েশ মিউজিয়ম' (মিউনিক), জাতীয় প্রযুক্তিবিদ্যার সংগ্রহশালা প্রাগ এবং শিকাগোর বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের মিউজিয়ম বা 'সায়েন্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী মিউজিয়ম' প্রভৃতিতে পূর্ণাঙ্গ কৃত্রিম খনি ও খনিগর্ভের প্রতিরূপ আছে।

ভারতে খনিপ্রযুক্তিবিদ্যা বিকাশের ক্ষেত্রে মিউজিয়ম পদ্ধতির ব্যবহার করার সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল। পূর্বভারতের বিখ্যাত উন্নতধরণের কয়লার আকর ধানবাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকট কোনও উপযুক্ত কিন্তু কয়লা আকর নিঃশেষিত, ফেলে যাওয়া খনিতে হাতে-কলমে সব রকম কাজের শিক্ষামূলক প্রদর্শনী সমন্বিত মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থ খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার মিউজিয়ম গড়ে তোলা যায়। ভারতের ভবিষ্যতের প্রদর্শনকক্ষে নির্বাচিত প্রতিরূপায়ণে আনবিক খনি ও খনন পদ্ধতি, সমুদ্রতলস্থিত খনি ও আকর আহরণের কর্মকৌশল এবং মহাকাশ অতিক্রান্ত চন্দ্রপৃষ্ঠের খনি ও খননক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নির্ভর প্রতিরূপ দেখান যেতে পারে।

বর্তমানে ভারতের একাধিক মিউজিয়ম বা সংগ্রহশালায় ভূতত্ত্বের নিদর্শন সমৃদ্ধ কক্ষ দেখা যায়। এই সব প্রদর্শন কক্ষে বিভিন্ন প্রকারের দাবী ও স্বল্প মূল্যের অলঙ্করণের উপযুক্ত পাথর, গৃহনির্মাণের উপযোগী পাথর ও সমশ্রেণীর উপাদান, অশ্মীভূত প্রাণীকুল ও উদ্ভিদীয় নিদর্শন, নানান ধাতব আকর, আঁশযুক্ত খনিজ পদার্থ, ও খনিজ জ্বালানী যথা বিভিন্ন কয়লা প্রভৃতির উপাদানসম্মত শ্রেণীভিত্তিক অথবা ব্যবহারনির্ভর বর্গবিন্যাসভিত্তিক প্রদর্শনী দেখা যায়। কিন্তু এধরণের প্রদর্শনীর আবেদন প্রধানতঃ খনিজবিদ্যায় বা ভূতত্ত্বের বিশেষজ্ঞ সংগ্রাহক ও শ্রেণীসংস্থানকারীদের জন্য কার্যকরী। তাও লাতিন নামের জটিল পরিচয়জ্ঞাপক বিজ্ঞপ্তি বা 'লেবেল' দিয়ে বোঝান এই ধরণের কক্ষের জিনিষকে সংগ্রহশালা পরিভ্রমণকারী সাধারণ দর্শক কেবলমাত্র পাশকাটিয়ে চলে যান। কিন্তু খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার প্রদর্শনীর চাক্ষুষ আবেদনকে অত সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কৃত্রিম দেওয়ালের পিছন থেকে 'স্লাইড প্রজেকটার' বা স্থিরচিত্র প্রক্ষেপকযন্ত্রের স্বয়ংক্রিয় পরম্পরায় দেখান কয়লার জন্মবৃত্তান্ত, ফাঁপাভোমর বা 'ড্রিল'-এর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ আকরস্তরের নমুনা তুলে নিয়ে যাচাই করার পদ্ধতি, খনির অভ্যন্তরের বায়ু-সঞ্চালক পাখা, খনির দুর্ঘটনা-নিরোধ বাতি ও আলোকন, খনিযন্ত্রের কর্মরত প্রতিরূপ ভারবিতরণ প্রভৃতিতে সাধারণ দর্শকের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। আধুনিক খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার কক্ষে প্রদর্শন সহায়ক সমস্ত কটি পদ্ধতি ব্যবহৃত। সাধারণ কর্মরত অথবা ক্ষুদ্রাস্থিত বা 'বৃহদীকৃত প্রতিরূপ। ত্রৈমাত্রিক প্রদর্শাধার বা ডায়োরামা, দর্শক-নিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন যন্ত্র ও যান্ত্রিক পদ্ধতি, সাল নক্সা বা চার্ট, এ সমস্তই দর্শকের পক্ষে প্রয়োজনীয়।

ভারতের বহু গুরুত্বপূর্ণ খনি এখন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণের জাতীয় উদ্যোগে ও অর্থবরাদ্দে কর্মরত এই প্রতিষ্ঠানগুলি কি পদ্ধতি অবলম্বন করে কাজ করে চলে বা তাদের খনিজ আহরণের প্রকৃতি, পরিমাণ ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা কি—এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তরদানের একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত। এমতাবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত খনিপ্রকল্পের উদ্যোগে দেশের বিভিন্নস্থানের খনি অঞ্চলে একাধিক ক্ষুদ্রাকার সংগ্রহশালা বা মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। অন্যান্য প্রধানুগ বিষয় ছাড়াও এই সমস্ত সংগ্রহালয়ের খনি দুর্ঘটনা নিরোধক কার্যক্রম ও দুর্ঘটনাকালীন জরুরী ব্যবস্থার

সম্পর্কে প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার। এইসব প্রদর্শনীর 'গাইড-সার্ভিস' বা 'প্রদর্শক ব্যবস্থা'তে এমন কর্মীরই প্রয়োজন যাঁরা সহজে বোধগম্য 'লেবেল' বা প্রদর্শন বিজ্ঞপ্তির সাহায্যে খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার ও খনি-দুর্ঘটনা এড়ানোর উপায় সাদামাটা কথায় সর্বশ্রেণীর কর্মীর নিকট তুলে ধরতে সক্ষম। সম্প্রতিকালের কয়েকটি ভয়াবহ খনি-দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এধরণের সংগ্রহশালার মূল্য অত্যধিক। খনিতে যান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়োগ সম্পর্কেও যথেষ্ট অবহিত হবে প্রস্তাবিত সংগ্রহশালা সমূহ। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখনও আমাদের দেশের খনিকর্মীদের এক বৃহৎ অংশ খনিতে ব্যবহৃত যন্ত্র ব্যবহারের কারিগরীতে ও দক্ষ পরিচালনায় বা কুশলতায় অভ্যস্ত নন। এক্ষেত্রে দুর্গাপুরস্থ 'মাইনিং এণ্ড এলায়েড মেশিনারীজ কর্পোরেশন' বা সমশ্রেণীর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানও খনিতে কার্যক্ষম প্রচার ও প্রসারের জন্য আধুনিক মিউজিয়ম পদ্ধতিকে গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম' অথবা 'ভারতীয় যাদুঘর' বা সংগ্রহশালায় দেশের সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি রক্ষিত আছে। সাধারণ মিউজিয়ম গমনকারী দর্শকদের জন্য এই ভূতত্ত্বের কক্ষটি উন্মুক্ত থাকে। এখানে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা থেকে বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণী ও উদ্ভিদের ফসিল, প্রস্তরাদি জ্বালানী ধাতব আকর ও অন্যান্য খনিজ, মূল্যবান পাথর, প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রদর্শিত বর্তমানে লুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় প্রাণীদের অশ্মীভূত কঙ্কাল, কয়েকটি প্রদর্শাধার ও অধুনা সংস্থাপিত একটি ঘূর্ণনক্ষম ভূগোলকের সাহায্যে পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক বিন্যাস এই প্রদর্শন কক্ষের অন্যতম আকর্ষণ। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ শহরস্থিত 'বীরবল সাহনি ইন্সটিট্যুট অব্ প্যালিওবটানি'র বিভাগীয় প্রদর্শনশালায় বা মিউজিয়মে উদ্ভিদজ ফসিল ও শিলীভূত নিদর্শনের সুবৃহৎ সংগ্রহ প্রত্ন-উদ্ভিদবিজ্ঞানের বা 'প্যালিওবটানি'র চর্চার কেন্দ্ররূপে বিশেষজ্ঞদের নিকট সুপরিচিত। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সর্বার্থসাধক সংগ্রহশালা সমূহে ও উচ্চতর শিক্ষাকেন্দ্রে অল্পবিস্তর ভূতত্ত্বের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে।

ভারতে ভূতত্ত্ববিদ্যার চর্চার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট খনিজ আকর আহরণ বা নিষ্কাশনের সমস্যা ও খনি প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সংগ্রহালয় অধিক নয়। রাজস্থানের বিলানি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় একটি প্রমাণ আকারের কয়লা খনি হতে এক চতুর্থাংশ পরিমাণে ক্ষুদ্রকার একটি ভূতলস্থিত প্রদর্শনযোগ্য কয়লার খনি আছে। ধানবাদের 'ভারতীয় খনিবিদ্যা বিদ্যালয়ে' বা 'ইণ্ডিয়ান্ স্কুল অব মাইনসে' ত্রৈমাত্রিক প্রতিরূপ প্রভৃতি শিক্ষাদানকালে ব্যবহৃত হয়।

ভারত সরকারের অর্থে 'কাউন্সিল অব্ সায়েন্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল, রিসার্চ' পরিচালিত কলিকাতাস্থ 'বিজ্ঞান ও কারিগরী সংগ্রহশালায়' (বিড়লা ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এণ্ড টেক্‌নোলজিকাল মিউজিয়ম নামে পরিচিত) একটি আধুনিকতম খনিপ্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত প্রদর্শনকক্ষ আছে। এখানে খনি-প্রযুক্তিবিদ্যার উপরিলিখিত প্রায় সকল প্রকার প্রদর্শনদ্রব্যের সংগ্রহ ছাত্র ও জনসাধারণের কৌতূহল নিবারণে সক্ষম। 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে'র ভূতাত্ত্বিক নিদর্শনের সমারোহ ও উপরউক্ত কারিগরী সংগ্রহশালার খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার কক্ষ ভূতত্ত্ব ও খনিপ্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে কলিকাতাকে দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে একটি ন্যায্য স্থানলাভের যোগ্য করে তুলেছে।

ননীগোপাল মজুমদার

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলার দেবরাজপুর গ্রামে ননীগোপাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল ডাঃ বরদাপ্রসন্ন মজুমদার। ননীগোপাল পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আই এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ননীগোপাল কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতে 'অনার্স' শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য প্রবেশ করেন। ইতিপূর্বেই তাঁহার সহিত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় স্থাপিত হইয়াছিল। রাখালদাসের সহায়তায় তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল প্রভৃতি ধুরন্ধর পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহচর্যে ননীগোপাল ছাত্রাবস্থাতেই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃতে প্রথমশ্রেণীর অনার্স সহ ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকত্ব লাভ করেন। এই পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য তিনি রৌপ্যপদক ও একটি বৃত্তিও লাভ করেন। স্নাতকত্ব লাভের পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম-এ ক্লাসে যোগদান করেন। এই সময়ে এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। ননীগোপালের মেধায় ইনি এবং ইঁহার সহকারী অধ্যাপকেরা সকলেই মুগ্ধ হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ননীগোপালকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেক্‌চারার নিযুক্ত করা হয়। এম-এ এমন কি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন তাম্রশাসন শিলালিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখিয়া বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ছাত্রাবস্থায়ই 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী' নামক গবেষণামূলক পত্রিকায় তাঁহার রচিত ১০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (১—১০)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্‌চারার রূপে কার্য করিতে করিতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় বজ্র-সাধনা' বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ননীগোপাল বহু আকাঙ্খিত গ্রীফিথ পুরস্কার লাভ করেন। পর বৎসর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল মোয়াট পদক ও প্রেমচাঁদ রায় চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তির জন্য তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল খরোষ্ঠি লিপিমালার তালিকা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে আবিষ্কৃত সমস্ত খরোষ্ঠি লিপির আলোচনা ননীগোপালের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। ভারতে মৌর্য যুগের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ইরাণ দেশীয় আখামেনীয় বংশীয় সম্রাটগণের শাসনাধিকারে ছিল। প্রাচীন আখামীয় লিপিকে ভারতীয় রূপে সংস্কৃত করিয়া এই সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খরোষ্ঠি লিপি প্রবর্তিত হয়। স্থানীয় লিপি হিসাবে খরোষ্ঠি লিপি খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পরেও এই অঞ্চলে এবং ভারত প্রভাবিত মধ্য এশিয়ার স্থানে স্থানেও প্রচলিত ছিল। মৌর্য ও কুষাণ সম্রাটদের কালের বহু শিলালেখাদি (৪) খরোষ্ঠি লিপিতে প্রচলিত

হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের বহু উপাদান এই লিপির পাঠোদ্ধার দ্বারাই সম্ভব। সুপ্রসিদ্ধ খরোষ্ঠি-লিপি বিশারদ অধ্যাপক ষ্টেন কোনো (Prof. Sten Konow 1867—1948) তাঁহার খরোষ্ঠি লিপি সম্বন্ধীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে ননীগোপালের খরোষ্ঠি বিষয়ক গবেষণা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। ননীগোপালের এই গবেষণা মূলক প্রবন্ধটি কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (জার্নালে) প্রকাশিত হইয়াছিল (১১)।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন ও অবিভক্ত বঙ্গের রাজশাহী জেলার রাজশাহী শহরে অবস্থিত বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালার অধ্যক্ষের (Curator) পদ গ্রহণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ চন্দ, দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণের চেষ্টায় এই বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি প্রত্নশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লিপিমালার পাঠোদ্ধার এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে ননীগোপাল সবিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলিয়াই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া এই নূতন পদটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালার অধ্যক্ষতা কালে ননীগোপাল নালন্দায় প্রাপ্ত দেবপালের একটি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন ও তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার এই গবেষণা নিবন্ধটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (১২)। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালার অধ্যক্ষতা কালেই ননীগোপাল প্রাচীন বাংলার চন্দ্র, বর্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের সমকালীন যে সকল তাম্রশাসন ও শিলালেখাদি এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহা সম্পাদন করিয়া প্রকাশ করেন। এই মহামূল্য গ্রন্থটি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির লেখমালা সিরিজের তৃতীয় খণ্ড রূপে প্রকাশিত হয় (১৩)। এই সিরিজের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডটি গৌড় রাজমালা ও গৌড়লেখমালা নামে যথাক্রমে ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রের দ্বারা সম্পাদিত হয়। প্রাচীন বাংলার ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে শেষোক্ত দুইটি গ্রন্থের মত ননীগোপালের সম্পাদিত গ্রন্থটিও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রত্নশালাধ্যক্ষ ননীগোপালের বিদ্যাবত্তার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধ্যক্ষ জন মার্শাল (Sir John Marshall, 1876—1958) তাঁহাকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষতঃ উৎখনন কার্য পরিচালন বিষয়ে শিক্ষাদান করিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হন। তাঁহার অনুরোধে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি ননীগোপালকে এই বিশেষ শিক্ষালাভের সুযোগ দান করেন। অতঃপর ১৯২৫-২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুইবার ননীগোপাল সার জন মার্শালের সহিত মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে উৎখনন অভিযানের সহযাত্রী হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও চেষ্টায় এই স্থানে উৎখনন কার্য আরম্ভ হয়। এই স্থানটি অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইহার কিছুকাল পূর্বে অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের মণ্টোগোমারী জেলার অন্তর্ভুক্ত হরপ্পা নামক স্থানে সিন্ধুনদীর অববাহিকায় উৎখননের ফলে তাম্রাশ্মীয় (Chalcolithic Age) যুগের বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। রাখালদাস তাঁহার অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি বলে বুঝিতে পারেন যে সিন্ধু প্রদেশের এই অঞ্চলেও অনুরূপ সভ্যতার নিদর্শন

পাওয়া যাইবে। উৎখনন কার্য চলার ফলে রাখালদাসের এই অনুমান সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহেঞ্জোদাড়ো অঞ্চলে উৎখনন কার্য আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু ইহা অব্যাহত থাকে নাই। ১৯২৫ হইতে ২৭ এর মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় অধিকর্তা মার্শাল ননীগোপাল সহ দুইবার এই অঞ্চলে উৎখনন অভিযান পরিচালনা করিয়া এই কার্যের সুদূর প্রসারী সম্ভাবনা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মার্শালের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তরুণ প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ ননীগোপালের সহায়তা ব্যতীত এই কার্য সম্ভব না হইতেও পারে। এই কারণে তিনি ননীগোপালকে স্থায়ী ভাবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একটি উচ্চপদে নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ননীগোপাল মহেঞ্জোদাড়ো ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে উৎখনন অভিযানে নিযুক্ত থাকেন। এই সময়ে ননীগোপাল কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তু ও লব্ধ তথ্য সমূহের বিবরণ তাঁহার রচিত 'এক্সপ্লোরেসনস্ ইন সিন্ধ' নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। এই বহু মূল্যবান গ্রন্থটি ভারতীয় প্রত্ন বিভাগের একটি বিবরণী (মেমোয়রস) রূপে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় (১৪)। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর ধুরন্ধর প্রত্নশাস্ত্রীরূপে ননীগোপালের খ্যাতি বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে উৎখনন কার্য পরিচালনা করিয়া ননীগোপাল মহেঞ্জোদাড়ো সন্নিহিত সিন্ধু উপত্যকায় আহম্মদ শাহ, আলি মুরাদ, আমরি, আমিলানো, বাচানি, বান্ধনি, চহ্নুদাড়ো, চৌরা, ডিসয়, চল, ডাম্বুথি, গোরাণ্ডি, গাজি সাহপীর ঝাঙ্গার, ঝাংড়ি, ঝুকর, ওরাঙ্কি, খড়ুয়, কোট্রাম, বুথি, লহুমঞ্জোদাড়ো, লাথিয়োপীড়, পোখরানপণ্ডি পাণ্ডিওয়াহি, মীরমাজারত, সাজোকাটিরো, ট্যাণ্ডো, রহিমথান, থারোপাহাড়, ত্রীভি প্রভৃতি প্রত্ন সমৃদ্ধ স্থান সমূহ আবিষ্কার করেন। এই স্থানগুলির বর্ণনা ইহাদের প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও এই সব স্থানে লব্ধ প্রত্ন দ্রব্যাদির বিবরণ তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ননীগোপাল এই গ্রন্থে ইহাও প্রমাণ করেন যে কিছুকাল পূর্বে (১৯২৬-২৮) সার অরেল ষ্টাইন দক্ষিণ বেলুচিস্থানে উৎখনন কার্য চালাইয়া যে সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার করেন তাহার সহিত সিন্ধু-সভ্যতার আত্মিক সম্বন্ধ আছে। ননীগোপাল তাঁহার গ্রন্থে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে সিন্ধু-সভ্যতার যে যুগের প্রত্নবস্তু সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই যুগের পূর্ববর্তীকালে যে এই সভ্যতা বর্তমান ছিল না তাহা নহে। আবার যে যুগের প্রত্নবস্তু পাওয়া গিয়াছে সেই যুগেই এই সভ্যতা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল ইহাও সত্য নহে। বর্তমান কালে পাকিস্তানের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ও বৈদেশিক উৎখনবিদদের প্রত্নাভিযানের ফলে ননীগোপালের এই দুইটি মতই অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হইয়াছে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপালকে প্রত্ন বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখায় স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৩১ হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ননীগোপাল পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উৎখনন পরিচালনা করেন। ১৯৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ বঙ্গের হুগলী জেলার মহানাদ নামক স্থান খনন করিয়া ননীগোপাল বহু প্রাচীন তৈজসপত্র উদ্ধার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে এইগুলি খ্রীষ্টীয় ৫ শতাব্দীর গুপ্ত যুগের সামগ্রী। এই সময়ে তিনি বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ষ্টেশনের নিকট দেউলিয়া গ্রামে মাটি খুঁড়িয়া একটি প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত মন্দির আবিষ্কার করেন। অবিভক্ত বঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী মহাস্থানগড়ের নিকট গোকুল নামক গ্রামের

মেঢ় বা লখিন্দরের মেঢ় নামক একটি ঢিপি খনন করিয়া ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল গুপ্ত যুগের একটি স্থাপত্য নিদর্শন ও অন্যান্য বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কার করেন। এই সময়েই তিনি অবিভক্ত বঙ্গের দিনাজপুর জেলার হিলি রেলষ্টেশনের (বর্তমান বাংলাদেশ) দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত বাইগ্রামে শিবমণ্ডপ নামে খ্যাত ঢিপি খনন করিয়া সেই স্থানে ১২৮ গুপ্তাব্দের (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) একটি তাম্রশাসন উদ্ধার করেন।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ননীগোপাল কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। (সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট আর্কিওলজিক্যাল সেকৃশন)। এই সময়ে এই পদাধিকারীর উপর পূর্বাঞ্চলীয় বিভাগের উৎখননাদি কার্যের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল। এই পদে নিযুক্ত থাকাকালে ১৯৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ননীগোপাল তিনবার বিহার রাজ্যের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লৌরিয়া নন্দনগড় স্থানে উৎখনন অভিযান পরিচালনা করেন। এই স্থানটি বেতিয়া শহরের ১৬ মাইল উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এই স্থানে বহু সংখ্যক ত্রিকোণাকৃতি স্তুপ বর্তমান, এই স্তুপগুলির অনতিদূরে সম্রাট অশোক নির্মিত ৩৩ ফিট দীর্ঘ বালু-প্রস্তর নির্মিত একটি মসৃণ স্তম্ভ আছে। স্তম্ভ-শীর্ষে ঘণ্টাকৃতিযুক্ত পীঠিকার উপর একটি সিংহমূর্তি আছে। এই স্থানটি ভারতীয় প্রত্নবিভাগের নিকট সুপরিচিত থাকিলেও এখানে ব্যাপকভাবে উৎখনন প্রচেষ্টা হয় নাই। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্ব বিভাগ এখানে উৎখনন আরম্ভ করিয়া কিছুদিন পর ইহা স্থগিত রাখেন। সুদীর্ঘকাল পরে ননীগোপাল এখানে তিনবার উৎখনন কার্য পরিচালন দ্বারা উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত মন্দিরের ন্যায় দীর্ঘায়তনযুক্ত একটি পুরাকীর্তি আবিষ্কার করেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থান হইতে কুষাণ সম্রাট কনিষ্ক ও হুবিষ্কের নামাঙ্কিত মুদ্রা, খ্রী: পূঃ ২য় ও ১ম শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপি যুক্ত মৃণ্ময় ছাপ (সীল) প্রভৃতি বহু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়। ননীগোপাল কৃত এই উৎখননগুলির বিবরণ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগীয় বার্ষিক বিবরণীগুলিতে লিপিবদ্ধ (দ্রঃ এ্যানুয়াল রিপোর্ট অব দি আর্কিওলজিক্যাল সারভে অফ ইণ্ডিয়া—১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬, ১৯৩৬-৩৭)। ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর অঞ্চলে খনন কার্য চালাইয়া নীগোপাল এই স্থান হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরায়ুধের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহার অধিক অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই তাঁহার জীবনান্ত হয়।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে প্রত্নতত্ত্ব শাখার দায়িত্ব ভার লইয়া ননীগোপাল এই বিভাগের সমস্ত প্রত্নদ্রব্য ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক রীতিতে পুনর্বিন্যস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এই প্রত্ন দ্রব্যগুলির বিস্তৃত বিবরণীমূলক তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা প্রকাশ করেন। ভারতীয় সংগ্রহশালার সাধারণ দর্শক ব্যতীত এই দুইটি বিবরণী ভারতীয় ইতিহাস-জিজ্ঞাসুর পক্ষেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে কর্মরত অবস্থাতেও ননীগোপাল কয়েক স্থানে উৎখনন অভিযান পরিচালন করেন ও তাঁহার অন্যান্য প্রিয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে গবেষণারত থাকেন। সুদীর্ঘকাল সিন্ধু-সভ্যতার ঐতিহ্যপূর্ণ স্থানগুলিতে উৎখনন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ননীগোপালের ধারণা জন্মিয়াছিল যে সিন্ধু প্রদেশের এই সভ্যতার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত তাহার সংখ্যা পর্যাপ্ত নহে। সিন্ধু প্রদেশে অনুসন্ধানের ফলে আর বহু লুপ্ত তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব। তিনি এ বিষয়ে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের

দৃষ্টি আকর্ষণ করায় ১৯৩৮ খ্রীঃ-র অক্টোবর মাসে ছয় মাসের জন্য তাঁহাকে সিন্ধুপ্রদেশে উৎখনন অভিযানের বিশেষ পদাধিকারী রূপে নিয়োগ করা হয়। এই নূতন কার্যভার গ্রহণ করিয়া মহোৎসাহে ননীগোপাল সিন্ধুদেশে উপস্থিত হন। প্রথমে তিনি সিন্ধু প্রদেশের দাদু জেলার মাঞ্চার হ্রদের উত্তর পশ্চিমে এক জনশূন্য অঞ্চলে তাঁবু খাটাইয়া এই অঞ্চলে উৎখনন কার্য আরম্ভ করেন। তাঁহার সঙ্গে অল্প কয়েকজন সহকর্মীও থাকিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রভাতকালে সহসা একদল উপ-জাতীয় দস্যু ননীগোপালের তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বন্দুকের গুলীতে তাঁহার প্রাণনাশ করে। ননীগোপালকে হত্যা করিয়া এবং তাঁহার তিনজন অনুচরকে গুরুতররূপে আহত করিয়া তাহারা তাঁবু হইতে অর্থাদি অপহরণ করিয়া পলায়ন করে। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সাধনায় আততায়ী দস্যুদের হস্তে প্রাণবিসর্জনের এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি অল্পই আছে। কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ রূপে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাত্রার সুযোগ ননীগোপাল পাইয়াছিলেন কিন্তু তিনি ইহাতে শান্তি পান নাই। সিন্ধু সভ্যতার অনুদ্ঘাটিত রহস্য-লহরী উত্তীর্ণ হইবার বাসনা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল। ননীগোপালের নির্বন্ধাতিশয্যেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তাঁহাকে সিন্ধুদেশে উৎখনন কার্যে প্রেরণ করা হয়। অমোঘ নিয়তি মৃত্যুবেশে সেই স্থানে যে ননীগোপালের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল তাহা অবশ্য সকলেরই স্বপ্নের অগোচর ছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বন্ধু-বান্ধবদের নিকট লিখিত পত্রে ননীগোপাল এই আশা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার এই অভিযানের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার সহিত বৈদিক আর্য সভ্যতার যোগসূত্রের সন্ধান মিলিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

মাত্র ৪১ বৎসর জীবিত থাকিয়া ননীগোপাল ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁহার বিশিষ্ট স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ও উৎখনন বিষয়ে তাঁহার রচনাদির কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলনকারীর পক্ষে খরোষ্ঠি ও ব্রাহ্মী লিপিতে লিখিত মুদ্রা, শিলালেখ, তাম্র শাসনাদি পর্যালোচনা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। ছাত্রাবস্থা হইতেই প্রাচীন লিপিমালার পাঠোদ্ধার ও তাহার ব্যাখ্যায় ননীগোপাল অপূর্ব দক্ষতা দেখান। ননীগোপালের সুষ্ঠু ও নির্ভুল লিপি পাঠের ফলে ভারতেতিহাসের বহু অজ্ঞাত উপকরণ ঐতিহাসিকদের হস্তগত হওয়ায় ইতিহাসের বহু অস্পষ্ট অধ্যায় উজ্জ্বলতর হইয়াছে। ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' নামক পত্রিকায় ননীগোপাল ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ও বিভিন্নকালে লিখিত বহু লিপির পাঠোদ্ধার করিয়া তাহার নিজস্ব ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন (১৬-২৬)। ননীগোপালের সমসাময়িক ও পরবর্তীয় দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিকেরা ননীগোপালের এই পাঠোদ্ধার ও ব্যাখ্যা প্রামাণ্যরূপে তাঁহাদের গবেষণা গ্রন্থাদিতে ব্যবহার করিয়াছেন। 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা' ব্যতীত ননীগোপালের লিখিত লিপিতত্ত্বের ব্যাখ্যামূলক কয়েকটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল কোয়াটার্লি' ও এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল (২৭-৩৩)। বর্ধমান জেলার মল্লসারুল গ্রামে প্রাপ্ত সেনরাজ বল্লাল সেনের পিতা বিজয় সেনের তাম্রশাসন ও অন্য দুইটি শিলালিপি সম্বন্ধে ননীগোপালের তিনটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৩৪-৩৬)। প্রাচীন লিপি পাঠ সম্বন্ধে ননীগোপালের অপর একটি বিরাট কীর্তি সাচীস্তূপে প্রাপ্ত সম্রাট অশোকের সময় হইতে ৯ম শতাব্দী

পর্যন্ত সমস্ত অনুশাসনের স্বকৃত পাঠনির্ণয়, মন্তব্য ও ইংরেজী অনুবাদ। এই গ্রন্থে ৮৪২টি প্রাচীন লিপিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, এইগুলির সময় নির্ণয়—প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য নিরূপণ ও ভাষ্যবিচারও করা হইয়াছে। সম্রাট অশোক হইতে শকক্ষত্রপ নহপালের সময় পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চারিশত বর্ষ ধরিয়া ব্রাহ্মীলিপির গতি প্রকৃতিও এই গ্রন্থে নির্ধারণ করা হইয়াছে। সার জন মার্শাল রচিত 'মনুমেণ্টস অফ সাচী' গ্রন্থের অংশ হিসাবে ননীগোপাল রচিত এই গ্রন্থটি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (৩৭)। মুদ্রাতত্ত্ব সম্পর্কেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ ছিলেন। বাঙ্গালায় প্রাপ্ত তিনটি কুষাণ-মুদ্রা সম্বন্ধীয় তাঁহার একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয় (৩৮)। মূর্তিতত্ত্ব বিষয়েও ননীগোপালের দক্ষতা ছিল—পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মীয় মূর্তিকলা বিশেষতঃ গান্ধার শিল্প সম্বন্ধেও ননীগোপাল বিশেষজ্ঞ রূপে পরিগণিত হইতেন। বৌদ্ধ-মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (৩৯)।

Sir John Cummings কর্তৃক সম্পাদিত 'Revealing India's Past' নামক গ্রন্থটির 'Pre-Historic and Protohistoric Civilization' ২৫ পৃষ্ঠা সমন্বিত অধ্যায়টিও ননীগোপাল রচনা করেন (৪০)।

বাল্যাবধি ননীগোপাল মাতৃভাষার পরম অনুরাগী সেবক ছিলেন। সমসাময়িক বাঙ্গালা সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার রচিত বহু নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাটনা শহরে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে ননীগোপাল ইতিহাস শাখার সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ননীগোপাল কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন। কিছুকাল সোসাইটির কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সোসাইটির সম্মানিত সদস্য বা 'ফেলো' নির্বাচিত হন। সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক ধুরন্ধর পণ্ডিতেরাই এই সম্মানিত সদস্যের সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত নলিনীমোহন সান্যালের (শাস্ত্রী) কন্যা শ্রীমতী স্নেহলতা দেবীর সহিত ননীগোপালের বিবাহ হয়। মৃত্যুকালে ননীগোপাল স্ত্রী, দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র রাখিয়া যান। ননীগোপালের পরলোকগমনকালে তাঁহার সন্তানেরা সকলেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। সুখের বিষয় তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ তাপস মজুমদার পিতার ন্যায় গৌরবোজ্জ্বল ছাত্রজীবন অন্তে খ্যাতনামা অর্থশাস্ত্রী ও অধ্যাপক রূপে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

[দ্রঃ—ইতিহাস, ৫ম বর্ষ, ১ম সং ; প্রাচ্য-বিদ্যাতরঙ্গিণী, কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯ ; An approach to India Archaeology, Vol. I, Calcutta 1972—Dr. S. R. Das]

১। A Warsha Stone Inscription, Indian Antiquary Vol. 56, 1917
২। Kalidasa and Kamandaka " Vol. 56, 1917
৩। Date of Abhira Migration into India " Vol. 57, 1918

৪। Vatsyana and Kalidasa ,, Vol. 57, 1918

৫। Samaja ,, Vol. 57, 1918

৬। Home of Kalidasa ,, Vol. 57, 1918

৭। Patna Musuem Inscriptions of Jaya Sena Vol. 58, 1919

৮। The Lakshmansena Era ,, Vol. 58, 1919

৯। Epigraphic Notes ,, Vol. 58, 1919

১০। Mundesvari Inscription ,, Vol. 59, 1919

১১। A list of Kharoshthi Inscriptions (Journal of Asiatic Soc) ,, Vol. 20, no. I 1924

১২। Nalanda Copper Plate of Devapal Deva Varendra Research Soc. Monograph no. I.—Rajshahi 1926

১৩। Inscriptions of Bengal Vol. III, Varendra Research Society. Rajshahi, 1929.

১৪। Explorations in Sind—Memoires of the Archaeological Survey of India no. 48, 1934.

১৫। A Guide to the Sculptures in the Indian Musuem—Delhi, 1937.
Part I—Early Indian School
Part II—The Greco-Buddhist School of Gandhra.

১৬। Peshwar Musuem Inscription of 168-Epigrapia India

১৭। Khorosthi Inscription from Jamal Gohri Vol. 19, 1927-8

১৮। Inscription on two relic casketts ,, ,, Vol. 24, 1937

১৯। Bajour Casket of the reign of Minander ,, ,, ,, ,,

২০। Kosam Inscription of Reign of Maharaja Vaisravana ,, ,, ,, ,,

২১। Cuttack Musuem Plates of Monavarman ,, ,, ,, ,,

২২। Nalanda Inscriptions of Vipulsrimitra ,, ,, vol. 21, 1931-2

২৩। Inda Copper plate of the Kamhojaking Nayapala ,, ,, vol. 22, 1933-4

২৪। Nandanpur Copper Plate of thc Gupta year 169 ,, ,, vol. 23, 1935-6

২৫। Mallasarul Copper Plate of vijaya Sena ,, ,, ,, ,,

২৬। Four Copper Plates from Soro. ,, ,, ,, ,,

২৭ A New Brahmi Inscription from Mathura ....Indian Historical Quarterly vol. II, No. 3, 1926

২৮। Rohitagiri of the Rampala Copper Plate „ „ „ „

২৯। China Inscription of the reign of Sri Jajna Satakarni
Journal of the Asiatic Soc., N. S. vol, 16, 1920

৩০। Notes of Khorosti Inscriptions „ „ N. S. vol.18, 1922

৩১। Maner Copper plate of
Govinda Chandra „ „ N. S. „ „

৩২। Sanchi Inscriptions of Sridharvarman „ „ N. S. vol. 19, 1923

৩৩। An inscribed Copper Plate ladle
from Hazra „ „ „ „

৩৪। বুদ্ধগয়ার দুইখানি শিলালিপি—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৩শ বর্ষ ১ম সংখ্যা

৩৫। নবাবিষ্কৃত সূর্যবর্মার শিলালিপি „ „ ৪র্থ „

৩৬। মল্লসারুলে প্রাপ্ত বিজয়সেনের তাম্রশাসন „ ৪৪ বর্ষ ১ম „

৩৭। The Monuments of Sanchi (3 vols) Sir John Marshall & A Fonches with texts inscriptions (ed) tr. and adpot by N. G. Mazumder 1941.

৩৮। Three Kushna Coins from North Bengal—Journal of the the Aiatic Soc. N. S., vol. 28, 1932

৩৯। Some Notes on Buddhist Iconography Soc. N. S. vol. 22, 1926.

৪০। Revealing India's Past—Ed. by Sri John Cumming, India Society London, 1939 (Chapter III—Pre-historic and Proto-historic Civilization —by N. G. Mazumdar, pps 91 to 116)

রামমোহন রায়—নবযুগের নেতা

সোমেন্দ্রনাথ বসু

রাজা রামমোহন রায় ধর্মীয় চেতনা সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। তৎকালীন হিন্দু সমাজে ধর্ম বলতে যা বোঝাতো, তার সঙ্গে লৌকিক আচার পালন ও পৌরাণিক শাস্ত্রের অন্ধ বশ্যতার বিশেষ কোন তফাৎ ছিল না। সকলেই জানেন যে আর দশজন সাধারণ হিন্দু যে ভাবে ধর্মপালন করতেন, গুরুকে মানতেন, দেবদেবীর পূজা করতেন, বিপদে আপদে মানত ও ধর্ণা দিতেন—রামমোহন তার কিছুই করতেন না। তিনি বহু ঈশ্বর মানেন নি, এক বিশ্বস্রষ্টায়—ব্রহ্মতে বিশ্বাস ন্যস্ত করতেন। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে আমাদের সমবয়সী লোক যাঁরা, তাঁরা বিশেষ কোন ধর্মের প্রেরণায় সত্যসন্ধান করেন বলে আমাদের মনে হয় না। ভগবান কি, তিনি আদৌ আছেন কিনা, থাকলে তাঁর সঙ্গে এই জগৎচরাচর কি ভাবে সম্পর্কিত এ সমস্ত আলোচনায় তর্কের খাতিরে যোগ দিলেও এগুলির সঙ্গে আমাদের বিশ্বাসের যোগ নেই। ধর্মের পরিভাষায় আমায় নাস্তিক বললে আপত্তি করবো না। সুতরাং ভগবৎ অস্তিত্বে অবিশ্বাসী আমি ভগবৎ বিশ্বাসী রামমোহন রায়কে কেন আমার আত্মীয় মনে করি এ প্রশ্ন বহুদিন নিজেকে করেছি।

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া আমার কঠিন হয়নি। যাঁরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মসাধক, যাঁরা ধর্মকে নিজেদের উপলব্ধির বস্তু বলে জেনেছেন এবং রীতি অনুষ্ঠান ও নিয়ম কানুনের কোন তোয়াক্কা রাখেন নি, তাঁদের ধর্মচর্চা কখনোই ব্যক্তিগত রসচর্চায় পরিণত হয়নি। ব্যবহারিক জীবনে স্বার্থান্বেষণ আর ধর্মজীবনে বিনম্র ভক্তিমত্ততার অসঙ্গতি তাঁদের বহন করতে হয়নি। তাঁরা যে সত্যকে উপাস্য দেবতার মধ্যে দেখেছেন সেই সত্যকেই মানব সমাজের দুঃখনিবৃত্তির পরম উপায় বলে জেনেছেন। মানব-সমাজের প্রতি ব্যবহার ভগবৎসাধনার প্রকৃতির ইঙ্গিত দেয়। যীশুখৃষ্ট ও বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মমতের স্রষ্টা। তাঁদের ধর্মমত মানব কল্যাণের চেতনার সঙ্গে জড়িত। কোন্ ভগবানকে তাঁরা পেতে চেয়েছিলেন সে তর্কে আমাদের উৎসাহ নেই, বুদ্ধদেবও কোন ভগবানকেই স্বীকার করেন নি। কিন্তু Sermon on the Mount অথবা বুদ্ধ নির্ণীত দুঃখ নিবৃত্তির যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ সেগুলিতে উত্তরাধিকারের দাবী আমরা কখনোই ছাড়বো না। রাজা রামমোহন রায় সত্যসন্ধানী ধর্মসাধক ছিলেন। ব্রহ্মের স্বরূপ নিয়ে তিনি মীমাংসায় বসেছিলেন। কিন্তু যে মানুষ সংসার করবে, লৌকিক জীবন যাপন করবে, আসক্তি ও কামনার ধুলি যাকে ঘিরে থাকবে ব্রহ্ম সাধনার অধিকার সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর চেয়ে তার কম—এ কথা রামমোহন স্বীকার করেন নি। মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁর ধর্মচেতনার গোড়া ঘ্যাঁসা উপাদান ছিল—তাই ব্রহ্মচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে চাষীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির চিন্তার মধ্যে তিনি কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে পান নি। বেদান্ত বিচারে শংকরভক্ত হয়েও রামমোহন 'ঈশোপনিষদে'র ভূমিকায় (ইংরাজী ও বাংলাতে) গৃহস্থের ব্রহ্মসাধনার অধিকারের দাবী সজোরে উত্থাপন করেছিলেন। হিন্দু ধর্মকে তিনি হিন্দু জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির অনুকূল মনে করেন নি। হিন্দু জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি যে চলতি হিন্দুয়ানীর চাপে ব্যাহত হচ্ছে তাও তিনি

স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। ধর্মচর্চাতে তিনি যে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন তার প্রমাণ হলো এই যে বৈদিক শাস্ত্রকে লোকভাষায় অনুবাদ করে তিনি সাধারণ মানুষকে সম্মান দিয়েছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রামমোহন কিন্তু তর্কের খাতিরে হলেও মেনে নিয়েছিলেন যে নিরপেক্ষ বিচারের দ্বারা একজন 'ফ্রী থিঙ্কার' ধর্ম ও দৈবের সত্যকে মানতে পারেন না। ইংরাজ সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে রামমোহনের যে কথোপকথন হয় তাতে উনি প্রথমে ওয়েন নাস্তিকতাকে স্বীকার করতে পারেন নি। কিন্তু পরে ১৮৩৩ সালের ১৯শে এপ্রিল তিনি যে চিঠি লিখলেন রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে তাতে তাঁর বক্তব্য একটু ভিন্ন—ভাবটা এই যে যুক্তিবাদীদের কাছে সন্তোষজনক ভাবে দৈব ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যায় না ঠিকই তবে যে ধর্মমত প্রেম ও করুণার উপর প্রতিষ্ঠিত তাকে অস্বীকার করে লাভ নেই, সেই কারণেই ধর্ম বিমুখতা ওয়েনের সাফল্যকে প্রতিহত করেছে। তিনি লিখছেন—

Admitting for a moment that the truth of divinity of religion cannot be established to the satisfaction of a freethinker, but for an impartial enquiry, I presume we may feel persuaded that a system of religion which consists in love and charity is capable of furthering our happiness, facilitating our reciprocal transactions and curbing our obnoxious suspicions and feelings.

তর্কের খাতিরে হলেও রামমোহন এ যুগের প্রথম ভারতীয় যিনি স্বীকার করেছিলেন যে দৈব দিয়ে সব ঘটনার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সংশয়কে মনে স্থান দিয়ে তিনি ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

য়ুরোপ যাকে রেণেসাঁস বলে জেনেছে তার প্রধান লক্ষণ হল ব্যক্তি চেতনার জাগরণ। নিজের মন, বোধ, বুদ্ধি সব গীর্জার কাছে বাঁধা না দিয়ে নিজে ভাববো, নিজে বোধ করবো একেই ব্যক্তি চেতনার জাগরণ বলা হয়েছিল। নিজের স্বার্থবুদ্ধিকে প্রবল করে তোলার নাম ব্যক্তি চেতনার উদ্বোধন নয়। মানুষ নিজেকে জানতো গোষ্ঠীর একজন বলে, ধর্মসঙ্ঘের অনুগামী বলে। তার নিজের কোন আত্মিক পরিচয় ছিল না। আমাদের দেশেও ঠিক তাই ছিল। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৈষ্ণব, কেউ শাক্ত, কেউ সিয়া, কেউ সুন্নি—মানুষ জানতো ঐ পরিচয়ই তার পরিচয়। বৈষ্ণব গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত নয় অথচ মনেপ্রাণে বৈষ্ণব এ পরিচয় কেউ দিতো না। আজ যেমন আমি বুক ফুলিয়ে বলতে পারি যে আমি ব্রাহ্ম নই, ব্রহ্মকে জানবার বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য আমার নেই অথচ আমি রামমোহনের আত্মীয়তার দাবীদার, তেমন করে বলা আগে সম্ভব ছিল না। ইতালীয় নবজাগরণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বার্খার্ট তাই বলেছিলেন man became a spiritual individual. আমাদের দেশের আধুনিক কালের সেই প্রথম spiritual individual হচ্ছেন রামমোহন রায়। নিজে ভাবতে লাগলেন এবং সে ভাবনার দায়িত্ব নিজে নিলেন। ১৮৩১ সালে বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন I have been guided only by my conscience and the impressions left on my mind by long experience

and reflection. নিজের বিবেকের দ্বারাই চালিত হয়েছি, অভিজ্ঞতার ও চিন্তার দ্বারা চালিত হয়েছি—আত্মবিশ্বাসের এই সুর, ব্যক্তিত্বের এই জাগরণ, রামমোহন আরও সুন্দর করে অন্যত্র বলেছেন। বেদান্তের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে আত্মীয়েরা চলিত ব্যবস্থার ফলে লাভবান। তাদের temporal advantage depends upon the present system. কী গভীর বেদনায় অথচ কি প্রবল গর্ববোধ নিয়ে আত্মসচেতন রামমোহন বলেছিলেন যে এই আত্মীয়দের কোন অপমানই তাঁকে স্পর্শ করবে না— But these I can tranquilly bear trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice— perhaps acknowlenged with gratitude. সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করা দরকার যে সামাজিক বেড়াভাঙ্গার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব তারই একটা চূড়ান্ত প্রকাশ সেই ব্যক্তিত্বকে বিশ্বাত্মবোধে মিলিয়ে নেওয়ায়। বার্থার্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন Cosmopolitanism is in itself a high stage of individualism. রামমোহন যে জ্ঞানান্বেষণে দেশে দেশে ঘুরেছিলেন, পৃথিবীর সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে খোলা মন নিয়ে ছুটেছিলেন, পুরানো সমুদ্রযাত্রার বিধি নিষেধ মানেন নি, তাতেই প্রমাণ হলো যে তাঁর মন জেগেছে—তাঁর জাগ্রত ব্যক্তিত্ব দেশের গণ্ডীকেই মানবতার গণ্ডী বলে ভুল করে নি। বন্ধু অ্যাডাম লিখেছেন, He attached himself to no sect exclusively and united cordially with all, whether Hindoos or Musalmans Jews or Christians.

এই প্রসঙ্গেই বলে নিতে হয় যে জাতীয়তার আন্দোলন সুরু হবার বহু আগেই রামমোহন জাতীয়তার ভাবনাকে উত্তীর্ণ হয়ে চলে গিয়েছিলেন। ইতালীর শিল্পী ঘিবার্টি বলেছিলেন, Only he who has learned everything is no where a stranger robbed of his fortune. ইতালীর আর এক মনীষী বলেছিলেন Wherever a learned man fixes his seat, there is home.' ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ১৯৪১ সালে, 'যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।' রামমোহনে যা সুরু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তারই পূর্ণ পরিণতি। রামমোহন যা কিছু করতে চেয়েছেন তার শেষ উদ্দেশ্য মানুষ—বাংলা বা ভারতবর্ষ তাঁর দৃষ্টির শেষ দিগন্ত ছিল না। ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল পাশ হওয়ার ব্যাপারে খুশী হয়ে লিখেছিলেন I have the infinite happiness or witnessing the salvation of the nation, nay of whole world. সতীদাহ সম্বন্ধে আর একটি চিঠিতে লিখেছেন যে লড়াইটা রিফর্মার ও অ্যান্টিরিফর্মারদের মধ্যে নয় but between liberty and tyranny throughout the world. সংঘর্ষ যে মূলে বিশ্বব্যাপী এবং আমাদের সমস্যা যে তারই অংশমাত্র এ কথা বুঝতে কার্ল মার্কস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি তাঁকে। সেদিন আর কোনো মানুষ এদেশে কোন ভাবনাকেই throughout the world-এর পটভূমিতে ভাবতে পারেন নি।

রামমোহনের ধর্ম চেতনা তাঁকে কোন পরলোকের মমতায় ইহলোকের প্রতি বিমুখ করে তুলতে পারে নি। ধর্ম আর সৎজীবন যাপন তাঁর কাছে সমার্থক। ব্রহ্মসাধনা তাই তাঁর কাছে জীবন ও সংসার বিমুখ ধর্ম চর্চা ছিল না। ১৮৮৯ সালে তাই নিষ্ঠাবান হিন্দু স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বলেছিলেন—to Rammohan is due the credit of forcibly pointing out to learned Hindus that religion does not require one to be a yogi or a suttee or to go to the forest but that home and society are the best surroundings of appropriate worship. কোন কিছু সম্পর্কেই তাঁর ঔৎসুক্যের অভাব ছিল না। ব্যাকরণ থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন পর্যন্ত বহুবিষয়ে তিনি চিন্তা করেছিলেন—তাতেই প্রমাণ জীবনের প্রতি আসক্ত হতে তিনি ভীত হননি। একেই রেনেসাঁর পরিভাষায় বলা হয়েছিল l'uomo Universale. ব্যক্তিত্ব যখন জ্ঞানের সংযোগে দিগন্তের পর দিগন্ত পার হয়ে যায় তখনই এই l'uomo Universale-এর আবির্ভাব। রামমোহন এই যুগের ভারতবর্ষের প্রথম Universal man.

শুধু যে দেশের সীমা উত্তীর্ণ হবার মত মন নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তা নয়। কালের সীমান্তও তাঁর চোখে যেন স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। ভবিষ্যৎ কোন্ নতুন নির্দেশ নিয়ে আসবে তা তিনি যেন তৎসাময়িক কালের ঘোলাটে পরিস্থিতির মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলেন। মোঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে, দীর্ঘ দিনের একটা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে কোম্পানীর শাসনের তখনো সুনির্দিষ্ট নীতির অভাব, কোম্পানীর কর্মচারীরা ঘুষ নিয়ে ধনী হতে ব্যস্ত, একটা অরাজকতা ভেদ করে তখনও কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার ছবি দেখা দেয় নি—তবু তারই মধ্যে রামমোহন এই নতুন ইউরোপীয় সংস্পর্শের শেষ ফলশ্রুতি যে কি তা ধরতে পেরেছিলেন। সেদিনকার বাঙ্গালাদের অনেকেই ইংরাজ সভ্যতার মূল শক্তির পরিচয় না পেয়েই শুধু রাজপুরুদের কাছে ঘেঁসে বসার সুযোগ চেয়েছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতা ইংরাজের হাত দিয়ে কি সম্পদ নিয়ে এলো তার সম্বন্ধে কোন ধারণাই তাঁদের ছিল না—খুব কম ইংরাজও সেদিন দূরকালের লিপি পড়তে পেরেছিলেন।

রামমোহনই এ সত্য বুঝেছিলেন যে ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংযোগেই অচলায়তনের প্রাচীর ভাঙ্গবে, দীর্ঘকালীন সঙ্কীর্ণতা ঘুচবে—পৃথিবীর চতুর্দিকে সভ্যতার স্রোত নিত্যনতুন সৃষ্টির খাতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, কেবল একটি অন্ধকার দ্বীপ নিজের নিশ্চলতাকে নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ভূষিত করে অনড় হয়ে রয়েছে; এই আত্মখণ্ডিত জীবনের সঙ্গে ঐ বহির্জগতের যোগ না ঘটালে আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী পেছিয়ে যাবো—একথা তিনি জানতেন। তাঁর চেষ্টা ছিল ভারতবর্ষকে যুগ যুগব্যাপী তামসিকতা থেকে জাগিয়ে তুলে বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত করা। তিনি পেশাদার ঐতিহাসিক ছিলেন না কিন্তু ইতিহাসের এই নির্দেশ আর কারও চোখে সেদিন ধরা পড়েনি।

ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে তিনি কি আশা করেছিলেন? অব্যবস্থার মধ্যে ব্যবস্থা বা, chaos এবং disorder-এর মধ্যে order. সেই ব্যবস্থা বা order ইংরাজের Law and order-এর order নয়। সমস্ত ভিত্তিহীন সংস্কার ও মনুষ্যত্বলোপী পরনির্ভরতার মোহ কাটিয়ে এই বিশ্বাসের দিকে মানুষের মনকে নিয়ে যেতে হবে যে সংসারে কোন কিছুই বেনিয়মে ঘটছে না। একটা বিশ্বব্যাপ্ত শৃঙ্খলা বস্তুজগতকে, সামাজিক জগতকে অটুট ঐক্যে বেঁধে রেখেছে। ইতিহাসের ওঠানামার মধ্য দিয়ে তার প্রগতির এই পরম সত্যটি রামমোহন রায় কি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে অনুধাবন করেছিলেন তা আর একটু সবিস্তারে বলা যায়।

বস্তুজগতের একটা নিয়ম আছে, ঝড়বৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প কোন কিছুই কারো খেয়ালে

ঘটছে না। বস্তুর চলাফেরার নিয়ম যদি সঠিক জানবার চেষ্টা করা যায় তাহলে ঝড়বৃষ্টি জাতীয় ঘটনাকে ম্যাজিকের পর্য্যায়ে ফেলতে হয় না আর হাজার গণ্ডা দেবদেবীর শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতে হয় না। বস্তুর জ্ঞান পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেই ইউরোপ বিদ্যার নানাপথ খুলে দিয়েছে—যাকে বলে Physical science. রামমোহন দেশের লোককে অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন ঐ Physical science-এর শিক্ষা দিয়েই। নানারকম ধোঁয়াটে তত্ত্ব, বিকৃতবিশ্বাসের অহমিকা থেকে মানব চিত্ত মুক্তি পেতে পারবে ঐ বিজ্ঞানচর্চার পথ দিয়েই। সুতরাং ইংরাজ রাজপুরুষের কাছে তাঁর আবেদন ছিল সংস্কৃত চর্চার গতানুগতিকতা থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার দিকে বাঁক ফেরাও। মনের দিগন্ত প্রসারিত করবার পথ তিনি জেনেছিলেন। তাই বিশ্ববিধানের কার্যকারণ পরম্পরাগত অনিবার্যতা যা আরিষ্টটলের কাল থেকে য়ুরোপে নানাভাবে আলোচিত ও পরীক্ষিত হয়ে আসছে তাকেই তিনি নতুন ভারতের শিক্ষার বিষয়বস্তু করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত চর্চা ব্যাপক হতে পারে না, তার কঠিনতার মধ্য দিয়ে জ্ঞান বিস্তার সম্ভব নয়, ব্যাকরণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ববিশ্লেষণে যৌবন কাটিয়ে কি পাবে ছাত্রেরা, বেদান্তের মায়াবাদে ঔদাসীন্য জাগিয়ে তুলবে, তেমনি নিরর্থক হবে মীমাংসা ও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চা। ইংরাজ রাজপুরুষকে স্মরণ করিয়ে দিলেন বেকন-পূর্ব ইংরাজী জ্ঞানচর্চার দীনতা এবং বেকনোত্তর ইংলণ্ডে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসারের কথা। সুতরাং ভারতীয়দের মনের বিকাশের জন্য চেয়েছিলেন—a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematies, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences—তার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজ চাইলেন—furnished with necessary books, instruments and other apparatus. সাহেবদের খোসামোদ করার জন্য এ প্রস্তাব তাঁর ছিল না। বরং যে সত্য সম্বন্ধে তাঁরাও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না শাসকদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করতেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন। এই বিজ্ঞানচর্চার শিক্ষাকে আনতে চেয়ে তিনি বলেছিলেন—discharging a solemn duty with I owe to my countrymen.

কিন্তু শুধু বস্তু জগতের বিধান সন্ধান করেই য়ুরোপীয় সভ্যতার কাজ ফুরোয় নি। আর একটি জগৎ আছে যেখানে নিয়ম অটুট হওয়া চাই। সেটা মানুষের জগৎ। এখানেও যে নিয়ম হবে তা সকলের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। রাজার প্রতাপ যদি সমদর্শী না হয়, আইন যদি শাসকের মর্জির অপেক্ষা করে, জমিদার যদি ইচ্ছামত মানুষকে বিনা পরিশ্রমে খাটাবার অধিকার পায় তাহলে আইন মধ্যযুগীয় ফিউডাল খেয়ালের নামান্তর হয়। ধনতন্ত্রের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সত্য প্রচারিত হল আইনের চোখে সবাই সমান—equal in the eyes of law. রামমোহন ইংরাজী আইনের এই যুগান্তকারী তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। সামন্ততন্ত্রের যুগ পার হয়ে পৃথিবী যে ধনতান্ত্রিক জগতে প্রবেশ করছে এবং রাজনীতির জগতে বুর্জোয়া ডেমোক্রেসীর সূচনা হচ্ছে একথা বোঝবার মত মন আর কোন ভারতীয়ের সেদিন ছিল না। গভর্ণর জেনারেলের কাছে ভাগলপুরের কলেক্টরের আচরণের প্রতিবাদ লেখবার সময় তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন—Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would

not tolerate an act of arbitrary aggresion even against the lowest class of individuals. ইংরেজের আইনে যে খেয়ালখুসীর ফাঁক নেই সেই কথাটাই স্বচ্ছ ভাষায় লর্ড মিণ্টোকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। বস্তুজগতে যেমন আইনের নির্ব্যতিক্রম ব্যবহার, সমাজজগতের আইনেও তাই হওয়া চাই। য়ুরোপীয় সভ্যতার শৃঙ্খলা সন্ধানের এই বাণী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিপর্যস্ত ভারতীয় জীবনের মধ্যে সম্ভবতঃ একা রামমোহনই অনুভব করেছিলেন। ভারতের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটিয়ে, বিশ্বসভ্যতার যা কল্যাণকর তার ধারার সঙ্গে তাকে যুক্ত করার চেতনা অর্জন করাই এক বিস্ময়কর ঘটনা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে আজও অনেকেই রামমোহনের এই সভ্যদর্শনের বাস্তব তাৎপর্য অনুভব করতে পারেন নি।

য়ুরোপীয় সভ্যতার যে দুটি উপাদানের—বিজ্ঞান ও গণতন্ত্রের—সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন রামমোহন, তাঁর মৃত্যুর ঠিক একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ সেগুলির তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝলেন। তিনি লিখলেন য়ুরোপীয় চিত্ত আমাদের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে 'এইটে দেখিয়েছে যে জ্ঞানের রাজ্যে কোথায় ফাঁক নেই, সকল তথ্যই পরস্পর অচ্ছেদ্যসূত্রে গ্রথিত, চতুরানন বা পঞ্চাননের কোন বিশেষ বাক্য বিশ্বের ক্ষুদ্রতম সাক্ষীর বিরুদ্ধে আপন অপ্রাকৃত প্রামাণিকতা দাবি করতে পারে না। বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন, তেমনি চরিত্রনীতি সম্বন্ধেও। নতুন-শাসনে যে আইন এল তার মধ্যে একটি বাণী আছে, সে হচ্ছে এই যে ব্যক্তিভেদে অপরাধের ভেদ ঘটে না।' ঠিক যে দুটি বৈশিষ্ট্যকে রামমোহন আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করেছিলেন, একশো বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তার নিপুণ ব্যাখ্যা করলেন। আর সেই কারণেই তিনি যখন রামমোহনকে নবযুগের প্রবর্তক বলেন, তখন তা এত অর্থবহ হয়ে ওঠে।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, যে আন্দোলন গড়ে তোলবার মত নেতৃত্ব তাঁর আদৌ ছিল কিনা। তিনি তো কোন রাজনৈতিক দল গড়তে পারেন নি। একথা আজকাল বেশ প্রচলিত হয়েছে যে রেণেসাঁসের আন্দোলন জনতার আন্দোলন নয়, তা ইংরাজী জানা বাবু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য যে কোন বুদ্ধি বা বিচারের আন্দোলন সব মানুষকে নিয়ে হয় না। বরং ঠিক উল্টোটাই হয়—প্রতিভার ধরণ ধারণ সাধারণের জ্ঞানবুদ্ধিগম্য নয় বলেই সাধারণের সমর্থন তাঁদের আন্দোলনের পিছনে থাকে না।—আজকের দিনের জনতার লেজুড়বৃত্তি করা নেতৃত্ব আর সেদিন সমাজে সকলের বিরুদ্ধে একলা লড়াই করার নেতৃত্বের গুণগত পার্থক্য আছে। তবু লক্ষণীয় আজকের পোলিটিকাল পার্টিগুলির প্রচার কৌশল অনেকটাই রামমোহনের জানা ছিল। তিনিও পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, পুস্তিকা ছেপেছিলেন, সভাঘরের প্রয়োজনীয়তা বুঝতেন, মেমোরেণ্ডাম লিখে আন্দোলনের গোরাপত্তন করতেন আর পার্লামেণ্টারী রাজনীতি যাকে lobbying বলে তাও তাঁর বেশ আয়ত্তে ছিল। আজকের আন্দোলনের কলাকৌশল, জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করার পদ্ধতি তিনি আজকের পলিটিক্সের গোঁড়ামী আর নোংরামীবাদ দিয়েই জানতেন। রাজনৈতিক চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য যা করণীয় তা সবই তিনি করেছিলেন।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এখানে তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন, চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই।' এই মন্তব্য আরও সুনিশ্চিতভাবে প্রয়োগ করা যায় রামমোহন সম্বন্ধে। বিদ্যাসাগর যে আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন সে আকাশ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার ছিল না; অন্ততঃ রামমোহন রায় নামে একটি জ্যোতিষ্ক সেখানে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সত্যিই অন্ধকার কালীমাখা আকাশ মাথায় নিয়ে, অপার বেদনার বরমালা নিয়ে যিনি একলা নবযুগের চালনা করেছিলেন তিনি রামমোহন। তিনি যে একলা দেশের দুঃখকে নিজের করে নিয়েছিলেন একথা কাব্য করার জন্য বলছি না। তাঁর সমসাময়িককালে অনেক বিদেশী তাঁর এই একলা চলার কঠিন বীরত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে এও দেখেছিলেন যে একটি বেদনার রেশ সর্বদাই তাঁর ঐ গাম্ভীর্যব্যঞ্জক মুখচ্ছবিকে ম্লান করে রেখেছে। ভিকটর জ্যাকমঁ বলেছিলেন: He has grown in a region of ideas and feelings which is higher than the world in which his country-men live, he lives alone; and though, perhaps, the consciousness of the good he is accomplishing affords him a perpetual source of satisfaction, sadness and malancholy mark his grave countenance.

যে নতুন যুগ রামমোহন গড়তে চেয়েছিলেন, জীবনের বুদ্ধিদীপ্ত বিচারশীল উদার যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন তা আজও সফল হয় নি। প্রতিক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার ঢেউ উঠেছে—গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা, অবতারবাদ, সংস্কার মানবার প্রবণতা, আনুষ্ঠানিক ধর্মের জটিলতাকে মানবধর্মের উপরে স্থান দিচ্ছে। আজ যখন চারদিকে নানাঅবতারের আবির্ভাব, শিক্ষিত আধুনিক মন যখন মিরাকল বিশ্বাস করতে ব্যস্ত তখন বুঝতে পারি নবযুগের এই নেতার আত্মীয়তা দাবী করতে আমাদের এখনো অনেক দেরী।

সামাজিক দৃষ্টিকোণে শেকসপিয়র

বছর কুড়ি আগে প্রকাশিত ঋষিদাসের 'শেকসপীয়র' আর তারপর উৎপলবাবুর এই বই, (শেকসপিয়রের সমাজচেতনা: উৎপল দত্ত। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা। মূল্য আঠারো টাকা ॥) এর মাঝে বাংলাভাষায় শেকসপিয়রের ওপর আর কোনো বই লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। ঋষিদাসের বই বেরুবার পর 'পরিচয়' পত্রিকায় স্বর্গত নীরেন্দ্রনাথ রায় এক সমালোচনা প্রবন্ধ লেখেন, তাছাড়া শেকসপিয়র বাঙালীর মনোজগতে কোনো স্থান অধিকার করে আছেন কিনা বোঝার বিশেষ উপায় নেই, থেকে থেকে দুচারটে নাটকের অনুবাদের চেষ্টা ছাড়া। 'বঙ্গীয়' শেকসপিয়র পরিষদ, এর কার্যকলাপ প্রকাশ্য নয়। শুধু এ বছর দেখছি শেকসপিয়রের সমগ্র নাটকাবলী বাংলায় সুলভ সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে ইংরিজি ছাড়াও সেই সেই দেশের ভাষায় প্রত্যেক বছর শেকসপিয়রের ওপর এক আলোচনা হয়। তার পাশে বাংলাদেশে শেকসপিয়র সম্পর্কে অনীহা দেখলে আমাদের দেশের সাহিত্যচর্চা ও নাট্যচর্চা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগে। উৎপলবাবুর বই অভিনন্দনযোগ্য। প্রথমতঃ তিনি এই দীর্ঘ নীরবতার বরফ ভেঙ্গেছেন বলে। দ্বিতীয়তঃ তিনি শেকসপিয়রের সৃষ্টির যে দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে দুঃসাহসের পরিচয় আছে—পণ্ডিতমহলে সাধারণতঃ ঐ দিকটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয় অথবা তার গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না। বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও আলোচনাসাহিত্যে যে জোয়ার এসেছে, আশা করা যায় উৎপলবাবুর বই সে জোয়ারে নতুন অভিঘাত সৃষ্টি করবে।

উৎপলবাবুর বিঘোষিত দৃষ্টিভংগী মার্কসবাদ। সমাজচেতনা ও শিল্পসৃষ্টির বিচারের নিরিখ হিসেবে তিনি মার্কস-এঙ্গেলস থেকে মাও-সে-তুং এর রচনা পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, তাঁর রাজনৈতিক মতামত তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই, হয়তো বা একটু সরবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই নির্ঘোষ যদি কাউকে বইটি পড়া থেকে নিরস্ত করে তবে সেই সম্ভাব্য পাঠকই ঠকবেন। ল্যাটিন, জর্মন ও ফরাসী—এই তিন ভাষায় অধিকার থাকার ফলে উৎপলবাবু এমন বহু মূল অনুসন্ধান ও আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছেন যা বহু বিদেশী সমালোচক এড়িয়ে যান। একটি যুগের চেতনার মর্মে পৌছোতে হলে কী কী ধরণের মূল রচনা আলোচনা করা প্রয়োজন, তা উৎপলবাবুর গ্রন্থপঞ্জীর বিস্তার ও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায়। পাঠক হয়তো বহু জায়গায় লেখকের আলোচনার নীতি, পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তকে মানতে পারবেন না, অনেক জায়গায় হয়তো তীব্রভাবে বিরোধ করবেন, কোথাও বা বেশ মজাও পাবেন—কিন্তু ক্লান্ত বা বিরক্ত হবেন না প্রায় কোথাও এ কথা বলা চলে। বাংলাভাষায় আজকাল যে হারে নির্বীর্য, ধোঁয়াটে, অতিপরিশীলিত এবং সেই কারণে, প্যাঁচালো ভাষায় (কবি-জনোচিত?) আলোচনা সাহিত্য লেখা হয়ে থাকে, উৎপলবাবুর লেখা পড়লে খানিকটা হাঁফ

ছাড়া যায়। যদিও ওঁর ভাষাও বিশিষ্ট, ওঁর ব্যক্তিত্ব, এমন কি ওঁর নাট্যশৈলীর মতই।

'বণিক', 'ইতিহাস', 'ধর্ম', যীশু', 'সাম্য ও সোনা', 'অরণ্য', 'রাজা' ও 'যোদ্ধা—এই আটটি পরিচ্ছেদে তাঁর সমস্ত বইটিকে ভাগ করে উৎপলবাবু শেক্সপিয়রের যুগের সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় ইতিহাসের পটভূমি রচনা করেছেন এবং সেই পটভূমিকায় শেক্সপিয়রের সমাজচেতনাকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। ফাঁকে ফাঁকে এক একটি নাটক ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, যখন যেদিকে তাঁর উপপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ বলে মনে করেছেন। প্রথম দুই পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় অর্থনৈতিক-সামাজিক ইতিহাস। এর সার বক্তব্য শেক্সপিয়রের সমাজে মূল বিরোধ ছিল পচা-গলা সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে উঠতি পুঁজিবাদের। নাবিক—বণিকেরা ছিল বুর্জোয়া শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর অংশ ও অধিনায়ক। নয়া-অভিজাতরা ছিল বুর্জোয়াদের মিত্র। ধীরে ধীরে রাজাও এদের দলে ভেড়েন। নয়া-অভিজাত-বুর্জোয়া-বণিক-রাজা এই অক্ষশক্তির পরিচালনায় ইংল্যাণ্ডে ফিউড্যাল ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ। এরাই টিউডর ইংল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণী। ইউরোপের বিভিন্ন বণিক-কোম্পানির সম্প্রসারণ, উপনিবেশ বিস্তার, পুঁজি সঞ্চয়, ফিউড্যাল কৃষিব্যবস্থার ধ্বংসসাধন এবং মুনাফা ও ব্যবসার স্বার্থে যুদ্ধ—এই সব কার্যকলাপের ভেতর দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পুঁজিবাদের সৃষ্টি ও প্রসার। এই শাসক শ্রেণীর স্বার্থে তাদের মুখপাত্ররা সাহিত্য-দর্শনকে বণিকবৃত্তি, সামুদ্রিক ও ভৌগোলিক অভিযান, সোনা, মুনাফা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, রাজতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের জয়গানে মুখরিত করে তুলেছিল। শেক্সপিয়রের রচনায় আমরা দেখি সমুদ্রযাত্রা বিরোধিতা, বণিকসমাজের কুৎসিত চিত্র, বণিকসভ্যতার কঠোর সমালোচনা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও ভোগবাদের নিন্দা আরণ্যক শান্তির জয়গান, রাজতন্ত্র ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট দর্শনের তীব্র বিরোধিতা, খৃষ্টীয় বৈরাগ্য ও সাম্যবাদী বণ্টনপ্রথার জয়জয়কার। উৎপলবাবু বলেছেন: ঐতিহাসিক বিচারে, ঘটনানুসারী দৃষ্টিতে ফিউড্যাল বনাম পুঁজিবাদের লড়াইয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভূমিকাই ছিল প্রগতিশীল সে কথা সত্য; কিন্তু তৎকালীন জনমানসে বুর্জোয়াদের যে ছবি ধরা পড়েছিল তা হচ্ছে অমানুষিক অত্যাচার ও লুণ্ঠনের। কালের ব্যবধানে আজ আমরা বুঝি যে উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি সামাজিক-রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার, বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতিকে জয়-এর কোনোটাই হোতো না ঐ সামাজিক বিপ্লব না হলে। কিন্তু সমকালীন বিচারে এই বিপ্লবের পুরোহিতের চেহারা ও কাজ ছিল ভয়ানক। শেক্সপিয়র ছিলেন জনগণের অত্যন্ত কাছের লোক—তিনি বুর্জোয়াদের জনবিরোধী নীতির প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। এই বিরোধ ও সমালোচনা প্রকাশ পেয়েছে আদিম ধর্মীয় মনোভাব ও আদর্শের প্রচারের ভেতর দিয়ে। তিনি তাঁর দেশের ও যুগের দরিদ্র ও নির্যাতিত মানবাত্মার কণ্ঠস্বর, সেই জনগণের মধ্যেকার বিদ্রোহ, প্রতিবাদ, অশ্রুপাত, উচ্চহাস্য, বীরত্ব ও কাপুরুষতা, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা সবই শেক্সপিয়রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এর জন্যে মাঝে মাঝেই তাঁকে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, কুসংস্কার ও প্রাচীনপন্থার সমর্থক বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন জনতার প্রবক্তা, জনমতের হুবহু রেকর্ড—তাই যুগেরও শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র। তাই তিনি যুগজয়ী।

তার পরের চারটি পরিচ্ছেদে উৎপলবাবু খৃষ্টধর্মের ইতিহাস আলোচনা করে মানবসমাজের বিবর্তনে তার ভূমিকা নির্দেশ করেছেন। সুসমাচারগুলো বিশ্লেষণ করে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা

করেছেন খৃষ্টধর্মের প্রোলেতারীয় উৎপত্তি ও সাম্যবাদী সুর। ধনীর প্রতি ঘৃণা, বিধ্বংসী পরিবর্তন, সাম্যবাদ ও ভোগবর্জন—এই তাঁর মতে যীশু-প্রচারিত ধর্মের মূলকথা। মধ্যযুগে ডোমিনিকান ও ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসীরাই খাঁটি খৃষ্টীয় তত্ত্বের বাহক ও প্রচারক। খৃষ্টীয় সাধুদের উক্তি দাখিল করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে সমষ্টি বিরোধিতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে তাঁরা পাপ বলে মনে করতেন, ভিক্ষণ, বৈরাগ্য, অরণ্যচারণ ও সমষ্টিজীবনের মধ্য দিয়ে তাঁরা যীশুর উপদেশকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করতেন। বুর্জোয়ারা কিন্তু যীশুর বাণীকে কখনো বিকৃত করে কখনো পরিহাস করে সরকারী খৃষ্টধর্মকে কুক্ষিগত করেছিল। ষোলো শতকের যন্ত্রণা-জর্জর জনগণের বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল ধর্মকে আশ্রয় করে। জনতার চোখে দারিদ্র্য ও দৈহিক ক্লেশ ছিল স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভের একমাত্র উপায়। তারা মনেপ্রাণে খৃষ্টীয় বৈরাগ্য ও ধনভোগ-বিরোধিতার ক্যাথলিক ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছিল। শেকসপিয়র এই বুর্জোয়া-বিরোধী জনমানসের কণ্ঠস্বর।

এর পরের পরিচ্ছেদে মধ্যযুগের খৃষ্টান সাধুসন্তদের লেখা, ধর্মপ্রচারক ও ধর্মীয় দার্শনিকদের মতামত, ধর্মসংগীত, ধর্মীয় নাটক ও ইতিহাস বিশ্লেষণ করে উৎপলবাবু অভ্যুত্থান ও একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী আলোচনা করেছেন। দেখিয়েছেন কী ভাবে রাজা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও জনসেবক থেকে সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন স্বৈরাচারী এক শক্তিতে পরিণত হোলো। আলোচনা করেছেন মধ্যযুগীয় শৃংখলাতত্ত্বের ও তার টিউডর বিকৃতির। টিউডর যুগে রাজতন্ত্রের স্তুতিতে যে ঐকতান উঠেছিল শেকসপিয়র তাতে সুর মেলাননি। ঐতিহাসিক নাটকগুলো আলোচনা করে উৎপলবাবু দেখাচ্ছেন যে শেকসপিয়র রাজতন্ত্রের সমালোচক, কারণ রাজকীয় কূটনীতি, বিশ্বাসঘাতকতা নীচতা, রক্তলোলুপতা, ভোগলিপ্সা ও স্বার্থপরতার বীভৎস চিত্র তিনি এঁকেছেন নাটকের পর নাটকে, পাশাপাশি খৃষ্টীয় বৈরাগ্যের সুর বাজিয়েছেন প্রতিবার। আর জয়গান গেয়েছেন সাধারণ মানুষের, রাজাদের পররাজ্যলিপ্সা ও ক্ষমতার লড়াইতে যারা হয় বলি।

সর্বশেষ পরিচ্ছেদ 'যোদ্ধা'র আলোচ্য বিষয় মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যোদ্ধা-কল্পকথার উদ্ভব ও শেকসপিয়রের নাটকে তার প্রয়োগ। উৎপলবাবু বলতে চাইছেন প্রোমিথিউস-এর কাহিনীতে যে যোদ্ধা-কল্পের সৃষ্টি যীশুর কাহিনীতে তারই যুগোচিত বিবর্তন। এই যোদ্ধা-মূর্তি ফিরে আসছে রাজা আর্থারের অনুচর স্যার গ্যালাহাডে ; শেষ পর্যন্ত শেকসপিয়র তাকেই রূপ দিয়েছেন হ্যামলেটে। এর পরে বাকি বই জুড়ে হ্যামলেট নাটকের সুদীর্ঘ আলোচনা। বিভিন্ন যুগের এই যোদ্ধা মূর্তির যে সামান্য লক্ষণগুলো উৎপলবাবু আবিষ্কার করেছেন তা হচ্ছে উন্মাদনা ও মূর্চ্ছা, পিতৃনির্দিষ্ট কর্তব্যপালনে তাড়না, মন্ত্রগুপ্তি, নগ্নতা ও নির্যাতনভোগ। হ্যামলেট নাটকে শেকসপিয়র দেখাতে চেয়েছেন বুদ্ধিজীবীসুলভ বিচ্যুতির ফলে যোদ্ধার ট্র্যাজেডি, এবং রেনেসাসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে হেয় প্রমাণ করে বুর্জোয়া-বিরোধিতা করেছেন।

উৎপলবাবুর ছকটি খুব মোটা দাগে টানা কিন্তু সুবিন্যস্ত নয়। যান্ত্রিক মার্কসবাদের পরিবর্তে দ্বান্দ্বিক মার্কসবাদ প্রয়োগ করে উনি প্রথমে ষোলো শতকে বুর্জোয়াদের চেহারাটা সমকালীন চোখ দিয়ে দেখে নিয়েছেন। সেটা লাল-কালো রং আঁকা (প্রসঙ্গতঃ, বইটির প্রচ্ছদও ঐ দুই রং-এই আঁকা), নিষ্ঠুরতা, লোভ, হৃদয়হীন শোষণ. অত্যাচার ও লুণ্ঠনের এক বীভৎস দানবের চেহারা : শেকসপিয়রের

মত মহান স্রষ্টার পক্ষে অসম্ভব ছিল এদের ধ্বজাধারী হওয়া, তা ছাড়া ছিলেন 'মাটির কাছাকাছি'; নবীন প্রোটেস্ট্যাণ্ট মতের নেতারা ছিল বুর্জোয়াদের দালাল—কাজেই তার বিপরীত সনাতন খৃষ্টীয় ক্যাথলিক ধর্মই ছিল জনগণের নিজস্ব দর্শন ও তাতেই জনগণের স্বার্থরক্ষা হতে পারত: অতএব শেক্‌স্‌পিয়র এই দ্বিতীয় মতই ঘোষণা করেছেন, তাকে যতই প্রতিক্রিয়াশীল বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে হোক—তাতেই তিনি গণসাহিত্যিক আখ্যা পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছেন। উৎপলবাবু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ প্রয়োগ করার দাবী করেছেন (এবং তাঁর মতে যাঁরা তা করেননি তাঁদেরকে তিনি প্রবল উপহাস ও ব্যঙ্গ করেছেন) কিন্তু নিজে তিনি বুর্জোয়াশ্রেণীর একটি একপেশে ছবিকেই তৎকালীন জনমানসে প্রতিফলিত একমাত্র ছবি বলে দাবী করেছেন। ঐতিহাসিক বিচারে যদি বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকা থেকে থাকে, তবে তৎকালীন বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক প্রশ্নে কিছু কিছু মুক্তি-সূচক নীতিকে তারা বাস্তবে রূপ দেবার জন্যে লড়াই করেছিল এবং সফল হয়েছিল বলেই তা থেকেছে। সেই সব নীতিকে সেকালের জনগণ কী চোখে দেখেছিলেন, বা শেকসপিয়রের নাটকে সেইসব মতবাদ সহানুভূতির সাথে প্রকাশিত হয়েছে কিনা—এই প্রশ্নের তন্নিষ্ঠ আলোচনা উৎপলবাবুর বইএ নেই। (এককথায় তিনি রায় দিয়েছেন: 'সমাজ-বিপ্লবের সহায়ক হিসেবে এ দর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডের জনগণের কাছে এ দর্শন কী রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল? এ দর্শনের সঙ্গে তারা অঙ্গাঙ্গীযুক্ত দেখেছিল নির্মম নগ্ন—শোষণ কে।' (পৃঃ ২২৮) এর স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ কিন্তু তিনি উপস্থিত করেননি।) এই অর্থে তাঁর বই ঘোর একদেশদর্শী। দ্বিতীয়তঃ যে সনাতন খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস (সাম্যবাদী) তিনি এলিজাবেথীয় জনগণের মর্মবাণী বলে ঘোষণা করেছেন, এবং শেকসপিয়রকেও যার প্রবক্তা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন,—সেই বিশ্বাসের ইশ্‌তেহার তিনি তৈরী করেছেন, প্রধানতঃ নিউ টেষ্টামেণ্ট এর সুসমাচার ও ধর্মসংগীতের বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন করে, যে যে অংশ তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোকে প্রমাণ করতে সাহায্য করে। এলিজাবেথীয় জনগণ যে শুধু সেই নির্বাচিত পাঠের দ্বারাই প্রভাবিত হোত এমন প্রমাণ কিন্তু উপস্থিত করা হয়নি। কয়েকজন সন্ন্যাসীর উক্তি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত করেছেন, যাঁদের উক্তি তাঁর বক্তব্যকে সাহায্য করে না, তাঁদেরকে তিনি গালাগাল করেছেন—কিন্তু কোথাও প্রমাণ রাখেননি যে তাঁর সমর্থকরাই (?) সে যুগে তাঁর বিরোধীদের চেয়ে বেশী প্রভাবশালী ছিলেন। উৎপলবাবু দাবী করেছেন যে জনমানসের আত্মপ্রকাশ ঘটতো 'জনতার ধর্মাচরণের ধারায়, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে। জনতার প্রবক্তা সেই সব ঋষি-সম্প্রদায়ের বক্তব্যের মধ্যে, একান্তরূপে জননির্ভর মধ্যযুগের ধর্মীয় নাটকের মধ্যে' (পৃঃ ২৬৮)। কিন্তু এই সব ধারা, বিশ্বাস ও বক্তব্য যে বুর্জোয়াদের ভাড়াটে প্রচারক ও স্বার্থরক্ষক চিন্তানবীশদের (যেমন ডারহামের সাধু রিপণকে উৎপলবাবু ছাপ দিয়েছেন) দ্বারা রচিত ও প্রভাবিত হোতো না—তার কি প্রমাণ বা যুক্তি আছে? বরং সুসমাচার ও সামস্‌-এর ধনী-রাজা-শক্তিমান-বিরোধী অংশগুলোকে বুজিয়ে দিয়েই সরকারী খৃষ্টধর্ম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল —একথা মনে করার কারণ আছে। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে এই সমস্ত বাণীকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে শ্রোতার মনে ত্রাস সঞ্চার করে তাকে ঠিক পথে রাখার জন্য। ধনী ও শক্তিমানের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী বহু ক্ষেত্রেই ধন-মদ-মোহ সম্পর্কে সতর্কবাণী। মধ্যযুগের মর‍্যালিটি নাটকগুলো অবশ্যই জন-নির্ভর

(আক্ষরিক অর্থে) এবং জনমতের সুষ্ঠু নির্দেশক—কিন্তু সেগুলোতে রাজা হেয়ডের লাঞ্ছনা সাধারণভাবে রাজতন্ত্রবিরোধী প্রচার হতে যাবে কেন ? এই প্রতিবাদ বা বিদ্বেষ পাপী অত্যাচারী রাজাদের বিরুদ্ধে —ঋষি ব্রামইয়ার্ডের যে উক্তি উৎপলবাবু উদ্ধার করেছেন (পৃঃ ২৭০) তাতেও তাই দেখা যায়।

তাহলে শেষপর্যন্ত যা দাঁড়াচ্ছে তা হচ্ছে মার্কসীয় ইতিহাস বিচারের অছিলায় নিজের সংকলিত একটি আদিম সাম্যবাদী সুর সম্বলিত সনাতন খৃষ্টীয় তত্ত্বকে উৎপলবাবু এলিজাবেথীয় জনগণের মর্মবাণী বলে দাবী করছেন, এবং দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে বিচার করে শেক্সপিয়রকে বুর্জোয়াবিরোধী জনমানসের ধর্মসংগীতবাদক হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি এর কোনো প্রয়োজন ছিল ? উৎপলবাবু ব্রায়াণ্ট, সীগেল, রিবনার, ভিভিয়ান (এঁদের সকলের গুরুদেব উইলসন নাইটকে বাদ দিলেন কেন ?) প্রভৃতি সমালোচকের খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের সাহায্যে শেকসপিয়র ব্যাখ্যার সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজেও তিনি ঠিক একই কাণ্ড করেছেন, কিছু মার্কসীয় গৌরচন্দ্রিকা এবং খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের এক 'জনগণতান্ত্রিক' সরলীকরণ বাদে। উইলসন নাইট ও তাঁর শিষ্যদের মত তিনিও শেক্সপিয়রের বিভিন্ন নাটকে খৃষ্টীয় রূপকল্প পাঠ করেছেন যদিও স্বাতন্ত্র্যরক্ষার খাতিরে পূর্বসূরীদের নিন্দা করেছেন রূপক ও সাংকেতিকতার মধ্যে বিভাজন রেখা টেনে (পৃঃ ৩৮৫)। পাঁচপৃষ্ঠা যেতে না যেতেই কিন্তু স্পিভাকের অনুধ্বনি করে তিনি বলছেন 'শেকসপিয়ার-এর নাটকগুলিও মধ্যযুগের মোরালিটি-রূপকের নূতন ভাষ্য মাত্র' (পৃঃ ৩৯০)। একথা যদিও বা বেন জনসন বা কিছু কিছু অমুখ্য এলিজাবেথীয় নাট্যকারের কিছু কিছু নাটক সম্পর্কে খাটে, শেকসপিয়রের নাটক সম্পর্কে এই সূত্র প্রয়োগ সন্দেহের উদ্রেক করে। এর অর্থ আদৌ এ নয় যে শেকসপিয়রের নাটকে ধর্মতত্ত্বের অবতারণা বা আভাস মাত্র নেই। রিচমণ্ড নোবল (Shakespeare's Biblical knowledge and use of the Book of Common prayer) এবং রোলাণ্ড ফ্রাই (Shakespeare and Christian Doctrine) তন্নতন্ন করে শেকসপিয়ারের নাটকে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় তত্ত্বের প্রকাশ আলোচনা করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কথা বলেছেন ফ্রাই, 'Shakespeare's concerns are essentially secular, temporal non-theological' 'when Shakespeare provides one of his characters with a theological allusion or comment, it is aptly and accurately subordinated to the characterization and the plot development within the context of which it appears' 'Always, the theology he knew and used is contributory to the drama, and not vice versa' (*ঐ গ্রন্থ ভূমিকা*)। এই গেল ধর্মতত্ত্বের কথা। নীতিতত্ত্বের কথা তুললেও দেখা যাবে শেকসপিয়রের নাটকে যে মানবতার জয় তাকে কালজয়ী শক্তি দিয়েছে, তাকে খৃষ্টীয় পোষাক পরাতে পারলে কি শেক্সপিয়রকে বেশী নম্বর দেওয়া যায়, না তার নাটক থেকে বেশী রস ও প্রেরণা লাভ করা যায় ? 'হেলেন গার্ডনার বলছেন, ধর্মীয় ব্যাখ্যাকাররা নাটকগুলির আসল তাৎপর্যকে মেঘাচ্ছন্ন (obscure) করে দেন'—এই কথা বলে উৎপলবাবু গার্ডনারকে সমালোচনা করেছেন। গার্ডনার ঐ ধর্মীয় ব্যাখ্যাকারীদের (যাঁদের নাম ওপরে করা হয়েছে) সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : "Patterns have been found in plenty and meanings are being pointed to

everywhere, but the true meaning cf the work—its supreme value when we re-read it, or when we go to see it acted, or when the memory of it comes back to us—seems less illuminated than obscured by the interpreters efforts" এবং একটু পরেই বলেছেন যে শেক্সপিয়র আলোচনা করতে গিয়ে যেন স্পেনসার আলোচনার পদ্ধতি প্রয়োগ না করা হয়। উৎপলবাবু, বোধকরি নিজের অজ্ঞাতেই New Criticদের খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন।

এইভাবে পূর্বকল্পিত একটি ছকের মধ্যে শেক্সপিয়রের সৃষ্টিকে সাজাতে গিয়ে যে ভাঙচুর উৎপলবাবুকে করতে হয়েছে, তার ফলে বহু ক্ষেত্রে স্ববিরোধিতা, অপব্যাখ্যা, হেত্বাভাস বা কষ্টকল্পনার হাত তিনি এড়াতে পারেন নি। কয়েকটি নাটকের আলোচনা তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন যেমন ম্যাকবেথ, জুলিয়াসসীজার, মেরি ওয়াইভস, টাইটাস, টুয়েলফথ নাইট, এ্যাণ্টনী এ্যাণ্ড ক্লিওপ্যাট্রা, কোরাইওলেনাস, মাচ এডো, অলস ওয়েল। কয়েকটিকে আলতো করে ছুঁয়ে গেছেন যেমন লীয়র, টেম্পেষ্ট, ট্রয়লাস ও ক্রেসিডা, মিডসামার নাইটস ড্রীম, রোমিও জুলিয়েট, মেজার ফর মেজার, পেরিক্লিস ও গোড়ার দিকের কমেডিগুলো। তাঁর আলোচনার বেশীর ভাগ জায়গা নিয়েছে হ্যামলেট, টাইমন, মার্চেণ্ট অফ ভীনিস. এ্যাজ য়ু লাইক ইট, উইণ্টার্স টেল, সিম্বেলিন ও ঐতিহাসিক নাটকগুলো। এইভাবে শেক্সপিয়রের একটি খণ্ডচিত্রকে সমগ্র বলে উপস্থিত করা হয়েছে। অবশ্য এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ তাঁর প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করার জন্য যে তথ্য প্রয়োজন সমালোচক তাই সাজাবেন, যদি না তাঁর উদ্দেশ্য হয় বিষয়ভূমির বস্তুনিষ্ঠ সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ ও বক্রী মনে হবে। শেক্সপিয়র সমুদ্রযাত্রার (অতএব বাণিজ্য ও বণিক সভ্যতার) বিরোধী ছিলেন বলে উৎপলবাবু নজীর দেখিয়েছেন। শেক্সপিয়রের বাল্য ও কৈশোর কেটেছে উপকূল থেকে দূরে। তিনি স্বয়ং কখনো সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন কিনা তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। কাজেই সমুদ্র যাত্রার বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর যে খুব রোমাঞ্চকর উৎসাহ থাকবে এমনটি আশা করা অন্যায়। কিন্তু সমুদ্রযাত্রা তাঁর মানসজগতে বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা জুড়ে ছিল (হয়তো স্থানও যুগপ্রভাবে) এটা তাঁর নাটকে সমুদ্রযাত্রার পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয়। সমুদ্রযাত্রা সর্বদাই শেক্সপিয়রের নাটকে নতুন অভিজ্ঞতার দ্যোতক। তাঁর শেষ কমেডিগুলোতে তো সমুদ্রযাত্রাই পুনর্মিলন এবং স্নিগ্ধশান্তির সহায়ক। মনে হয়, সমুদ্রপাড়ির বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তাঁর ভয়ের ভাবটাই প্রবল ছিল, যদিও সাংকেতিক কল্পনার জগতে তিনি বারবার বলেছেন 'এলেম নতুন দেশে, তলায়ে গেল ভগ্নতরী'। এর সঙ্গে বণিক সভ্যতার কোনো যোগ নেই। আর স্যালারিওর যে উক্তি উৎপলবাবু উদ্ধার করেছেন (পৃঃ ৭) তাকে ঈশ্বরবিদ্বেষ বলে উনি ব্যাখ্যা করলেন কী বলে? স্যালারিও যে নাটকে একটি উপহাসাস্পদ চরিত্র এ কথা উৎপলবাবুর কখনো মনে হয়নি, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত। তার কথায় প্রেক্ষাগৃহে যদি কখনো কিছু ফেটে থাকে তা বিক্ষোভের বোমা নয়, হাসির পটকা। এর একটু পরেই (পৃঃ ১১) পোর্শিয়ার মুখে বণিক-সভ্যতার নিন্দা শেকসপিয়র বসান নি, ওটা উৎপলবাবুর কষ্টকল্পনা। তার একটু পরেই পোর্শিয়া হয়ে গেলেন এ যুগের যীশু (পৃঃ ১২) কিন্তু তিনি 'অভিজ্ঞ

ক্রুশবিদ্ধ হলেন না, শয়তানের সঙ্গে শয়তানের অস্ত্রেই লড়লেন।' [এর আট বছর পরে টাইমনে যে যীশুর আবির্ভাব হোলো তিনি কিন্তু 'বিভ্রান্ত ব্যর্থ, ক্রুশবিদ্ধ' (পৃঃ ২০৯-২২২); পোর্শিয়া-যীশু কথার প্যাচে জিতলেন, টাইমন-যীশু কথার তোড়ে মরলেন। [শেকসপিয়রীয় (?) যীশুর এই বিবর্তন সম্বন্ধে উৎপলবাবু নীরব।] তামাক ('বণিক-সভ্যতার বিজয়স্তম্ভ ?) নিয়ে শেক্সপিয়র একটি কথাও বলেন নি, কাজেই প্রমাণ হচ্ছে শেক্সপিয়র বণিক-বিরোধী! 'কিং জন' নাটকের আলোচনায় উৎপলবাবু প্রথমেই ঠিক করে দিয়েছেন শেকসপিয়র জন-তথা-এলিজাবেথ-তথা-প্রোটেষ্ট্যাট বণিক-রাজতন্ত্রের বিরোধী : কাজেই জনের মুখে পোপ-বিরোধী কথা আসলে শেকসপিয়রের পোপের প্রতি সমর্থনই সূচনা করে। এদিকে তিনি বলছেন শেকসপিয়রের চোখে ও তাঁর কালে শ্রমজীবীজনতার কানে 'ইটালি' কথাটাই আতংক ও ঘৃণা সৃষ্টি করত (পৃঃ ২২৯-২৩০ এবং ২৩৫ পর্যন্ত) অথচ প্যাণ্ডালফকে জন যখন 'ইটালিয়ান পুরোহিত' বলে উল্লেখ করছেন (পৃঃ ৮৬) তাতেও প্যাণ্ডালফের প্রতি শেকসপিয়রের (ও সমকালীন জনগণের) সমর্থনই সূচিত হয়! ফকনব্রিজকে উৎপলবাবু শেকসপিয়রের মুখপাত্র আখ্যা দিতে চাইছেন (পৃঃ ৮৯), অথচ রাজা জনের প্রতি ফকনব্রিজের যে মনোভাব, তার যে আনুগত্য (শেষ পর্যন্ত) তার প্রতি অনায়াসেই কান বন্ধ করে থাকছেন। নাটকের দ্বিতীয় অংকের শেষে ফকনব্রিজের মুখে যে commodityর ওপর বক্তৃতা তার শেষ অংশটুকুকেও (যেখানে ফকনব্রিজ নিজেও commodityর উপাসক হতে চাইছে) উৎপলবাবু বেশ ভুলে থাকছেন। মঠ-লুণ্ঠন করাতে ফকনব্রিজের দোষ হোলো না। হোলো জনের (পৃঃ ৯২)! ফ্রান্সের যুবরাজ লুইকে শেকসপিয়র মমত্ব সহকারে এঁকেছেন, সে এক নির্ভীক কিশোর-যোদ্ধা—এই উৎপলবাবুর বিচার—কিন্তু ফকনব্রিজ ও প্যাণ্ডালফ, উৎপলবাবুর ভাষায় শেক্সপিয়রের এই দুই মুখপাত্র, লুই সম্বন্ধে ও লুইকে যা বলছেন তা শোনার পর উৎপলবাবুর বিচার সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। নাটকের শেষে ইংলণ্ডের গৌরব ঘোষণায় মুখর ফকনব্রিজের সেই বিখ্যাত সংলাপটিকে উৎপলবাবু ছুঁয়েও দেখেন নি। 'উইন্টার্স টেলে'র যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন (পৃঃ ১১১—১১৭) তা পুরোপুরি ব্রায়ান্ট এবং উইলসন নাইটের অনুসারী, শুধু হার্মাইওনিকে তিনি যীশু থেকে মেরীমাতার পদে প্রোমোশন দিয়েছেন। মাঝখানে পার্ডিটার একটি সংলাপকে লিওন্টেসের বলে (পৃঃ ১১৫) চালিয়ে দিয়ে নিজের তত্ত্বের সমর্থন সংগ্রহ করেছেন। নয়তো লিওন্টেস—হেরড এবং পলিনা—সেন্টপল অভেদ কল্পনা ঠিকই আছে। অবাধ কল্পনাশক্তি অবাধ্য ঘোড়ার মতই কোথায় দিয়ে যেতে পারে তার আভাস পাওয়া যাবে উৎপলবাবুর old tale hooted at এর ব্যাখ্যায় (পৃঃ ১১৭)। যীশু মূর্তির সন্ধানে উৎপলবাবু বেপরোয়া। একই পাতায়, একই অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৯৮) তিনি একই সাথে পার্ডিটা, কর্ডেলিয়া, হ্যামলেট, ফোর্টিনব্রাস, ম্যালকম এবং শেষ পর্যন্ত 'অষ্টম হেনরী' নাটকের শিশু এলিজাবেথ—প্রত্যেকেরই মধ্যে যীশুকে দেখেছেন, এ ছাড়া টাইমন ও পোর্শিয়াতো আছেই। ভক্তেরা যে কীভাবে জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হরিময় বা তারাময় দেখেন তা খানিক যেন বোঝা যাচ্ছে। গনজালো (পৃঃ ১৫৩) এবং গ্লস্টার (১৫৪) এর দুটি সংলাপ উৎপলবাবু উদ্ধার করেছেন, কিন্তু তাদের ওপর মঁতেনের প্রভাবের, উল্লেখমাত্র না করে উৎপলবাবু এদের খৃষ্টীয় সাম্যবাদের প্রভাব বলে বর্ণনা করেছেন। য়ুলিসিসের যে উক্তিটিকে (পৃঃ ১৫৫) তিনি 'বিদ্রোহী-চিন্তা'

'সমষ্টির আধিপত্যের ঐতিহ্যবাহী' ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন সেই উক্তিটির উদ্দেশ্যটা মনে রাখলে তিনি নিশ্চয়ই এসব কথা বলতেন না। তিনি নিজেই য়ুলিসিস সম্পর্কে যথাযথ (এবং ভিন্ন) আলোচনা করেছেন (পৃঃ ৩৭১)।) মধ্যযুগ থেকে ষোলো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, বিরোধ বা মিলন, এবং সমষ্টিগত স্বার্থ বনাম ব্যক্তিস্বার্থের যে আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ১৬০—১৬৬) তা পদে পদে স্ববিরোধিতার এবং অবান্তর মন্তব্যে কণ্টকিত। এই আলোচনার শেষে য়ুলিসিসের universal wolf কথাটিকে উৎপলবাবু ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে এর মধ্যে বুর্জোয়াদের হিংস্র আরণ্যক আইন, নিবৃত্তিহীন মহাক্ষুধা সম্পর্কে শেক্সপিয়রের নিজমত ঘোষিত হচ্ছে। অথচ এই কথাটি য়ুলিসিসের বিখ্যাত 'degree' সংলাপের অন্তর্ভুক্ত এবং সেখানে এর অর্থ যে অত্যন্ত রক্ষণশীল সে কথা কি উৎপলবাবুর অজানা? তারপরেই টিলিয়ার্ডকে আক্রমণ করে উনি বলছেন 'সোনা' জিনিষটা শেকসপিয়রের নাটকে সর্বদাই লালসার প্রতীক, কাজেই Golden কথাটাও সর্বদাই নিন্দাসূচক! ইহুদী শাইলকের প্রতি শেকসপিয়রের সহানুভূতি উৎপলবাবু মানতে রাজি আছেন, কিন্তু নিগৃহীত ক্যালিবানের প্রতি নয়, অন্ততঃ তার উল্লেখ কোথাও নেই। সে শুধুই সোনার স্তাবক দানব (পৃঃ ১৭৮)। তারপর আছে শেক্সপিয়রের নাটকে অরণ্যের বিচিত্র ভূমিকার ব্যাখ্যা। আর্ডেনে বাণপ্রস্থ সাচ্চা খৃষ্টীয় তত্ত্বানুসারী (অতএব বিপ্লবী প্রতিবাদ) (পৃঃ ১৯৯); টাইমন এর বাণপ্রস্থ কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিজীবীর প্রতি নাট্যকারের তীব্র উপহাস, (পৃঃ ২২২); আবার সিম্বেলিন নাটকে অরণ্য হোলো 'মুক্ত-অঞ্চল' (পৃঃ ২২৩), কিন্তু 'মিড সামার নাইটস ড্রীমে'র অরণ্য প্রেমিক ও অভিনেতাদের 'মুক্ত-মেলা' (পৃঃ ১৯২)। এই সব অরণ্য সঞ্চারের পেছনে যে খৃষ্টীয় সাম্যবাদী বৈরাগ্যতত্ত্বের জয়গান উৎপলবাবু আবিষ্কার করেছেন, একটু ভেবে দেখলেই দেখা যাবে তা আসলে মার্কস-বর্ণিত 'জনতার আফিম।' তারপর ফ্রেডরিক সিলিয়াকে টাকার লোভে নির্বাসন দিয়েছেন (পৃঃ ১৯৫) ; জেকুইস নাটকের ভাঁড় (পৃঃ ১৯৬) অলিভার ও ফ্রেডারিকের হৃদয় পরিবর্তন ঈশানুসরণে (পৃঃ ২০০) টাচস্টোনের মুখে angel শব্দটির ভুল ব্যাখ্যা (পৃঃ ১৯৭) অর্ল্যাণ্ডো বর্ণিত অতীত জগতের dignity of labour (পৃঃ ১৯৬) এর সাথে যীশু প্রচারিত কর্মবিমুখতার (পৃঃ ১৩৯) কোনো অসঙ্গতি দেখতে না পাওয়া—তালিকা বেড়েই চলে। জেকুইসকে উৎপলবাবু সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছেন। সে ভাঁড় নয়, ভাঁড়ের ভূমিকা নিতে চায়। কারণ তাহলেই সে সবাইকে অপ্রতিহত সমালোচনা করার অধিকার পাবে। সে আসলে একটি দায়িত্ববোধহীন, আত্মসর্বস্ব, পণ্ডিতম্মন্য পরগাছা। নাটকে 'ফুল' একজনই—টাচস্টোন—তার সমালোচনার অধিকার কেউ অস্বীকার করে না, না পাত্র-পাত্রীরা, না নাট্যকার নিজে, না কোনো সমালোচক। জেকুইসের melancholy, melancholia নয়, তা এলিজাবেথীয় চতুর্বর্গ humour এর একটির আধিক্য। জ্যেষ্ঠ ডিউক, রজালিণ্ড, অর্ল্যাণ্ডো, টাচস্টোন, অড্রি, করিন প্রত্যেকের জেকুইসের প্রতি মনোভাব এবং জেকুইসের শেষ দুজনের প্রতি (এরা কিন্তু শ্রমজীবী জনতা!) দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করলে জেকুইস চরিত্রের অর্থ স্পষ্ট হবে। তার দার্শনিক বাগাড়ম্বরও তার স্বভাবেরই অংশ, এবং তার মধ্যে অনেক কিছুই সমকালীন প্রচলিত এবং বহু আবৃত্ত মতবাদ। কিছু মৌলিক চিন্তা নয়। আর্ডেনের জীবন মোটেও বৈরাগ্যভিত্তিক, ভোগবর্জিত (পৃঃ ১৯৯) নয়।

পালাশেষে তাই অরণ্যচারীদের সকলের সেই ভোগবিলাসের কেন্দ্রে প্রত্যাবর্তন। টাইমনকে বারবার যীশু বলে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু মোহভঙ্গের আগে পর্যন্ত তার যে ভোগবিলাস (যদিও একা একা নয়, সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে) তার কথা বোধহয় না বলাই ভাল। এই রূপক দর্শনে উৎপলবাবু আবার উইলসন নাইট, সীগেল এবং আর্ভিং রিবনারের পদাংক অনুসরণ করেছেন (টাইমন যীশু নয়, কারণ যীশুর অনেক উক্তির প্রতিধ্বনি করলেও, সব বিলিয়ে দিয়ে সে অন্তরেও রিক্ত হয়ে যায়, আবার প্রতিবাদ না পেলে খেপে গিয়ে মানবদ্বেষী হয়ে যায়—এমন কি তার প্রতি যারা অনুগত তাদের পর্যন্ত সে ত্যাগ করে—এ sentimental fool ছাড়া আর কী ? টাইমনের নাটকে তাই শেকসপিয়র লোভী, বিশ্বাসঘাতক ও ভণ্ড স্তাবকদের অত্যন্ত তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেও টাইমনের ট্রাজেডি আমাদেরকে অভিভূত করে না—এর কোনো মহৎ মানবিক অভিব্যক্তি নেই—নাটক হিসেবেও এ অত্যন্ত দুর্বল। টাইমন শেকসপিয়রের একক রচনা নয় এবং আধাখেচড়া নাটক—এ ধরণের মত পণ্ডিতমহলে প্রচলিত আছে। এবং সে মত বুর্জোয়াদের শ্রেণীস্বার্থে প্রচারিত নয়, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত। cash nexus-এর মত তীব্র সমালোচনা ও রূপ রূঢ় চিত্র টাইমনে আছে এমন আর কোনো নাটকে আছে কিনা সন্দেহ ; বাইবেলেরও বহু উক্তির প্রতিধ্বনি বা ইংগিত এতে আছে ঠিকই—কিন্তু সবকিছু সত্বেও টাইমন নাটক টাইমনের সমস্যা ও বেদনাকে সার্বজনীন করে উপস্থিত করতে পারেনি। এ্যালসিবাইয়াডিসকে উৎপলবাবু দেখেছেন মুক্তিদাতা বিপ্লবী বীর হিসেবে, কিন্তু তার দুই সহচরীকে ঘেরাটোপ ঢাকা দিয়ে রেখেছেন। টাইমনের মানববিদ্বেষ সম্পূর্ণ না আংশিক এ বিষয়ে উৎপলবাবু মনস্থির করতে পারেননি (২০৪, ২০৯, ২১৭) ২২২-২২৩ পৃষ্ঠায় বেলারিউসের যে সংলাপ উৎপলবাবু উদ্ধৃত করেছেন তা স্পষ্টতঃই রাজসভা ও রাজপ্রাসাদের আড়ম্বরপূর্ণ, কৃত্রিম জীবন সম্পর্কিত কিন্তু উৎপলবাবু বলছেন, 'যে জীবনকে বেলারিউস আক্রমণ করছেন তা সাধারণভাবে বর্ণিত কোনো শহর-সভ্যতা নয়, তা সুপরিনির্দিষ্ট অর্থলোভ-ভিত্তিক শহর, যেখানে সুদখোর আর অর্থলোলুপ নয়া-অভিজাতদের দৌরাত্ম্য।' সিম্বেলিন নাটকটিকে উৎপলবাবু দেখেছেন (উইলসন নাইটও তাই দেখেছেন) ইংলণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী হিসেবে। থেকে থেকেই তিনি এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কবির শ্রেণীচেতনা (পৃঃ ২৩৭), জনগণের বীরত্ব ও জনতার আপসহীন বিজাতীয় ঘৃণার স্বাক্ষর (পৃঃ ২৪০)। এমন কি কারাকক্ষের দৃশ্যে পসটিউমনের স্বপ্নদর্শনের masque-টিকে তিনি তুলনা করেছেন 'যাত্রা/সাদ' নাটকের নাট্যকৌশলের সঙ্গে। কিন্তু বাকি নাটককে তিনি যে চোখে দেখেছেন তার সাথে এক অংশকে মেলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বলেছেন 'এছাড়া আর কোনো সমাধান এ নাটকে হতে পারে না, নাটক রূপকথায় উন্নীত হয়ে গেছে' (পৃঃ ২৪১)। অথচ 'সিম্বেলিন' আসলে আগাগোড়াই একটি রূপকথা, (আর্ডেন সংস্করণে নোজওয়ার্দির ভূমিকা দেখুন) কৌতুক-নক্সার ভঙ্গিতে উপস্থাপিত—রাক্ষসী রাণী, স্ত্রৈণ রাজা, কীচক পুত্র, হারানো রাজকুমার, নিরুদ্দেশ রাজকন্যা, নির্বাসিত দরিদ্র রাজজামাতা, খল প্ররোচক, বিতাড়িত রাজভক্ত মন্ত্রী, ভবিষ্যৎবক্তা, আদর্শ ভৃত্য—প্রত্যেকে এক একটি animated puppet. রূপকথার মর্মে যে এষণাটি লুকিয়ে আছে তা হচ্ছে পুনর্মিলনের। ইংল্যাণ্ড বনাম রোমের যে যুদ্ধটি উপস্থিত করা হয়েছে সেটি যে নাটকের একটি গৌণ ঘটনা, একটি নাট্যকৌশল সব কটি চরিত্রকে এক জায়গায় জড়ো করে রহস্য উদ্ঘাটন করার জন্যে, তা

বুঝতে কি খুব বেগ পেতে হয় ? আর সে যুদ্ধও উপস্থিত করা হয়েছে কী ভাবে ? উৎপলবাবু যাকে দাবানলসৃষ্টিকারী স্ফুলিংগ বলে বর্ণনা করেছেন (অত্যন্ত বিপ্লবসম্মত মনোভাব, সন্দেহ নেই) সেযুদ্ধও রূপকথার যুদ্ধ—দৃষ্ট নয়, বর্ণিত, তাই নিয়ে পলটিউমস ছড়া পর্যন্ত বাঁধতে সুরু করে। এই নাটক এত এত মনস্বী পণ্ডিত এত গুরুগম্ভীর ব্যাখ্যার সাহায্যে আলোকিত করার চেষ্টা করছেন, যে শেকসপিয়রের কৌতুকবোধ একটু বেশী সূক্ষ্ম হয়ে গেছে সন্দেহ হয়, অথচ 'সিম্বেলিন'কে শহরবাসীর চোখে দেখা ঐতিহাসিক যাত্রার পালা বলেই বরাবর মনে হয়েছে। এর মধ্যে নাট্যকারের সমাজচেতনা অবশ্যই প্রকাশ পেয়েছে, তবে তা এজিটপ্রপের বিষয়বস্তু নয়, তা কতকগুলো মৌলিক মানবিক পরিস্থিতি ও কতকগুলি আদিরূপের সরলীকৃত বিবৃতি। ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনায় এসে উৎপলবাবু শেকসপিয়রকে রাজতন্ত্র-বিরোধী হিসেবে প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন। সেযুগের বহু সাহিত্যিক ও তাত্বিকের মত শেকসপিয়র যে রাজ-মহিমা-কীর্তনে সর্বদা নিযুক্ত ছিলেন না এ সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উৎপলবাবু আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন, কিন্তু তাই বলে শেকসপিয়রকে রাজতন্ত্র-বিরোধী বলাটা কি ঠিক ? আমাদের মনে হয় রাজার প্রতি শেকসপিয়রের মনোভাব পোপের প্রতি দান্তের মনোভাবের সাথে তুলনীয়। শেকসপিয়রের বেশীর ভাগ রাজাই লোভী, স্বেচ্ছাচারী, ভণ্ড, ক্রূর—তার অর্থ এই নয় শেকসপিয়র রাজতন্ত্রেরই বিরোধী ছিলেন, এবং বিকল্প শাসক হিসেবে পোপ বা পার্লামেন্টকে শ্রেয় মনে করতেন। রাজাদের সমস্ত অপগুণ প্রকাশ করতে গিয়ে শেকসপিয়র কোথাও দুর্বলতা দেখাননি, বা সাফাই গাননি। কিন্তু শেষ বিচারে তাদের তিনি মানুষ হিসেবে দয়া দেখিয়েছেন। শক্তির দম্ভ ও নিষ্ঠুরতার আতিশয্য সত্বেও প্রত্যেকেই পরাস্ত এমন অন্য কোন শক্তি বা পরিস্থিতির কাছে যাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করেছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই কাহিনী তাই ট্র্যাজেডি। শেকসপিয়রের দৃষ্টিভংগীও এই বিচারে শ্রেণীসংগ্রামের দৃষ্টিভংগী নয়, মানবিক, উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি। শেকসপিয়র যদি 'Combat Liberalism পড়তে পেতেন তবে হয়তো উৎপলবাবুর বর্ণিত দৃষ্টিভংগী নিয়ে নাটকগুলোকে সংশোধন বা পুনর্লিখন করতে পারতেন। কিন্তু তা পান নি, সেই জন্যেই 'শেকসপিয়র কি শাসকশ্রেণীর পক্ষে, না জনতার' (পৃঃ ২৮৭) প্রশ্নটির এককথায় উত্তর হয় না। উনি অত্যাচারীর বিপক্ষে, অত্যাচারিতের পক্ষে ; উনি দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, বিশ্বাস, আনুগত্য, বিবেচনাবোধ, ক্ষমা প্রভৃতির পক্ষে ; লোভ, শঠতা, ঈর্ষা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতির বিপক্ষে ; মানুষ যখন অসহায়, নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাকাতর তখন উনি তাকে করুণাবারি দিতে ইতস্ততঃ করেন না, সে মানুষ পূর্বজীবনে যত অন্যায়ই করে থাকুক ; পরাজিত ও লাঞ্ছিতের দুঃখে তিনি সর্বদাই করুণ আঁখি। এই জন্যেই 'রাজা রিচার্ড মানুষ রিচার্ডে উন্নীত' হয় (পৃঃ ২৯৪) ; রক্তলোলুপ নরপিশাচ তৃতীয় রিচার্ডের পতন করুণ ; ভণ্ড চতুর্থ হেনরীর শেষের সেদিন ভয়ংকর ; পঞ্চম হেনরী অজ্যাঁকুর-এর যুদ্ধ-শিবিরে মোক্ষম শিক্ষা লাভ করেন সেই সাধারণ মানুষের কাছে, যাদের প্রতিনিধি তিনি নিজেকে মনে করেন, কিন্তু আসলে যাদের তিনি পরিহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ফলষ্টাফ ও তার সঙ্গীদের 'সাধারণ শ্রমজীবি', দরিদ্র জনগণ প্রভৃতি বলে উৎপলবাবু যে বর্ণনা করেছেন তা স্বীকার করতে যে কোন শেকসপিয়র পাঠকের বাধবে। ফলষ্টাফ ও তার সঙ্গীদের সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি এঁকেছেন, কিন্তু তাই বলে তারা যে পরজীবি, শ্রমবিমুখ, ইয়ার-বক্সী এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ রাখেননি।

তারা দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু কেউ সততা নিয়ে বেশী মাথা ঘামায় না। শেকসপিয়রের অসংখ্য সৎ দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথা মনে রাখলে সরাইখানার এই দলটিকে বিপ্লবী রং এ রাঙ্গাতে বাধে। যুদ্ধলোলুপ কুচক্রী রাজা ও তার সভাসদদের প্রতিপক্ষ ও তাদের ওপর শেকসপিয়রের ভাষ্য হিসেবেই এই দলটির উপস্থিতি। এদের সাথে অন্তরঙ্গতা যুবরাজ হ্যালের চরিত্রের মানবিক দিককে উদ্‌ভাসিত করে, কিন্তু রাজা হেনরি হতে গেলে এদেরকে বর্জন করতেই হয়, যদিও ফলষ্টাফের নির্বাসন নির্দয়। পঞ্চম হেনরিকে তাই আবার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় সাধারণ সৈনিকের কাছ থেকে, উইলিয়ম্‌সকে পুরস্কৃত করে হেনরি নিজের নৈতিক পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছেন। এই কারণেই পঞ্চম হেনরি শেকসপিয়রের অন্য সব রাজাদের চেয়ে বিশিষ্ট, পুরো গ্রেট ব্রিটেনের সমর্থনপুষ্ট, যদিও আদর্শ-পুরুষ বা আদর্শ রাজা হয়তো তিনি নন। হারফ্লোরের দৃশ্যের Savage King থেকে শেষ দৃশ্যের Soldier King-এ তার উত্তরণ। আসলে সব ঐতিহাসিক নাটকেই শেকস্‌পিয়র একটি বক্তব্য উপস্থিত করতে চেয়েছেন—তা হচ্ছে সর্বমত্যন্তমৃগর্হিতম্‌। দ্বিতীয় রিচার্ডের মালীদের কথোপকথন থেকে পঞ্চম হেনরির শেষ দৃশ্য পর্যন্ত, এই ইংল্যাণ্ডকে যে একটি পরিচ্ছন্ন, সুষমামণ্ডিত উদ্যান হিসেবে রক্ষা করা রাজার কর্তব্য—এটাই ধুয়োর মত উচ্চারণ করেছেন। 'ষষ্ঠ হেনরি' নাটকগুলোর বিশ্লেষণে উৎপলবাবু গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও বিষয়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তবে কেড-এর বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর বিচার গ্রহণ করা শক্ত। উৎপলবাবু বলছেন, 'সামগ্রিকভাবে বিদ্রোহটিকে নিন্দা করা প্রয়োজন ; অথচ বিদ্রোহীদের আঁকতে হবে সমবেদনা নিয়ে (পৃঃ ৩৬৬) এই নাকি ছিল শেকসপিয়রের মনোভাব। আমাদের মনে হয় এর ঠিক উল্টাটাই সত্যি। বিদ্রোহের যে চিত্র নাট্যকার এঁকেছেন তাতে বিদ্রোহীদের দাবী ও মনোভাবের প্রতি তাঁর সহানুভূতি সুস্পষ্ট। কিন্তু কেড-কে তিনি উপহাসাস্পদ করে উপস্থিত করেছেন, যে রাজতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করতে চায় নিজে রাজা হবার মৎলবে। এরকম নেতার পরিচালনায় বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিদ্রোহটা জনবিরোধী নয়, জনবিরোধী তার নেতৃত্ব। কেড-এর বাগবিস্তার বিদ্রোহকে কমিক করে তুলেছে, শেষ দৃশ্যে তার সাহসিক মৃত্যু তাকে বাঁচিয়েছে।

উৎপলবাবুর আলোচনা পদ্ধতির সমূহ প্রকাশ হ্যামলেট নাটক ও চরিত্রের আলোচনায়। যে আদিরূপ যোদ্ধামূর্তিকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন তার বিশিষ্ট লক্ষণগুলোর তাৎপর্য তিনি বিচার করেন নি—এ ভাবে লক্ষণ মিলিয়ে রোগনির্ণয় করলে রুগীর মারা পড়ারই সম্ভাবনা। ৪২২ পৃষ্ঠায় ডোভার উইলসন, স্পেনসার ও গোর্কিকে সাক্ষী মেনে হ্যামলেট চরিত্রের যে বিশ্লেষণ উনি উপস্থিত করেছেন তা এই যোদ্ধামূর্তির খোলসের মধ্যে হ্যামলেটকে নিবদ্ধ করার চেষ্টার চাইতে অনেক বেশী যুক্তিগ্রাহ্য ও বিষয়ানুগ। ওঁর এই যোদ্ধামূর্তির সাথে অনেক বেশী খাপ খায় সেকালের আন্তিগোনি বা একালের জঁ ক্রিস্তফ। হ্যামলেটের তথাকথিত উন্মাদনা ভগবৎ প্রেমিকদের ধর্মীয় উন্মাদনা নয়, তা একান্তই জাগতিক—তার মধ্যে মিশেছে তীব্র বিষাদ ও অসহায়তা অবরুদ্ধ ক্রোধের সাথে নিজের প্রকৃত মানসিক অবস্থা লুকিয়ে রাখার একটি কৌশল। পাগলের অনেক কথা বা ব্যবহার লোকে তুচ্ছ করে, পাগল সেজে তাই অনেককে অনেক কথা শুনিয়ে দেওয়া যায়, যা স্বাভাবিক

অবস্থায় যায় না। তাছাড়া নিজের প্রকৃত চিন্তাকে লুকিয়ে রাখা যায়।* হ্যামলেটের পাগলামি তাই ভাণও বটে, ভাণ নয়ও বটে। এর মধ্যে মুক্তিদাতার ঐশ্বরিক উন্মাদনা আবিষ্কার রজ্জুতে সর্পভ্রম। ঈশানুসরণে হ্যামলেটের পাগলামি হচ্ছে 'সংযম'-বর্জন—এই বলতে গিয়ে উৎপলবাবু যা বলেছেন তার মানে দাঁড়ায় উনি বিশ্বাস করেন ক্লডিয়াস সত্যি সত্যিই সংযমী ও মিতাচারী (পৃ: ৪৩৭) সে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ভণ্ডামি করছে না! ইয়াগোও 'বুদ্ধিবৃত্তির জয়গান করে, আবেগকে সংযত করার বুর্জোয়া উপদেশ দেয়' (পৃ: ৪৩৮) এই নীতিতে সে সত্যি বিশ্বাস করে বলে!—এ যে তার স্বার্থের কারণে পরকে বলি দেওয়া তা বোঝা কি এতই কঠিন? রডরিগোকে সে ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়, কারণ রডরিগো অধৈর্য হলে তার বিপদ; ওথেলোকে সেই একই উপদেশ সে দেয় যাতে অচিরে ওথেলোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। ঐ লড়াই আসলে চতুরতার সাথে সারল্যের, সংযমের সাথে উন্মাদনার নয়। বিচারবুদ্ধি ও সংযম সর্ব অবস্থায় কাপুরুষতা ও ক্ষুদ্রতার লক্ষণ অতএব বর্জনীয়—এ যুক্তি কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কুযুক্তি। প্রেতাত্মার দৃশ্যে হ্যামলেট হয়ে উঠেছেন স্যার গ্যালাহাড, ডেনমার্কের মুক্তিসূর্য! (হ্যামলেট ছাড়া আর কাকে তাঁর নিহত পিতা প্রতিশোধের জন্য নির্বাচন করতে পারতেন?) অলৌকিকের ডাক, প্রতিশোধের কর্তব্য অবলাবান্ধবতা, এসোটেরিক মন্ত্রগুপ্তি, বিশ্বাসের কাছে যুক্তির খর্বতা একটু একটু করে হ্যামলেট বেশে খোঁপে এটে যাচ্ছেন। এই দৃশ্যে হ্যামলেট নাকি আসন্ন ধর্মযুদ্ধের উদ্দীপনায় অস্থির, আনন্দে বিহ্বল—এই আনন্দ-উদ্দীপনার সাথে এই দৃশ্যেই প্রেতের সাথে হ্যামলেটের লঘুভাষণ কিংবা পরবর্তী দৃশ্যের পর দৃশ্যে হ্যামলেটের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিষাদ, হতাশা, আত্মহননের ইচ্ছা, কর্তব্যপালনে দ্বিধা ও বিলম্ব, শেষপর্যন্ত ভবিতব্যকে স্বীকার করে নেওয়া—এসবকে মিলিয়ে কোনো সুষ্ঠু ব্যাখ্যা উপস্থিত করার চেষ্টা কিন্তু করেন নি উৎপলবাবু। হ্যামলেট-ওফিলিয়া সম্পর্কের আলোচনায় উৎপলবাবু নাটকের পাঠকে বিকৃত করেছেন ও আশ্চর্য সব ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। ওফিলিয়া যে তাঁর বাবা ও দাদার নির্দেশে হ্যামলেটের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন তার একাধিক ইঙ্গিত ও উল্লেখ নাটকে আছে (I, iii, 45 ; I, iii, 136 ; II, i, 108-110 ; II, ii, 145 ; III, i, 93—95)—প্রথম অংকে ওফিলিয়া প্রতিজ্ঞা করছেন হ্যামলেটের সঙ্গে তিনি মেলামেশা বন্ধ করবেন, দ্বিতীয় অংকে নিজমুখে বলছেন তিনি হ্যামলেটের চিঠি নিতে ও তাঁর সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেছেন, তৃতীয় অংকে আমরা দেখি তিনি হ্যামলেটকে পুরোনো সব উপহার ও স্মৃতিচিহ্ন ফিরিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ৪৭৪—৪৮৮ পৃষ্ঠায় উৎপলবাবু বলছেন মহৎ ওফিলিয়া নাকি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করে হ্যামলেটের সঙ্গে মেলামেশা করছিলেন কিন্তু ধর্মযুদ্ধের পরিব্রাজক হ্যামলেট নারীবর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিকে তিনি নিজের কামনা বাসনা দমন করতে পারছেন না, অন্যদিকে কর্তব্যের নির্দেশে তিনি ব্রহ্মচর্য পালনে বদ্ধপরিকর। এই দোটানায় পড়ে তিনি জর্জরিত, আর সেই ঝাল ঝাড়ছেন ওফিলিয়ার ওপর, নির্দোষ ওফিলিয়ার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। 'নানারি' দৃশ্যে অভিনয়ের মঞ্চ-ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা সম্পূর্ণ উপযুক্ত, কিন্তু তাঁর

---

* যে পরিস্থিতিতে হ্যামলেট পড়েছেন তাতে মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল। তার সবচেয়ে প্রিয় তিন জন মানুষের মধ্যে একজন নিহত, একজন কলংকিত, একজন অন্তর্হিত।

নিজস্ব ব্যাখ্যা একেবারে ভাজ্জব। ওফেলিয়া—বিষ্ণুপ্রিয়া, হ্যামলেট—ভ্রষ্টাচার-শংকিত ধর্মযোদ্ধা ইত্যাদি আজগুবি সমীকরণ সাধন তিনি করেছেন। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও ওফিলিয়া তাঁর গুরুজনদের আদেশ লক্ষীমেয়ের মত মেনে নিতে গিয়ে হ্যামলেটের চিত্তজগতে যে ভূমিকা সৃষ্টি করেছেন তার সন্ধান তাই উৎপলবাবু পান নি। হ্যামলেটের বিষাদকে উৎপলবাবু দেখছেন libido vs asceticism এর সংগ্রামজাত হিসেবে—অথচ সে বিষাদের সাধারণবুদ্ধিগ্রাহ্য সব কারণই বর্তমান রয়েছে: পিতার হত্যা, মাতার কলংক, প্রিয়ার প্রেমের দুর্বলতা। এর মধ্যে কল্পনার প্রক্ষেপ করার প্রয়োজন কী? কল্পনার রাস ছুটিয়ে ৪৭৩ পৃষ্ঠায় তিনি হ্যামলেটের সঙ্গে তুলনায় কাকে না এনেছেন—ভীষ্ম, বিশ্বামিত্র, মধ্যম-পাণ্ডব! 'মাতার নির্লজ্জতায় হ্যামলেট আরো বেশি করে ওফিলিয়াকে তৃণখণ্ডসম আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছিলেন' (৪৬৭), কিন্তু 'ওফিলিয়ার দর্শনমাত্রেই হ্যামলেট অনুভব করেছেন আপন দৌর্বল্য—যোদ্ধার মানসিক সাজে এত সহজে ফাটল ধরতে দেখে হ্যামলেট লজ্জাবিপ্লুত নিজের প্রতি ঘৃণায় তিনি সংকুচিত' (পৃঃ ৪৭৩), কারণ 'মুক্তিদাতার রমণীসম্ভোগ তো শাস্ত্রে নেই' (পৃঃ ৪৭০)। সমালোচকেরা এইসব বুঝতে পারেন না, তাই তাদের এত সমস্যা! 'ন্যায়প্রতিষ্ঠার জেহাদের' 'তুলনায় এক নারীর প্রেমকে তুচ্ছ মনে করার ক্ষমতা' যদি এদের থাকতো তবেই হ্যামলেটের চোখ দিয়ে এরা ওফিলিয়াকে দেখতে পেতেন! আপন বেগে পাগলহারা নদীর মত তাঁর কল্পনাশক্তি ছুটেছে, তাই উৎপলবাবু বুঝতে পারছেন না এটা হ্যামলেটের চোখ নয়, এটা তাঁর নিজেরই রঙীন চশমা। এই থিওরীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোনো প্রমাণের দরকার হয়না, দরকার হয় অপব্যাখ্যার যা উৎপলবাবু 'নানারি' দৃশ্যের আলোচনায় পদে পদে করেছেন (পৃঃ ৪৭৯, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৯, ৪৯১)। সেই সঙ্গে টম-জিল-ব্রাউন-শ্রীমতী জোনসের কথোপকথন (যা অত্যন্ত খেলো ও স্থূলরুচির পরিচায়ক) ফেঁদে তাঁর কাল্পনিক প্রতিপক্ষদের বিদ্রূপে বিধ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন (পৃঃ ৪৮১)। যাঁরা ধরে নেন যে ক্লডিয়াস ও পোলোনিয়স পর্দার পেছনে লুকিয়ে আছেন বুঝতে পেরেই হ্যামলেট এই দৃশ্যে পাগলামির ভাণ করেন ও ওফিলিয়ার প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন, তাঁদের সাথে উৎপলবাবুর আসলে কোনো ঝগড়া নেই—তাঁদেরই মত তিনিও শেক্সপিয়রের পাঠকে বিকৃত করে স্বকপোলকল্পিত অর্থ প্রক্ষেপ করেন। 'নানারি' দৃশ্যে হ্যামলেটের অভিশাপরাশি তাঁর দ্বিধাবিভক্ত হৃদয়ের আন্তরিক প্রকাশ (পৃঃ ৫৯৫) এ সম্বন্ধে দ্বিমত হবার কিছু নেই—যত মুস্কিল ঐ দ্বিধার কারণটিকে নিয়ে। ওফিলিয়া তাঁর প্রেমকে মর্যাদা দিল না, প্রত্যাখ্যান করলো, অথচ এখন সে-ই কিনা নালিশ করছে যে হ্যামলেট তাকে বঞ্চনা করছেন—এ-ই কি সততা? (এখানে হ্যামলেটের নীরবতাকে উৎপলবাবু বলছেন মৌনই নাকি সম্মতির লক্ষণ।) এই নারীকে তিনি ভালবাসেন কিন্তু এর মিথ্যা আচরণকে ঘৃণা করেন; যে পাষাণভার তাঁর হালকা হতে পারতো এর প্রেমের স্পর্শে, সে ভার আরো দুঃসহ হয়ে উঠছে এর কপটাচরণে (যা আসলে তার দুর্বলতা)। হ্যামলেটের 'দুঃস্বপ্ন' (পৃঃ ৫০০) মোটেও 'কবির সুপরিচিত ভোগবর্জনবাদ' নয়, সে হ্যামলেটেরই সুখস্বপ্নের ভগ্নস্তূপ। ক্লডিয়াসের সিংহাসনারোহণে উৎপলবাবু দেখতে পাচ্ছেন 'নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থা' (পৃঃ ৪৪৪) অথচ এ দেখার কোনো সংগত ইংগিত নাটকে নেই। ক্লডিয়াস সম্পর্কে হ্যামলেটের উক্তিতে নাকি 'রাজতন্ত্র সম্পর্কে খাঁটি খৃষ্টীয় ঘৃণা ফেটে পড়েছে' (পৃঃ ৫০২) কিন্তু রাজা হ্যামলেট সম্পর্কে যুবরাজ হ্যামলেটের

পুনঃপুনঃ ভঙ্গিতে তা হলে কী ফেটে পড়ছে? পোলোনিয়সের মৃত্যুর পর হ্যামলেটের 'রাজতন্ত্র-বিরোধী' 'খৃষ্টীয় সাম্যবাদী' উক্তি শুনে ক্লডিয়াস যখন বলছেন 'হায়, হায়, এ পাগলামি'—সেটা উৎপলবাবুর মতে এই জন্যে যে তা না হলে তাঁর রাজ্য টেঁকে না, রাজতন্ত্রভিত্তিক সমাজ টেঁকে না (পৃঃ ৫০৩)। এটা যে ক্লডিয়াসের হ্যামলেটকে forthwith dispatch করার ছুতো তা উৎপলবাবু ভেবেও দেখছেন না। 'gravediggers' scene এ হ্যামলেট নাকি রেনেসাঁসের বুর্জোয়া ভোগবাদের বিরুদ্ধে শেক্সপিয়রের অতীতাশ্রয়ী গোঁড়া খৃষ্টীয় সাম্যবাদী মতবাদ ঘোষণা করছেন। হ্যামলেটের শ্মশানবৈরাগ্যের পেছনে তাঁর মানসিক জগতে যে উপপ্লব ঘটে গেছে এবং তার ফলে আজ তিনি যেভাবে ভবিতব্য ও নিয়তিকে স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত সে সব কথা ভুললে এইসব থিওরি উদ্ভবের প্রয়োজন হয় বৈকি। তাঁর সব দ্বন্দ্বের অবসান হয়েছে জলদস্যুদের জাহাজ থেকে ফেরার পর থেকে, তিনি এখন প্রস্তুত তাঁর শেষ দৃশ্যের জন্য। উৎপলবাবুর বিচারে প্রেতাত্মা হ্যামলেটকে ধর্মযুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন (পৃঃ ৫০৮) কিন্তু আসলে সে যা চেয়েছিল তা পার্সোনাল রিভেঞ্জ মোটেও ধর্মযুদ্ধ নয়—অন্তত; নাটকে তার কোনো আভাস নেই। হ্যামলেটের কাছে প্রশ্নটা শুধু পার্সোনাল রিভেঞ্জ এর থাকেনি—এই উত্তরণই হ্যামলেটকে সর্বজনীন করে তুলেছে। হ্যামলেটের বিখ্যাত delayকে শেক্সপিয়র পাঠককে সতর্ক করার জন্য ব্যবহার করেছেন, তিনি এই delayর বিরোধী—জনষ্টনের এই মন্তব্যকে উৎপলবাবু পিঠ ঠুকেছেন (পৃঃ ৫০৯)। এই delayর কারণ কী? পিটার আলেকজাণ্ডারকে অনুসরণ করে তারপরই উৎপলবাবু বলছেন, কারণ হচ্ছে উইটেবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত চিন্তার অভ্যাস। নাটকে কি এর কোনো ইংগিতমাত্র আছে? নেই। এভাবে চরিত্র ও নাটকীয় কার্য ব্যাখ্যার জন্য নাটক বহির্ভূত কারণ নির্দেশ কল্পনাপ্রবণ সমালোচনার দুর্বলতা। উইটেনবার্গই যদি এই অতিরিক্ত চিন্তাশীলতা তথা কর্তব্যে শ্লথতার জন্য দায়ী হোতো তবে সহপাঠী হোরেশিওর মধ্যে সেই লক্ষণ দেখা যেত না কি? উইটেনবার্গের উল্লেখ যে কোথাও নিন্দাসূচক এ প্রমাণও উৎপলবাবু দাখিল করেন নি। তাছাড়া ট্র্যাজেডি তো তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার, হ্যামলেটের নয়। যাই হোক, উৎপলবাবুর মতে হ্যামলেটের সংকট অতএব বুদ্ধিজীবীর সংকট সেই কোলরিজীয় সমাধান। তার পরেই উনি তার দ্বান্দ্বিক ঐতিহাসিক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন: 'শেকসপিয়র আসলে এখানে রেণেসাঁসের জ্ঞানবিজ্ঞানের বিরোধী একটি মনোভাব প্রকাশ করেছেন' (পৃঃ ৫১০)। শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিজীবী থেকে হ্যামলেট গিয়ে দাঁড়াল গ্রন্থকীটে (পৃঃ ৫১২)। এই বই পড়াই তার কাল, সে যদি ঝপাঝপ তরোয়াল চালিয়ে কর্মযোগীর ভূমিকা পালন করতো, তবেই সে বিপ্লবী আখ্যা পেতে পারত। এইভাবে অতীতাশ্রয়ী, পশ্চাৎপদ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবই আসলে জনতার মতবাদ; হ্যামলেট সৃষ্টির মূলে প্রগতি ছিল না। ছিল প্রতিক্রিয়া; তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা দ্বারা হ্যামলেটেরা পুষ্ট; নাটকে এলিজবেথীয় যুগের অগ্রসর শ্রেণীর অগ্রসর চিন্তার শোচনীয় পরাজয় দেখানো হয়েছে; হ্যামলেটের বিদ্যাজনিত যুদ্ধবিমুখতার শোচনীয় পরিণতি দেখিয়ে শেকসপিয়র জনতার মুখপাত্র হিসেবে এই কথাই বলতে চেয়েছেন 'লেখাপড়া করে যে গাড়িচাপা পড়ে সে'—এই সমস্ত 'মার্কসবাদী' তত্ত্ব উৎপলবাবু আমাদের পরিবেশন করেছেন (পৃঃ ৫১০-৫১৩)। কিন্তু (এ সব সত্ত্বেও হ্যামলেট কালজয়ী, মহৎ নাটক, কারণ এতে যে জনগণের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

আর বাস্তব বিচারে যা প্রতিক্রিয়াশীল, তা যদি জনগণ সমর্থন করে, তবে তা-ই হয়ে দাঁড়ায় প্রগতিশীল) উৎপলবাবু বুঝতে ভুল করেছেন, অতীতাশ্রয়ী ধ্যানধারণা নিয়ে কেউই ইতিহাসে অমর হ'ন না। অমর হন তাঁরাই যাঁরা সর্বকালের মহত্তম মূল্যগুলোকে আশ্রয় ক'রে ভবিষ্যৎ রচনার ভিত্তি স্থাপনের কৌশল জানেন। জনগণ যদি অজ্ঞান, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বিদ্যাবিরোধী (এই সঙ্গে যুদ্ধবাদী, সাম্প্রদায়িক ও পরজাতিবিদ্বেষী নয় কেন ?) হয় তবে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও বিদ্যা-শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণই হবে প্রকৃত জনগণের প্রতিনিধির সঠিক নীতি। পঞ্চম অংকে প্রত্যাবর্তনে হ্যামলেটের যে পরিবর্তন হয়েছে তা উৎপলবাবু লক্ষ্য করেছেন কিন্তু ব্যাখ্যা করেন নি—অতিরিক্ত চিন্তাশীলতা যদি হ্যামলেটের delayর কারণ হয় তবে তাঁর resignation এর কারণ কী ? আসলে হ্যামলেটের সংকট আনুপূর্বিক বিবেকের সংকট। এই তীব্র বিবেক বোধের জন্যই তিনি মাতার পুনর্বিবাহকে স্বীকার করতে পারেন না। ওফিলিয়ার দ্বৈতাচার সহ্য করতে পারেন না, নিরস্ত্র ক্লাডিয়াসকে খুন করতে পারেন না, জগতের চোখে ক্লাডিয়াসকে দোষী প্রমাণ না করে তাকে হত্যা করতে পারেন না। এই সংকট থেকে তাঁর মুক্তির প্রথম ধাপ ইংলণ্ডগামী জাহাজে তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা আবিষ্কারে। রোজেনক্রান্টস্ ও গিল্ডেন্স্টার্নের মৃত্যুদণ্ডের কারচুপি তাই তাঁর বিবেককে স্পর্শ করে না। ডেনমার্কে ফিরে আসার পর থেকে তাই তিনি সমাহিত, তিনি জানেন তাঁর ভবিতব্য কী, এখন যেভাবেই হোক তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে। এখন কিছুতেই কিছু এসে যায় না (V. II. 73—74), কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবার আগেই ভবিষ্যতের শমন এসে উপস্থিত হয়। বিবেক ও কর্তব্যের দোটানা হ্যামলেটের যদি না থাকতো তবে হ্যামলেট আর লেয়ার্টেসে কী তফাৎ থাকতো ? হ্যামলেটের আলোচনা এত দীর্ঘ করতে হোলো, কারণ বই এর প্রায় এক চতুর্থাংশ জুড়ে রয়েছে এই আলোচনা।

উৎপলবাবু কখনো 'জেসুইট', কখনো 'পপুলিষ্ট' ব্যাখ্যার সাহায্যে শেকসপিয়রের সমাজ চেতনার যে চিত্র উপস্থিত করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ তা বস্তুনিষ্ঠ নয়, তা অমার্কসীয়ও বটে। তাঁর মূল premise সাক্ষ্যপ্রমাণ নির্ভর নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে casuistry-র ওপর। এর চেয়ে মঞ্চে শেকসপিয়রের প্রয়োগ কৌশল ও অভিনয় সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান আলোচনা করতে পারতেন বলে আমার বিশ্বাস। (বই এর সবচেয়ে সুলিখিত দুটি অধ্যায় 'ইতিহাস' ও 'যীশু' এ দুটিতে শেকসপিয়রের নাটকের আলোচনা নেই বললেই চলে।) এই বইয়ের চিন্তার দুর্বলতার বেশীর ভাগই তাঁর সযত্ননির্মিত তত্ত্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহ ও সেই উৎসাহের প্রাবল্যে বাস্তব (এ ক্ষেত্রে শেকসপিয়রের রচনাবলী) কে নিজের কল্পনার ছাঁচে খাপখাওয়ানোর চেষ্টা থেকে এসেছে। অন্যান্য ত্রুটি স্বল্পপ্রসূত বলে মনে হয়। এত বড় বই-এ একটি নির্ঘণ্ট থাকা খুব দরকার ছিল। যদিও ছাপার ভুল এত কম যে তারিফ করতে হয়। শেকসপিয়র সম্বন্ধীয় আলোচনায় এ বই নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংযোজন।

ধনঞ্জয় সেন

নেতৃত্ব

মানসী দাশগুপ্ত

নেতৃত্বের ব্যর্থতা বলে একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছুদিন—এর জন্য অবশ্য সাংবাদিক নেতৃত্বকে ধন্যবাদ দিতে হয়। সাংবাদিকরা হচ্ছেন ঘোড়ার লেজের ডগায় বসে থাকা মাছির তুল্য শক্তিশালী, ঘোড়া যেদিকে যায়, মাছি সেদিকে যায়—তার মানে এই নয় যে ঘোড়াটা মাছিকে পথনির্দেশ করে নিয়ে যাচ্ছে, বরং উল্টো, মাছিই ঘোড়াকে চালাচ্ছে—পরিচালনার বিপরীত অর্থে। অর্থাৎ কিনা মাছিকে এড়াতে ঘোড়াকে সরে সরে যেতে হচ্ছে, এই ঋণাত্মক প্রচেষ্টার সুবাদে মাছি হয়ে উঠছে ঘোড়ার গতির উদ্দীপক। এড়িয়ে চলার চেষ্টা ছাড়াও ঘোড়াকে আরেকটি চেষ্টা করতে হয়, সেটি হচ্ছে নিজপথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা, সেই সম্মুখগতি অবশ্য মাছির নিয়ন্ত্রণে নেই, স্পষ্টতই মাছি ঘোড়ার একমাত্র চালক নয়। অশ্বজাতীয়ের গতির সঙ্গে অবশ্য মানবীয় গতির বহু প্রভেদ রয়েছে, কিন্তু বিপরীত ও সম্মুখগতির একটা সমাহার উভয়ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, নইলে এগোনো যায় না। নেতা যে স্তরের এবং যে দরের হোন না কেন, তাঁকে বিপরীত উদ্দীপনা দেবার জন্য নানা মন্তব্য আসেই কেবলমাত্র তার দ্বারা তিনি নিজের সারথ্যকে নির্দেশিত হতে দিতে পারেন না। নেতৃত্বের নিজস্ব লক্ষ্য স্থির রাখতে হয়।

গতির কথাটা নেতৃত্বের ভিতরে ধরা থাকে, যা চলমান নয়, যার কোনো যাত্রা অথবা লক্ষ্য নেই, তাকে নেতৃত্ব দেওয়া যায় না, গাছ পাথরের কোনো নেতা নেই। আমরা যখন পর্বতে শীর্ষস্থানের কথা বলি, বনস্পতির প্রাধান্যের কথা তুলি, তখন মূল্য প্রাধান্যের কথা এসে যায়। সেই বিশেষ অর্থে শ্রেষ্ঠত্বের সুবাদে, বনস্পতিকে কিংবা সেরা পাহাড়কে নেতার পদমর্যাদা দেওয়া হয়তো চলে। অর্থাৎ নেতা মানে দলপতি, রাজা, শ্রেষ্ঠ—এ কথাটাও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করবার মতো নয়।

যেক্ষেত্রে গতি নেই, অথবা থাকলেও সে গতি কোনমতেই আত্মকর্তৃত্বাধীন নয়, (যেমন গাছের) সেখানে উর্ধগতি অধোগতির মান নিয়ে করণীয় কিছু নেই, শুধু মাস্তকে মাস্ত বলতে পারলেই সেখানে কর্তব্য শেষ। এরকম নিঃশর্ত উপস্থাপনায় মানুষকে দেখা শক্ত, কোনোকালে যখন দেখা হয়েছে তখন মানবশ্রেষ্ঠ বলে চিহ্নিত রাজা অথবা ব্রাহ্মণের হাতেই নেতৃত্বের রশি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। সে রকম নির্ঝঞ্ঝাট বন্দোবস্ত চলতে থাকলে অধিকাংশ মানুষই যে তাতে সায় দিতো এতে সন্দেহ করার খুব বেশি কারণ নেই। কিন্তু এ ব্যবস্থা চললো না, কেননা মানুষের জীবনে চলমানতা এবং গতি ঢের বেশি স্পষ্ট এবং প্রত্যেক মানুষই তার নিজের জীবনে এই গতি অনুভব করার সম্ভাবনাকে প্রত্যহ অল্প অল্প করে পুষ্ট করে তোলে ; জীবনের পথে মানুষ কেন যে চলছে, কোথায় চলছে, এইসব লক্ষ্য-নিশানা-সংক্রান্ত মনপ্রাণ উদাস করা চিন্তাও প্রত্যেকের মনে কখনো কখনো উদয় হয়। যিনি মানবশ্রেষ্ঠ বলে, রাজা বলে বিবেচিত, তিনি যদি এমন পথে কাউকে চলতে বলেন যা তার আদৌ মনে ধরছে না, এমন লক্ষ্যে পৌঁছতে বলেন যা তার ধারণার অগম্য, তাহলে তাঁর নেতৃত্ব নির্দেশ মেনে চলার ব্যাপারে রীতিমতো গোল বাধে। বেশ কিছু মানুষ যদি এইরকম গোলমালে পড়ে, তাহলে নেতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ না জেগে যায় না। সে সন্দেহে রাজা বা ব্রাহ্মণকেও জনতার কোপে পড়তে হয়। যিনি নেতা, তিনি মানবশ্রেষ্ঠ হলেও মানবই তো, কাজেই এত বিঘ্নে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ দিতে হলে যে অলৌকিক বলের প্রয়োজন পড়ে সে বল প্রায়ই তাঁর আয়ত্তগম্য থাকে না। তখন তিনি সকলের হিসেবে একেবারে বাতিল হয়ে যান। এজন্যই, মানুষের সমাজে নেতৃত্বের বিচারে মানবিক গুণগত শ্রেষ্ঠতার চেয়েও পথনির্দেশনার দক্ষতাকে হিসেবের ভিতরে ধরতে হয় বেশি। সকলের মন-মতি বুঝে পথপরিচালনা করা আর গুণীশ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে ওঠা তো এক জিনিষ নয়, এ কথা আমরা এখন আর ভুলে যেতে পারি না। এ রকম ভুল যখন হতো, সকলের পথপরিচালকের ভূমিকা আর মানবশ্রেষ্ঠ গুণীর ভূমিকাকে এক করে দেখে যখন রাজাকে মেনে নেওয়া হতো, তখন রাজারা হয় প্রথম ভূমিকায়, নয় দ্বিতীয়টিতে, নয়তো দুটিতেই ব্যর্থতা দেখিয়েছেন, ইতিহাসে সে সব ব্যর্থ রাজাদের কথা আমরা পড়েছি। সে সব ব্যর্থতার মাপকাঠি কী? কেন তাঁদের ভূমিকা ব্যর্থ? তাঁরা কি নিজেরা নিজেদের ভ্রান্ত, অপপরিচালিত মনে করেছিলেন? না। তাঁরা তাঁদের ভূমিকাকে জনতার কাছে,—যাদের জন্য রাজার এ ভূমিকার নাম রাজা,—তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে পারেন নি। জনতা যে কেবলমাত্র দর্শক নয়, জনতাই প্রকৃত নির্দেশক—রাজশক্তির এই অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতাটি এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজার ভূমিকাই হলো জনতাকে নির্দেশ দেওয়া, রাজাই জনতার পরিচালক, জনতা যখন প্রসন্ন অনুগত, আভূমিনত্র তখন এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। অথচ, যে মুহূর্তে জনতা অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো, তখন এ সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে রাজার শক্তি জনতারই শক্তি, জনতার আনুগত্য বিনা রাজা আর রাজা নন। তখন, ভয় দেখিয়ে হোক, অন্য কৌশলে হোক, জনতার আনুগত্য ফিরিয়ে আনার একান্ত প্রয়াসে ব্রতী হতে হয় রাজাকে, তাতে ব্যর্থ হলে তাঁর রাজা সাজা শেষ। রাজা যখন তাঁর ক্ষমতার তুঙ্গে, তখন তিনি ইচ্ছে করলে হয়তো জনতার অংশকে বিনষ্ট করলেও করতে পারেন, কিন্তু যতো বড়ো রাজাই হোন, ইচ্ছে করলে জনতা সৃষ্টি করা তাঁর ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। অন্যদিকে, জনতা নিঃসন্দেহে রাজাকে সৃষ্টিও করে, বিনষ্টও

করে। ক্ষমতা জনতারই, রাজার শ্রেষ্ঠতা জনতার স্বীকৃতিনির্ভর। এইখানেই রাজা খুব লক্ষণীয়ভাবে ভগবান থেকে সম্পূর্ণত ভিন্ন। মানুষের কাছে ভক্তি-ভালবাসা কিছু না পেলেও ভগবান ভগবানই থাকবেন—তাঁর নিত্যলীলায় মগ্ন, কিন্তু প্রজার আনুগত্য ব্যতিরেকে, চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো মানুষ না পেলে, রাজার প্রভুত্ব শেষ। অর্থাৎ রাজা একটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব, ভগবান তা নয়। স্বর্গীয় ন্যায়বিধানের পরোয়ানা নিয়ে পার্থিব প্রভুত্বকে স্থায়ী করা যায় না। প্রভুত্বের পালা শেষ হয়ে গেলেও রাজভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ ছিলেন তিনি যদি যথার্থ শ্রেষ্ঠ মানুষ হয়ে থাকেন, তাঁর গুণাবলীর জন্য নমুনা তিনি একটি সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে দিলেও দিতে পারেন। সে রকম শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা অবশ্য আমরা বড় একটা দেখতে পাই না, তার কারণ, জনতার রোষ প্রায়ই প্রাণঘাতী। যাকে তারা একদা প্রভু বলে মান্য করেছিল সে যে মান্যের উপযোগী রইলো না, এতে সে-হৃতমান ব্যক্তির বেঁচে থাকার ন্যূনতম অধিকারটুকু রক্ষা করা খুব শক্ত হয়ে ওঠে। এসব তত্ত্ব বহু পূর্বে অনেকে নানাভাবে বলে গেছেন। এসব কথা এখন আবার নতুন করে মনে করার বিশেষ প্রয়োজন হলো এই যে, এখন যে-নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা আমরা শুনে থাকি (কখনো কখনো বলেও থাকি) তার সঙ্গে এই রাজকীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার বেশ কিছু তফাৎ থাকলেও মূলে একটা মিলও রয়েছে। সে আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রাচীন কাঠামোটা তাই মনের ভিতরে স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো।

নেতা বলতে এখন আমরা গুণী বা শ্রেষ্ঠ মানুষ বুঝি না। রাজশক্তি যে আসলে জনতারই শক্তি এ কথা পরিষ্কার বুঝে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ধারণা তৈরী হওয়া বিচিত্র নয় যে আসলে জনগণের প্রতীক হস্তী যাকে পিঠে তুলে নেয় সে মানুষই এরকম উচ্চতা পেয়ে যাবে, তার জন্য কোনো বিশেষ গুণপনার প্রয়োজন নেই, শ্রেষ্ঠতার তো নয়ই। এইরকম কথা বুঝে নিয়ে আমরা জেনেছি যে পদাধিকারই আদত অধিকার, সেই বলেই মানুষ অধিকারী হয়ে থাকে। 'রাণী করো পাবো রাণীর প্রকৃতি'। এই জড়বাদী, অবস্থাগতিকের-বলে-আস্থাশীল চিন্তার প্রতিকূলে তবুও 'সবাই হয় না রাণী কল্যাণী' কথাটির ক্ষীণ প্রতিবাদ এখনো শোনা যায়। এ বিশ্বাস এখনো কোনো কোনো পণ্ডিত এবং কিছু সংখ্যক সাধারণ মানুষের অস্ফুট চিন্তায় রয়ে গেছে যে, ব্যক্তি-চরিত্রের এক বিশেষ গুণে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা দেখা যায়, সে গুণটি কারো ভিতরে আছে, কারো ভিতরে নেই, যে নেতা সে স্বভাব নেতা, নেতাকে বানিয়ে নেওয়া যায় না। পদাধিকার দিলেই কেউ নেতা হয়ে ওঠে না।

নেতৃত্বের স্বভাবজ গুণপনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তার মূল কথা হলো এই যে সমস্ত মানুষের সুখদুঃখকে যিনি নিজের সুখদুঃখ বলে অনুভব করতে পারেন, এবং মানুষের দুঃখগুলিকে আড়াল করে দাঁড়াতে পারেন তিনিই রাজা। এ অর্থে সাধু সন্তদের রাজা বলা যায়। সেরকম কথনো বলা হয়নি এমনও নয়। কিন্তু রাজকার্য শুধু মানুষের দুঃখনিবারণ এবং সর্বজনে সমবেদনা-বোধের সঙ্গে একীকৃত হতে পারে না, রাজার সাহায্যে রাজ্যের সম্পদবৃদ্ধি হবে—এ প্রত্যাশা প্রজাদের থাকে। সে প্রত্যাশা সাধুসন্তদের দিয়ে মিটবার নয়। প্রজাদের প্রত্যাশিত এ সম্পদ বাস্তব ধনসম্পদ, একে বাড়িয়ে তোলবার জন্য কার্যকরী কাণ্ডজ্ঞান লাগে, যার অভাবে ধর্মজ্ঞানে তারতম্য না ঘটতে পারে, রাজকর্মে হানি হয়ে থাকে। রাজকর্তব্যের এদিকটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ

পর্যন্ত চিন্তা ব্যয় করেন নি। বউঠাকুরাণীর হাট থেকে সুরু করে নানা কাহিনী নাটকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মহান রাজা আর রাজকোষের হীন রক্ষাকারীর বৈপরীত্য বেশ স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন, কিন্তু মহত্তম রাজারও যে অন্যতম প্রধান কর্তব্য রাজকোষের রক্ষণাবেক্ষণ, অন্যথায় রাজ্যের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে টান পড়ে, এ কথা তিনি, মনে হয়, ইচ্ছে করেই খেয়াল করেন নি। তাঁর রচনা পড়লে মনে হয়, সবাইকে নিজ নিজ ইচ্ছায় কাজ করতে দিলে এবং অভিরুচি মতো কর্মে স্বাধীনতা দিলে ধনসম্পদ স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে, এই রকম গা-এলানো (laissez faire) নীতিতে তাঁর মনে মনে আস্থা ছিলো। অন্যদিকে, জনসাধারণের স্বার্থে জনকল্যাণকর কাজগুলি রাজারই করণীয়। এ রকম মতও তিনি প্রকাশ করেছেন, কিন্তু জনকল্যাণকর কাজের জন্য রাজা সম্পদ সংগ্রহ করবেন কোথা থেকে, এ নিয়ে তিনি কোনো স্পষ্ট নির্দেশ দেন নি। হয়তো তিনি ভাবতেন রাজা যেভাবে অর্থসংগ্রহ করে থাকেন তা তো তিনি করবেনই, শুধু সে অর্থ যে প্রজার কল্যাণে ব্যয় করা কর্তব্য এ কথাটা রাজাকে মনে রাখতে হবে, আর, লোকে যে যা করছে তাদের স্বাভাবিক আত্মবিকাশে বাধাসৃষ্টি বা তাদের ওপরে জোরজুলুম করা যে যথার্থ রাজকীয় কর্ম নয়, এ বোধও রাজার মনে রাখা প্রয়োজন। নানা যুক্তি ও আবেগের আবেদন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ কথাদুটি স্পষ্ট করেছেন। যথার্থ রাজাকে মানুষ ভক্তি করবেই, এরকম বিশ্বাস তাঁর ছিলো। অর্থাৎ, রাজা জনপ্রিয় হলেই সমস্যাটা মিটে যায়। কিন্তু, সে জনতা যে কোন জনতা যার মানদণ্ডে প্রিয় হলে রাজা সকল রাজকীয় সদ্‌গুণের সমাহার হয়ে উঠতে পারবেন, আবার সকলের মনোহরণ করতেও সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বেশি মন্তব্য করেন নি, করবার কথাও নয়, সমাজনীতির সম্পূর্ণ তত্ত্বালোচনা কবি নিজস্কন্ধে তুলে নেবেন এমন প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।

যে-নেতৃত্ব জনপ্রিয়তায় ও আত্মোৎসর্গ-প্রবৃত্তিতে মহান তাকে নাম দেওয়া হয় সম্মোহক নেতৃত্ব। এরকম নেতা রাজকীয় সাজেও দেখা দিতে পারেন, সম্পূর্ণ আধুনিক বন্দোবস্তের ভিতরেও তাঁকে পাওয়া সম্ভব। এ নেতাকে কেন্দ্র করে অনেক মুগ্ধতা সঞ্চারিত থাকে। এ ধরণের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশি দরকার পড়ে সংকটকালীন নীতি নির্ধারণে। সংকটকালে, খুব জরুরি কোনো অবস্থায় নেতা এসে বুক পেতে দাঁড়ালেন, বললেন 'হবেই হবে'—কী হবে, কেমন করে হবে, হলে সেটা ভালো হবে না মন্দ হবে, এ সমস্ত প্রশ্ন ভুলে গিয়ে জনতা আনুগত্যে এক হয়ে গেলো তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, এরকম দৃষ্টান্ত আমরা যুদ্ধে, বিপ্লবে, ইতিহাসের বহু পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই। সংকটকালীন নেতৃত্বের মোহগ্রস্ততা নিত্যগত কর্মসম্পাদনে চালু রাখলে মানুষের স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার স্ফূর্তি ঘটতে পারে না, কিন্তু নেতার পক্ষে কাজ চালিয়ে যেতে অনেকটা সুবিধা হয়। এ জন্য অনেক সময়েই আমরা দেখতে পাই নেতারা সর্বদাই সংকটকালের কথা বলছেন, জরুরি অবস্থার আর কিছুতে শেষ হচ্ছে না। নেতৃত্বে সম্মোহন থাকলে সাধারণ মানুষ সে কথা মেনে নিতে রাজিও থাকে, কেন না, সত্যি বলতে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তো অধিকাংশ মানুষের পক্ষে এক বিষম সংকটের ব্যাপার, সে অবস্থায়, জনস্বার্থে উৎসর্গিতপ্রাণ কোনো সম্মোহক নেতা যদি এসে বলেন, আমরা বিষম সংকটে পড়ে আছি, আমি যা বলছি তাই করলেই তোমরা এ সংকট থেকে নিজেদের এবং আমাদের সকলকে উদ্ধার করতে পারো—তাহলে তাঁর ডাকে অনেকের মনে সাড়া জাগে। কিন্তু সাধারণভাবে সম্মোহনের যে

সমস্যা এক্ষেত্রেও সেগুলি উপস্থিত থাকে, সকলে সমানভাবে সম্মোহিত হয় না, যারা সম্মোহিত হয়েছিল তাদের মোহও ক্রমে কেটে যায়, নিত্যনৈমিত্তিক সুখসুবিধার হিসাবগুলি মেলাতে হয় নেতাকে সংকটের আকস্মিকতা কেটে গেলে। তখন নেতৃত্ব মুগ্ধ না করলেও চলে, কর্মপটুতা দেখাতে হয় তখন নেতৃত্বকে। মোহবিস্তার করবার যোগ্যতা তাই নেতৃত্বের একটি প্রয়োজনীয়, মূল্যবান উপাদান হলেও অত্যাবশ্যক উপাদান নয়। বরং, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানকে বলা যায় নেতৃত্বের মূল, অত্যাবশ্যক উপাদান। এটি স্পষ্টতই শিক্ষাদীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয় যদিও সহজাত প্রবণতা ব্যতিরেকে অনেক অভিজ্ঞতা বৃথা যায়, তার থেকে কোনো শিক্ষা নিতে পারেন না কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি। কাণ্ডজ্ঞানের সহজাত মূলটিকে চলিত ভাবে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি কিন্তু মেধা অর্থে যে বুদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের যে সহজ বোধ এ দুইয়ে তফাৎ অনেক। বিমূর্ত বিষয়ে বুদ্ধি প্রখর হলে তাতে নেতৃত্বের সুবিধার চেয়ে বাধা হতে পারে।

নেতা এবং নিয়ন্ত্রিতের ভিতরে যোগসূত্র যাতে রাখা যায়, এই রকম গুণগুলি নেতৃত্বের অবশ্য প্রয়োজন। অন্যের মন বুঝবার ক্ষমতা, পর্যাপ্ত সমবেদনা এ জাতীয় গুণ। নেতার বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের চেয়ে এতোই বেশি হয়ে ওঠে যে, তিনি যা চান এবং যাকে মানবজীবনের আদর্শ বলে মনে করেন তা আর কেউ বুঝে উঠতেই পারে না, তাহলে এ যোগসূত্র রক্ষা করা শক্ত হয়ে ওঠে। আবার তেমনি, নেতার বুদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রিতের সঙ্গে একেবারে এক স্তরে থাকে, তাহলে তাঁর পক্ষে নেতৃত্ব দেওয়া কঠিন হয় কেন না নেতাকে একেবারে বুঝতে না পারলে যেমন মুশকিল, বড়ো বেশি বুঝে গেলেও আবার কম মুশকিল নয়। বাঞ্ছিত ও সম্ভ্রম উদ্রেককারী এ দূরত্ব কী করে নিয়ন্ত্রিতের মনে জাগাতে হয়, সে বিষয়ে কোনো প্রশিক্ষণ সম্ভব নয়, কাণ্ডজ্ঞানের সাহায্যে নেতা এ ব্যবহারবিধি আয়ত্ত করেন। নিজের ও অন্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষমতাও নেতার আয়ত্তে থাকা দরকার। যে আদর্শ ও লক্ষ্যনিষ্ঠা থাকলে নেতা শ্রদ্ধেয় ও সার্থক হয়ে ওঠেন সেটি গড়ে তোলার ব্যাপারে উপরিউক্ত সদ্‌গুণগুলি অল্পবিস্তর সাহায্য করে। সেদিক থেকে ভেবে দেখলে নেতৃত্বের রূপায়নে সহজাত কতকগুলি প্রবণতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতানুসারী অনুশীলন-এ দুয়েরই সমন্বয় প্রয়োজন। নেতা জন্মস্বত্বে নেতা না নেতৃত্ব পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্টি করা যায়—এরকম প্রশ্ন তোলাই সেক্ষেত্রে অবান্তর।

নেতা একই কালে তাঁর সমগ্র নিয়ন্ত্রণাধীন জনতার কাছে সমানভাবে আয়ত্তগম্য থাকেন না। খুব কাছের শিষ্যবৃন্দ, দল, এবং জনসাধারণ এইরকম তিনটি বিভাগ প্রায় সর্বত্রই সর্বদা রয়ে যায়। এই নিকটতম মানুষগুলি যদি নেতার স্বনির্বাচিত হয়, এদের যদি তিনি নিজগুণে আকর্ষণ করে থাকেন, তাহলে যে বিনাপ্রশ্ন আজ্ঞাকারিতা তাঁর কাজের জন্য প্রয়োজন তার অভাব ঘটে না। অন্যথায়, পদমর্যাদাবলে যদি তাঁকে এঁদের গ্রহণ করতে হয়—যেমন প্রথানুসারে নতুন রাজা এসে পুরাতন মন্ত্রীসভাকে গ্রহণ করতেন, কিংবা, এখন যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে নবনিযুক্ত প্রশাসনিক (প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ, কিংবা সহ-উপাচার্য কি উপাচার্য) এসে প্রাচীন শিক্ষকদের কিংবা শিক্ষা-কর্মচারীদের গ্রহণ করেন, তাহলে বাহ্য আজ্ঞাকারিতার অন্তরালে আস্থার যোগ্য অনুবর্তন স্পৃহা আছে কিনা তা নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে ওঠে, নেতা তখন নিঃসঙ্গ, এমন কি, কখনো কখনো বিপন্ন বোধ করেন। যেহেতু নিকটতম অনুবর্তীরাও দূরের জনগণ অথবা অন্তরগত শক্তির বিরোধে নেতাকে পরিত্যাগ

করে যাবেন কিনা এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত আস্থা তাঁর মনে সঞ্চারিত হওয়া শক্ত, তাই এ অবস্থায় নেতাকে অনুবর্তীদের তথা সর্বসাধারণের স্বার্থ দেখার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পদরক্ষা তথা স্বার্থরক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। এ দুই স্বার্থ সম্পূর্ণত এক হয়ে গেলে ব্যাপারটি যতো সুচারুরূপে সম্পন্ন হোতো, ততোখানি ঐক্যবিধান প্রায়ই কঠিন হয়। ফলে, নেতা সময়ে সময়ে যখন তাঁর বিরুদ্ধে দল ভারি হচ্ছে দেখে বলতে থাকেন যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হচ্ছে, তখন তাঁর নিয়ন্ত্রিতদের একাংশই আড়ালে মুখ টিপে হাসেন কি না সে বিষয়ে নেতা নিঃসন্দেহ হতে পারেন না। অন্য যাঁরা নেতার সঙ্গে একাত্ম ভাব দেখাতে চান তাঁরা এ প্রচারে যোগ দেন, চক্রান্ত বন্ধ করাই তখন এই দ্বিতীয় অংশের এবং স্বয়ং নেতার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, মূল কর্ম লক্ষ্যগুলি গৌণ হয়ে যায়। যে-কোনো স্তরের নেতৃত্বেই এসব লক্ষণ দেখা যায়, সে নেতৃত্ব কোনো সাংস্কৃতিক দলেরই হোক কিংবা অন্য কোন কর্মকেন্দ্রেরই হোক।

সাধারণভাবে নেতৃত্বের কথা বললে আমাদের সরকারী তথা রাজনৈতিক ক্ষমতাচক্রগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সরকারের হাতে থাকে রাষ্ট্রের সংগঠনের সাবিক শক্তি, সে শক্তির পরিচালনায় যে ধরণের নির্দেশে প্রকাশ পায়, সমাজের সর্বস্তরে নেতৃত্বের ধারা সেই গতিপ্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। রাষ্ট্রশক্তির ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের এই নিরংকুশ প্রভাব গণতান্ত্রিক বিধানে এবং আনুষঙ্গিক নিয়ম-রীতির কল্যাণে সম্প্রতি যতো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে. এতদূর প্রভাব চিরকাল এমন ভাবে ছিলো কি না, সামাজিক নিয়মগুলি নিজ ক্ষেত্রে সার্বভৌম ছিলো কি না, সে আলোচনা এখানে তোলা হচ্ছে না। রাজনীতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সমাজে ব্যাপ্ত নেতৃত্বভঙ্গীর মিল না থাকলে সমাজ-জীবনে কিছু অসঙ্গতি ও পরস্পর বিরোধিতা দেখা যায়, এর লক্ষণ নিয়ে আমরা কিছু আলোচনা করতে পারি, কেন না এর খুব সহজ দৃষ্টান্ত আমরা এখন আমাদের দেশে দেখতে পাচ্ছি। নেতৃত্বে যে সংকট দেখা দিয়েছে, যা লক্ষ্য করে নেতৃত্বের ব্যর্থতার কথা শোনা যাচ্ছে তার মূল এই সমাজের আভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব-রীতির স্ববিরোধিতা। এ স্ববিরোধিতা আমাদের সমাজে চিরকাল ছিলো, এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। আমাদের প্রাচীন রাজনীতির কেন্দ্রে যখন ছিলেন রাজা আর তাঁর পূজ্য মন্ত্রণাদাতা ছিলেন ব্রাহ্মণ, তখন পারিবারিক নেতৃত্বভঙ্গী এবং রাজনীতিক নেতৃত্বভঙ্গী একে অন্যের ছাঁচে ঢালা ছিলো। উচ্চনীচ অবস্থান এবং ক্ষমতা বিন্যাসের এক চেহারা দেখা যেতো সর্বত্র, বর্ণ এবং বয়সকে কেন্দ্র করে নেতৃত্ব প্রত্যাশিত আকার নিতো। নেতৃপদে যাঁরা বৃত তাঁরা কী উপায়ে অধস্তনদের নিয়ন্ত্রণে রাখবেন, আর, অধস্তন সকলে নিয়মানুসারী কোন্ প্রথায় সে সকল নিয়মকে মান্য করবেন, তার একটা স্বীকৃত রীতি ছিলো। অর্থাৎ, নেতৃত্ব যে দেবে এদের ভূমিকা সুষ্ঠুভাবে সীমাঙ্কিত ছিলো। এর ভিতরে নিয়মভঙ্গের অবকাশ ছিলো না এমন নয়, সে সব বিচ্যুতি বিষয়ে শাস্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও বেশ যত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল, আর সেই সযত্নরচিত রীতিনীতি নিষ্ঠুর হয়তো ছিলো, কিন্তু কোনো জটিলতা ছিলো না সেগুলির ভিতরে। রাজনীতির স্তরে এখন রাজকীয় মর্যাদাকে ঘিরে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাজনীতি চালু হয়েছে। এ রীতি যেদিন আমাদের শাসনতন্ত্র গৃহীত হলো, সেদিন চালু হয়েছে তা নয়। এ শাসনতন্ত্র গ্রহণের বহু পূর্বে, আমাদের সমাজের বাকপটু চিন্তাশীল, উদ্যোগী ব্যক্তিরা রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী শক্তির বিরোধিতা

করছেন, তাঁদের মাধ্যমে আমরা রাজশক্তিকে অত্যাচারী জ্ঞানে পরিত্যাজ্য ভাবতে শিখে গিয়েছি। আমাদের নিজস্ব বিরোধী নেতৃত্বই যে দেশের জনতার যথার্থ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত, ক্ষমতাসীন রাজশক্তির নেতৃত্ব যে গ্রহণীয় নেতৃত্ব নয়—এ কথাটাও আমাদের মুখে মুখে কতকটা ছড়িয়েছে। উপস্থিত নেতৃত্বের বিরোধ যে সপক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলার একটা উপায়, বিরোধ মানেই যে বিচ্যুতি বা নীতিচ্যুতি নয়, এ কথাটা সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কালেই আমাদের রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের মনে ব্যবহারে রূপ নিয়েছিলো, শিক্ষিত রাজনীতিক চেতনায় এ ভাবটি ছড়িয়েছিলো। গণতন্ত্র প্রসারের সেই পর্যায়ে কিন্তু সমাজ-বিন্যাসে এবং পারিবারিক সম্বন্ধ বিধানে অভ্যস্ত উচ্চনীচ ভেদ রয়ে গেলো, এবং নেতৃত্ব উপর থেকে নিচে, বৃদ্ধ থেকে প্রৌঢ়ে ন্যস্ত হতে থাকলো অতি পুরাতন ঐতিহ্য অনুসারে। পিতৃপিতামহের নির্দিষ্ট পথে বিনাপ্রশ্নে চলাই যে মানবজীবনের ধ্যেয় এবং লক্ষ্য—এ কথা সাধারণভাবে স্বীকৃত রয়ে গেলো। অথচ, আগেই যেমন বলেছি, রাজনীতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানকে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠান বলেই মান্য করতে হবে এ চিন্তার মূলে আঘাত পড়লো। নিয়ম-বিরোধিতার নিয়মানুগ রূপায়ন—যার অন্য নাম গণতন্ত্র—রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠলো। আমাদের সমাজাদর্শে আভ্যন্তরীণ স্ববিরোধিতার সুরু হলো সেখানেই।

রাজনীতিক নেতৃত্ব আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে নিয়ে সকলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। বিরোধীপক্ষ নিয়ম করে প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলির যথার্থকে প্রশ্ন করে, পরিবর্তিত করে দিতে পারবে, এ সম্ভাবনার সূত্র আছে এ বন্দোবস্তে। অথচ, আমরা এখনো প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্রশ্ন তুলতে অভ্যস্ত নই, নিয়মানুগ বিরোধিতা বিষয়ে পরিষ্কার অপরিষ্কার কোনো ধারণাই আমাদের তৈরি হয়নি বললেই হয়। আমরা সাদা-কালোয় ভাবতে জানি, নির্দেশ দিলে চলতে জানি, নির্দেশ না মানতে পারলে সব ভেঙে চুরে কিংবা ত্যাগ করে কালা পাহাড় কিংবা সন্ন্যাসী হয়ে যেতে জানি। দিনের পর দিন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিয়ম রাখার জন্যই-যে অপ্রযোজ্য নিয়মগুলিকে সরানো দরকার—এ বিশ্বাসে আমাদের কোনো জোর আসেনি। গণতন্ত্র মানে নিয়মতন্ত্র। রাজার বদলে রাজসম্মানে সর্বস্বীকৃত কতকগুলি নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেগুলিকে আবার প্রয়োজনমতো পুনরায় সর্বস্বীকৃতির ভিত্তিতেই পরিবর্তিত করা যাবে—গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কথাটার মানে হলো এই। এসব ভাবনা আমাদের বাক্যে, ব্যবহারে ও বিশ্বাসে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো খাড়া হয়ে গেছে রাষ্ট্রপর্যায়ের নেতৃত্বে। এ যেন খেলার নিয়ম শিখে নেবার আগেই খেলতে বসে যাওয়া। এতে যদি গোল না বাধে তো কিসে বাধবে!

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতৃত্ব যারা নেবে আর যারা দেবে এরকম দুটি পরিচ্ছন্ন ভাগ রাখা সম্ভব নয়। উপর থেকে নির্দেশ আসছে, আর নিচের থেকে সবাই তাকে মেনে নিচ্ছে, এ রকম ব্যবস্থা তো গণতন্ত্রে চলতে পারে না। সর্বস্বীকৃতির কথা উঠলেই সর্বজনমতের কথা ওঠে, নেতৃত্বকে ব্যক্তিগত আত্মনিয়ন্ত্রণের তুল্য করে তুলতে হয়, এ জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে তার নিজ নিজ জীবনের লক্ষ্য ও সার্থকতা বিষয়ে অবহিত হতে হয়। এর জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা কোনো বিশেষ শিক্ষাক্রমের চতুঃসীমায় ধরে রাখবার জিনিষ নয়, সেটি ধারাবাহিক চলতেই থাকে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে। এ শিক্ষা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের

শিক্ষা, উপরের দিকে নির্দেশের জন্য চেয়ে না থেকে নিজের জন্য নিজে ভাবতে শেখা। আমাদের সামাজিক জীবনে এ শিক্ষার ধারা এখনো ভালো করে এসে পৌঁছয়নি, আমাদের শিক্ষাসদনগুলিতে তো আদৌ পৌঁছয়নি। যদি পৌঁছাতো তাহলেও হয়তো কিছু কিছু সমস্যা রয়ে যেতো, তবে সে অবস্থা এখনকার চেয়ে সহনীয় হতো সন্দেহ নেই। নিজের লক্ষ্য নিজে ভেবে স্থির করে নেবার শিক্ষায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী, প্রতিটি মানুষ, সমান দক্ষতা দেখান না। কিছু মানুষ সমস্যাটা তাড়াতাড়ি বুঝে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁরা এগিয়ে আসেন নিজের মত দিতে, কিছু মানুষ পিছিয়ে থাকেন। দেশে ও সমাজে যেহেতু যে কোন সময়েই বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন যোগ্যতার মানুষ একই সঙ্গে জনসাধারণের অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত থাকেন, এই সমগ্রতাকে নিয়ে একটি চলমান জনমতের সৃষ্টি হয়। এর ভিতরে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত প্রতিফলিত থাকে না, প্রতিটি ব্যক্তির নিজ মত বলে কিছু নেই বলেই। একে ছুয়ে প্রতিজনের নিজ নিজ মত তৈরী হবে, সেগুলির ভিতরে কতটা মিলছে তার খতিয়ান নেওয়া হবে, তবে জনমত গড়বে—এ রকম আদর্শ ব্যবস্থা কোথাও নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

আমরা জনমত বলে যাকে জানি তা কিছু মানুষের মত, যে মত নিজের সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত প্রকাশে ও প্রচারের সুবাদে সকলের মত হিসেবে চলছে। কিছু কিছু মানুষ মতামত তৈরী করে ফেলে অন্যকে—যারা চিন্তায় অলস ও নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে বিলম্ব করেন, তাঁদের—সেই মতে প্রভাবিত করেন। এক একরকম মতকে ঘিরে সাধারণ মানুষ ভিতরে ভিতরে দলবিভক্ত হয়ে যান। এগুলির ভিতরে যার প্রচারের হাতিয়ার যতো শক্তিশালী, তার দল ততো ভারি হয়। গণপ্রচার গণতান্ত্রিক সমাজের এক অপরিহার্য অংশ। খবরের কাগজ, বেতার, দেয়াললিখন, শ্লোগানের হাঁক ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে গণপ্রচার চলে। যাঁরা ক্ষমতায় উঠেছেন, যাঁরা উঠতে চান, এঁদের পিছনে পাশে এবং বিপরীতে ছোট বড়ো চিন্তাশীল মানুষ যাঁরা আছেন তাঁদের মতামতের নির্গলিতার্থ আবেগযুক্ত ভাষায় প্রচার হতে থাকে এইসব মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য। যেমন আবেগ যার মনঃপূত, সেই অনুযায়ী সে মানুষ নিজের দল খুঁজে নেয়। এ অবস্থায় দূরদর্শী চিন্তা এবং সুষ্ঠু প্রচারকে মেলাতে পারলে নেতৃত্বে পারদর্শিতা দেখানো যায়। নেতৃত্বে পারদর্শিতার সহজ প্রমাণ এবং পরিমাপ মেলে নিয়ন্ত্রিতদের আনুগত্যে।

গণতন্ত্রে যদিও আনুগত্যের চেহারা পালটেছে কিন্তু এই আদত কথাটা পালটায়নি যে আনুগত্য ব্যতিরেকে নেতৃত্ব নেই। নেতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিতের সম্পর্ক ঠিক যাদুকরের সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ জনতার সম্পর্কের সমতুল্য নয়। একটা লোক যাদু দেখাবে বলে ডাকলো আর দেখাতে পারলো না, এতে সাধারণ লোক যে ভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়, একজন নেতার ব্যর্থতাতেও লোকের যদি সেই প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আনুগত্য গড়ে ওঠার ব্যাপারে কিছু গোলমাল রয়ে গেছে। আমাদের দেশে সেইরকম গোলমাল আছে বলে মনে হয়। আনুগত্যকে কী করে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে মেলানো যায় তার সূত্র মেলে নিয়মানুগত্যে। সেটি আমাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছয়নি, কেন না নিয়মানুগত্য জিনিষটা আমাদের কাছে কোনো ভদ্ররকম অনুষঙ্গ নিয়ে আসেনি। আমাদের এ পক্ষ, ও পক্ষ, সকল পক্ষের সকল চিন্তাবিদ যাঁরা বক্তব্য সর্ববিষয়ে উদ্ধৃত করেন, সেই রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর নেতৃত্ব বিষয়ে যেমন, নিয়মানুগত্য বিষয়েও তেমনি, কিছু শিথিল চিন্তার ঐতিহ্য আমাদের দিয়ে গেছেন যাকে কোনো গ্রাহ্য কর্মপন্থায় অনূদিত করা যায় না। 'হেরো অরণ্য ঐ, হোথায় শৃঙ্খলা কই' বলে তিনি যখন আমাদের প্রাণের বাণী শোনাতে চেয়েছেন, কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি খেয়াল করেন নি যে অরণ্য-প্রকৃতি তথা সমগ্র প্রকৃতির ভিতরে খুব কঠিন শৃঙ্খলা কাজ করে যাচ্ছে। শৃঙ্খলা থাকবে, অথচ তা পায়ে পায়ে শৃঙ্খল হয়ে বাজবে না, একে বলা হয় সুশৃঙ্খলা। এই সুশৃঙ্খলা বিধানই মানুষের জগতে নেতৃত্বের পিছনে আনুগত্য জমিয়ে তোলার মূল সূত্র। এ সূত্র রবীন্দ্রনাথের ছন্দে ধরা পড়েনি। প্রাণবস্তুতাই আসল (কী গূঢ় নিয়মে প্রাণবন্ততা নির্ভার, সহজ হয়ে থাকে কে জানে) নিয়ম আবর্জনা মাত্র, এই ধরণের কাব্যময় বক্তব্যে তিনি মানুষের স্বাভাবিক নিয়মানুগত্যহীনতাকে কতকটা প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। এই প্রশ্রয় আমাদের ঐতিহ্যের অঙ্গ হয়ে উঠলো এমন এক সময়ে যখন নিয়মানুগত্য আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে, সমস্যা আমাদের জটিল হয়ে উঠছে। আমাদের আনুগত্য এখনো ব্যক্তিগত শ্রদ্ধাতে কিংবা আশু স্বার্থ বিধানে আবদ্ধ হয়ে আছে। আমরা •তাই সামাজিক নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম নিচয়গুলি ধরতে, গড়তে দরকার মতো ভেঙে পালটে ফিরে চালু করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু পুট্টাপুর্তি কিংবা পণ্ডিচেরীতে আমরা সম্যক নিয়মানুগ, কেন না, সেখানে বাবা কিংবা মা রয়েছেন যে! তিনি যে-নিয়ম করেছেন, সেগুলি তিনি করেছেন বলেই মানতে হবে, নিয়ম বলে তো নয়। জনচিন্তার এই যে ধারা এটি আমাদের প্রাচীন সামাজিক প্রথাসম্মত চিন্তার উত্তরাধিকার। এটিকে নাড়া দেবার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত নিয়মকেই ত্যাজ্য করে জটিলতা আরো বাড়িয়ে গেছেন। দুয়ে মিলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নিয়মানুগত্যের সামান্যতম চেষ্টাকেও সার্থক হতে দিচ্ছে না। আর, আগেই বলেছি, আনুগত্য না এলে নেতৃত্ব বলে কিছু দানা বাঁধতে পারে না। আনুগত্য দিতে পারবো, তবে তো আমাদের নেতা মিলবে।

ন্যাশনাল থিয়েটার, নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন ও বাংলা নাটক

পুলিন দাশ

ন্যাশনাল থিয়েটার-এর প্রতিষ্ঠার (৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২) ঠিক চার বছরের মাথায় ১৭ই ডিসেম্বর ১৮৭৬ এ এসে বিধিবদ্ধ হয়েছিল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য-সংসারের উপর আইনের বিধান নেমে আসতে দেখা গেছে। আইনের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সাহিত্যপ্রয়াস এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। সেই সুদূর সময়ে গ্রীক-নাটকের বিকাশপর্বে থেসপিস-এর নাট্যপ্রয়াস সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল শাসনকর্তা সলোন্-কে। মিরাকল্ প্লে-র জায়গায় সেক্যুলর নাটকের আবির্ভাবের দিনে ক্ষমতাসীন প্রায় প্রত্যেকেরই ধারণা হয়েছিল যে নাটকের অভিনেতাদের উপর সতর্ক পাহারা বসানো উচিত। থিয়েটারকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল কতকগুলি এলাকা থেকে। আরো একধাপ এগিয়ে এসে সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পিউরিটানরা বন্ধ করে দিল নাট্যশালার দরজাগুলো। বন্ধদ্বার অবশ্য আবার খুলে গেল রেষ্টোরেশন-এর যুগে। অতঃপর প্রায় শতাব্দকাল নিরংকুশ স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ায় ইংরেজী নাটকের চর্চা চলে। আর এই অবধি চর্চার সময়েই ইংরেজী নাটকের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলতে দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী হয় নি এই অবস্থাটা। ১৭৩৭ এর লাইনেন্সিং এ্যাকট-এর মাধ্যমে ওয়াল্‌পোল্ পুনরায় নাট্যনিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করলেন। ১৮৪৩-এর থিয়েটারস এ্যাকট অনুযায়ী প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয় প্রদর্শনীর পূর্বে লর্ড চেম্বারলেইন্-এর দরবারে পেশ করার বিধি নির্ধারিত হল। প্রয়োজনবোধে যে কোন নাটকের অভিনয়প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে পারবেন লর্ড চেম্বারলেইন, আইনে তাঁকে অধিকার দেওয়া হল।

বহু শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয় প্রদর্শনীর উপর নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের খড়্গ নেমে এসেছে। ইব্‌সেন-এর গোষ্টস্ (১৯১৪ অবধি নিষিদ্ধ ছিল), ওয়াইল্ড এর সালোম্ (১৯৪১ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল); এর আগে বার্ণর্ড শ-এর নাটক, গ্রান্‌ভাইল বার্কার এর ওয়েষ্ট এর মত এমনি আরো অনেক নাটকই নিষিদ্ধতার বেড়াজালে আটকা পড়েছে।

বিনা প্রতিবাদে কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে শিরোধার্য ক'রে নেয়নি ওদেশের মানুষ। ইয়েটস্, ব্যারি, গলস্‌ওয়ার্দির মতো নাট্যরসিক মানুষরা গিয়ে এ্যাস্‌কুইথ্-এর কাছ থেকে নিয়ন্ত্রণাদেশের শিথিল প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ বহুলাংশেই শিথিল করা হয়েছে। অবশেষে এই কিছুদিন আগে নাট্যনিয়ন্ত্রণ রহিত করার জন্য বিল্ আনতে দেখা গেছে ডিংলে ফুট্‌কে। ব্যবস্থা হয়েছে নিয়ন্ত্রণ বিধিগুলোর অতি সংযত প্রয়োগের। অন্যদিকে অপেশাদার নাট্যাভিনয় সংস্থাগুলো তো আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নাটক নির্বাচনে তাদের স্বাধীনতাকে প্রায় অক্ষতই রেখে এসেছে।

ইতিহাসের ঘটনাচক্র যেমনই হোক না কেন একথা ঠিক যে শাসকগোষ্ঠী তাদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার জন্য নাটক আর নাট্যাভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে এসেছে বরাবর। নাটক

ও মঞ্চ যে জনগণকে জাগ্রত ও সচেতন ক'রে তোলার পথে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে শক্তিশালী অস্ত্র একথা শাসকশ্রেণীর না বোঝবার কথা নয়। এই সেদিনও কেনেডি পরিবারের কাহিনী নিয়ে লেখা একটি নাট্যচিত্রের অভিনয় নিষিদ্ধ করা হয়েছে গণতন্ত্রী মার্কিন দেশে। শিল্পচর্চায় নিরঙ্কুশ অধিকার বিদ্যমান বলে শোনা যায় যে পারী নগরীতে, সেখানকার নাট্যাভিনয়ের উপরও পুলিশের হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

ভারতবর্ষে নাট্যনিয়ন্ত্রণবিধির প্রবর্তন ইংরেজ রাজত্বে ইংরেজের তৈরি নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে। নাটক ও অভিনয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নিষেধাজ্ঞা বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বটে তবে ইংরেজের কলোনী ভারতবর্ষে সেই আইনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও প্রকরণ স্বতন্ত্ররূপে দেখা দিয়েছিল। অন্ততপক্ষে ইংরেজের আপন দেশে এই আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগপদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অনুরূপ আইনের বিধিবিধান ও প্রয়োগের গুরুতর পার্থক্য ঘটেছে। এটাই বোধ হয় স্বাভাবিক।

ইংরেজ তার আপন দেশে নাটক আর অভিনয়কে যে সব কারণে সংযত করার প্রয়োজন বোধ করেছিল তা সূচনায় প্রধানত ধর্মীয় আর তার পরের দিকে অনেকটাই শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ ধরণের নীতিবোধের দোহাইতে। অপরদিকে তার কলোনী ভারতবর্ষে এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনবোধ এসেছে প্রধানত রাজনৈতিক আর সূক্ষ্মভাবে অর্থনৈতিক কারণে। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ অধিকারে অপ্রতিহত রাখা এবং আর্থিক শোষণের একচেটিয়া ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করা ইংরেজ শাসনের মূল লক্ষ্য। তাই আইন প্রণয়নের সময় সেদিনের শাসকগোষ্ঠী স্বদেশের সমতুল আইনের নজিরের দোহাই পাড়লেন বটে, কিন্তু এখানে আইনের বিধিবিধানগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে নিজেদের বিশেষ স্বার্থের অনুকূল ক'রে রচনা করলেন আর তাদের প্রয়োগও ঘটাতে থাকলেন ভিন্ন পদ্ধতিতে একান্তভাবে নিজেদের স্বার্থসাধনে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় পড়ে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হল বাংলা নাটক। আইনের কবলে পড়ে একটা দেশের সাহিত্যপ্রচেষ্টা যে কী পরিমাণ বিপন্ন বিপর্যস্ত এবং বিপথগামী হ'তে পারে তার চরম দৃষ্টান্ত বোধ হয় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন-নিগৃহীত বাংলা নাটক। বাংলা নাটক তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে; প্রতিহত হয়েছে তার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ। বাংলার জাতীয় নাটক গড়ে উঠতে উঠতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কৃত্রিম পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

এদেশে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের স্বরূপ, সেই স্বার্থে বাংলা নাটক এবং তার অভিনয় কিভাবে কতোটা আঘাত হেনেছিল যার প্রতিক্রিয়ায় নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করতে হল আর সেই আইনের ধারাগুলোর প্রয়োগ বাংলা নাটকের স্বাভাবিক বিকাশের পক্ষে কী পরিমাণ প্রতিবন্ধকতা করেছে এসব প্রসঙ্গ বাংলা নাটকের ধারায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিকরা সমুচিত গুরুত্ব আরোপ করেন নি।

এদেশে ইংরেজ শাসনের ভালোমন্দ দুরকম ফলই বর্তেছিল আমরা জানি। সমুদ্র মন্থনের ফলে বিষামৃতের উদ্ভবের মতো। পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সংস্পর্শে উদ্বুদ্ধ জাগরিত চিত্ত আত্মপ্রকাশ ও প্রসারের সাধনায় মগ্ন হয়েছিল। এ পথে সবরকম বন্ধনমুক্তিই তার কামনা। সাহিত্য, বিশেষ করে

নাটক ও মঞ্চ এই মুক্তির পথে শক্তিশালী বাহন স্বভাবতই একথা মনে হয়েছে সেদিন। মনে হয়েছে মধ্যযুগের ধর্মীয় ও সামাজিক জীর্ণসংস্কার ও কুপ্রথার আবদ্ধতা এই মুক্তিপ্রয়াসের পক্ষে বাধা। ফলতঃ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের তীব্র আন্দোলন দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে সমাজে। আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফেনায়িত তরঙ্গশীর্ষে যে সব নাটকীয় মুহূর্তের সঞ্চার নাটকে তাকে প্রতিভাত ক'রে সম্ভব-মতো মঞ্চপ্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক কুপ্রথাগুলির কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস দেখা দিয়েছে। নাটকের বিষয়রূপে একে একে নির্বাচিত হয়েছে কৌলিন্যের কুফল, বহু বিবাহের ঘৃণ্য বেসাতি, বৈধব্যের করুণ ব্যর্থতা, নব্য পন্থীর অন্ধ অনুকরণমত্ততা, প্রবীণ ভণ্ড তপস্বীর নির্লজ্জ লাম্পট্য ইত্যাদি সমসাময়িক সামাজিক সমস্যাকেন্দ্রগুলি।

ইংরেজের শাসনাধীনে থেকেই সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব এ বিশ্বাসের উপরে ভর যতোদিন ছিল ততোক্ষণ প্রতিবাদ চলেছে প্রধানত সামাজিক বন্ধনের বিরুদ্ধে। জমিদারের অত্যাচারে হৃতসর্বস্ব প্রজা সুবিচারের আশায় কোম্পানীর দরবারের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে তখন। "রাইওৎ বেচারীগো জানে মায়ে, তাগোর সব লুটে নিয়ে, তার পরে এই করে" অর্থাৎ তাদের বাড়ীর বউকে বার করে নিয়ে যায়। বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ-র হানিফ্ একথা মর্মে মর্মে জানে তবু আশা করে থাকে 'আচ্ছা দেখি, এ কুম্পানির মুলুকে এন্‌ছাফ্ আছে কি না।'

এ পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে অচিরেই। মোহ ভাঙ্গতে বিলম্ব হয় নি। জমিদারীর চিরস্থায়ী স্বত্বের সুযোগে প্রজাশোষণের অবাধ অধিকারপ্রাপ্ত যে জমিদারগোষ্ঠীকে ইংরেজ শাসক তাঁদের আশ্রয়ে গড়ে তুলেছিলেন, নায়েব গোমস্তা আর অসংখ্যরকমের মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর প্রজাপালনের দায় অর্পণ করে তাঁদের অধিকাংশই শহরবাসী হয়ে বিলাসে ব্যসনে দিনযাপন সুরু করেছেন। অন্যদিকে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়ে গ্রাম্যকুটীর শিল্পের বিপর্যয়ে বংশগত বৃত্তিচ্যুত অগণিত গ্রামীণ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। শহরমুখী হয়ে ছুটে এসেছে তাদের অনেকে। ইংরেজের শাসন শোষণ বজায় রাখার কাজে নিযুক্ত নূতন বৃত্তিধারী কেরানীকুল গড়ে উঠেছে। নূতন অর্থ নৈতিক বিন্যাস আর তার ফলে শোষণ ও নিপীড়নের নূতন নূতন পদ্ধতি দেখা দিয়েছে।

একদিকে নূতন কেঁপে ওঠা কলকাতাশহর। অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্র আর মর্মান্তিক শোষণে অন্তঃসারশূন্য গ্রামীণ বাংলাদেশ আর সেখানকার অগণিত অবহেলিত মানুষ। নূতন উপদ্রব দেখা দিয়েছে তার উপর। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের নূতন পথে আর একদিকথেকে শাসকশ্রেণীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে গ্রামে গঞ্জে। নীল ও চায়ের ব্যবসা সূত্রে নীলকুঠি চাবাগিচা আর সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছে শ্বেত জমিদারী। শ্বেত জমিদারদের বীভৎস অত্যাচারে ডুবে গেছে গ্রামের মানুষ। এই শ্বেতজমিদারের খাসপ্রজা তোরাপ তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় তাই আর 'কুম্পানীর মুলুকে' কোম্পানির প্রতিভূদের কাছে 'ইনসাফ'-এর প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে পারে নি। ক্ষোভ মিটিয়েছে অত্যাচারী লম্পট নীলকুঠীর ছোট সাহেবের নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে।

মুক্তিকামী যে মন একদা সামাজিক কুপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল নিজেকে ক্রমে সে তার লক্ষ্যকে প্রসারিত করেছে। রাজনৈতিক শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে যন্ত্রণাময় কাতরোক্তি

ক্রমে সহিংস বিদ্রোহ প্রয়াসের পথে স্বাধীনতা অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। গ্রামীণ মানুষের শোষণ ও দারিদ্র্যের চিত্র বাস্তবতায় তুলে ধরতে গিয়ে আর্থিক অসাম্য ও একচেটিয়া বাণিজ্যিক শোষণের প্রসঙ্গও দেখা দিতে সুরু করেছে নাটকে। সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদও দানা বেঁধে উঠতে সুরু করেছে দর্শক ও পাঠক মনে। এসবই শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রতিকূল। তাই সে তার নখদন্তবিস্তারে কার্পণ্য করে নি। একের পর এক আইনের বিধিনিষেধ আরোপ করে ব্যাহত করেছে মুক্তিপ্রয়াসকে।

বাংলা সাহিত্যে অপরাপর শাখার তুলনায় নাটকই প্রথম থেকে স্বাভাবিকভাবে সমাজ-সচেতনতার পথে সমধিক অগ্রসর ছিল। সামাজিক কুপ্রথার কুফল প্রদর্শনের প্রচেষ্টা প্রথম পর্বের নাটকে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকে ভীমসিংহের খেদোক্তিতে পরাধীনতার বেদনা প্রকাশে রাজনৈতিক সচেতনতার অভিব্যক্তি ঘটল। এই চেতনার সম্প্রসারণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম সরোজিনীতে। আর বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহাত্মক চেষ্টার ইঙ্গিত বয়ে আনল উপেন্দ্রনাথ দাসের শরৎ সরোজিনী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী প্রভৃতি নাটক। ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ এক নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করে দিয়েছে নীলদর্পণ নাটক।

নীলদর্পণের পটভূমি নীলচাষের অন্তর্ভুক্ত গ্রামবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। ইংরেজের কলোনী ভারতবর্ষে সেদিন দিশি মূলধনের বিনিয়োগের মাধ্যমে বৃটিশ মূলধনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা সম্ভবপর ছিল না। মুক্তিচেতনা যেদিন আর্থিক ক্ষেত্রকেও স্পর্শ করতে চাইল তখন সেই মুক্তি বাসনাকে তাই সংযত ও সীমিত রাখতে হল শুধুমাত্র একচেটিয়া পুঁজির মুনফার লোভের ফলে শোষিত মানুষের দুঃখ দারিদ্র্য আর অসহায়ত্বের করুণ ছবি এঁকে তোলার মধ্যে। নির্মম অত্যাচারের করুণ চিত্র আর এই শোষণের বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধের কিন্তু পরিণামে বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে নীলদর্পণের আবির্ভাব।

নীলদর্পণ সরাসরি আঘাত হানল ইংরেজের আর্থিক স্বার্থে। এই পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠী সতর্ক না হয়ে পারে না। তার উপর নীলদর্পণের আদর্শে অতি অল্পকালের মধ্যে লেখা হলো পর পর অনেকগুলি 'দর্পণ' নাটক। পল্লীজীবনের দুরবস্থার কাহিনী নিয়ে পল্লীগ্রাম দর্পণ, গ্রাম্য জমিদারের অত্যাচারের কাহিনীচিত্র কেরাণীদর্পণ, জেলখানায় কয়েদীদের উপর অত্যাচারের চিত্র সমন্বিত জেল দর্পণ আর চাবাগিচার মালিক ইংরেজ কর্তাদের দ্বারা কুলীদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের নাট্যরূপ চা-কর দর্পণ একে একে আবির্ভূত হল। ইংরেজ শাসনাধীন বাংলাদেশের সমাজের ও জীবনের নানা অঞ্চলের বাস্তব চেহারাটা তুলে ধরেছে এই নাটকগুলি। উদ্দেশ্য অবশ্যই মানুষকে সচেতন করে তোলা—প্রতিবাদের বিক্ষোভের পথে ঠেলে দেওয়া; নীলদর্পণের প্রকাশ যেমন ভাবে একদিন বাংলাদেশের মানুষকে সচেতন এবং প্রতিবাদে মুখর করে তুলেছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে।

লক্ষ্য করার বিষয়, এই নাটকগুলির সাক্ষাৎ প্রেরণাস্থল নীলদর্পণ নাটক সন্দেহ নেই, তবে সে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত নীলদর্পণ। নীলদর্পণের রচনাকাল ও সাধারণ রঙ্গালয়ে তার মঞ্চায়নের মধ্যে 'বার বছরের' ব্যবধান। ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটিত হল নীলদর্পণের অভিনয় দিয়ে

১৮৭২ সালে। আর এই দর্পণ নাটকগুলির রচনাকাল হল ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫-এর মধ্যবর্তী সময়।

নাটকের বিষয় ও বক্তব্যকে জনমনে পৌছে দেবার জন্ম প্রয়োজন নাট্যশালার। কলকাতার বড়মানুষদের বাড়ীতে তাঁদের পরিচালিত মঞ্চে তাঁদের মর্জিমাফিক নাটকেরই অভিনয় হবে। সেখানে নাটক বা অভিনেতার নির্বিশেষ প্রবেশাধিকার নিশ্চয়ই থাকবার কথা না;—ছিলও না। কাজেই প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল এমন নাট্যশালার যেখানে নির্বিশেষে নাটক, অভিনেতা ও দর্শকদের জায়গা মিলবে; নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা থাকায় নাটক রচনার প্রেরণাও বাড়বে। নাটক সেদিন অবধি সমাজ সচেতনতার যে ঈপ্সিত পথে.প্রাগ্রসর তাতে আশা করার সঙ্গত কারণ ছিল যে জাতীয় নাট্যশালার প্রশ্রয় পেলে নাটক সহজেই জনগণমনে তার বক্তব্যকে পৌছে দিতে পারবে। এইসব আশা ও আগ্রহের সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল ন্যাশনাল থিয়েটার। বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে ঘটল নবযুগের অভ্যুদয়। বড় লোকের বাড়ীর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে মুক্ত হয়ে থিয়েটার সাধারণের দ্বারে এসে দাঁড়াল। মঞ্চমালিকের মর্জির উপর নির্ভর না করে টিকিটের বিনিময়ে সাধারণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হল। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধিকাংশই এলেন সাধারণ মধ্যবিত্ত-স্তরের যুবকসম্প্রদায়। অভিনীত হল নীলদর্পণ নাটক—অবজ্ঞাত গ্রামীণ মানুষের উপর ইংরেজের বাণিজ্যিক শোষণের নির্মম চিত্র আর তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিরোধের কাহিনী। ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে দর্শক নীলদর্পণের অভিনয় দেখলেন সাধারণ রঙ্গমঞ্চ—ন্যাশনাল থিয়েটারে। অন্যদিকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও একই সঙ্গে শঙ্কিত ও সতর্ক হয়ে উঠল। কেমন করে এহেন মঞ্চপ্রয়াসকে বন্ধ করা যায় তার সুযোগ খুঁজতে থাকল শাসক সম্প্রদায়।

ক্ষীণায়ু ন্যাশনাল থিয়েটারের দরজা অচিরেই বন্ধ হল বটে কিন্তু এই আদর্শে গড়ে উঠল একাধিক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ। এইসব মঞ্চের আশ্রয়ে নাটক আর তার বক্তব্য পৌছে যেতে থাকল নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের কাছে। ১৮৭২ থেকে সাধারণ মঞ্চে অভিনীত নাটকের তালিকার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যেসব নাটক অভিনীত হয়েছে তাদের অধিকাংশই জাতীয় মুক্তি বাসনার রূপায়নে প্রয়াসী। অধিকাংশ নাটকই ইংরেজ শাসন আর শোষণের প্রকৃত রূপকে কোন না কোন ভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছে। ইংরেজ শাসনের ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রশ্নমনস্ক করে তুলেছে দর্শককে। শাসকগোষ্ঠীর আতঙ্কিত হয়ে ওঠার পক্ষে এইটাই যথেষ্ট ছিল। সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা। অবশেষে অন্তিম আঘাত এলো সম্ভবত চা-কর দর্পণ-এর মতো নাটক প্রকাশিত হওয়ায়।

সূচনায় চা-কর সাহেব কর্তৃক কুলী রমনী ধর্ষণের লিথোছবিসহ চা-কুলীদের উপর চা-কুঠীর শ্বেতাঙ্গ কর্তাদের পাশব অত্যাচারের কাহিনী সমন্বিত চা-কর দর্পণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে। লোকদৃষ্টির অন্তরালবর্তী চায়ের বাগানের চা-শ্রমিকদের জীবনে যে অমানুষিক অত্যাচার নিত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সাহেব মালিকদের দ্বারা তার বাস্তব চিত্র এঁকে প্রকৃত অবস্থাটা ফাঁস করে দিল এই নাটক। এ নাটকও নীলদর্পণের আদর্শেই রচিত। নীলদর্পণ নীলের ব্যবসায়ে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরির উপায় উদ্ভাবিত হওয়ায় সে ব্যবসা না হয় গুটিয়ে ফেলতে হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ মূলধনের একটা বড় অংশ যে তখন লগ্নীকৃত চায়ের ব্যবসায়। আর এই একচেটিয়া ব্যবসাতে লাভের অঙ্কও যে অনেক বেশি। বাজারও প্রায় পৃথিবী জুড়ে। এ ব্যবসাও যদি

বিরুদ্ধ আন্দোলনের ফলে গুটিয়ে ফেলতে হয় তাহলে শোষণের মাধ্যমে শাসন কায়েম রাখাটাই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। চা-কর দর্পণ তখনো মঞ্চস্থ হয় নি যদিও তবু সাধারণ রঙ্গালয়ে যে কোনদিন তার আশ্রয় জুটে যাওয়ার সম্ভাবনা। তার আগেই ব্যবস্থাগ্রহণ বিধেয়। অতএব নাট্য নিয়ন্ত্রণ অর্ডন্যান্স জারী করতে হল (২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৬) এবং বহু প্রতিবাদ ও প্রতিবেদনকে অগ্রাহ্য করে কালক্ষেপ না করে অবিলম্বে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ করে নেওয়া হল (১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৬)। ছোটলাট এ্যাস্‌লে ইডনের পক্ষ থেকে এই আইনের সংযত প্রয়োগের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও অচিরেই (৪ঠা মার্চ, ১৮৭৬) এই আইনের খড়্গ নেমে এসেছিল নাটক ও নাট্যশালার উপর।

একথা ঠিক যে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে 'গজদানন্দ' ও 'Police of Pig and Sheep' এর অভিনয় (১লা মার্চ, ১৮৭৬) উপলক্ষ্যে নাট্যনিয়ন্ত্রণ অর্ডন্যান্সের প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল। সুরেন্দ্র-বিনোদিনী অশ্লীলতার দোহাইতে অভিযুক্ত হয়েছিল। থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার, অভিনেতা, মঞ্চাধ্যক্ষকে গ্রেপ্তার করা হল, বিচারে উপেন্দ্রনাথ দাস ও অমৃতলাল বসুর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান দেওয়া হল। আবার হাইকোর্টের বিচারে অভিযোগ টিকল না বলে এঁরা মুক্তিও পেলেন। এই প্রহসনের সবটাই ঘটে গেল সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগকে কেন্দ্র করে। একটু তলিয়ে দেখলেই কিন্তু বোঝা যাবে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর আদৌ কোন শিরঃপীড়া ছিল না। কারণ এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বহু অশ্লীলধরণের বই ছাপা ও বিক্রি আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৮১৯-২০ সনের School Book Society-র তৃতীয় বার্ষিক রিপোর্টে পূর্ববর্তী পনের বছরে প্রকাশিত মুদ্রিত বই সম্পর্কে মন্তব্য ছিল—'Not a few are distinguished only by flagrance violatlon of common decency ; and are too gross to admit of their attempts to be disclosed before the public eye. এর পর স্বভাবতই পত্রপত্রিকায় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে থাকে। দাবী ওঠে অশ্লীল পুস্তকাদি প্রকাশের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের। কর্তৃপক্ষ কিন্তু এই দাবীতে সাড়া দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেন নি সেদিন। অথচ নাট্যশালার উপরে পুলিশের হস্তক্ষেপ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বেলায় সেই অশ্লীলতার অভিযোগই আনলেন তাঁরা। আসলে সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্টে যা বলা হয়েছিল সেইটাই শাসকগোষ্ঠীকে চঞ্চল করে তুলেছিল। নাটকে বর্ণিত ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশবিক অত্যাচারের ফলে নারীর সর্বনাশের ঘটনা, ইংরেজের জেলখানা ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রসঙ্গ প্রভৃতির ভিতর দিয়ে ইংরেজের বিচার ব্যবস্থার প্রকৃত চেহারা ফাঁস করে দেওয়া এবং ইংরেজবিরোধী মনোভাবকে তীব্র করে তোলার যে প্রচেষ্টা সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে ছিল পুলিশ সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিতে ভোলে নি। জনমানসের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়েই যেন সুশাসকের মতো তাঁরা অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছেন এটা ছিল লোকদেখানো মুখোস। এ অভিযোগ যে টিকতে পারে না একথাও তাঁরা জানতেন। সেইজন্য পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে মামলা ওঠে যেদিন (২০শে মার্চ, ১৮৭৬) ঠিক সেই দিনই মামলার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করেই অশোভন ব্যস্ততার সঙ্গে কাউন্সিলে নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপস্থাপিত করেন কাউন্সিলের ল' মেম্বার হবহাউস সাহেব। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য যে শাসন ও শোষণকে কায়েম রাখা যে কোন প্রকারে শ্লীলতা

অশ্লীলতার বিচার বিবেচনায় আদৌ কোন মাথাব্যথা তাঁদের যে ছিল না তার সমর্থন মিলবে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের ব্যবধানে প্রকাশিত (২৮ মে, ১৮৭৭) সমাচার চন্দ্রিকায় মন্তব্যটি পড়লে—

'হবহাউসের এত সাধের নাট্যাভিনয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়া কী হইল ? নাট্যাভিনয় আইনের একটি ধারায় লিখিত আছে ; অশ্লীল, নিন্দাজনক অথবা অপবাদজনক কোন নাটক কিম্বা প্রহসনের অভিনয় করিলে নাট্যশালার অধ্যক্ষ, অভিনেতৃ এবং দর্শকগণ দণ্ডার্হ হইবেন। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে (১৬ই মে ১৮৭৭ এ বেঙ্গল থিয়েটারে) 'আয় ঘুরে আয় নদের চাঁদ' প্রহসনখানি কি এই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে ? আমরা আশ্চর্য হইলাম যে পুলিশের অন্যতম সুযোগ্য ইন্সপেক্টর বাবু সর্বানন্দ রায় তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যে এ প্রকার অশ্লীল প্রহসনের অভিনয় দেখিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়।'

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের সমর্থনে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবার জন্য বিলের উত্থাপক হবহাউস আপত্তিজনক নাটকের দৃষ্টান্ত হিসেবে 'গজদানন্দ' প্রহসনের উল্লেখ করে কাউন্সিলের সদস্যদের বললেন—

…'a highly respectable Hindu gentleman of good position in society, one of the legal advisers of Government, and one of the members of the legislature of Bengal'—এর ছবি প্রহসনটিতে এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে তিনি যেন 'deliberately selling his own honour and that of his family in order to get promotion and money.' সেদিনের জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় সপ্তম এডওয়ার্ডকে যেভাবে তাঁর বাড়ীতে আপ্যায়ন করেছিলেন সে সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা লিখলেন—'ইনি যে মূল্যে রাজসম্মান ক্রয় করিলেন, তাহাতে সমস্ত জাতির সম্ভ্রম আজ পদদলিত হইয়াছে।' অমৃতবাজার মন্তব্য করলেন —'যে পাষণ্ড নিজ পরিবারের মর্যাদা এই ভাবে ধূলিসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না, সে দেশের জাতির ও সমাজের ব্যাধিস্বরূপ ঘোর কলঙ্ক।' 'গজদানন্দ' প্রহসনে এই জনমতেরই প্রকাশ ঘটান হয়েছিল, তার বেশি কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই জগদানন্দের মতো আশ্রিতজনের রক্ষণাবেক্ষণের কথা শাসকগোষ্ঠীকে ভাবতে হয়েছে। নাগরিকের জীবন নির্বিঘ্ন ও সম্মানজনক করে তোলার যে দায় সুশাসকের তার জন্য মোটেই নয়। যদিও হবহাউস তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজ শাসনের নিরপেক্ষতা ও সমদর্শিতা বিষয়ে একটা মোহজাল বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। কিছুটা সফলও হয়েছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি দু' একটি পত্রিকাকে দলে টানতে পেরে।

হবহাউস তথা শাসকগোষ্ঠীর আসল উদ্দেশ্য কিন্তু বেরিয়ে পড়েছে হবহাউসের বক্তৃতার পরবর্তী অংশে। তিনি জানেন খুব ভালো করেই সর্বকালে সর্বদেশে জনগণমনে নাটক ও মঞ্চের দুর্বার প্রভাবের কথা। …in all times and countries the drama has been found to be one of the strongest stimulants that can be applied to the passions of men'—একথা বলে তিনি স্বীকার করে নিলেন বাংলা নাটকের অস্ত্রটিও ঠিক এই ভাবেই শাণিত হয়ে উঠেছে এবং উদ্যত হয়ে উঠেছে চরম আঘাত হানবার জন্য। হবহাউসের নিজের ভাষায়—'…to excite

feeling of disaffcetion to the Crout।' বাংলা নাটকের তদানীন্তন আশা ও আদর্শ সম্পর্কে পুরো ওয়াকিবহাল তাঁরা। জানেন—'The Dramatic literature of Bengal was in a very rising and promising condition, If greatly exercised the thought and imaginativc faculties of the people। অতএব অঘটন, লেফ্‌টেনাষ্ট গভর্ণরের ভাষায় 'serious mischief' ঘটে যাওয়ার আগেই আইনের বেড়া তুলে দেওয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠল নাটক ও নাট্যশালার সামনে।

এই 'serious mischief' অর্থাৎ চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে শাসকগোষ্ঠী জানেন যদি তাঁদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত আসে, শোষণের পথগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়। সে আশঙ্কার ঝড়ো মেঘ হবহাউস দেখতে পেলেন চা-কর দর্পণ নাটকে। চা-কর দর্পণ তখনো অভিনীত হয় নি। কিন্তু তাঁর কাছে গোপন রিপোর্ট আছে যে এই নাটকে এমন কিছু আছে যা চায়ের ব্যবসার মালিকদের মুখোস খুলে দিয়েছে একেবারে নগ্নভাবে। কাউন্সিলের সদস্যদের তিনি যা বললেন তাঁর নিজের ভাষাতেই শোনা যাক—

There was composed a work in dramatic form called the Cha-Ka-Darpan, ('চা-কর দর্পণ' নামটি ঠিকভাবে বলতে পারেন নি দেখা যাচ্ছে) which I am told means the mirror of Tea, I do not know who was the auother or what his motives were, but the work itself was as gross a calumny as it was possible to concieve. The object was to exhibit as monster of inequity the tea planters and those who were engaged in promoting emigration to the districts—bodies of men as well conducted as any in the Empire।' তারপর আত্মগোপন সমর্থনের ভঙ্গিতে ছলনাময় উক্তি করলেন—'These gentlemen who are carrying on the business to the benifit of everybody concerned, and perhaps with a greater proportion of benifit to the labourers they employ than to anybody else, have what is called a Mirror held up to them in which the gratification of vile passions, cruelty, avarice and lust, is presented as there ordinary occupation……'*

এই চা-কর দর্পণ নাটক যদি একবার পাদপ্রদীপের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে জনসমক্ষে এসে উপস্থিত হতে পারে তাহলে হবহাউসের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে অনুমান করা শক্ত নয় মোটেই যে চায়ের ব্যবসায়ের উপর প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়বে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে সুরেন্দ্র বিনোদিনীর তথাকথিত অশ্লীলতা নয়, আরোপিত অভিযোগে অভিযুক্ত গজদানন্দ প্রহসনও নয়, তার থেকে অনেক বেশী অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন শাসক সম্প্রদায়

*হবহাউস-এর উক্তিগুলো India Grazette, Oct—Dec, 1876 এর Abstract from the proceedings of the Council of Governor General of India থেকে উদ্ধৃত।

সেদিন চা-কর দর্পণ নাটকের অনুপ্রেরণা তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থের প্রতি চরম আঘাতের সম্ভাব্যতায়। আর তাই সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য ক'রে নাট্যনিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় নেমেছিলেন।

একান্তভাবে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার্থে প্রণীত হল নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন। এর লক্ষ্য হ'য়ে উঠল স্বভাবতই উদীয়মান নাটক আর নাট্যশালার স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশকে প্রতিহত ক'রে তাকে বিপথগামী হ'তে বাধ্য করা এবং ফলতঃ পঙ্গু করে তোলা।

এমন আটঘাট বেঁধে নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনটি করা হয়েছিল যে এর থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় ছিল না কারো কোনদিক থেকে। ইংরেজের আপন দেশে অনুরূপ আইনের বিধিতে যেখানে আছে 'Royal Letters Patent' অথবা 'Lord chamberlains Licence' কিম্বা 'Licence given by Justice of peace' ছাড়া কোন ব্যক্তি কোন স্থান নাট্যাভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট ক'রে রাখতে পারবে না; এখানে সেই জায়গায় বলা হল 'Whenever the Provincail Govt is of opinion that any play, pantomime or other drama performed or about to be performed in a public place is—

(a) of a scandalous or defamatory in nature, or

(b) likely to excite feelings of disaffcetion to the Govermenent established by law in British India [or British Burma] or,

(c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance* নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগে তাদের নিষিদ্ধ করা হবে। এখানে নিষেধাজ্ঞা নেমে এল নাটকের উপরে। Any building or enclosure to which the public are admitted to witness performances on payment of money'—'public place' এর এই ব্যাখ্যার সাহায্যে টিকিট বিক্রি করে যে সব মঞ্চ অভিনয়ের আয়োজন করছিল অর্থাৎ সেদিনের সমস্ত পাবলিক থিয়েটারকেই এই আইনের আওতায় এনে ফেলা হল। অভিনয়ের জন্য মনোনীত প্রত্যেকটি নাটককে অভিনয়ের আগে অনুমতিসাপেক্ষে পুলিশের কাছে পেশ করার বিধি হল। যদি অননুমোদিত হয় কোন নাটক আর তা সত্ত্বেও সেই নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করা হয় তাহলে নাটক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যে কোনভাবে যুক্ত অভিনেতা, নির্দেশক, মঞ্চাধ্যক্ষ, নাট্যগৃহের মালিক বা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তির কাছে কৈফিয়ৎ তলব করা যাবে এবং বিধিলঙ্ঘন করা হয়েছে মনে হলে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার জরিমানা জেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে।

সুরেন্দ্র বিনোদিনীর মামলায় জড়িয়ে পড়ে সর্বস্বান্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ভুবনমোহন নিয়োগী থিয়েটারের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে দূরে সরে গেলেন। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস পাড়ি দিলেন বিলেতে। ম্যানেজার অমৃত বসু তাঁর অনুগামী হতে গিয়ে বাধা পেলেন বাড়ী থেকে; চলে গেলেন আন্দামানে। অভিনেতা বিহারীলাল পুলিসের চাকরী নিয়ে চলে গেলেন পোর্টব্লেয়ারে। অভিনেত্রী সুকুমার দত্ত থিয়েটার ছেড়ে বাড়ী বসে রইলেন আর অর্ধেন্দু মুস্তাফী বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে।

*Section 3 of the Dramatic Proformances Act 1876.

এর পর নিশ্চয়ই আর কেউ সাহস করে এগিয়ে আসবেন না এমন নাটকের অভিনয়ে আয়োজন করতে যে নাটকে জাতীয় জীবনের সামান্যতম আশা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে।

আইনে আরো যেন চোখ রাঙিয়ে বলা হল আইন বিরুদ্ধ কোন নাটকের অভিনয় হতে থাকলে পুলিশ প্রয়োজনবোধে বলপূর্বক সেখানে ঢুকে গ্রেপ্তার করা ছাড়াও সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ক'রে নিতে পারবে। অতঃপর নিশ্চয়ই কোন মঞ্চাধ্যক্ষ আদৌ সাহসী হবেন না এমন কোন নাটক নির্বাচন করতে যা পুলিশের বিচারে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হ'য়েছে বা হ'তে পারে।

সব থেকে মারাত্মক যে ধারাটি এই আইনে সংযোজিত, যার নজীর আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না তা হল নিষিদ্ধ অভিনয়ের ক্ষেত্রে দর্শকদেরও শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা।

পাবলিক থিয়েটারের যুগে যেখানে দর্শকের পয়সায় থিয়েটার চলে সেখানে দর্শকের সামনে এই আতঙ্ককে তুলে ধরাটা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল সন্দেহ নেই।

এইভাবে নাট্যকার থেকে শুরু করে দর্শক অবধি সবাইকে আইনের আওতায় এনে নাটক আর নাট্যশালাকে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে এনে ফেলেছিল সেদিনের শাসক সম্প্রদায়। এর পর কে ঝুঁকি নেবে জাতীয় চেতনামূলক নাটকের অভিনয়ের আয়োজন করতে বা তা দেখতে।

যে উদ্দেশ্যে এই আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তা সিদ্ধ হল। সমগ্র নাট্যজগতে একটা দিশেহারা অচল অবস্থার সৃষ্টি হল। শৌখিন অভিনেতাদের হাত থেকে মঞ্চ আস্তে আস্তে ব্যবসাদারের হাতে গিয়ে পড়ল এই সুযোগে। পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যে যেখানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন ব্যবসায়ী মঞ্চ মালিকেরা স্বভাবতই তাঁরা আইনের চোখে নির্দোষ নাটককেই বেছে নিতে লাগলেন।

এই ছন্নছাড়া অবস্থায় পড়ে গীতিনাটক ছাড়া অন্য কোনপ্রকার নাটকের অভিনয় করার সাহস হল না কারো। জীবনঘনিষ্ঠ নাটকের জায়গায় স্থান নিল আদর্শসতী, পারিজাত হরণ এর মতো অসার গীতনাট্যের অভিনয়। যে ভুবনমোহন সুরেন্দ্র বিনোদিনীর অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন তিনিই আবার ওই পারিজাতহরণ গীতিনাটকের মঞ্চায়ন ঘটালেন। অভিনয় দেখে হতাশ গিরিশচন্দ্র গান লিখলেন—

'আমার ফিরিয়ে দে না আধুলি
কি ঠকানটা ঠকালি।'

সত্যিই নাটক ও মঞ্চ সেদিন আত্মবঞ্চনার পথে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল। নাচগানের পসরা সাজানো গীতনাট্য, পঞ্চরং তামাসা আর বাস্তব জীবন থেকে অনেক পেছন ফেরা পৌরাণিক যুগ ও জীবনের আখ্যান নিয়ে লেখা পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমে ভক্তিরসের বন্যাস্রোত নেমে এল মঞ্চে। প্রহসনের সামাজিক স্পর্শ হারিয়ে গেল। নাটক তার বলিষ্ঠ জীবনাবেগ হারিয়ে ফেলল।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের শেষ ধারায় ছিল—'Nothing in this Act applies to any Jatras or performances of or like kind at religious festivals.' যাত্রা ও তার সমধর্মী অভিনয় অনুষ্ঠানের প্রতি এই আইনের বিধিনিষেধ প্রযুক্ত হবে না এই অঙ্গীকার পৌরাণিক আধারে ভক্তিধর্মের প্রবাহকে নিয়ে আসতে নিশ্চয়ই অনেকখানি উৎসাহ যুগিয়েছিল।

কলকাতায় অবস্থিত বিদেশী মঞ্চের অনুকরণে এদেশের মঞ্চ গড়া হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারের মঞ্চও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে যেহেতু মঞ্চপ্রকৃতি ও নাট্যপ্রকৃতি পরস্পরসাপেক্ষ, একে

অন্যের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়; শক্তিশালী নাটকের প্রভাবে তাই মঞ্চরূপের পরিবর্তনও অসম্ভব ছিল না। মঞ্চ যেদিন বড় মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে বেরিয়ে এসে ন্যাশনাল থিয়েটাররূপে সাধারণের দ্বারে এসে দাঁড়াল সেদিন এ সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজন সেদিন জীবন-ঘনিষ্ঠ বলিষ্ঠ নাটকের যা তার আপন প্রয়োজন অনুযায়ী মঞ্চরূপকে পরিবর্তিত করে দিতে সক্ষম। নিয়ন্ত্রণ আইনের শিকল পরে নাটক ও মঞ্চকে সেদিন যে পথে চলতে দেখা গেল তাতে সে সম্ভাবনা সুদূরে মিলিয়ে গেল। মঞ্চপ্রকৃতিকে রূপান্তর ঘটাতে পারে এমন নাটক মঞ্চস্থ হয় না বরং ভাল নাটকের অভাবটাকে পুষিয়ে দেবার জন্য ব্যবসাদার মঞ্চ-মালিকরা মঞ্চের বিলিতি ছাঁদকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার উপর মঞ্চমায়া ও কুহক সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। নাটক ও মঞ্চে ব্যবধান ঘুচে গিয়ে ন্যাশনাল থিয়েটার যথার্থ জাতীয় মঞ্চ হয়ে উঠতে পারত, সে সম্ভাবনা দেখাও গিয়েছিল, যদি নাটক ও মঞ্চের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ ব্যাহত না হত আইনের নাগপাশে পড়ে। মঞ্চ ও নাটকের প্রকৃতিতে যে ব্যবধানের সূচনা হয়েছিল সেদিন আজও তা মুছে গেছে সম্পূর্ণভাবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় না। ন্যাশনাল থিয়েটারের যাত্রারম্ভে আইনের অপঘাত তাকে পঙ্গু করে তুলেছিল। সত্যিকার ন্যাশনাল থিয়েটার বা জাতীয় মঞ্চ আজও আমাদের কল্পনার বস্তুই হয়ে আছে।

নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন বাংলা নাটক আর নাট্যশালার যে পরিমাণ ক্ষতিসাধন করেছে আর কোন দেশের কোন আইন তা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না।

বিক্রমপুরের আটপৌরে ভাষা

ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়

রান্না হয় নাই বুঝি।

না, বাজারে দেরী হইছিল। পরের হাতে ধন, পরের পায় গমন, নিজের ইচ্ছামত কাজ হয় না।

নাও আমাগোও নাই, তবে নি নাইয়ার শতেক নাউ। বাজার থেকা কি আনছে?

আমাগো আবার বাজার। পুঁটি মাছ পিটালি আঁধার। তোমার কথায় মনে পড়ল, বাতি নিয়া যখন রাত্রে ঘাটে যাই তখন পুকুরে পুঁটি মাছের খই ছোটে।

দেওরের চলছে কেমন?

হাতে যেদিন টাকা থাকে মচ্ছমূলা কইরা খায়। পরদিন হয়ত চুলায় হাঁড়ি চরে না। পরের দুয়ারে হাত পাতে। লোকেই বা কত দিব। একবার নিলে আর চিৎ হাত উপর করে না। রামার মা আমার থেকা দুইটা টাকা নিছিল, কিছুতেই দেয় না। সেদিন কয়েকটা চিমটি কাটা কথা বলায় এক টাকা বার করেছে। সিধা আঙুলে ঘী ওঠে না।

জাল কেমন?

জেমন দেবা তেমন দেবী। নিজের সংসারে মন নাই। পরের সবটাতে সে সকল ব্যন্জনের হলুদের গুঁড়া।

তার ছেলেটি দেখতে ভালো না।

ও কথা বইলো না দিদি, সোনার আংটি কি বাঁকা হয়।

তোমার মেয়ের নাম রাখছ কি?

ওর দাদু ওকে ডাকে অপূর্বা সুন্দরি।

এ যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।

বড় মেয়ে আছে কেমন?

খাওয়া পরার কষ্ট নাই, কিন্তু হাড় ভাঙ্গা খাটুনি। কর্তা গেছিলেন মেয়ের বাড়ি। একজন পড়শী বললেন, আপনার বেয়ান ত নিবাইরা কাপড়।

সে আবার কি?

জান ত ধোপা দুই রকম কাপড় কাচে, আটপৌরা ও নিবাইরা। নিবাইরা কাপড়ে মাড় থাকে আর তা সাফ বেশী। তা ভাজ করিয়া তুলিয়া রাখা হয়। কোথাও যাইবার সময় নিবাইরা কাপড় পইরা যায়। বাড়িতে লোকজন আসলে আমার বেয়ান ফুলফুলুরি রান্না করেন; হাসতামাসা ও গল্পগুজব করেন। প্রতিদিনের আটপৌরে গৃহস্থালি কাজের ধার দিয়াও তিনি যান না। তাই মেয়েটা সংসারের জন্য শরীরের রক্ত জল করছে। তিনি মেয়েকে পূজায় আনবেন বলছেন। মেয়ে ত দুই হাতে দিন ঠেলছে। মেয়ে ত আসব খরচের কথা ভাবছি। আমাদের আর মধু-পর্কের বাটীর মত কাইৎ হলেই নাই।

ভাগ্‌নে কিছু সাহায্য করে না ?

তার কথা আর কইওনা। দুধ কলা দিয়া সাপ পুষছিলাম। পরের উপকার করা আর ছাইতে জল ডালা সমান।

তোমার ছোট শাশুড়ীকে আনমনা দেখি কেন ?

ভাইয়ের বাড়ি থেকা নিতে আসছিল। তিনি বললেন, ওঠ ছেমরি তর বিয়া—এই কথা বললেই কি আমি যাইতে পারি। আমি আছি কংসের কারাগারে এক পা বাইরে বাড়াবার উপায় নাই।

তার কয় ভাই পো ?

ভাইয়ের সন্তান নাই, বৌ বাঝা। পরের ছেলে পালে।

যশোদা বড় ভাগ্যমন্তী, পরের ছেলেতে পুত্রবতী।

সেদিন কথকতা শুনতে গেছিলাম। পাঠক না পারে গাইতে না পারে বলতে। যত ছিল নাড়া বইনা সবাই হইছে কীর্তনীয়া। তোমারা পয়সা দিবে একটি; গান শুনতে চাও অক্রুর সংবাদ। তোমার বড়জা কেমন আছে ?

তার ছেলে ভালো চাকরি পাইছে। সে ত অহংকারে গদ গদ, মাটিতে পা পড়ে না।

জমের রুষি নিয়া বড়াই করা ভাল না।

মানুষের জীবন কচুপাতার জলের মত—এই আছে, এই নাই। এত ত সেদিন দাস বাড়ির জলের জেতা ছেলেটা মিমিষের মধ্যে মইরা গেল। ব্যামো শ্যামো কিছু না, শুকনার কুমীরের ঘা। বিনা মেঘে বজ্রপাত। মা কাটা ছাগলের মত ছট্‌ফট্ করছে; তার শোকে বৃক্ষের পত্র ছইড়া পড়ে; পাষাণ গলে। বাপ কোড়ালের মত কোঁ কোঁ করছে। বুড়া ঠাকুরমা বলে, মৎসের মার আর পুত্রশোক কি। তোমার বড় ভাসুর কেমন ?

তার মুখে মিষ্টি পেটে বিষ। আপন স্বার্থ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া নেন। কিন্তু ধরি মাছ না ছুই পানি। কোন কাজের মধ্যে তিনি নাই। ছোট ভাইয়ের বিবাদে পায়ে নল চালান। আনারসের পাতার মত মেজোজার দুই দিকেই ধার—যেমন কাজ কর্মে তেমন বিবাদে। ছোট দেওর ত এক জড়ভরত। যে যা করুক, তার কোন তাপ উত্তাপ নাই। মাঝের বাড়ির শাশুরি-বৌর মধ্যে অষ্টপ্রহর যুদ্ধ চলে। শাশুরি বলে— কলির বৌ-ত হাড়জ্বালানি

বললে হয় বাঁকা,

বুইড়া বুড়ি কুইড়ায় থাকব

আমরা নিমু বড় ঘর।

কলির বৌ ত ভাঙ্গল সোনার ঘর।

বৌ বলে—কানি, কত করবি কর

কভু না কাতর হবে চাঁদ সদাগর।

শাশুরি এমন ছুতির ছুত কাঠি মাইপা রাখে দুধ।

বৌ এমন ছুতির ছুত জল মিশাইয়া খায় দুধ।

ভয়ে সে বাড়ি যাই না। গেলে দোটানায় পড়তে হয়।
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা দাঁড়ায়।
সেদিন শাশুড়ি হঠাৎ মারা গেছে। মইরা গেছে ধন্বন্তরি ওঝার পাইছে স্বতন্তরি!

বৌ বলে—আগে খাইমু পান্তার ভাত
পরে লেপুম ঘর
শাশুরি নাই ননদ নাই
কার বা করি ডর।

কিরে সজা, এখানে তুই কি আকড়া চাউলের দোকান করিস? তর লেখা পড়া নাই? হাতের লেখা যেন কাউয়ার পাড়া। সারাদিন শয়তানি। বাপ বাড়িতে আসলে সাপের মাথায় ধুলা পড়া পড়ে। সে ত ছেলেকে দায় আনে কুড়ালে কাঠে! তিনি বলেন যেমন হাউরা নল তেমন সুন্দইরা মুগইর চাই।

দায়রে বালি কুড়ালেরে শিল
বাঁদীরে লাথি গোলামের কিল

না দিলে তারা ঠিক থাকে না। শাসনে কি হবে। ইল্লত যায় ধুইলে খাসলত যায় মইলে।

হাড়িয়া কোণে কাউয়ায় ডিম পাড়ছে, তুফান আসবো, শিগ্‌গির বাড়ি যা!

এটা একটা লঙ্কাপোড়া। যেখানে যাই লগে লগে আসে। আমাগো পাশের বাড়ির দুই ভাই ভিন্ন হইয়াছে। একত্র করার জন্য সকলে বহু চেষ্টা করছে। কিন্তু ভাঙ্গা-শাঁখা কি জোড়া লাগে। লোকে বলে জল কাটালে দুই ভাগ হয় না। দক্ষিণের ঘরের স্বামী স্ত্রীর শরজাল চলছিল। বোন মধ্যে পড়িয়া মিট্‌মাট্ করিয়া দিয়াছে। এখন আর বোনকে জিজ্ঞাসা করে না। আমে দুধে মিশা গেছে, আঁটি আদাড়ে গেছে। দিনেশ নাকি বড় ঘরে বিয়া করছে তারা লোক কেমন?

বৌ দেইখ্যা মনে হয় লোক ভালো। একটা ভাত টিপলে হাঁড়ির খবর পাওয়া যায়। তবে একটা কথা আছে জাহাজের সংগে ডিঙ্গি চলতে পারবে কি? তেলেজলে মিশে কি? এখন বাড়ি যাও নইলে বকুনি শুনতে হবে। সায়রে শয্যা শিশিরে আর কি ভয়। শাশুড়িরা কলির বৌর নিন্দায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তারা যখন শরশয্যায় পড়েন তখন ত বৌদেরই টানতে হয়। বিয়ার পর এখানে একটা ইচার আংটিও পাই নাই। শাশুরি বলে, ছেলে রোজগার কইরা গয়না দিব। আশায় রইছেন কাউয়া পাকলে খাইবেন ডউয়া।

আমার ছোট দেওর খুব ভাল। কারো সঙ্গে তার অসিয়তা নাই। বেশী গলাগলিও নাই। পাড়ার সকলের সঙ্গে তার ভাই-আচারি ভাব। ননদ আর এক রকম, তার পেটে কথা পচে না। তিলরে তাল কইরা বলা তার অভ্যাস। শ্বশুরের চাঁছাছোলা কথা। কথায় রস-তস নাই। মেঝো কর্তার ছেলের কঠিন ব্যামো। তার মাথার উপর খাড়া ঝুলছে। তার কাছে পূজার মাথট চাইতে কারো সাহস হয় না।

ছেলেটার অসুখ বিসুখ কিছুই না। পাঠশালায় যাইবো না তাই ভেক ধরেছে।

কাল এমন কইরা নিমন্তন্ন খাইছিল যে পেটের উপর লিক মারা যইত।

আচ্ছা সেদিন কাছারির লোকেরা গরিবের উপর অত্যাচার কইরা গেল। মাতব্বরের জমিদারকে কিছু বলছে কি ?

মাতব্বরদের কথা ছাড়।

বড় বড় বানরের
বড় বড় পেট
লঙ্কায় যাইতে
মাথা করে হেঁট।

বিক্রমপুরের কোন কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে নারীরা সমবেত কণ্ঠে গান গাইতেন—

আমরা যত বঙ্গ নারী
পরবো না আর কাচের চুড়ি
সুরেনবাবু করেছেন মানা
সবার মনে আছে জানা।

কৌলিন্য প্রথার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল বিক্রমপুর। ঘটক জাতির উদ্ভব ছিল বল্লালির অন্যতম উপজাত। কৌলিন্য প্রথার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঘটকেরা বৃত্তিহীন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণশ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়ে। তারা বিনা নিমন্ত্রণে অকুলীনের বাড়ির বিবাহে উপস্থিত হতেন। অনাহুতদের অনাদর সহ্য করে তীর্থ কাকের মত আহারের প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন। ধুলা-বালি মাখা ফরাশের উপর শুয়ে মশার কামড়ে জর্জরিত ঘটকেরা বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। দিনের বেলা তীর্থের ভিক্ষুকদের মত গৃহকর্তাকে ঘিরে ফেলে বার বার প্রত্যাখানের পর দুই চার আনা বিদায় সংগ্রহ করে কয়েক মাইল দূরে নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতেন।

তাদের এই অদৃষ্টকে তারা হাস্যমুখে পরিহাস করতেন। বিক্রমপুরের পাঁচটি গ্রামের নাম পাশাপাশি বসিয়ে তারা তাদের এই বিড়ম্বনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রেখে গেছেন।

রাইতভো বালিগাঁও পাইনা পয়সা কান্দনীসার। (ভাষার এই নমুনা সংগ্রহে শ্রীমতী সুশীলা দেবী লেখককে বিশেষ সাহায্য করেছেন।)

স্বখাত সলিল

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ অনেক সময়ে অজ্ঞাতসারে নিজের অনিষ্ট নিজেই করে। গাছের একটি ডালে বসিয়া যদি ঐ ডালই কাটা হয়, তাহা হইলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিবার জন্য অনুতাপ কবি শ্যামা মায়ের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ একটি আত্মঘাতী অপকর্ম পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকার আবশ্যিক বিষয়সমূহ হইতে সংস্কৃতকে বর্জনের প্রস্তাব। একজন সংস্কৃত সেবী ও সংস্কৃতশিক্ষক হিসাবে এই পরিকল্পনার কুফল সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সবই বেদে আছে, ইহা বলিতে চাহি না। সংস্কৃত স্বর্গ, সংস্কৃত ধর্ম—ইহাও আমার প্রতিপাদ্য নহে। বর্তমানে সংস্কৃতের অবশ্য পাঠ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি মাত্র। চিন্তাশীল ব্যক্তি ও চিন্তানায়কগণের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য, সংস্কৃতের স্তুতিগান বা জীর্ণ পন্থাকে একমাত্র পন্থা বলিয়া প্রতিপাদন নহে।

সংস্কৃতের বিরুদ্ধবাদী বলিবেন, সেকেলে সংস্কৃতের একালে প্রয়োজন কি? এই যুক্তিতে যদি সংস্কৃতকে বর্জন করিতে হয় তাহা হইলে নবীন পুত্র কন্যারও প্রবীণ পিতামাতাকে ত্যাগ করা উচিত বা তাঁহাদের পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতাকে অচল মুদ্রার ন্যায় প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত। সূর্য লক্ষ লক্ষ বৎসর রশ্মি বিকিরণ করিয়া থাকিলেও অদ্যাপি বলি—আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ; অর্থাৎ, সূর্য প্রাচীন হইলেও উহার রোগনাশক শক্তি অটুট আছে। গঙ্গা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইলেও তাহার শৈত্য পাবনত্ব হারায় নাই। চিকিৎসক প্রাচীন হইলে তাঁহার উপদেশ মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয়। তেমনই মার্গসাহিত্য (classical literature) প্রাচীন হইলেও উহার শাশ্বত মূল্য আছে। আজও শিক্ষিত পরিবারে শিশুদের মনে পবিত্র ভাব এবং দয়া বীরত্বাদি উদ্বোধিত করিবার জন্য রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী দিয়া শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ভক্তি, নীতিবোধ, প্রেম প্রভৃতি মানবিক ভাবের বীজ শৈশবে মনে উপ্ত না হইলে পরে আর হয় না; এই সব ভাব না থাকিলে মানুষও ইতর প্রাণীর মধ্যে ভেদ রেখা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সংস্কৃত সাহিত্য এই সকল ভাবসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ ইদানীন্তন কালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে সকল বিষয় পঠিত হয়, তন্মধ্যে মানবিক ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্যাপারে বোধকরি কোন বিষয়ই সংস্কৃতের সমকক্ষ হইতে পারে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মানুষকে অর্থোপার্জনকারী যন্ত্রে পরিণত করা নহে। এডুকেশন শব্দটির তাৎপর্য মানুষের মধ্যে যে উত্তম বৃত্তিগুলি আছে উহাদের পূর্ণ বিকাশ। শিক্ষার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য, জীবন-দর্শন-গঠন। উপনিষদে এবং গীতায় ত্যাগের, কর্মের, মৈত্রীর যে আদর্শ আছে তাহা বিশ্বের মনীষীগণ কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের পথ সংস্কৃত ভাষা; অল্প বয়সে এই পথের সন্ধান দিতে না পারিলে অধিক বয়সে কি করিয়া উহাতে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে?

প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, ইংরেজগণ তাঁহাদের মার্গ সাহিত্যকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয়

বিষয় বলিয়া মনে করেন। এমনকি, কাহারও কাহারও ধারণা যে, ঐ সাহিত্য পাঠ না করিলে **gentleman** বা ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় না।

আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা গোষ্ঠীর উৎস সংস্কৃত ভাষা। ভবিষ্যজ্জীবনে কেহ যদি এইরূপ কোন ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে বা উহাতে গবেষণা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সংস্কৃতের জ্ঞান ভিন্ন সে কি করিবে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, উৎকীর্ণ লিপিমালা প্রভৃতি বিষয়ে গভীর ব্যুৎপত্তি এবং গবেষণায়ও সংস্কৃত অপরিহার্য।

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন, সংস্কৃত পড়িয়া জীবিকার্জন হয় না। ইহা সর্বাংশে সত্য নহে। সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্যা আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া হাজার হাজার লোক কি জীবিকা অর্জন করিতেছেন না? শুধু জীবিকা নহে, এই সকল বিদ্যার সাহায্যে বহু লোক সমৃদ্ধশালীও হইয়াছেন।

যদি বলেন, সংস্কৃত সাহিত্য পড়িয়া মানুষ ইহবিমুখ হইয়া পড়ে। না, তাহাও সত্য নহে। কৃষিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি বহু বাস্তব জীবনের উপযোগী বিষয় সংস্কৃতগ্রন্থ সমূহে লিপিবদ্ধ আছে।

কেহ বলিতে পারেন, সংস্কৃত অত্যন্ত কঠিন ভাষা। সুকুমারমতি বালক-বালিকার উপরে ইহা চাপাইয়া দেওয়া সঙ্গত নহে। উত্তরে বলিতে পারি, তাহা হইলে ছেলেমেয়েকে নারিকেল খাইতে দিবেন না; ইহার বহিরাবরণ অতি কঠিন এবং ইহার ছেদন কষ্টসাধ্য। কর্কশ বহিরাবরণের ভিতরে কোমল পদার্থের আস্বাদনই কাম্য। সংস্কৃতের শিক্ষা পদ্ধতির কিঞ্চিৎ সংস্কার করিলেই ইহার আপাত কর্কশ রূপটি তিরোহিত হইবে।

এইবার ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে আসা যাউক। জাতীয় দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে সংস্কৃত প্রতিটি নাগরিকের অবশ্য পাঠ্য। ভাষা, বেশভূষা, রীতিনীতি, আহার বিহারে যে দেশে এত বিভিন্নতা। সেখানে সংহতিস্থাপন না করিতে পারিলে ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। জাতীয় সংহতির অভাবেই অতীতে ভারত বৈদেশিক আক্রমণের লক্ষ্য হইয়াছিল এবং বিজাতীয় শাসকের কবলিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও ভাষা সমগ্র ভারতের সম্পদ। এই চেতনা উদ্‌বুদ্ধ হইলে প্রাদেশিকতা, ভাষাজনিত হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি অনিষ্টকর মনোভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত হইবে। কিন্তু, সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ, শ্রদ্ধাও ইহাতে ব্যুৎপত্তি ব্যতীত এই চেতনা কি করিয়া জাগ্রত হইবে?

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কথা একবার ভাবিয়া দেখুন। বিশ্বের দরবারে, বিশ্ব সংস্কৃতির মহা সম্মিলনে ভারত কি স্বীয় পরিচয় দিবে? তাহার বেদ, উপনিষদ্, রামায়ণ, গীতা, দর্শন প্রভৃতিই ত তাহার গৌরব খ্যাপন করিবে। আজিকার জগতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার যে অগ্রগতি প্রতীচ্যে হইয়াছে তাহার তুলনায় এই সকল বিষয়ে ভারতের দান নগণ্য। কিন্তু, ভারতের প্রজ্ঞা যুগ যুগ ব্যাপিয়া তাহাকে বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকার দান করিয়াছে। প্রতীচীর বহু দার্শনিক ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পিথাগোরাস্ (Pythagoras) এর উপরে সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের উল্লেখ করা যায়। শোপেন্‌হাওয়ারের (Schopenhauer) উপরে বেদান্তের প্রভাব স্পষ্ট। এক 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থখানি প্রায় পঞ্চাশটি বিদেশী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে এবং বিশ্বের নীতিমূলক গল্পসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অতি আধুনিককালে কতক ইংরাজ ও মারকিন কবির রচনায়

গীতা উপনিষদের প্রভাব প্রকট হইয়াছে। ঔপন্যাসিক সমারসেট মম্ (Somerset Maugham) এর Razor's Edge (ক্ষুরস্য ধারা) নামক গ্রন্থখানির নামই উপনিষদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার নিদর্শন।

পারস্যদেশে আরবে সংস্কৃত আয়ুর্বেদ ও 'পঞ্চতন্ত্রে'র প্রভাব বিদ্যমান। প্রাচীনকালে এই দেশের সম্রাট্ দরায়ুস্ (Darius) 'মনুসংহিতা'র আদর্শে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের ব্যাপক প্রভাব সুদূর প্রাচ্যের (Far Fast) কতক দেশেও প্রমাণিত হইয়াছে। যব দ্বীপ, বলি, শ্যাম, কম্বুজ প্রভৃতি দেশে উৎকীর্ণ লিপিমালা, আচার ব্যবহার, সাহিত্য প্রভৃতিতে রামায়ণ মহাভারত ও বিবিধ সংস্কৃত কাব্যাদির প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

স্বাধীন ভারত অন্যান্য দেশের সঙ্গে, বিশেষতঃ তাহার এশিয়াবাসী প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে, মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছুক। সংস্কৃতের মাধ্যমে ঐ সকল দেশের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্রটি আবিষ্কার করিতে পারিলে এই মৈত্রী দৃঢ়তর হইবে, সন্দেহ নাই।

ভারতবাসীকে সর্বপ্রথমে ভারতীয় হইতে হইবে, ভারতের অন্তরাত্মাকে বুঝিতে হইবে এবং দেশে বিদেশে অহিংসার, আধ্যাত্মিকতার, শান্তির বাণী শুনাইতে হইবে। সংস্কৃত ব্যতীত এই কার্য অসম্ভব। ম্যাক্স্‌মূলার বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের উচ্চতা যেমন এভারেষ্টের উচ্চতা দ্বারা নির্ধারিত হবে, অন্যান্য শিখরের দ্বারা নহে, তেমনই ভারতাত্মার মহনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইলে বেদপাঠ করিতে হইবে। বুদ্ধ, বিবেকানন্দ; গান্ধী, চৈতন্য, রামমোহন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্মপ্রবর্তক, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ্, সাহিত্যিক সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে ভাবসমুদয় আহরণ করিয়াছিলেন। আজ দেশ বিদেশে যে যোগের মহিমাকীর্তন হইতেছে, যে যোগ বিবিধ রোগনাশক বলিয়া খ্যাপন করা হইতেছে, যাহাকে শান্তির অন্যতম সোপান বলিয়া মনে করা হইতেছে তাহার মূলও সংস্কৃত রচিত গ্রন্থ।

বিরুদ্ধবাদী বলিতে পারেন যে, সংস্কৃতকে বর্জন না করিয়া ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত রাখিলে ক্ষতি কি? যাহার ইচ্ছা সে উহা শিখিবে। কিন্তু, কোমলমতি অনভিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীগণ সংস্কৃতের কঠিন বহিরাবরণ দেখিয়াই উহা বর্জন করিবে। ইহা পাঠে ভবিষ্যতে কি উপকার হইবে তাহা উহাদিগকে বুঝাইবার লোক কম, নিজেরাও বুঝিতে পারিবে না। শিশু অনেক সময় উপকারী খাদ্য অনেক সময়ে আহার করিতে অনিচ্ছুক হইলে মা উহা ভক্ষণ করিতে বাধ্য করেন। তাহাতে ফল ভালই হয়। সুতরাং সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করিলে বিদ্যার্থিগণ আপাততঃ ক্ষুব্ধ হইতে পারে; কিন্তু, পরিণাম মঙ্গলজনকই হইবে।

বর্তমান যুগে সংস্কৃতের উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রখ্যাত ভারতবিজ্ঞানী ব্যাসামের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব—the sages who meditated in the jungles of the Ganges Valley six hundred years or more before Christ are still forces in the world.

[যে ঋষিগণ গাঙ্গেয় উপত্যকায় বনে খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বা তদধিক বৎসর পূর্বে ধ্যান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ অদ্যাপি পৃথিবীতে প্রেরণা জোগাইতেছে।]

প্রাচীন ভারতে নৌ বাণিজ্য

উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

খৃষ্ট জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্যেরা যখন ভারতের উত্তরাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন তখন তাঁরা নৌ বিদ্যায় কতটা পারদর্শী ছিলেন তার কোন বিবরণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে বুদ্ধের মৃত্যু কালে (অর্থাৎ ৪৮৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দে) ভারতের নাবিকেরা যে জলপথে ব্রহ্মদেশ, আধুনিক ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ায় গিয়ে পৌঁছেছিলেন তার কিছু কিছু প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে; খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে যেমন আফগানিস্থান, মধ্য-এশিয়া, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তেমন এদেশের বণিকেরা জলপথেও আফরিকা ও ইউরোপের নানা বন্দরে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে সেকালে যে ভারতীয় সওদাগরদের লেনদেন চলতো তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণও আমরা পেয়েছি; ভিসুভিয়াসের অগ্নুৎপাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হারকুইলেনিয়াম নগরীর ধ্বংসস্তূপ থেকে কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিল্পীর তৈরী একাধিক শিল্পকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সেকালে রোমের অভিজাত সমাজে ভারতীয় আতর, মশলা, কার্পাস বস্ত্র, লাক্ষা, চুনী-পান্না-হীরে, চিনি, চাল, ঘি, হাতীর দাঁতের নানা শিল্প দ্রব্য, নীল, হাতী, বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, বাঁদর, টিয়া, ময়ূর, প্রভৃতি পশুপাখির বিশেষ চাহিদা ছিল; রোমের সঙ্গে নৌ বাণিজ্যে প্রতি বছর ভারতের যে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত থাকতো তার উল্লেখ পাই প্লিনির রচনায়; প্রতি বছর তাই রোম থেকে প্রচুর পরিমাণ সোনা ও রৌপ্য মুদ্রা চলে আসতো, ভারতের বন্দরে। একসময় দক্ষিণ ভারতে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও যে রোমের মুদ্রা ব্যবহৃত হত তার কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে পণ্ডিচেরীর কাছে আরিকামেডুতে; ঐ এলাকায় খনন কার্য চালিয়ে স্যার মরটিমোর হুইলার একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দরের সন্ধান পেয়েছেন; শুধু তাই নয়, আরিকামেডুতে প্রচুর রোমক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক প্লিনির ধারণা প্রচুর রোমক মুদ্রা ভারতের বাজারে চলে আসার ফলেই রোমের ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব দেখা দেয়; এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই শেষ পর্যন্ত রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়; প্লিনি তাই উচ্চমূল্যে ভারতের বিলাসদ্রব্য কেনার জন্যে সেকালের অভিজাত সমাজকে দোষারোপ করেছেন; তাঁর ধারণা, রোমক রমণীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর ভারতীয় বণিকেরা রোমে প্রায় এক কোটি টাকা (সেস্টারসেস্) মূল্যের জিনিষ বিক্রয় করে অনুরূপ পরিমাণ সোনা ভারতে নিয়ে চলে যেতেন। অবশ্য প্লিনির এই বিশ্বাস কতটা সত্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। যাইহোক রোম সাম্রাজ্যের ধীরে ধীরে পতন ঘটলে পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাময়িকভাবে ভারতের নৌ বাণিজ্যও অনেকটা কমে আসে। তখন আরব ও পারস্যের বণিকেরা ভারতের বন্দর থেকে পণ্য সামগ্রী তুলে নিয়ে পৌঁছে দিতে থাকে ইউরোপের বন্দরে; সেকালে আলেকজান্দ্রিয়া, জেনোয়া, ভেনিস প্রভৃতি বন্দরেই ভারতের মাল খালাস করা হত। মার্কো পোলের ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই কথার স্বীকৃতি আছে।

মধ্যযুগের ইউরোপে ক্রমশঃ জীবন যাত্রার মান উন্নত হতে থাকলে সে দেশের বাজারে ভারতীয়

বিলাস দ্রব্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে ; সেই সঙ্গে ভারতের লোহা, চিনি, মস্‌লিন প্রভৃতি বস্তুও তাঁরা আমদানী করতে থাকেন ; পাশ্চাত্য জগত থেকে আমরা আনতে থাকি সোনা, কাঁচের বাসন, মদ, প্রবাল, টিন, তামা প্রভৃতি ; আরিকামাড়ুতে ইউরোপের কারখানায় তৈরী বেশ কিছু চীনামাটি ও কাঁচের পাত্র পাওয়া গেছে ; তুরস্ক সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তারে বাইজানটাইন সভ্যতার পতন হলে সাময়িক ভাবে ইতালীয়দের সঙ্গে আমাদের জলপথে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। ঠিক এই সময়েই ক্রিষ্টোফার কলম্বাস অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে পৌঁছাবার নতুন রাস্তা বার করবার চেষ্টা করেন। এই খোঁজাখুঁজির ফলেই আমেরিকা আবিষ্কার হয়। ভাস্কো-ডা-গামা আফরিকা ঘুরে ঠিক ঐ উদ্দেশ্যেই ভারতের বন্দরে এসে হাজির হন। কারণ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রতিযোগিতায় তখন মেতে উঠেছে ইউরোপের দেশগুলি। কিন্তু শুধু ইউরোপ বা আরব দেশগুলির সঙ্গেই নয় গুপ্ত যুগের আগেই (অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে) দক্ষিণ পূর্ব ভারতের সওদাগরেরা চীনের সঙ্গেও জলপথে সংযোগ স্থাপন করেন ; শুধু তাই নয়, পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সরাসরি নৌ বাণিজ্য যতই ব্যাহত হতে থাকে ততই আমাদের বণিকেরা চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠেন ; চীনের রাজদরবারে ভারতের গন্ধদ্রব্য, মশলা, মস্‌লিন, হীরে জহরত প্রভৃতির যে যথেষ্ট চাহিদা ছিল তা ফাহিয়েন ও হুয়েন সাঙের বিবরণ থেকেও জানা যায়। চীন থেকে আমরা আমদানী করতাম রেশম, চীনামাটির বাসন, ব্রোঞ্জের তৈরী তৈজসপত্র, আরও নানা টুকিটাকি জিনিস।

কোন কোন উৎসাহী গবেষক ভারতীয় নাবিকদের সঙ্গে উত্তর ইউরোপের জলচারী ভাইকিংদের তুলনা করেছেন। এই ভাইকিংরা ছিল দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ; তারাই প্রথম জলপথে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছায়। তবে নৌ বাণিজ্যে এদের কোন আগ্রহ ছিল না, তাই নৌ চালনায় দক্ষ ভারতীয় বণিকদের সঙ্গে এদের তুলনা করা সমীচীন নয়। এছাড়া জাহাজ নির্মাণের ব্যাপারে ভারতীয় যন্ত্রকুশলীরা এই ভাইকিংদের মত দক্ষ ছিল কিনা সেটাও বিতর্কের বিষয়। সুপণ্ডিত ব্যাশমের মতে, যে সব বাণিজ্যতরীতে সেকালে ভারতীয় পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হত তার অধিকাংশই ছিল বিদেশী। তিনি আরও বলেন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে যদিও এক হাজার যাত্রীবহনক্ষম বাণিজ্য পোতের বর্ণনা আছে, তবু এই বিবরণ কতটা বাস্তব তথ্য ভিত্তিক সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় দেখি যে রোমের বন্দরে তখন যে সব বড়ো বড়ো ভারতীয় জাহাজ এসে লাগতো সেগুলি ছিল তিন হাজার তৈলপাত্র (তাঁর ভাষায় আমফেরা) বহনের উপযোগী। অর্থাৎ একালের হিসাব মত প্রায় ৭৫ টন। পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন যে ভারতীয় জাহাজে চেপে সিংহল থেকে জাভা গিয়েছিলেন তাতে সর্বমোট যাত্রী ছিল দু'শ জন। তাঁর মতে, ভারতের বাণিজ্য তরণীর এটাই নাকি সবচেয়ে বেশি যাত্রীবহনের ক্ষমতা। অজন্তার গুহায় পঞ্চম ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারতীয় বাণিজ্য পোতের যে সব ছবি আছে তার থেকেও ঐ জাহাজের দৈর্ঘ্য বা আকার ঠিক কেমন ছিল তা' অনুমান করা কঠিন ; যেমন, দু'নম্বর গুহায় তিন মাস্তুল বিশিষ্ট যে জাহাজের ছবি দেখি তাতে মাত্র একজন নাবিককে বসে থাকতে দেখা যায়। জাভার বোরবুদুর মন্দিরেও ভারতীয় তরণীর অপূর্ব চিত্র খোদিত আছে ; তার থেকেও জাহাজের সঠিক আকার অনুমান

করা কঠিন। কারণ ঐ ফ্রিজের (ভাস্কর্যের) সব চেয়ে বড়ো জাহাজটির যাত্রী মাত্র পনেরো জন। শুধু তাই নয়, এই তরী-যূথ অনেকটা একালের পাল তোলা জেলে ডিঙির মত দেখতে। তাছাড়া তা'তে দাঁড় দেখা গেলেও কোন হাল নেই।

একটা বিষয়ে একালে প্রায় সকলেই একমত যে প্রাচীন ভারতে জাহাজ নির্মাণ কালে লোহার পাত্তি বা পেরেক ব্যবহার হত না; নারকেলের দড়ি দিয়েই বরং বাঁধা হত কাঠের পাটাতনগুলি। অনেকের অনুমান, জলের নীচে থাকা কাল্পনিক চুম্বক পাহাড়ের ভয়েই বর্জন করা হত লোহার পেরেক বা পাত্তি। দক্ষিণ আমেরিকার আদি বাসিন্দারাও অনুরূপ ভাবে বালসা কাঠের বড়ো বড়ো ভেলা ও জাহাজ বানাতেন। নোনা জলে কাঁচা লোহার পেরেকের থেকে নারকেলের দড়ি যে ঢের টেকসই এটা তারাও বুঝেছিলেন। 'কনটিকি' বইটিতে থর হেয়ারধাল এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

সেকালে ভারতের বণিকেরা কিভাবে দেশ বিদেশে পাড়ি দিতেন তার অনেক কাহিনী সমকালীন ভারতীয় সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন, একটি জাতকের গল্পে দেখা যায় যে সেকালের ভৃগুকচ্ছ বন্দর থেকে একটি ভারতীয় বাণিজ্যপোত 'বভেরু'তে পণ্য সম্ভার নিয়ে গিয়েছিল; ভারত তত্ত্ববিদ ব্যাশমের অনুমান যে এই বভেরু বন্দর আসলে প্রাচীন ব্যবিলন। সিংহলী কাব্য 'রাজাবলীর'তেও ভারতের বণিকদের বাণিজ্য অভিযান সম্পর্কে সত্য ও কল্পনা মিশ্রিত অনেক কাহিনী পাওয়া যায়। খৃষ্টীর প্রথম শতকে লেখা 'মিলিন্দ পঞ্‌হো' নামক পালি গ্রন্থে অনেক ভারতীয় বণিক যে বাণিজ্য সূত্রে চীন, জাভা, সুমাত্রা, ব্রহ্মদেশ এবং আলেকজান্দ্রিয়ার গিয়েছিলেন তাঁর স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে; খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে লেখা দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত' বইটিতেও এক সওদাগরের পুত্র যে কৃষ্ণ যবনদের দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল তার বিবরণ দেখি; অনেকের ধারণা, এই 'কৃষ্ণ যবনদের দ্বীপ' আসলে হয় আধুনিক জান্‌জিবার নয় ম্যালাগাসি রাজ্য। এছাড়া, আমাদের মঙ্গলকাব্যে ধনপতি সওদাগর কিভাবে সিংহলে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন তার বিবরণ তো আমরা অনেকেই পড়েছি।

পরিশেষে, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্য পথ সম্পর্কে দু'এক কথা বলা প্রয়োজন। সেকালে ভারতের প্রধান বন্দর ছিল ভ্রিগুচ্ছক বা ভৃগুচ্ছক, সুপারা, পাটল, চম্পা, তাম্রলিপ্তী, মুশিরি, কোরকাই আর কাবেরী পত্তনম্। এর মধ্যে প্রথম তিনটি বন্দর অবস্থিত ছিল ভারতের পশ্চিম উপকূলে; চম্পা আর তাম্রলিপ্তী ছিল পূর্ব ভারতের দুই প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র; আর শেষোক্ত তিনটি বন্দর থেকে দক্ষিণ ভারতের নৌ বাণিজ্য পরিচালিত হত। ভৃগুকচ্ছ বন্দরটি অবস্থিত ছিল নর্মদার মোহনায়, সুপারা ছিল বোম্বাই-এর কাছে আর পাটল সিন্ধুনদের অববাহিকায়। এই তিনটি বন্দর থেকে সুদূর রোম, সিংহল, ব্যাবিলন প্রভৃতি দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেন ভারতের সওদাগরেরা। ভারতের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গানদীর মোহনায় ছিল চম্পা নামে বন্দরটি; সেখান থেকে পণ্য সম্ভার গিয়ে পৌছাতো সুমাত্রা, জাভা ও ব্রহ্মদেশে। মৌর্য যুগে (অর্থাৎ তৃতীয় খৃষ্ট পূর্বাব্দে) আর্য সভ্যতা ক্রমশঃ ভারতের পূর্বপ্রান্তে বিস্তার লাভ করলে গঙ্গার অববাহিকায় তাম্রলিপ্তী (আধুনিক তমলুক) নামে আর একটি বন্দর গড়ে ওঠে; এই বন্দরের সমৃদ্ধির ফলে চম্পার গুরুত্ব অনেকটা হ্রাস পায়। এই তাম্রলিপ্তী থেকেই আচার্য বোধিধর্ম চীন যাত্রা করেছিলেন; এই তাম্রলিপ্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়

হুয়েন সাঙের রচনাতেও। সারা পূর্ব ভারতের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এই বন্দরটি। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে রোম শাসিত মিশরের নাবিকেরা যে ভারতের এই সমস্ত বন্দর সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ খবর রাখতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সমসাময়িক কালে রচিত একটি গ্রীক গ্রন্থে; বইটির নাম—'দি পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সী' (The Periplus of the Erythrean Sea)। এই পেরিপ্লাসে, টলেমির লেখা 'ভূগোলে' আর প্রাচীন তামিল কবির লেখা 'এণ্ডুতোগাই' কাব্যে দক্ষিণ ভারতের নৌ-বাণিজ্যেরও কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রধান বন্দর ছিল 'মুশিরি' বা 'মুশ্' (পেরিপ্লাসে একে বলা হয়েছে Musiris); এই 'মুশিরি' অবস্থিত ছিল চের রাজ্যে (একালের কেরালায়)। এছাড়া কোরকাই (একালের তুতিকোরিণ) ও কাবেরী পত্তনম্ বন্দর অবস্থিত ছিল যথাক্রমে পাণ্ড্য ও চোল রাজ্যে। চোল নরপতিরা যে বন্দরের সংস্কার ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখতেন তার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়; রাজা করি কালন কাবেরী নদীর মোহনায় সিংহলী যুদ্ধ বন্দীদের দিয়ে কাবেরী পত্তনম্ বন্দরটি তৈরী করিয়েছিলেন; এই কৃত্রিম বন্দরের প্রবেশ মুখে ছিল একটি সুউচ্চ বাতি স্তম্ভ। কাবেরী পত্তনম্ এর জেঠিতে যবনদের বড়ো বড়ো জাহাজ থেকেও মাল খালাস করা হত। বন্দর কর্মীরা বিদেশ থেকে আমদানী করা পণ্যের শুল্ক নির্দ্ধারণ করে' তার ওপর রাজকীয় সীলমোহর লাগিয়ে দিতেন; তারপর সেই সব দ্রব্য জমা করা হত শুল্কাধীন পণ্যাগারে। এখন এই কাবেরী পত্তনম্ একটি গণ্ডগ্রাম; সেখানে বেশ কয়েক ঘর জেলের বাস, তবু প্রাচীন ঐতিহ্যের বেশ কিছু নিদর্শন আসেপাশে ছড়িয়ে আছে। এরপর অতীতের নাবিকেরা কোন কোন জলপথ ব্যবহার করতেন তা বলি। অতীতে আমাদের অধিকাংশ বাণিজ্যপোত যাতায়াত করতো ভারতের উপকূল ধরে। তবে আফরিকায় পাড়ি দেবার কালে ভারত মহাসাগরের অনুকূল সমুদ্র-স্রোতের সন্ধান করতে হত ভারতীয় নাবিকদের; বিভিন্ন সমুদ্র স্রোতের গতিপথ সম্পর্কে প্রাচীন ভাইকিংদের মতই তাঁরা ছিলেন সচেতন; আর দিক নির্ণয়ের জন্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে দেখতেন ভারতীয় সওদাগরেরা। আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবার সময় লোহিত সাগরে অনুকূল বাণিজ্য বায়ুর সুযোগ নিত ভারতীয় বাণিজ্য তরীগুলি। ৪৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে হিপ্পলাস মৌসুমী বায়ুর গতিপথ আবিষ্কার করলে ভারতীয় বণিকদের নৌ যাত্রা আরও সহজ ও ব্যাপক হয়ে ওঠে।

রাজা ও তপতী নাটকে সঙ্গীত যোজনার নাটকীয় তাৎপর্য

বিমলভূষণ চট্টোপাধ্যায়

কথা যেখানে শেষ গানের শুরু সেখান থেকে। অন্তরের আবেগোচ্ছ্বাসকে প্রকাশ করতে কথা যেখানে পঙ্গু হয়ে পড়ে, উপলব্ধির নিবিড়তার ভার যখন কথার পক্ষে বহন করা আর কোনোমতেই সম্ভব হয় না তখনই তা রূপ পায় সুরে। ভারতীয় ঋষি বলেছেন ;—'শব্দ ব্রহ্ম'—সৃষ্টির আদিমতম রহস্য সঙ্গীতে বিধৃত। কথা, ছন্দ, বাস্তবতার আলেখ্য কোন কিছুকে আশ্রয় না করে সুরের বিচিত্র বিস্তার আত্মার গভীরে যে অব্যক্ত আনন্দের শিহরণ তোলে তা বিশ্বচিত্ততার নিঃসীম অবকাশের ব্যাপ্তিতে অনধিগম্য। তাই বলা হয়েছে—'Every form of art aspires to the condition of music. নাটকে শিল্প-মূল্যের দিক থেকে সঙ্গীত যোজনা করা হয় এবং তার প্রয়োজন বহুমুখীন। প্রথমতঃ সংলাপ যেখানে নাটকীয় চরিত্র এবং সংঘাত পরিস্ফুটনে পঙ্গু হয়ে পড়ে নাট্যকার সঙ্গীত যোজনা করেন নাটকের ভাবরূপকে গভীর এবং গতিসঞ্চারী করবার জন্য। দ্বিতীয়তঃ নাটকের একঘেয়েমীর মধ্যে, রুদ্ধশ্বাস তীব্র গতির মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য এবং আত্মস্থ হওয়ার অবকাশ সৃষ্টির জন্য সঙ্গীত যোজনা করেন। এইটে হল অলঙ্করণের দিক। কিন্তু অলঙ্করণ কখনও অলঙ্কৃতকে ছাপিয়ে যাবে না। নাট্যবস্তুর অপরিহার্য অঙ্গরূপেই অলঙ্করণ স্থান পাবে। তৃতীয়তঃ নাটকে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্যেও প্রয়োজন হয় সঙ্গীতের। বাস্তব মানুষ অনেক সময় স্বীয় চিন্তা, কর্ম ও পরিবেশকে লক্ষ্য করে অজ্ঞাতেই গান গেয়ে ওঠে। নাটকে সেই পরিবেশের অনুরূপ চিন্তা ও কর্মে বাস্তবতার স্পর্শ আনবার জন্য প্রয়োজন হয় সঙ্গীত সংযোজনার।

মোটামুটি ভাবে উপযুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্র নাটকের সঙ্গীত সংযোজনা বুঝে নিতে হবে। কারণ রবীন্দ্র নাটকের গানগুলোর একক ভাবে মূল্য যেমন অসামান্য, তেমনই নাটকীয় বিরোধের আবর্তে, ভাবানুভূতির দ্বন্দ্ব মূহূর্তে তরঙ্গশীর্ষ কিরীটের জ্যোতিমালার সুষম সঙ্গতিতে তাদের বৃহত্তর দ্যোতনা আছে। নাটকের উপজীব্য ভাববস্তু অনুযায়ী আবেগোচ্ছ্বাস কখনও বীর্যবত্তায়, কখনও বা প্রেমের স্নিগ্ধতায়, কখনও বা মুক্তির এষণায়, কখনও বা মুক্তির লীলারস আস্বাদনের তন্ময়তায়, কখনও বা অতীন্দ্রিয় চেতনায় তথা আত্মিক উপলব্ধির অবকাশের কমনীয়তায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে তাদের সূক্ষ্মতম এবং নিবিড়তম মুহূর্তগুলো নাটকের সঙ্গীতাংশে বিধৃত হয়েছে। সঙ্গীতগুলো নাটকের ভাববস্তুর সঙ্গে চরিত্রের প্যাটার্নের সঙ্গে গভীর ভাবে অন্বিত। এই হল রবীন্দ্র-নাটকে সংযোজিত সঙ্গীত সম্পর্কে সাধারণ সত্য। আমরা এইবার 'রাজা' ও 'তপতী' নাটকের সঙ্গীত সংযোজনার নাটকীয় তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে উক্ত বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করব।

রাজা—আমরা বলে এসেছি যে, কথায় যখন আশ মেটে না, স্বরের বাচনিক ওঠানামা বা স্বরগ্রামের চড়াই উৎরাই স্থান বিশেষে, শব্দ বিশেষে জোর দিয়ে কথা বলে ওঠে, নাটকের অন্যান্য আঙ্গিক, আক্ষেপ-বিক্ষেপ, হাসি-অশ্রুবর্ষণ ইত্যাদি দিয়ে ভাবের গভীরতা, প্রাণের কথাটি আর বলা হয়ে ওঠে না, তখন আশ্রয় নিই গানে। যুদ্ধের রক্তোন্মাদনার জন্য যেমন সঙ্গীত রচিত হয়েছে সত্বাকে

রক্তস্নানে উৎসাহিত করার জন্য, হননেচ্ছাকে তীব্রতর করবার জন্য, তেমনই আবার গভীরতম আত্মিক উপলব্ধির নিবিড়তাকে আস্বাদন করবার জন্য মুক্তির অবকাশ রচিত হয়েছে গানে।

রাজা নাটকটি এমনই একটি সঙ্গীতময় কাব্যসুষমামণ্ডিত দার্শনিকতার রূপকারকতা। প্রথম দৃষ্টিতেই দেখি গানের পথ বেয়ে রাজা আসছেন আর রূপাতীত দেয়ালীর আলো জ্বলছে যাদের বুকে, সেই বাস্তব জগতের ঘন অমারাত্রিকে অতিক্রম করে যিনি কোটি কোটি তারার আলোর মালা গাঁথেন আকাশে তার কাঁপন লেগেছে যাদের হৃদয়ে তারাই গেয়ে উঠেছে গান। গাইছে সুরঙ্গমা, ঠাকুর্দাদা, শম্ভু, সুধন, বাউল, ক্ষ্যাপা আর যাদের বুকে লেগেছে সুরের ছোঁয়া। রাণী রূপ খুঁজলেন, চোখের দেখাতে হৃদয়ের মাধুর্য, গভীরতা যাচাই করতে গিয়ে বয়ে আনলেন শাস্তি, আর অপর হৃদয়ের যদি কোনও পরিচয় পেয়ে থাকেন তবে তা হল কুশ্রিতা। রাণী চেয়েছিলেন এমন রাজার রাজত্বে না মিশে, রাজাতে যে বিচিত্র আনন্দস্রোত তাতে নিজেকে অভিষিক্ত না করে, নিজের একাকিত্বের দম্ভে, রূপের অভিমানে রাজাকে একার করে পেতে—স্থূল ইন্দ্রিয়সুখকর ক্ষেত্রে রাজাকে নিয়ে ঘর বাঁধতে। এই তামসিকতা যেদিন চোখের জলে ধুয়েমুছে গেল সেদিন রাণী সুদর্শনার কণ্ঠে মূর্ছিত হল সঙ্গীত ;—'অতল অন্ধকারে' ডুবিয়ে দেওয়ার আকুতি ধ্বনিত হল গানে।

এই নাটকে গান গাইছে না কারা ? গাইছে না হিসেব-নিকেশ করবার দলে যারা,—যারা স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্ত বস্তুসম্পৃক্ত। এই রাজ্যে যারা বিদেশী, যারা সাধারণ গান গাইছে না তারা। ভাবের বন্যায় অন্তরাত্মা হি হি করে না কাঁপলে সে আবার রাজার যুগ্যি না কি ? তার গলায় গান আসবে কোথা থেকে ? আর গান গাইছে না রাজন্যবর্গ, যারা দখল, ক্ষমতাবিস্তার, স্থূল ভোগবিলাসের জন্য অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা শুনিয়ে এসেছেন চিরকাল, অন্ধ দম্ভের উপরে তাদের প্রাসাদ গড়েছেন। তাদের সবই আছে—নেই শুধু গান।

নাটকীয়তার দিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে তা হল খণ্ডরূপের সঙ্গে রূপাতীত অরূপের সংঘাত। রূপ ধারণার বস্তু অরূপ ধ্যানের সামগ্রী। রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লোকের উপাদান, অরূপ ইন্দ্রিয়াতীত ইন্দ্রলোক, রূপ প্রেক্ষণার অতৃপ্তি, অরূপ প্রৈতির প্রশান্তি। সংঘাত এদের মধ্যে চিরন্তন—কালপ্রসারী। 'রাজা' নাটকটি এই সংঘাতের ভিত্তিতে রচিত। তাই দেখি সংঘাত বেধেছে গানের সঙ্গে অভিমানের, সুরের সাথে অহঙ্কারের, ঝঙ্কারের সাথে হুঙ্কারের। জয় হয়েছে কার ? জয়ী হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই গান, সুর, ঝঙ্কার। কারণ প্রতিটি মানুষের চিত্তে আছে বিশ্বচিত্ততার ব্যঞ্জনা, খণ্ড রূপের মধ্যে অরূপের ছোঁয়া, গূঢ় প্রবর্তনা। রূপ ছাড়াতে চাইছে তার সীমা। তার এই আকুতি, প্রৈতি জয়যুক্ত হবেই—নইলে থেমে যাবে প্রাণের গতি—জীবনের এষণা। এই প্রতিপাদ্য তত্ত্বের মূল ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন কবি গানের ভিতর দিয়ে—নাটকীয় সংঘাতের পথে। লক্ষ্য করতে হবে, এই নাটকে রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার, কল্পনার খেয়ার কাজ করেছে তাঁর গীতিময় গদ্য—কবি-ব্যক্তিত্বের স্পর্শপাতে গদ্য কাব্যের স্তরে উন্নীত হয়েছে ; তৎসত্ত্বেও, কবি, রাজার দলে যারা তাদের আরও মুক্ত, আরও লঘুপক্ষ করে দেওয়ার জন্য তাদের কণ্ঠে সঙ্গীত-মূর্ছনা আরোপ না করে পারেন নি—অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় চেতনার সূক্ষ্মভাবের স্তরে রূপ পরিগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে নাটকের চরিত্র এবং ঘটনা সংঘাতের ভিতরে যে ভাবে কবি উপযুক্ত ভাবরূপকে বিধৃত করেছেন তারও সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। এই আলোচনাতে দেখা যাবে যে সঙ্গীত যোজনা নাট্যিক তাৎপর্যের দিক থেকে অপরিহার্য।

রাণীর নাম সুদর্শনা, তিনি আপন সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন তাই রাজার চাক্ষুষ দর্শনপ্রার্থিনী। সখী সুরঙ্গমা। 'রঙ্গ' এক অর্থে বর্ণ আরেক অর্থে লীলা। দুই অর্থেই তিনি সার্থকনামা। ঠাকুর্দাদা রূপাতীতের বার্তাবাহী,—চিরপুরাতন সৃষ্টির উষাকালে আলো-আঁধারের লীলাচাঞ্চল্য তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত। আর রাজা শুধু নামটিতেই সকলের চিত্তের অধিপতি, সকলের তীর্থক্ষেত্র,—সার্থকতার ত্রিবেণীসঙ্গম। অন্যদিকে যারা অন্য রাজ্যের লোক অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ পৃথিবীর লোক তাদের কাছে রাজার একটি বিশেষ অত্যাচার, অন্যায় জুলুমের উৎকট সংমিশ্রণে তৈরী ভয়াবহ চেহারাও আছে। যে রাজাকে দেখলে অন্তরাত্মা ভয়ে বাঁশপাতার মতো হি হি করে কেঁপে ওঠে। 'বেটার শির লে আও' না বলা পর্যন্ত তার উপকরণ সমৃদ্ধ অবস্থানকে যেন জানাই যায় না। কবি আধুনিক রাজাদের (আসল এবং মেকি রূপ) সম্পর্কে কতবড় সত্যকথা বলেছেন সেইটা সহজেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে সন্দেহ থাকে না কবির মহত্তম উপলব্ধির অলোকসামান্য সার্বজনীন শাশ্বতকৃতি সম্পর্কে। এইখানে আছে সুবর্ণ বর্ণাঢ্যতার চোরা কারবারী। আর এমন কাব্যলোকে বিদেশীদের নাম কাঞ্চীরাজ অবন্তীরাজ, কোশলরাজ! পৃথিবীর অধীশ্বর রাজারা এমনই কাঞ্চী, কোশল, অবন্তীর সঙ্গে মিলে পরস্পরের যোগসাজসে লুণ্ঠন করেছে জাগতিক সম্পদ, ঐশ্বর্য বর্ণাঢ্যতার চকমকি গায়ে এঁটে, সত্যরূপের নকল ছাপ গায়ে এটে। সুবর্ণকে সামনে রেখে দর্শনেন্দ্রিয় সুদর্শনাকে জয় করতে চেয়েছে সুকৌশলে। কিন্তু যখনই দর্শনপিপাসা রূপকে ছাড়িয়ে অরূপের গভীর আস্বাদ পেয়েছে তখনই ঝড় এসেছে। এদের কথা রূপকথা, কথার গায়ে রূপসজ্জা জুড়ে ক্ষণিক আনন্দের, জয়ের তাসের ঘর বানিয়ে যখন সত্যকে হনন করতে উদ্যত হয়েছে তখনই হারিয়ে গিয়েছে হাজারলোকের মিছিলে।

এইদিক থেকেও গানগুলোর তাৎপর্য অসাধারণ। কারণ একই সঙ্গীতহীন বাস্তব যখন গীতিময় অসামান্য অরূপকে আহ্বান করে শক্তি পরীক্ষায়—বারেবারেই তা করেছে, তখনই দেখা গেছে সুরের ঢেউ এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সুরহীনতার অন্ধকার গহ্বময় খুপরীগুলোকে। চরম দুঃখের মূল্যে মানুষ হয়েছে দুঃখাতীত; খুঁজে পেয়েছে আপন সত্তার সত্য স্বরূপকে, সৌন্দর্য, আনন্দকে। এই মূলভাবের অনুসারিতায় 'রাজা' নাটকের গানগুলো পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত হয়ে নাটকীয়তাকে অভিব্যক্ত করেছে। নাটকীয় সংঘাতের মূল উপজীব্যতাকে অটুট রেখেও স্থূলতাকে পরিহার করবার অবকাশ রচিত হয়েছে সঙ্গীতে। ফলে সঙ্গীত নাট্যছন্দের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে সংযুক্ত হয়ে কাব্যিক ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

'তপতী' নাটকটির গানগুলোও বিচার করলে দেখা যাবে নাটকের মূলতত্ত্ব সঙ্গীতের তাল, লয়, ছন্দ ও সুর ব্যঞ্জনায় পথবাহী হয়ে সমগ্র নাটকের নাটকীয়তাকে অভিব্যক্ত করেছে। দেব আবাহনের মন্ত্রোচ্চারণের মতো নাটকের সমগ্রতাকে আহ্বান জানানো হয়েছে নাটকের প্রারম্ভ সঙ্গীতে। প্রেমের যে মহান সার্থকতা ত্যাগে রুদ্রভৈরবকে তার মূর্ত প্রতীকরূপে নাটকের প্রারম্ভিকতায় সঙ্গীত নৈবেদ্য অর্চনা করা হয়েছে। যে মহান প্রেমের স্পর্শপাতে মৃত্যুকে অতিক্রম করবার অবিচলতা

আসে, শক্তির প্রচণ্ডতাকে যিনি, 'নিবাতনিষ্কম্প দীপশিখেব রাত্রৌ' স্বরূপ আত্মস্থ করেছেন আপন সত্তায় তাঁর উদ্বোধনী মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে প্রথম সঙ্গীতে। সঙ্গীত ছাড়া শুধু কথায় সাধ্য ছিল না এই আবেগঘন মানসিকতাকে উন্মোচন করবার। শক্তি ও বীর্যবত্তার ঐ সমাধিস্থতাকে নিঃসীম স্পর্দ্ধায় যে আলোড়িত করতে গিয়েছিল, শক্তি ও ভোগের পথে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছেন রাজা বিক্রম মীনকেতুর স্তব সঙ্গীতে। জীবনে ভোগের উজ্জ্বলতা ছাড়া ত্যাগের স্থৈর্য আসা-সম্ভব নয়। ভৈরব যদি মীনকেতুকে ভস্ম করে থাকেন, তবে ভস্ম করবার প্রয়োজনীয় মুহূর্ত সৃষ্টির অমোঘ ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েই তা করেছেন। মীনকেতু ভস্মীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রচনা করেছে ভৈরবের ত্যাগমহান চিত্র। কাজেই মদন ভস্ম এবং ভৈরবের নিরাসক্তরূপ পারস্পরিক নির্ভরশীল। তাই জীবনে তার উদ্বোধনও পরম সত্য।

'তপতী' নাটকের এই মূলতত্ত্বটি গানের ভিতর দিয়ে ঘটনা সংঘাতের সূত্র ধরে অভিব্যক্ত হয়েছে—নাটকীয়তাকে মেলে ধরেছে। প্রথম দৃশ্যের বিক্রমের গানের আরোহণ অবরোহণকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়েছে বিপাশার গান। প্রাণোজ্জ্বলতার যে ব্যঞ্জনা এবং দোতনা জীবনে পরিপূর্ণতা আনে, বাস্তবতার মধ্যে থেকেও খণ্ড বিচ্ছিন্নতাকে মিলিয়ে জীবনের পরিপূর্ণ পরম প্রকাশকে অখণ্ডতার পথবাহী করে তোলে, বিপাশার সঙ্গীতাংশে সুমিত্রা-বিক্রমের সঙ্গীতের পরিপূরক হিসেবে জীবনসত্যের সেই অংশকে মেলে ধরেছে। একক হিসেবে জীবনের বাস্তবানুভূতিতে সমুজ্জ্বল নরেশ-বিপাশার জীবনের স্নিগ্ধতা যেমন নাটকের নাটকীয়তাকে কেন্দ্রায়িত করেছে তেমনই বিপাশার গান এই গতির অনুস্যুতিতে লোক-জীবনের প্রাণসত্ত্বাকে আবেগোজ্জ্বল মুহূর্তে কখনও প্রেমানুভূতির তীব্রতায় কখনও বীরপূজার আহ্বান মন্ত্রে, কখনও সুপ্ত আত্মশক্তির উদ্বোধনে সুরে, ছন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

মোটামুটিভাবে এই নাটকটির মূলমন্ত্রটি সঙ্গীত বিধৃত বললে অত্যুক্তি করা হবে না। ভাবঘন তীব্রতার মুহূর্তে যেমন সঙ্গীত উৎসারিত হয়, তেমনই জীবনবোধের ভাবঘন নিবিড়তার সূক্ষ্ম অথচ তীব্র আবেগ থেকে উৎসারিত হয়েছে নাটকের সমগ্রতা এবং নাটকীয়তা। 'তপতী'র গানগুলো ঐ সমগ্রতাকে ধরে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকের দুইটি দিক আছে, একটি তত্ত্বঘটিত অপরটি নাটকীয় বাস্তবতার দিক। কবি পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবকে হরগৌরীর মতো যুগনদ্ধ করে প্রকাশ করেছেন এবং এর আলম্বন হ'ল সঙ্গীত। এইখানে রবীন্দ্রনাটকে সঙ্গীত যোজনার সার্থকতা। যদি দুঃসাহস না হয় তবে বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের গানগুলোকে পরপর সাজিয়ে সামনে ধরলেই নাটকের সংঘাত এবং উত্তরণ অনুভব করা যায়—মূল বক্তব্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।

বঙ্কিম সাহিত্যের বর্ণানুক্রমিক আলোচনা

অশোক কুণ্ডু

হস্তিনায় প্রথম দিবস (কৃঃ চঃ ৫/৬) ॥

কৃষ্ণের আগমন সংবাদ পেয়ে ধৃতরাষ্ট্র রাজসভায় আড়ম্বর করার জন্যে ব্যস্ত হলেন। বিদুর বললেন যে তার তেমন প্রয়োজন নাই, বরং কৃষ্ণের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় সেই চেষ্টা করুন। দুর্যোধন কিন্তু কৃষ্ণকে বন্ধনের পরিকল্পনা করলেন। যাইহোক কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় দর্শন দিয়েই তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দরিদ্র বিদুরের গৃহে আশ্রয় নিলেন। সেখানে কুন্তী ছিলেন। কুন্তীকে বিদুরের গৃহে রেখে পঞ্চপাণ্ডব বনগমন করেছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে পঞ্চপাণ্ডব সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। তারপর পুনরায় তিনি এলেন ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায়। দুর্যোধন তাঁকে অন্নগ্রহণ করতে বললে তিনি অস্বীকার করলেন। বিদুরের গৃহে সামান্য আহার্য দ্বারাই তিনি আতিথ্য স্বীকার করলেন। সেই সময় তিনি যে সমস্ত রাজনীতির কথা বলেন তা যথার্থ রাজনীতিবিদদের গ্রহণযোগ্য।

হিন্দু কি জড়োপাসক ? (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম) ॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০।

হিন্দুরা মূর্তিপূজা করে বলে অনেকে হিন্দুদের জড়োপাসক বলে থাকে। কিন্তু হিন্দুরা যে সমস্ত শক্তির উপাসনা করে থাকে, তাকে সে চেতনপদার্থ বলেই জানে। জড় বস্তু হিন্দুদের কাছে মৃতের ন্যায় অস্পৃশ্য।

হিন্দুধর্ম (দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম) ॥ প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ১ম বর্ষ, পৃ. ১৫-২৩।

বঙ্কিমের সমকালে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রচেষ্টা চলে। তখন কেউ কেউ হিন্দুধর্মের আচার-আচরণগুলির উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করায় প্রয়াসী হয়েছেন। অবশ্য সেকাজ যে খুব সহজসাধ্য নয়, তাও তিনি স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি।

হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা (দেবঃ ও হিন্দুঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

এখানে ঈশ্বরতত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। বেদে বিভিন্ন দেবতার কথা আছে। পরবর্তীকালে দেবতাদের সঙ্গে শক্তিমান ঈশ্বরকে একীভূত করা হয়। উপনিষদে সমস্ত দেবতাকে ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন করে দেওয়া হয়েছে। আনন্দময় ব্রহ্মই সেখানে উপাস্য দেবতারূপে বিরাজমান। কিন্তু বঙ্কিমের মতে এখানেই হিন্দুধর্মের চরম উৎকর্ষ ঘটেনি। গীতার উক্তির মধ্যেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই (দেবঃ ও হিন্দুঃ) ॥

প্রঃ প্রকাশ—প্রচার, ২য় বর্ষ, পৃ. ২৭৪-২৭৮।

বঙ্কিমচন্দ্রের এখানে সিদ্ধান্ত এই যে—'ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধিপূর্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।'

হেমন্ত বর্ণনাছলে স্ত্রীর সহিত পতির কথোপকথন (বাল্যরচনা—পুঃ অপ্রঃ) ॥

প্রঃ ছত্র—'রাথ রাথ প্রিয়ে, | বসনে ঢাকিয়ে, | জলদ চাঁচর চয়।' প্রঃ প্রকাশ—সংবাদ প্রভাকর, ১০ জানুয়ারী, ১৮৫৩।

লঘু ত্রিপদী ছন্দে রচিত কবিতাটিতে, পতি স্ত্রীর প্রশংসা করে হেমন্তের প্রকৃতির পরিবর্তনের এক একটি কারণ জিজ্ঞাসা করছে এবং স্বামী স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর রূপ ও গুণের প্রশংসায় মত্ত। বর্ণনায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি কোথাও কোথাও অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। এটি হুগলি কলেজের ছাত্রাবস্থার রচনা।

রুচিবিকার—উৎসবে

একটি জাতির পরিচয় তার উৎসবের মধ্য দিয়ে যেমন ধরা পড়ে এমন আর কিছুতে নয়। কিন্তু আমাদের অর্থাৎ বাঙালীদের উৎসবের যে চিত্র আজ প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে রুচির প্রকাশ কতটা দেখা যায়?

আগের দিনে উৎসব সজ্জার সূচনা থেকেই একটা স্নিগ্ধ পরিশীলিত পরিমণ্ডল গড়ে উঠতো, যা থেকে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যেত। বাড়িতে ঢোকার মুখেই নহবত। ধনী-গৃহে পাকা নহবতখানা থাকা রেওয়াজ ছিল, সাধারণ ঘরে সাময়িক বাঁধা মঞ্চের ব্যবস্থা করা হতো, স্থানাভাবে প্রবেশপথের ধারে—যেখান থেকে উৎসবোপযোগী সুরলহরী প্রকাশিত। দরজায় সুন্দর আলপনা ফুলের তোড়া বা রিং বা মালায় সাজানো, বসার ঘরে সুদৃশ্য ফরাস, তার ওপর তাকিয়া, ক্ষেত্রবিশেষে পারস্য গালিচার ওপর কিংখাবের তাকিয়া, গড়গড়া আলবোলা সুগন্ধী অম্বরী তামাক, স্বাগতম লেখা না থাকলেও আমন্ত্রিত ব্যক্তি স্বাগত অনুভব করতো। আর এখন ডেকরেটারের কেঠো চেয়ার, যা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। নহবতের জায়গায় কর্কশধ্বনিসৃষ্টিকারী মাইক, যার থেকে নির্গলিত সুর ঝঙ্কার হৃদরোগ সৃষ্টি না করলেই বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

একদা কবি অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন—

কি যাদু বাংলা গানে
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
গেয়ে গান নাচে বাউল
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

তিনি কিন্তু ভদ্র বাঙালীর গানের কথা বলেন নি। তা না বলুন, তাঁর যুগের ভদ্র বাঙালীরা যে গান গাইতেন তার একটা দাম ছিল যার উল্লেখ করেই কবি বলেছিলেন,

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনলো মালা জগৎ জিনে
তোমার চরণতীর্থে মাগো
জগৎ করে যাওয়া আসা।

আবার অন্যত্র আছে—

জগৎ কবি সভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালী আজ গানের রাজা বাঙালী নয় খর্ব।

কিন্তু হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল! তাই আজ বাঙলাদেশের বাঙলা গানের জায়গা

নেই। (বাঙালীর কিইবা আছে　অবশ্য অধুনা বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রীয় সত্তাকে বোধ হয় এ থেকে বাদ দেওয়াই সমীচীন কারণ তার বাঙালীয়ানার গর্ব যথেষ্টই আছে।) আজকের চাষা হালের গায়ে ট্র্যানজিস্টার ঝুলিয়ে বিবিধ ভারতী বা রেডিও শিলং (ওটা সিলোনের অপভ্রংশ মাত্র) শোনে।

এহেন অবস্থায় আমাদের উৎসবে যে 'ববিতা মাই ডার্লিং' 'কি হরে রাম হরে কৃষ্ণ' বাজবে এতে আর বিস্ময়ের কি আছে? যদি কারো বাঙলার ওপর একটু সুনজর থাকে তো রবীন্দ্রনাথের দু' একখানা গান শোনা যেতেও পারে (তবে বিয়ে বাড়িতে যদি, 'আমি জেনেশুনে বিষ করেছি পান' শোনেন অবাক হবেন না, গানবাজনার সময় আমাদের যত্ব-ণত্ব লোপ পায়। বিশ্বাস করুন আমি এক বিয়ে বাড়িতে 'হরি দিন যে গেল সন্ধ্যা হল পার কর আমারে' শুনেছি!) আর নয়তো 'যাব কি যাব না' জাতের হিন্দী গানের বঙ্গানুসরণ শোনা যাবে।

যে গৃহে অনুষ্ঠান সেখানকার গৃহকর্তা থেকে আমন্ত্রিত সবাই প্রায় সার্ট-প্যাণ্ট পরে থাকেন, কারণ তাতে নাকি অনেক সুবিধা। আমাদের এই গরম দেশে ও পোষাকে সুবিধা হয় এমন কথা আমি মানতে রাজী নই। কাজের সময় ও পোষাকে কিছুটা সুবিধা হয়, বিশেষ করে যেখানে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয় কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে কেন তার জের টানবো? তাছাড়া যাদের অনুকরণে আমরা অফিস থেকে বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি সর্বত্র একই পোষাক পরি তারা কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিন্ন পোষাক পরে। ড্রেস স্যুট নিদেন পক্ষে লাউঞ্জস্যুট, বো-টাই, মানানসই জুতো ছাড়া ইউরোপীয়দের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। এশিয়ার যারা সবচেয়ে কেজো লোক সেই জাপানীরা আমাদের মতই ইউরোপীয় পোষাককে কাজের পোষাক করেছে, ঘরের পোষাক করেনি। সদ্যস্বাধীন আফ্রিকার দেশগুলির কিছু ছাত্রকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল, দেখতাম এমনিতে তাদের পোষাক পুরোপরি ইউরোপীয় প্যাটার্ণের কিন্তু কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে এলেই নিজেদের ঝোব্বাঝাব্বা লাগিয়ে আসতো। অর্থাৎ নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতো। একমাত্র আমাদের মেয়েদের মধ্যেই পোষাককে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি আনুগত্য দেখা যেত চিরাচরিত শাড়ী-ব্যবহারে কিন্তু ইদানীং লুঙ্গী, ম্যাক্সি প্রভৃতির দৌরাত্ম্যে সে আনুগত্যেও চিড় খেতে আরম্ভ করেছে।

আনুষ্ঠানিক আহারাদির ক্ষেত্রে এখনো পুরোপুরি রুচিবিকার দেখা যায় নি, কিন্তু রুচিবিকারের সূচনা দেখা যাচ্ছে। তবে এঁদের পক্ষে বলার কথা কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে কাকের মাংস আর মদ খাওয়াওতো এদেশীয় রুচির মধ্যে পড়ে, তা ততদূর পৌঁছে তাকে অতিক্রম করলে তবেতো রুচিবিকারের প্রশ্ন উঠবে?

একথার জবাব যখন দেওয়ার রাস্তা নেই তখন পাঠক সাধারণের ওপর বিচারের ভার ছেড়ে দিচ্ছি।

রবি মিত্র

স্বদেশীয় ভারত-বিদ্যাপথিক। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী ১৫ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত অসিচালনায় সপটু কিনা জানি না কিন্তু পাঁচজন মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী সুসন্তানদের মত কর্মজীবনে ছিলেন সরকারী কর্মচারী। তিনি জীবিকার জন্ম সরকারী কাজের পাওনা বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু জীবন নিয়ে দীনগত পাপক্ষয় করেন নি। প্রাচীন ভারত তাঁকে হাতছানি দিয়েছিল এবং সে ডাক তিনি প্রাণ দিয়ে শুনেছিলেন। তাঁর মন চলেগিয়েছিল অদূর ও সুদূর অতীতে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতিতে, প্রয়াসে, মনে হয়েছিল কোথায় সেই ভারতপথ-পথিকরা কোথায় সেই বিদেশী ও স্বদেশী ভারত-বিদ্যা রথী মহারথীরা যারা পাথুরে প্রমাণ খুঁজে, বিলুপ্ত ভাষার পাঠোদ্ধার করে শিলা-লেখ, অনুশাসন পড়ে পুরাতনী স্মৃতিকে নবীন করে তুলেছেন, প্রাচীনের পঙ্কোদ্ধার করেছেন। তাঁদের কথাই গৌরাঙ্গবাবুর মনে লেগেছে এঁরাও জ্ঞানতপস্বী—সৃষ্টিশীল মনস্বীর দল এও এক ধরণের বিদগ্ধ মননের বিলাস। এরই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা পেয়েছি পর পর তিনখানি বই। আলোচ্য পুস্তকটি তারই অন্তর্গত। 'ভারতীয় প্রজ্ঞার নবাবিষ্কার' এই নামকরণ করেছেন একজন সুরসিক সাহিত্যযোদ্ধা পণ্ডিত। এই অভিধা সার্থক।

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি ঘটনার পর ঘটনার লম্বা এক ফিরিস্তি (record of events) বা কোন রাজামহারাজা সম্রাটের জয়-পরাজয়ের বিবরণ, না হয় বংশলেখমালা, না হয় বুরঞ্জী বা ওয়াকিয়া-নবীশের বা সভাকবির অত্যুক্তিভরা দোষগুণকীর্তনাবলী নির্ভর তুদশটা শিলালেখ, প্রশস্তি, মুদ্রা, মূর্তি অর্থাৎ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি নিদর্শন নিয়ে পণ্ডিতী আলোচনা বা সেই যুগের সাহিত্যের শিল্পের পরিচয় বা পরিব্রাজকের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে মালমশলা যতটুকু পাওয়া যায় তার সংগ্রহ। ইতিহাস কিন্তু শুধু ঐ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নয়, তার চেয়েও বেশী। মৃত্তিকার তথ্য থেকে তত্ত্বে পৌছতে আমরা ভালবাসি কিন্তু ঘটনাপঞ্জীর শাসনকে না মেনে অর্থাৎ discipline of facts-কে সম্পূর্ণ মর্যাদা না দিয়ে, অনুমান বা কিম্বদন্তী নির্ভর হয়ে। ইতিহাস শুধু রেকর্ড নয়, তার চেয়েও বেশী—একটি জাতির বা দেশের বা গোষ্ঠীর মনমস্ত্রিত আগ্রহ-সংগ্রহের পরিচয়। শুধু অশোকের কটা ছিল নাতি বা আওরঙ্গজেবের কটা ছিল হাতি, এই সব ঘটনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করাই ইতিহাসের শেষ কথা নয়, কারণ ইতিহাসে রাজা-মহারাজা—সামন্ত-সেনাপতি, শাস্ত্রকার-লিপিকাররা প্রধানদের ভূমিকা গ্রহণ করলেও সত্যিকার ইতিহাসের এগুলি বহিরঙ্গের কাহিনী। জানি কট্টর বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকেরা হয়তো মুচকে হাসবেন, বলবেন ইতিহাস রম্যরচনা বা দর্শন নয়, কিন্তু টয়েনবীর মত চিন্তাশীল ঐতিহাসিকরা তবু খুঁজবেন—সৃষ্টিশীল স্থায়ী সত্তাটিকে মানব-প্রকৃতির মাঝখানে। সত্যিকার ইতিহাস গড়ে ওঠে এই বিশ্লেষণ

ও সংশ্লেষণের মাঝখানে—যাকে বলা হয়েছে Historiography বা ইতিহাস চিন্তা। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্প্রতি Heras Institute of Indian History and Culture Bombay-এর আমন্ত্রণে ইতিহাস পঠনপাঠনের এই বিশেষ দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যা ইউরোপে দুইজন ঐতিহাসিক দিকপাল নীবুর (Neibur) এবং লিওপোল্ড ভন্ র্যাঙ্কে (Leopold Von Ranke) করেছিলেন। নীবুর বলেছিলেন, চূড়ান্তভাবে অনুসন্ধান করে লিখতে হবে তবেই 'objective treatment of history' সম্ভব। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীর লেখক কলহন্ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরের ইতিহাস সম্পর্কিত অন্ততঃ এগারোটি গ্রন্থ পরীক্ষা করে ও ঘোষিত আইনের অনুলিপি ও খোদিত লিপির সাহায্যে তার ইতিহাস তৈয়ারী করেন। সেইজন্য আকরতথ্য ও বস্তুর সংগ্রহ, তার বিচার ও বিশ্লেষণ, ও আলোচনায় প্রয়োজন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ভাউ-দাজী, মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, সত্যব্রত সামশ্রমী, রমেশচন্দ্র দত্ত, শরচ্চন্দ্র দাশ, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ, আনন্দরাম বরুয়া, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী এই পনেরোজন মনীষির সারস্বত প্রচেষ্টা ও জীবনী আলোচনা লেখক করেছেন, যদিও আরো অনেকের কথা (স্বদেশী ও বিদেশী) তিনি অন্যত্র বলেছেন এবং তাঁর ঝুলিতে আরো কয়েকজন সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভারী ভালো লাগলো যে উনবিংশ শতাব্দীর বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মনীষিকে তিনি লোকমানসে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যাঁদের কথা বিস্মরণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাঁদের প্রতিভাদীপ্ত কর্ম ও জ্ঞানজীবনের কিছুটা ছবি লেখক এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে তাঁদের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রগুলিও পরিস্ফুট হয়েছে। ফলে আমাদের লাভ হয়েছে দুদিক থেকে, শুধু মনীষি স্মরণ নয়, পিতৃরিকথের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন নয়, সেই সেই আলোচ্যবস্তুর ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানং বা শ্রদ্ধৎস্ব সৌম্য এই কথা বলি বটে কিন্তু এই সব সারস্বত পিতৃ-পুরুষদের কথা জানি না, বুঝি না যে এই সাধনায় মধুমানও হওয়া যায়। বইটিতে মুদ্রাকর প্রমাদ কিছু আছে—সবকিছু মালমশলার সম্যক আলোচনাও হয়তো নেই—স্বল্প পরিসরে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যেমন কোন সমালোচক বলেছেন যে 'ভাণ্ডারকর পদ্ধতি'র আলোচনা থাকলে আরো উপকৃত হতে পারতো পাঠকপাঠিকারা। তবু আমরা অনেক কথা জেনেছি, শিখেছি, আমাদের চিন্তার বেগকে তিনি দ্রুত করেছেন, নির্দেশ দিয়েছেন, সেইজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। কতকগুলি বিস্ময়কর সংবাদও তিনি সংগ্রহ করেছেন। তজ্জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই তা ভারতবর্ষের নিশীকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। একথা আজকের পরিপ্রেক্ষিতে খানিকটা কবিজনোচিত অত্যুক্তি হলেও কোথা হতে কারা এলো, কাটাকাটি মারামারি পড়ে গেলো, বাপেতে ছেলেতে, ভায়েতে ভায়েতে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি চলতে লাগলো, একদল যদি বা যায়, কোথা থেকে আর একদল উঠে পড়ে—পাঠান, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ইংরেজও রক্তবর্ণরঞ্জিত এই পরিবর্তমান দৃশ্যপট। এর পিছনে খণ্ড ইতিহাসের উপাদান পাওয়া

গেলেও অখণ্ড সূত্রটিকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ইতিহাস পড়তে ও পড়াতে বসে আমরা মাঝে মাঝে এই মৌলিক ভুলটিই করে বসি যে কোনো দেশের, কোনো জাতির, কোনো সময়ের একটা গোটা ইতিহাস পেতে গেলে কি কি উপাদান দরকার—শুধু তাম্রশাসন, মুদ্রা, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের অতিরঞ্জিত প্রশস্তি বা বিদ্বেষপ্রসূত বিবরণী, জয়স্কন্দাবারের কাহিনী, রাজমালাই কি যথেষ্ট না এই সব 'এহবাহ্য' কঙ্কালস্তূপ পেরিয়ে আমরা খুঁজবো তারা কেমন ছিল, তাদের আশা আকাজ্ক্ষা কামকামনা লাভ লোভ ক্ষুধা কেমন ভাবে ফুটে উঠতো, তাদের ধর্মবিশ্বাসের বিবর্তনের খবর, তাদের রাষ্ট্রবোধের চেতনার অঙ্কুর, কোন মাৎস্যন্যায়ে তাদের কোনদিকে গতি, তাদের সমাজসংগঠন ও বিন্যাসের ধারা, তাদের শিল্পসাহিত্যের পরিচয় কোন ভূর্জপত্রে লিপিবদ্ধ কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ। পুরাতনকে মূল্য দিতে হবে শুধু পুরাকীর্তি চর্চার জন্য নয় ভবিষ্যতের অমোঘ ইঙ্গিত ও যে সেখানে। ইতিহাসের ধারাবাহিকতা গতিময় তার রথচক্র থামে না, তার পরিণতি রূপ থেকে রূপান্তরে।

তাই গৌরাঙ্গবাবুর বইটি পড়ে সেই জ্ঞানমার্গী ইতিহাস পথিকদের স্মরণ করতে চেয়েছি। যেমন চন্দ্রকান্তের বৈশেষিক দর্শনের বিশেষ টীকায়, বা বৈদিক ব্যাকরণের কাতন্ত্রচ্ছন্দ প্রক্রিয়া আলোচনায় বা ভাণ্ডাজীর কালিদাস সম্বন্ধে বিতর্কে বিচারে বা রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকরের শুধু শৈবপ্রকরণের বিবরণীতে নয়, দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রভৃত্য রাজারা কারা এর চিন্তায়, ত্রৈকূটক রাজা কে ছিল, সত্যব্রত সামশ্রমীর বিবাহ কাহিনীতে নয়, 'প্রত্নকর্মনন্দিনী' পত্রিকার খবরেও রমেশচন্দ্র দত্তের ভারতীয় সভ্যতার মনোজ্ঞ ইতিহাসে, শরচ্চন্দ্র দাশের 'Indian Pandits in the land of Snow' পুস্তকে বা তিব্বতীয় ভাষার ব্যাকরণের বা আনন্দরাম বরুয়ার নামলিঙ্গানুশাসন ও ধাতুবৃত্তিসার নামক গ্রন্থসংকলনে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে দেখেছি, কাছে গেছি, বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু লোকায়ত দর্শন সম্বন্ধে যে তিনি লিখেছেন একথা জানা ছিল না। যেমন ছিল না গণপতি শাস্ত্রী মশাই প্রথমে ত্রিবন্দ্রম সংস্কৃত গ্রন্থমালায় ভাসের নাটকের আবিষ্কর্তা বা সেকালে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল সুধীমহলে, বিশেষ করে এই কারণে যে ভাস, কালিদাস-পূর্বসূরী। ইতিহাসকে যারা The ricepot and the rupee policy, Fire and steel, the Dungeon and the Rack বা হিদেনদের অমৃতালোকে নিয়ে আসবার প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত করে দেখেন, গৌরাঙ্গবাবু সেদলের নন্‌ তিনি যাঁদের কথা বলেছেন, তাঁরা ইতিহাস ও সংস্কৃতির ন্যাস-রক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন। সেই হিসাবে তাঁরা আমাদের নমস্য এবং গৌরাঙ্গবাবুও তাঁদের জীবিকা ও জীবনের সঙ্গে আমাদের যে মূল্যবান পরিচয় করিয়ে দিলেন তার জন্য শ্রদ্ধার পাত্র। জানি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক্ টয়েনবী কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় বলেছিলেন যে, 'Our psyche cannot be recorded in its entirety. Our actions are also controlled. So true history in never written. But within these limitations we have to move. আবার একথাও জানি (স্যার যদুনাথের কথা)......Indian historical studies are at present at a much more primitive stage than Roman history was when Gibbon began to write. We have yet to collect and edit our materials, and to construct the necessory foundation—the bedrock of ascertained

and unassailable facts on which alone the superstructure of a philosophy of history can be raised by our happier successors.'

বইটির প্রকাশক 'রূপা' কোম্পানী সুধী মহলে বিশেষ পরিচিত, তাঁদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটু বৈশিষ্ট্য সব সময়েই পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য পুস্তকটির প্রকাশের ভার গ্রহণ করায় তাঁরা সেই সুনাম রক্ষা করেছেন। নতুন ধরণের নূতন স্বাদের বই এটি। নির্ঘণ্ট ও গ্রন্থপঞ্জিগুলি বিশেষ মূল্যবান।

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

Message of India : Ranajitkumar Sen : Published by P. P. Sen from Sen's Book Corner, 24 N Garcha First Lane, Calcutta-19 : Price Re. 1·00

রণজিৎকুমার সেন শুধু কবি, উপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসাবে সুপরিচিত নন, মননশীল প্রাবন্ধিক হিসাবেও তিনি সুধীসমাজের গভীর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ রচনার অন্যতম বিষয় বাংলা তথা ভারতের সংস্কৃতি। তিনি মনে করেছেন বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের মানুষেরা নানা মতবাদের বিষয়ে বিভক্ত হলেও তারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারার আশ্রয়ে প্রকৃত ঐক্যবদ্ধ জীবনে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর কারণ ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষের অন্তরসত্তা থেকে উৎসারিত। আলোচ্য ছোট পুস্তিকাটির মধ্যে লেখক ভারত আত্মার বাণীকে অন্তরঙ্গ ও প্রাঞ্জলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

লেখকের মতে নূতন ভারতবর্ষের বাণী চিরন্তন ভারতবর্ষের বাণী থেকেই জন্ম নিয়েছে এবং যুদ্ধ-পীড়িত পৃথিবীতে সেই বাণী সর্বজয়ী সত্যপ্রতিষ্ঠায় সার্থকভাবে ক্রিয়াশীল। 'সত্যমেব জয়তে' এই হচ্ছে নূতন ভারতের বাণী এবং দ্বন্দ্বময় পৃথিবীতে এই বাণী প্রতিষ্ঠার জন্যে ভারতের মহাপুরুষগণের জীবনী ও বাণীর অনুধাবন করা অত্যাবশ্যক। এই বাণীই ভারত দেশদেশান্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যই জ্ঞান এবং সত্য সর্বজয়ী। লেখকের ভাষায়, 'The message of new India is that of truth, 'Satyameva jayate.' It is necessary to study the lives and messages of great Indians in our every day lives to establish that truth in this war-tormented world. New India is carrying the same message from one country to other : 'Satyam, janaman, anantam : Satyameva jayate.' Truth is knowledge, truth triumphs everywhere.'

আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধ, নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী প্রমুখ মহাপুরুষদের আবির্ভাবে পুত ভারতবর্ষই শান্তি সংহতি ও মৈত্রীর বাণী শোনাতে পারে। লেখক শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, কবীর, নানক,

শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ; গান্ধীজী, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ মনীষীদের বিভিন্ন উক্তি উদ্ধৃত করে ভারতের চিরন্তন বাণীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। বিবিধ উক্তির পুষ্পগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করে নিপুণ মালাকরের মতো লেখক যে মাল্য রচনা করেছেন তার সৌন্দর্য ও সৌরভে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। বর্তমান নৈরাশ্য, অস্থিরতা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের যুগে এই ধরণের প্রবন্ধ যত রচিত হয় ততই ভালো। লেখক স্বল্প পরিসরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে তিনি নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। সময়োপযোগী এই প্রবন্ধ রচনার জন্য লেখক ধন্যবাদার্হ।

সুশীলকুমার গুপ্ত

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

সাহিত্য অলংকার এবং দর্শন বিষয়ে এক অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ সপ্তদশ শতাব্দীর এক যুগচিহ্নিত পুরুষ।

পণ্ডিতরাজকে ঘিরে ভারতে পণ্ডিত মহলে 'কিংবদন্তীর' প্রচলন প্রচুর। বোধহয় তিনি সাধারণ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন না বলেই এই বিভিন্ন কিংবদন্তী।

(১) জগন্নাথ কিছুদিন কাশীধামে বাস করেছিলেন। পণ্ডিতরা তাঁকে সুনজরে দেখতেন না; কারণ তাঁর প্রেয়সী ছিলেন মুসলমান রমণী, নাম ছিল 'লবঙ্গী'। তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র কোথাও যেতেন না, তাঁর মুখ না দেখলে পণ্ডিতরাজের গ্রন্থলেখায় স্ফূর্তিই আসতো না। উভয়ে গঙ্গাতটে বাস করতেন। গ্রীষ্মের কোন এক রাত্রে শুয়ে ছিলেন একটি খাটিয়ায় সেই গঙ্গাতীরে, এবং কাছেই ছিলেন লবঙ্গী। পণ্ডিত রাজ প্রেয়সীর কণ্ঠে বাহুলগ্ন হয়েই ঘুমিয়ে ছিলেন। উভয়ের দেহে ছিল একটি ধপধপে চাদর। চাদরের পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল পণ্ডিত রাজের শুভ্রশিখার গুচ্ছটি।

ঐ পথেই আসছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিত। ভোরের সন্ধ্যাকৃত্য সেরেই জগন্নাথের বিলাস নিদ্রার রম্যস্থল দেখতে দেখতেই নজরে পড়লো পণ্ডিতরাজের ঐ যুগলরূপ। হায়! বৃদ্ধবয়সেও এই যবনী যুবতীর আলিঙ্গন পাশ! তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে পড়লো—

কিং নিঃশঙ্কং শেষে শেষে বয়সি ত্বমাগতে মৃত্যৌ।

অমনি গায়ের চাদর সরিয়েই দেখে নিলেন পণ্ডিতরাজ কে ইনি? একটু পাশ ফিরেই উত্তর দিলেন—
'ইয়মেব তৃপ্তি স্তবাপি কাম্যা নিকটে জাহ্নবী জাগর্ত্তি ॥

(২) বাদশাহ আকবর নাকি বন্ধু ছিলেন জগন্নাথের। কোন একদিন উভয়ে শতরঞ্চ

খেলছিলেন। এমনি সময় উভয়ের নজরে পড়লো একটি যুবতী কন্যার উপর। কন্যাটি আকবরেরই উপপত্নী রাজপুত রমণীর। এরই নাম লবঙ্গী। মাথায় ছিল জলভরা কলসী। সে রাজ অন্তঃপুরের তোরণ পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করছিল। আকবর ছিলেন নেশায় চুর হয়ে। সেই অবস্থায় পণ্ডিত রাজকেও দেখলেন তিনিও ঐ যুবতীকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে দেখছেন। তৎক্ষণাৎ বাদশাহ মৃদু হেসে বল্লেন জগন্নাথ! বলতো কেমন লাগছে!

পণ্ডিতরাজ বল্লেন—ইয়ং সুস্তনী মস্তক ন্যস্ত কুম্ভা

কুসুম্ভারুণং চারু চৈলং দধানা।

সমস্তস্য লোকস্য চেতঃ প্রবৃত্তিং

গৃহীত্বা ঘটে ন্যস্য যাতীব ভাতি॥

জগন্নাথের উত্তর শুনেই বাদশাহের মন খুশীতে ভরে গেল, তিনি বল্লেন বাঃ, খুব তৃপ্তি পেলাম, ইচ্ছামত চেয়ে নাও আমার কাছে, যা চাও—

জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় কবিতার মাধ্যমে বল্লেন—

ন যাচে গজালিং ন বা বাজিরাজং, ন বিত্তেষু চিত্তং মদীয়ং কদাচিৎ।

ইয়ং সুস্তনী মস্তক ন্যস্তকুম্ভা লবঙ্গী কুরঙ্গী দৃগঙ্গী করোতু॥

যবনী নবনীত কোমলাঙ্গী শয়নীয়ে যদি লভ্যতে কদাচিৎ।

অবনী তলমেব সাধু মন্যে ন বনী মাঘবনী বিলাস হেতু॥

বাদশাহ জগন্নাথের মন কি চায় তা বুঝেই লবঙ্গীকে তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

(৩) ঐ ঘটনাটি একটু হেরফের করে আর একটি কিংবদন্তীর প্রচার যে, লবঙ্গী ছিল বাদশাহের অন্তঃপুরে দাসী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন জগন্নাথ। অবশেষে তাঁকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়ে সেই মুসলিম রমণীকে পণ্ডিতরাজের হাতে অর্পণ করেছিলেন বাদশাহ।

(৪) জয়পুরের রাজা জয়সিংহ ছিলেন মাননীয় পুরুষ। কিন্তু তাঁর প্রজাবৃন্দের মধ্যে মুসলিম মোল্লারা তাঁকে খুব সম্মান করতেন না। তাঁরা বলতেন এই রাজা খাঁটি ক্ষত্রিয় নন। আসলে রাজপুত বংশের। কিন্তু কোন্ রাজার পুত্রের বংশধর ইনি? কারণ পরশুরাম তো একুশবার ক্ষত্রিয় নিধন করেছিলেন। তা হলে ক্ষত্রিয় বলতে আর কে ছিলেন?

দ্বিতীয় গুঞ্জন ছিল তাঁদের আরবী ভাষা সংস্কৃত থেকেও প্রাচীন। এই দুটি প্রশ্ন জয়পুরে খুব চালু ছিল। তাতে জয়সিংহ কোন প্রতিবাদ করতে পারতেন না। তিনি শুনেছিলেন কাশীধামে এক বিরাট পণ্ডিত থাকেন নাম তাঁর জগন্নাথ, উপাধি তাঁর পণ্ডিতরাজ।

জয়সিংহ কাশী এলেন। ঐ দুটি প্রশ্ন তার কাছে তুললেন। জগন্নাথ বল্লেন ঠিক আছে, আপনি আপনার মুসলিম প্রজাদিকে বলবেন—এই পৃথিবীতে পরশুরাম ক্ষত্রিয় শূন্য করলেন ২১ বার? বাইশ বারেও নয় একবারেও নয়? শূন্যতা সৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে 'ধকাবটু আগয়ী থী?

দ্বিতীয় উত্তর মুসলিমগণ আপনারা শুনুন আপনাদের 'হদিশে' লেখা আছে 'এ মুসল মানো। জ্যায়সা হিন্দুলোগ মান্‌তে হ্যায়, উস্‌কা উল্‌টা তুম্‌হে মান্‌না চাহিয়ে।

জয়সিংহ এই উত্তর শুনে জয়পুরে এসে প্রজাদিকে শোনালেন। তাঁরা তো অবাক। আর এনিয়ে

তাঁরা আলোচনা করতেন না। জয়সিংহ খুব খুসী হয়ে পণ্ডিতরাজকে দরবারে এনে যথেষ্ট সম্মান করেছিলেন নানান পারিতোষিক উপহার দিয়ে।

(৫) পণ্ডিতরাজ দিল্লীর দরবারে কাজীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধ করেন। তাদিকে পরাজিত করেন 'মজহবী' গ্রন্থের বয়াৎ তুলে তুলে। কাজিরা বিস্মিত হয়েই রাজদরবারে সমবেত আবেদন করেছিলেন তাঁকে নিজেদের ধর্মের সামিল করে নিতে। দিল্লীশ্বর সে আবেদন মঞ্জুর করেই তাঁকে ধর্মান্তরিত করে যবন কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। সেই পত্নীকে নিয়েই তিনি কাশীধামে এসে বাস করেন। পত্নীর সঙ্গে একত্র হয়েই তিনি নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। হিন্দু-পণ্ডিতবৃন্দ তাঁকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ও সুযোগ পেলে তিরস্কার করতেন।

পণ্ডিতরাজ যে সব তিরস্কার হাসিমুখে মেনে নিতেন। মনের এক একটি প্রশ্ন তুলে দেবী জাহ্নবীকে শোনাবার ছলেই তাঁর ৯২টি গঙ্গাস্তুতির শ্লোকের জন্ম হয়। ওই ৯২টি শ্লোকের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবী ভাগীরথী সেই পণ্ডিত দম্পতীকে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যান। গঙ্গা বারিতেই তাঁদের লোকান্তর ঘটে। এই দৃশ্য দেখেই কাশীধামের পণ্ডিতবৃন্দ তাঁদের পাদপূর্ত ভূমিতে এসে নিত্য প্রণাম করতেন।

(৬) পণ্ডিতরাজের জীবনে সবচেয়ে বিষাদের কারণ ঘটেছিল সেই যবন কন্যার জন্যই। যাকে গ্রহণ করে তিনি হিন্দু জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করেছিলেন, সেই মুসলিম কন্যাই একদিন তাঁর প্রৌঢ়াবস্থায় তাঁকে ত্যাগ করে অপর ব্যক্তির সঙ্গে কোথায় পলায়ন করেছিল। বাকীজীবন তাই পণ্ডিতরাজ বড়ই বেদনার সঙ্গে কাটিয়ে একদিন মা জাহ্নবীর জলে ঝাঁপ দিয়ে এ ধরণী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

(৭) পণ্ডিতরাজ যখন কাশীবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময় কোন এক রাজ্যের রাজা তাঁকে আহ্বান করেছিলেন তাঁর রাজদরবারে সম্মানিত পণ্ডিত হয়ে থাকতে। জগন্নাথ সেই রাজার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নিয়েছিলেন— দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা

মনোরথং পূরয়িতুং সমর্থঃ।
অন্যৈ নৃপালৈঃ পরিদীয়মানং
শাকায় বাস্যাৎ লবণায় বা স্যাৎ ॥

(৮) পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর সেই অগাধ প্রতিভা লাভ করেছিলেন বিশেষ এক ধরণের তান্ত্রিক তপস্যায়। তপস্যায় জাগ্রতা দেবী তাঁকে বর দিয়ে বলেছিলেন—

'আ কুরুদেশং বিচরে র্মা কুরু পরবাদি নির্জয়ে শঙ্কাম্।
স্বীকুরু বরমেকং মে ব্যাকুরু ভো বৎস শাস্ত্রাণি''

এইসব কিংবদন্তীর মধ্যে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের আসল পরিচয় কিছুই পাওয়া যায় না। তাঁর ব্যক্তি জীবনের পরিচয় এবং তাঁর কৃতিত্ব কোথায় কোথায় সে সব তিনি নিজেই টুকরো টুকরো কবিতা এবং গদ্য রচনায় রেখে গিয়েছেন। পণ্ডিতরাজের অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ 'আসফ বিলাস'।

এ গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখেছেন—

শ্রী সার্বভৌম শাহিজহান প্রসাদাৎ অধিগত পণ্ডিত রাজপদবী-

রাজিতেন তৈলঙ্গ কুলাবতংসেন পণ্ডিতজগন্নাথেন আসফ-
বিলাসাখ্যেয় মাখ্যায়িকা নিরমীয়ত'

এতেই তিনি স্পষ্ট বলেছেন 'আমি তৈলঙ্গ কুলে জন্ম পেয়েছি, এবং শাজাহানের কাছে 'পণ্ডিতরাজ' উপাধি লাভ করেছি। আমার পিতার নাম 'পেরম ভট্ট'। তাছাড়া পিতৃপরিচয় দিয়েছেন প্রাণাভরণ ও জগদাভরণ কাব্যে

(১) তৈলঙ্গান্বয় মঙ্গলালয় মহালক্ষ্মী দয়ালালিতঃ
শ্রীমৎপেরম ভট্টসূনু রনিশং বিদ্বল্ললাটন্তপঃ'
সন্তুষ্টঃ কতমাধিপস্য কবিতা মাকর্ণ্য তদ্বর্ণনম্
শ্রীমৎপণ্ডিত রাজ পণ্ডিত জগন্নাথ ব্যধাসীদিদম্'

(২) দ্বিতীয় শ্লোকটি জগদাভরণ কাব্যের শেষে। ও শ্লোকের প্রথম দুটি পাদ একই, তৃতীয় আর চতুর্থ চরণে একটু পরিবর্তিত করে লিখেছেন—

শ্রীরাণা কলি কর্ণ নন্দন জগৎ সিংহ প্রভোবর্ণনম্
শ্রীমৎ পণ্ডিত রায় সৎকবি জগন্নাথো ব্যতানীদিদম্ ॥

পণ্ডিত রাজ জগন্নাথের অন্যতম প্রখ্যাত গ্রন্থ 'রসগঙ্গাধর'। তার শেষে আরও স্পষ্ট করে নিজের মাতা, পিতা এবং অধ্যাপকের পরিচয় দিয়েছেন। তাতে বলেছেন মাতার নাম লক্ষ্মী দেবী এবং অধ্যাপক মহাগুরু জ্ঞানেন্দ্র ভিক্ষু। ভিক্ষুর কাছে তিনি বেদান্ত, আর ন্যায় এবং বৈশেষিক দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন। মহেন্দ্রের কাছে, পূর্ব মীমাংসা অধ্যয়ন করেছিলেন। খণ্ডদেবের কাছে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন। শেষ বীরেশ্বরের কাছে।

এই কথাগুলি তিনি আরও সংক্ষেপে লিখেছেন 'রসগঙ্গাধরে' দ্বিতীয় শ্লোকে

শ্রীমজ্‌জ্ঞানেন্দ্র ভিক্ষো রধিগত সকল ব্রহ্মবিদ্যাপ্রপঞ্চঃ
কাণাদী রাক্ষপাদী রপি গহন গিরো যোমহেন্দ্রাদবাদীৎ।
দেবাদেবা ধ্যগীষ্ট স্মরহর নগরে শাসনং জৈমিনীয়ং
শেষাঙ্ক প্রাপ্ত শেষামলভণিতি রভূৎ সর্ববিদ্যাধরোঽভূৎ ॥

এইসব শ্লোক যেমন পণ্ডিতরাজের জন্ম কুল, পিতা মাতা ও বিদ্যাগুরুবর্গের পরিচয় দেয়। তেমনি আর একটি শ্লোক এবং অন্যত্র তাঁর আত্মপ্রসঙ্গের আভাস ইঙ্গিতেরও কয়েকটি পংক্তির অস্তিত্ব বহন করে—

পণ্ডিত রাজের 'ভামিনী বিলাস' একটি সুখ্যাত গ্রন্থ। এটি মুক্তক কাব্য বা কোষকাব্য তার ৩.৩ শ্লোকে লিখেছেন

সর্বেঽপি বিস্মৃতি পথং বিষয়াঃ প্রয়াতাঃ
বিদ্যা পি খেদ কলিতা বিমুখী বভূব।
সা কেবলং হরিণ শাবক লোচনা মে
নৈবাপযাতি হৃদয়াদধি দেবতেব ॥

এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি করেছেন রসগঙ্গাধরের 'ভাবা ভাসে' অপর পক্ষে ভাবধ্বনিতে। শ্লোকটির অর্থ ভারী চমৎকার 'হায় আমার এখন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে অত কষ্টের বিদ্যা তাও যেন বিমুখী হয়ে

আমায় ফেলে চলে যাচ্ছে, কারণ তার এখন অভিমান হচ্ছে কোন কারণে। তাই ভাবছি সবাই তো যাচ্ছে, কিন্তু সেই চঞ্চল হরিণী লোচনা সে তো হৃদয়ের অধিদেবতার মতই আজও রয়েছে হৃদয়ে।'

ভাবধ্বনিতে এটির ব্যখ্যা এইরকম—

গুরুকুলে বিদ্যাভ্যাস সময়ে তদীয় কন্যা লাবণ্য গৃহীতমানস্তস্য অন্যস্য বা কস্যচিৎ অপ্রতিবিদ্ধ গমনাৎ স্মরতো দেশান্তরগতস্য ইয়ং উক্তিঃ—'

ভাবাভাসের দৃষ্টান্ত শ্লোকে পণ্ডিতরা মনে করেন গুরুগৃহে বিদ্যালাভের সময়েই জগন্নাথ গুরুকন্যা অথবা গুরুপত্নীর প্রতি আসক্তচিত্ত হয়েছিলেন, সারাটি জীবন সেই আসক্তিকে পোষণ করেছিলেন, কিন্তু নিষিদ্ধ কার্য বলেই সেটা স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই, তবে ঘটনাটি সত্য বলেই অনুভূত সত্যের দ্বারা ভাবাভাসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন। কেন না তিনি তাঁর রসগঙ্গাধরে একটিও অপরের রচিত শ্লোকের উপস্থাপনা করেন নাই এটা তাঁর প্রতিজ্ঞাই ছিল। 'নির্মায় নূতন মুদাহরণানুরূপং, কাব্যংময়াৎ নিহিতং ন পরস্য কিঞ্চিৎ'

এই পণ্ডিতরাজ যে দিল্লীর রাজ দরবারে অনেকদিন কাটিয়ে জীবনের অন্তিম কালে মথুরায় বাস করেছিলেন, তেমন ইতিহাসেরও বার্তাও লিখে রেখে গিয়েছেন। জীবনের মধ্যে যৌবন উৎকৃষ্ট বয়স। সে বয়সটা তাঁর কেটেছিল দিল্লীতে—

'শাস্ত্রাণ্যা কলিতানি নিত্যবিধয়ঃ সর্বেঽপি সম্ভাবিতাঃ
দিল্লীবল্লভ পাণিপল্লবতলে নীতং নবীনং বয়ঃ।
সম্প্রত্যুজ্ঝিত বাসনং মধুপুরী মধ্যে হরি সেব্যতে
সর্বং পণ্ডিতরাজ-রাজিতলকে নারি লোকাধিকম্॥ ভামিনী বিঃ।৪।৫৪

পণ্ডিতবৃন্দ আরও মনে করেন জগন্নাথ পুত্র শোকও লাভ করেছিলেন সে পুত্রটি যবন কন্যা লবঙ্গীর কিনা তা বলা যায় না। তবে তাঁর পুত্র ছিল এবং সে তার পিতাকে রেখে অকালে লোকান্তরিতও হয়েছিল— অপহায় সকল বান্ধব চিন্তাং উদ্বাস্য গুরুকুল প্রণয়ম্।
হা তনয়! বিনয় শালিন্ কথামিব পরলোক পথিকোভূঃ॥ (রস গঙ্গাধর)

তবে এই শ্লোকটির দ্বারা শিষ্যের বিয়োগও হতে পারে। কারণ—ওঁর শিষ্য ছিলেন নারায়ণ ভট্ট। তিনি অকালেই মৃত্যু লাভ করেছিলেন। তাঁর ভাইপো হরিহর ভট্টও একদিন কেঁদেছিলেন তাঁর জন্য। হরিহর ভট্ট—তাঁর 'কুলপ্রবন্ধ' কাব্যে অমনি শ্লোক লিখেছিলেন—

লব্ধা বিদ্যা নিখিলাঃ পণ্ডিত রাজাৎ জগন্নাথাৎ।
নারায়ণস্তু দৈবাৎ অল্পায়ুঃ স্বপুরীং অগমৎ॥

এবার আলোচনা করা যাক্ জগন্নাথের সময়। পণ্ডিতরাজ নিজেই বলেছেন (ভামিনী বিঃ।৪।৪৫) আমার যৌবন কেটেছে দিল্লীর বল্লভের কর পল্লবে

১। দিল্লীর বল্লভ কে ছিলেন?

২। আবার উদয়পুরের রাণা জগৎ সিংহেরও বর্ণনা করেছেন তাঁর জগদাভরণ কাব্যে—

'শ্রীরাণা কলি কর্ণনন্দন জগৎ সিংহ প্রভো বর্ণনম্
শ্রীমৎ পণ্ডিত রাজ সৎকবি জগন্নাথো ব্যতানী দম্।'

৩। এ ছাড়া রস গঙ্গাধর অলংকারে পণ্ডিতরাজ একটি শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন—যেটি তাঁরই রচিত 'আসফ বিলাস' কাব্যের—

সুধেব বাণী বসুধেব মূর্তিঃ, সুধাকর শ্রীসদৃশী চ কীর্তিঃ
পয়োব্ধি কন্যা মতি রাস কেন্দো মহীতলেঽস্মস্ম নহীতি মন্যে।

তারপর— যুক্তংতু যাতে দিবমাস কেন্দো তদাশ্রিতানাং যদভূদ বিনাশঃ।
ইদংতু চিত্রং ভুবনাবকাশে নিরাশ্রয়া খেলতি তস্য কীর্তিঃ।

৪। পণ্ডিতরাজের আর একটি কাব্য 'প্রাণাভরণ' ও কাব্যের বর্ণিতব্য বিষয় হোলো আসামের অধিপতি প্রাণনারায়ণের কীর্তি কথা। অতএব এই চারটি কাব্যের উক্তিগুলিকে রাখলে বোঝা যায় জগন্নাথ এই চারজন নরেশেরই আশ্রয় লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর। জয়পুরের জগৎ সিংহ অথবা দিল্লীশ্বর 'শাজাহান' এবং আসামরাজ প্রাণ নারায়ণ।

কিন্তু গোল ঠেকে আসফ বিলাস কাব্যের বর্ণনায়। তার উত্তরে ভাবা যায়—ঐ সময় পণ্ডিতরাজ শাজাহানেরই দরবারে থাকতেন এবং তাঁর মামা ছিলেন আসফ্ খাঁ। যাঁর প্রতাপ শাজাহানের তুলনায় নিষ্প্রভ তো ছিলই না, বরং আরও উজ্জ্বলই ছিল।

শাজাহান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করেন এবং ৩০ বৎসর কাল তা ভোগ করেন। তারপর তাঁর পুত্র ঔরঙ্গজেব তাঁকে বন্দী করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শাজাহানের মৃত্যু ঘটে।

পণ্ডিতরাজ আসফ্ খানের বর্ণনা প্রসঙ্গে নুরদীনের নামও উল্লেখ করেছেন। আসফ খাঁর মৃত্যু হয় ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে। জাহাঙ্গীর পত্নী নুরজাহানের ভাই ছিলেন এই নুরদীন। আসফ বিলাসে পণ্ডিত রাজ লিখেছেন—'সার্বভৌম সম্বন্ধিষু সকলেষু সামন্তেষু……সকল শাস্ত্র সারা বগাহী নবাবা-সকজাহী।' নুরদীনের অপর নাম ছিল জহাঙ্গীর। এটি পরিষ্কার করে বলেছেন—উত্তর অলং-কারের প্রসঙ্গে…ব্যাকুপ্যাৎ 'নুরদীন' ক্ষিতিরমণ রিপু ক্ষৌণিভৃৎ পক্ষ্মালাক্ষী।

এই জাহাঙ্গীর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্য লাভ করে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দ তক শাসন করেন। আর—আসাম নৃপতি প্রাণ নারায়ণ ১৬৩৩ থেকে ১৬৬৬ পর্যন্ত আসাম শাসন করেন। আর উদয়পুরের জগৎ সিংহ ১৬২৮ থেকে ১৬৫৯ পর্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন।

এই সব ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁদের ঐতিহাসিক সাল তারিখের দ্বারা খুবস্পষ্ট হয়ে যায়—পণ্ডিত রাজের জীবন ও সাহিত্য সাধনার কাল সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বাব্দে।

পণ্ডিত রাজের 'আসফ্ বিলাসের' কয়েকটি পংক্তি তাঁকে বিশেষভাবেই চিহ্নিত করে রেখেছে স (শাহজাহান) কদাচিৎ…কাশ্মীর দেশং আজগাম…যথতত্র সকল শস্যাবগাহী নবাবাসকঃ হি'

মাতুল আসফ খাঁ-ই জগন্নাথকে 'পণ্ডিত রাজ' উপাধি দিয়ে প্ররোচিত করেন এবং তাঁর অজস্র প্রশংসা করেন। ভাগিনেয় শাজাহান দিল্লীতে ফিরে গিয়ে জগন্নাথকে রাজদরবারে সাদর আমন্ত্রণ জানান, এবং তাঁকে ঐ উপাধি পত্র দিয়ে সম্মান জ্ঞাপন করে।

তারপর ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে আসফ খাঁর মৃত্যুর পর পণ্ডিতরাজ জগন্নাথকে আবার দিল্লীতে বাস করতে আহ্বান করেন।

এ ইঙ্গিতও করেছেন জগন্নাথ তাঁর রস গঙ্গাধরে—

যুক্তস্ত যাতে দ্বিবমাসকেন্দ্রৌ
তদাশ্রিতানাং যদভূদ বিনাশঃ ॥

সংস্কৃত ভাষা চর্চা যাঁরা ক'রে থাকেন বা ক'রতেন তাঁদের একটা ঝোঁক বেশ পরিস্ফুট হয়, সেটা হোলো, একটু আত্মশ্লাঘা, কিছু পরোৎকর্ষ অসহিষ্ণুতা। আর বলা কওয়া লেখার মধ্যে শ্লেষ, আক্ষেপ, ব্যঙ্গ করার প্রবণতা। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের লেখার মধ্যে ওগুলি এত বেশী প্রকাশ পেয়েছে যে, প্রখ্যাত পণ্ডিত অপ্যয় দীক্ষিতের সাহিত্য বিচারকে তিনি সুযোগমত খণ্ডন করেও তৃপ্ত হন নাই, তাঁর মতবাদকে খণ্ডন করতে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় 'চিত্র মীমাংসা' নামে একখানি গ্রন্থও লিখে গিয়েছেন জগন্নাথ।

সূক্ষ্মং বিভাব্যময়কা সমুদীরিতানা—
মপ্যয্য দীক্ষিত কৃতাবিহ দূষণানাম্।
নির্মৎসরো যদি সমুদ্ধরণং বিদধ্যাৎ
তস্যাহমুজ্জলমতেশ্চরণৌ দধামি ॥

পণ্ডিতরাজ ভামিনী বিলাসে (৪।৪৪) বলেছেন 'যদি আমার লেখা কবিতা পড়ে বা শুনে কোন লোক আনন্দে না মাথা নাড়ে তবে সে মনুষ্য স্বভাব থেকে চ্যুত হয়ে নরপশুতা লাভ করেছে বুঝবে—

গিরাং দেবী বীণা গুণ রণন হীনা দরকরা
যদীয়ানাং বাচামমৃতময় মাচামতি রসম্।
বচস্তস্যা কর্ণ্য শ্রবণ সুভগং পণ্ডিত পতে
রধুন্বন্ মূর্ধানং নৃপশুরথবা পশুপতিঃ ॥

পণ্ডিতরাজ একথা বলেও সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁর কবিতা না পড়লে সে নরপশু হয়, এতে তো তার জীবিত আখ্যাই রয়ে গেল তাই আর একটি শ্লোকে বললেন, ও লোকটাকে মৃত বলেই ধরে নেবে, কারণ ও যে পণ্ডিতরাজের কবিতাই শোনে নাই—

মধুদ্রাক্ষা সাক্ষাদমৃতমথ বামাধর সুধা
কদাচিৎ কেষাঞ্চিৎ ন খলু বিদধীরন্নপিমুদম্।
ধ্রুবং তে জীবন্তোঽপ্যহহ মৃতকা মন্দ মতয়ঃ
ন যে যাং আনন্দং জনয়তি জগন্নাথ ভণিতিঃ ॥

এই সব শ্লোকে তাঁর ঔদ্ধত্য যেমন প্রকাশ পেয়েছে, আবার আশ্চর্য রকমের অকপট অন্তরের দৈন্যময়ী ভক্তি বাণীও পণ্ডিতরাজের লেখায় পরিস্ফুট হয়েছে। গঙ্গালহরীর ৩১ শ্লোকে বলেছেন মা জাহ্নবি! এমন কি কি কুবৃত্তি আছে যা আমাতে নাই। মিথ্যা বলা, কুতর্ক করা, পরচর্চা করা, ইত্যাদিতো আছেই আমার, তাছাড়া আছে চণ্ডালের সঙ্গ। তাই বলছি মা, তুমি ছাড়া আমার এই সব কথা শোনার আর কে আছে? যে আবার আমার মুখের পানে চায়—

শব বৃত্তি ব্যাসঙ্গো নিয়তমথ মিথ্যা প্রলপনম্
কুতর্কে যবভ্যাসঃ সতত পরপৈশুন্য মননম্।
অপি শ্রাব শ্রাবং মমতু পুনরেবং বিধগুণান্

ঋতে ত্বৎকো নাম ক্ষণমপি নিরীক্ষেত বদনম্ ॥

আবার যখন 'করুণা লহরী' গ্রন্থ রচনা করেছেন তখন ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি এমনভাবে. নিজের অপরাধ মার্জনা চেয়ে তাঁর করুণা প্রার্থনা করেছেন, যে, তা পাঠ করলেই পাঠকের চিত্ত ভাব জড়িত হয়ে যায়—

অয়ি ! শৈশব লাগিতঃ শিশুঃ প্রতিবুদ্ধো জনকেন তাড্যতে।
ন কদাপি চ লালিতস্ত্বয়া কিমুতাড্যো ভগবান্ কুকর্মভিঃ ॥

ঐ গ্রন্থের ৫৫ শ্লোকে বলেছেন হে গোবিন্দ ! আমার জন্ম আবার যে কুলেই হোক্ না কেন, যেন তোমার নাম না ভুলি, তোমার ভক্তের সঙ্গ বিচ্যুত না হই—

প্রণিপত্য বিধে ভগবন্ত মন্ধা বিনিবদ্ধাঞ্জলি রেকমেব যাচে।
জনুরস্তু কুলে কৃষী বলানামপি গোবিন্দ পদার বিদ ভাজাম্ ॥

জগন্নাথের প্রতিভার পরিমাপ করা যায় না। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণে মানব প্রতিভা যেভাবে নিরীক্ষিত হয় ঠিক ঐভাবে না দেখে ভাব ভাষা সাহিত্য ব্যাকরণ ও দর্শনের জ্ঞান সাধনার দিক্‌গুলি সমীক্ষা করলে দেখা যায় পণ্ডিতরাজ ওসব ক্ষেত্রে অপরিসীম যোগ্যতার আধার ছিলেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পণ্ডিরাজের (১) রস গঙ্গাধর। (২) চিত্র মীমাংসা খণ্ডন। এই দুখানি গ্রন্থ, ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ, অভিজ্ঞতা, রচনা, পটুতা, সমীক্ষা, বিচার, বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও আস্বাদন করার পক্ষে তুলনাহীন গ্রন্থ। দুটি গ্রন্থের সাহায্যে আদি রসিক ভরত থেকে আরম্ভ করে ষোড়শ শতকের কেশব মিশ্র পর্য্যন্ত যারা এই সাহিত্য সমীক্ষায় গুরু স্থানীয় তাদের সকলের অভিমত এবং ত্রুটি এবং মীমাংসা কি সবই জানা যায়।

জগন্নাথ রসগঙ্গাধরে বলেছেন 'সন্নিমিতাঃ পঞ্চ লহর্য্যো ভাবস্য'। ভাবের পাঁচটি মুখ্যতরঙ্গ। তাই অবলম্বন করে তিনি এই পাঁচটি কাব্য রচনা করেন—

(১) গঙ্গা লহরী। (এর অপর নাম পীযুষ লহরী।) অনেক পণ্ডিত ভুল করে বলেন এটির রচয়িতা জয়দেব। না। এর রচয়িতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ। এতে ৫২টি কবিতা এবং শেষেরটিতে এর ফলশ্রুতি।

(২) অমৃত লহরী। এ কাব্যটি শার্দ্দুল বিক্রীড়িত ছন্দে যমুনার স্তুতি। ১১টি পদ্য।

(৩) করুণা লহরী। বিষ্ণু বিষয়ে অপরূপ ভাব প্রকাশময় স্তুতি।

(৪) লক্ষ্মী লহরী। এটি লক্ষ্মীর প্রতি ৪১টি পদ্য। এর রচনাভঙ্গী শিখরিণী ছন্দে রচিত।

(৫) সুধালহরী। এ কাব্য সূর্য্য স্তুতির। এটি স্রগধরা ছন্দে ৩০টি কবিতায় সমাপ্ত।

জগন্নাথ লিখিত আখ্যায়িকার নাম আসফ বিলাস। এর আলোচনা একটু আগেই করেছি। সমগ্র গ্রন্থটি এখনও পাওয়া যায় নি। এটি গদ্যে রচিত। আর একটি আখ্যায়িকা প্রাণাভরণ। এ গ্রন্থটিতে কামরূপের রাজা প্রাণনারায়ণের গুণ কীর্তির প্রশংসা প্রশস্তি। সমগ্র গ্রন্থ কবিতায় রচিত। এরই অন্তিম শ্লোকে পণ্ডিত রাজ আত্মপরিচয় দিয়ে লিখেছেন 'তৈলঙ্গান্বয়…। তাঁর আর একটি প্রশস্তি কাব্য 'জগদাভরণ'। এটি পদ্যময়। এতে আছে জয়পুরের রাজা জগৎসিংহের

গুণকীর্তন। এর শেষেও আত্মপরিচয় দিয়ে একটি শ্লোক রচনা করে পণ্ডিতরাজ নিজেকে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

জগন্নাথ তাঁর প্রখ্যাত অলংকার গ্রন্থ রসগঙ্গাধরে 'যমুনাবর্ণন' নামে একখানি নিজের গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এবং তার থেকে শ্লোকও তুলেছেন। কিন্তু সে গ্রন্থটি অদ্যাবধি কোন পুস্তকপ্রকাশক প্রকাশ করতে পারেন নাই, হয়তো তা কালের গর্ভেই সমাধি লাভ করেছে।

পণ্ডিত রাজের ব্যাকরণ শাস্ত্রে প্রতিভাও অতুলনীয়। যদিও সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রে পাণিনি রচিত গ্রন্থের কাছে পরবর্তিকালে রচিত অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থ খুব উচু সম্মানের আসন পায় নি, তবুও বলা চলে অন্যান্য ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতারা তাঁদের প্রতিভা দেখিয়ে পণ্ডিত সমাজে স্বল্প সমাদরও পান নি। পণ্ডিতরাজ গঙ্গাধরের খ্যাতি রসশাস্ত্রে সর্বাধিক। তাই তার দুখানি ব্যাকরণ বিচারণার প্রতিভা পণ্ডিত সমাজে খুব ছড়িয়ে নাই। তবে জগন্নাথের ব্যাকরণ প্রতিভা পণ্ডিত সমাজে অজ্ঞাত নয়। ১। প্রথম গ্রন্থ 'মনোরমা কুচমর্দনী'

এটির উল্লেখ এবং বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন সংস্করণের রসগঙ্গাধরের ভূমিকায়। পুঁথি বা পুস্তক আকারে দেখি নাই। ওইসব ভূমিকার মাধ্যমে জানা যায় এর মনোরমার বিষয়বস্তু হোলো ভট্টোজী দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' ভাষ্য প্রৌঢ় মনোরমারই মতবাদ খণ্ডন।

দ্বিতীয় গ্রন্থটির উল্লেখও ঐসব ভূমিকার মাধ্যমে। এটির বিষয়ও ভট্টোজীর মতবাদ খণ্ডন। ভট্টোজী 'স্ফোটবাদে'র বিচার যে পদ্ধতিতে স্থাপন করেছেন তা পূর্বমীমাংসার রীতিতে। কিন্তু জগন্নাথ পণ্ডিত বেদান্তের অদ্বৈতবাদের আশ্রয়ে তা খণ্ডন করেছেন। পণ্ডিতরাজ বলেছেন 'অপ্যয্যদুগ্র্হ বিচেচিত চেতনানাং...

এছাড়া পণ্ডিতরাজের নামে অনেকে রতিমন্মথ নাটক বসুমতী পরিণয় নাটক অল্লোপনিষদ এই তিন খানি গ্রন্থকেও চালাতে চান। সেটা ঠিক নয়। কারণ জগন্নাথ নামধারী এই কয়েকজন পণ্ডিতও ছিলেন (১) তাঞ্জোরবাসী জগন্নাথ। (২) জয়পুরবাসী সম্রাট জগন্নাথ। (৩) জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন (৪) জগন্নাথ মৈথিল। (৫) শ্রীনিবাস জগন্নাথ। (৬) জগন্নাথ মিশ্র। (৭) জগন্নাথ সুরি। (৮) নারায়ণ দৈবজ্ঞ সুতজগন্নাথ। (৯) জগন্নাথ। এদের প্রত্যেকেরই রচনা আছে।

(১) প্রথম জগন্নাথ অশ্বঘাট—(২) রতি মন্মথ (৩) বসুমতী—রচনা করেন!

দ্বিতীয় জগন্নাথের রচনা :—(১) রেখা গণিত। সিদ্ধান্ত সম্রাট। সিদ্ধান্তকৌস্তভ।

তৃতীয় জগন্নাথের রচনা :—বিবাদ ভঙ্গার্ণব

চতুর্থ জগন্নাথের রচনা :—অতন্দ্র চন্দ্রিকা নাটক

পঞ্চম জগন্নাথের রচনা :—অনঙ্গ বিজয় ভাণ।

ষষ্ঠ জগন্নাথের রচনা :—সভাতরঙ্গ।

সপ্তম জগন্নাথের রচনা :—অদ্বৈতামৃত।

অষ্টম জগন্নাথের রচনা :—সমুদায় প্রকরণ।

নবম জগন্নাথের রচনা :—শরভরাজ বিলাস।

অতএব সেই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের নামে ওসব গ্রন্থের প্রচার ঠিক নয়।

পণ্ডিতরাজের দুখানি গ্রন্থই তাঁকে অমর করে রেখেছে। একটি ভামিনী বিলাস দ্বিতীয়টি রসগঙ্গাধর।

ভামিনী বিলাস গ্রন্থটি কোষকাব্য। এতে চারটি বিলাস। (১) প্রাস্তাবিক বিলাস। (২) শৃঙ্গার বিলাস। (৩) করুণ বিলাস (৪) শান্ত বিলাস।

দ্বিতীয় গ্রন্থ রস গঙ্গাধর।

এ গ্রন্থটিতে পণ্ডিতরাজ অলংকার শাস্ত্রের সুখ্যাতি সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কি কি রূপ নেয়, সেই গুলিই মানব মনের অলংকার—অর্থাৎ জীবন সাহিত্যের অলংকরণ। এই অলংকারের দ্বারাই মানব মানবীয় মন শোভা পায়, তারই দ্বারা ঔচিত্য রীতি, ধ্বনি এবং অনুমিতি উপমিতির সাহায্যে সমগ্র জীবনের ভাব ভাষা দেশ কাল পাত্র এবং বিবর্তিত সমাজের অবস্থাকে স্বীকার করে বিশ্বের জীবন রস আস্বাদন করে।

সাহিত্যের রসই জীবনের রস। আবার জীবনের রসই সাহিত্যের রস। উভয়ের প্রকাশই সমাজের প্রতিটি স্তরে স্তরে পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে। এইটিই অনাদি অনন্ত কালের জীবন বেদ।

অসাধারণ প্রতিভার দ্বারা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ এই দ্বিতীয় গ্রন্থের রচনা করেছেন। আর প্রথম গ্রন্থটিতো কাব্য সাহিত্য জগতে 'মুক্তক কাব্যের' সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ আদর্শ গ্রন্থ।

ভারতীয় সাধনার ধারা

প্রিয়দারঞ্জন রায়

বেদ, উপনিষদ ও দর্শনের যুগ থেকে সুরু করে ভারতে সাধনার যে সব ধারা প্রবর্তিত হয়েছে, তাদের প্রায় সবারই মূলে রয়েছে আস্তিক্যবুদ্ধি বা ঈশ্বরবাদের ভিত্তি। ঈশ্বরবাদ বলতে বোঝায় বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা ও অধিষ্ঠাতারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস। উপনিষদে ঈশ্বর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পুরুষোত্তম নামে অভিহিত, এবং ব্রহ্মকে বলা হয়েছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সর্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'—এর অর্থ ব্রহ্ম একক, অদ্বিতীয় সৎ বা সত্বস্ত এবং তিনি সর্বব্যাপী, বা যা কিছু আছে সবই ব্রহ্ম। এরই পুনরুক্তি আমরা দেখতে পাই গীতার সপ্তম ও দশম অধ্যায়ে—

'মত্ত পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগনা ইবং॥

'হে ধনঞ্জয়! আমা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বিশ্বজগতে কিছু নাই। সূত্রে মণিগণের মত এই সকল আমাতে গ্রথিত আছে।'

'যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্।'

'হে অর্জুন! যাহা সর্বভুতের বীজ তাহাও আমি। চরাচরে সর্বভুতে আমা হইতে ভিন্ন কিছু নাই।'

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।'

'আমি এই সমস্ত বিশ্বজগৎ একাংশ দ্বারা ধারণ করিয়া আছি।'

বেদান্ত মতে এই একক সর্বব্যাপী ব্রহ্মস্বরূপতঃ নিরাকার নির্বিকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয় ও অব্যক্ত। উপনিষদে আছে, এই একক অব্যক্ত, ব্রহ্ম বহু হবার অভিলাষ করেন—'একোঽহং বহুস্যামি।' এই অভিপ্রায় পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি (পরমেশ্বর) এই বিচিত্র বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করে আপনাকে ব্যক্ত করেছেন তিনটি ঐশ্বর্যের বা গুণের মহিমায় বা প্রাধান্যে। এ তিনটি ঐশ্বর্য বা গুণের নাম হচ্ছে (১) তামসিক ঐশ্বর্য বা তমোগুণ, (২) রাজসিক ঐশ্বর্য বা রজোগুণ ও (২) সাত্বিক ঐশ্বর্য বা সত্বগুণ।

গীতায় ঈশ্বরের দুই প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ আছে পরা প্রকৃতি এবং অপরা প্রকৃতি—

'ভূমিরা পোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি রষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীব ভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥'

'ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্, মনবুদ্ধি ও অহংকার—এই অষ্ট প্রকারে তোমার প্রকৃতি বিভক্ত।

কিন্তু এটি অপরা; ইহা অপেক্ষা পরা আমার অন্য একটি জীবস্বরূপা প্রকৃতি অবগত হও যাহা

যারা হে মহাবাহো ! এই জগৎ বিধৃত রহিয়াছে।'

পরা প্রকৃতির প্রকাশ হয়েছে মানবাত্মা বা জীবাত্মায় এবং অপরা প্রকৃতি হচ্ছে অষ্টবিধ এবং এর প্রকাশ হয়েছে পঞ্চসূক্ষ্ম ও পঞ্চস্থূলভূতে (তামসিক অহংকারে),—দশইন্দ্রিয় (রাজসিক অহংকার) এবং মন ও বুদ্ধিতে।

বিজ্ঞানীদের সমীক্ষায় জানা যায় যে জগতের সব কিছুই চঞ্চল ও গতিশীল,—কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকা সবাই অহরহ প্রচণ্ড বেগে মহাশূন্যে ছুটে চলেছে। জগৎ চঞ্চল বলিয়াই অপূর্ণ এবং পূর্ণতাকে ব্যক্ত করিবার তার এই প্রচেষ্টা। জগতের বৈচিত্র্যের রূপের মধ্যেই আমরা অপরূপের সন্ধান পাই এবং উহা আমাদের আত্মাকে অনির্বচনীয় আনন্দে নিমগ্ন করে। কিন্তু এই চঞ্চল গতিশীল জগতের অন্তঃস্থলে একটি স্থিতি বা সত্যের এবং নিয়মের বাঁধন রয়েছে—এই সত্য বা নিয়মেই ঈশ্বরের শান্তস্বরূপ ব্যক্ত আছে। এ কারণেই জগৎ দেশ কালে আবদ্ধ এবং প্রাকৃতিক অলঙ্ঘ্য নিয়মে বিধৃত। বিজ্ঞানীরা জগতে তাই আবিষ্কার করেছেন—কার্যকারণের শৃঙ্খলা এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা, বেদের ভাষায় ইহাকে 'ঋতম' বলা হয়।

মানব সমাজ অপূর্ণ ও দুঃখময় বলিয়াই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবার অহরহ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। মাঙ্গলিক কার্যে এতেই ভগবানের রাজসিক ঐশ্বর্যের বা রজোগুণের কথা দেখি। মানবাত্মা অপূর্ণ বলিয়াই নানা ভেদবিভেদের বৈশিষ্টে আমাদের চিত্ত অহরহ প্রতিহত হচ্ছে। তাই মানবাত্মা ঐক্যের দ্বারা এই ভেদবিভেদের দুঃখ এড়াবার জন্য সর্বদা প্রচেষ্ট। প্রেম এই ভেদবিভেদের মধ্যেও ঐক্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে। এখানে ভগবানের প্রেমের মহিমায় সত্বগুণের প্রকাশ হচ্ছে। তাই উপনিষদে, ঈশ্বরকে বলা হয়েছে—শান্তম্ শিবম্, অদ্বৈতম্।

মানবজীবন দুঃখময় একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই দুঃখ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রমতে তিন প্রকার :—(১) আধিভৌতিক—জড়া, ব্যাধি, মৃত্যুভয় ইত্যাদি। (২) আধিদৈবিক—প্রাকৃতিক দুর্যোগ যথা ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, দাবানল, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি এবং (৩) মানসিক ও আধ্যাত্মিক—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও বিরহ, হিংসা, দ্বেষ, কলহ ইত্যাদি, ও সংসারে সুখ ও শান্তির অনিত্যতা। আধিভৌতিক দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তি মানুষ করতে সক্ষম হয়েছে বিজ্ঞান চর্চার ফলে। আধিদৈবিক দুঃখেরও বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি ঘটেছে, মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখের নিবৃত্তির কোন উপায় জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে সম্ভব হয় না। তাই সকল দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি এবং পরমাশান্তির ও আনন্দের অভিপ্রায়ে যুগ যুগান্ত ধরে মানুষ যে সব সাধনার পথ অবলম্বন করেছেন তার মূলে রয়েছে ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস একথা গোড়াতেই বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলতে পারেন বুদ্ধদেবের প্রচারিত সাধনার পথ ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সত্য বটে বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি—কিন্তু বুদ্ধের নির্বাণে, ঐকান্তিক দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে বলা হয়েছে। ইহা বেদান্তের ব্রহ্মনির্বাণের রূপান্তর বল্লে অত্যুক্তি হয় না। বেদান্তমতে, ভগবান সত্য, মঙ্গল ও প্রেমময়—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। যা সুন্দর তা আমাদের আনন্দ দেয় ; তাই সুন্দরকে আমরা ভালবাসি, তার সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করতে ব্যাকুল হই। এ কারণে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হচ্ছে ভগবৎ উপলব্ধি, যার ফলে আমরা পরম জ্ঞান, পরম সত্য,

শাশ্বত আনন্দ ও শান্তি লাভ করতে পারি। এর জন্যেই সাধনা করতে বা তপস্যা করতে হয়। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকে বা সামাজিক জীবনকে কল্যাণে ও আনন্দে পরিপূর্ণকরে সকল দুঃখের নিবৃত্তি করবার উদ্দেশ্যে যুগযুগান্ত ধরে মানুষ সাধনা করে আসছে। ব্যক্তিগত জীবনে সাধনার ফলে মানুষের মুক্তি বা মোক্ষলাভ হয়। এই মুক্তি বা মোক্ষকেই বলা হয় দেহের ও সংসারের বন্ধন হেতু পুনর্জন্ম থেকে মানবাত্মার নিষ্কৃতি বা ব্রহ্মনির্বাণ। অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার মিলন।

আমাদের দেশে সাধনা সাধারণতঃ ভগবানের শক্তির বা ঐশ্বর্যের উপাসনা ও ধ্যান ধারণায় সীমাবদ্ধ বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে ভগবানের তিন প্রকার ঐশ্বর্য—তামসিক, রাজসিক এবং সাত্বিক। তামসিক বা রাজসিক ঐশ্বর্য ব্যপ্ত হয়েছে জগতে ও মানবসমাজে অপরিসীম শক্তির প্রকাশে, সাত্বিক ঐশ্বর্য ব্যপ্ত হয়েছে তাঁর প্রেম স্বরূপে বা সৌন্দর্যের বিকাশে। অপর কথায় বলা যায় তাঁর অপরা প্রকৃতি রূপ নিয়েছে শক্তির ক্ষেত্রে এবং পরা প্রকৃতি রূপায়িত হয়েছে প্রেমের ক্ষেত্রে। আগেই বলা হয়েছে যে বিজ্ঞানীদের সমীক্ষার জগতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনু পরমানু হতে অতিকায় গ্রহ, উপগ্রহ সূর্য, নক্ষত্র ও নীহারিকাপুঞ্জ সবাই চঞ্চল ও গতিশীল অধিকন্তু অনু পরমানুর মধ্যেও অপরিসীম শক্তি আছে অবরুদ্ধ হয়ে। এই শক্তির আমরা দুটি মূর্তি দেখতে পাই—একটি তার অন্নপূর্ণা মূর্তি—মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজের বহুবিধ কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। কিন্তু শক্তির আর একটি মূর্তি আমাদের নিকট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—সেটি হচ্ছে তার সংহার বা করালী কালী মূর্তি যার প্রয়োগে গোষ্ঠীবদ্ধ মানব সমাজ পরস্পর হিংসা ধ্বংসের জন্য উদ্যোগী। আমাদের শাস্ত্রে মানবজীবনের উদ্দেশ্য হিসাবে বলা হয়েছে আত্যন্তিক বা সকলপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সাধনার প্রয়োজন। ভগবৎ উপলব্ধিতেই এই সাধনার সম্ভব—ইহাকেই মুক্তি বা মোক্ষ বলে। ভগবানের উপলব্ধির জন্য মানুষ যুগে যুগে সাধনা করে আসছে তাঁর শক্তির ক্ষেত্র ও প্রেমের ক্ষেত্রকে অবলম্বন করে। আমাদের দেশেও প্রাচীন কাল হতে প্রবর্তিত হয়েছে দুটি বিশিষ্ট সাধনার পথ—শক্তির সাধনা এবং প্রেমের সাধনা।

শক্তি-সাধনায় দুটি শাখা যাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ ও তাঁর সত্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপের সাধনা। জ্ঞান বলতে বুঝায় সেই জ্ঞান যাতে সত্যের প্রকৃত স্বরূপের উদ্‌ঘাটন হয়। যা চরম সত্য বা সামগ্রিক জ্ঞান তাই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান। অন্য শাখা হচ্ছে কর্মযোগ—এই জ্ঞান বা সত্যকে যখন ভাবে পরিপাক করে, কর্মের প্রকাশ পায়, তখন মানুষ অনাসক্তভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত জনহিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হয়—একে বলা হয় কর্মযোগ।

প্রেমের ক্ষেত্রে ভগবৎ উপলব্ধির যে সাধনা তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ। যেখানে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও প্রীতি নাই, তাকে প্রেম বলা যায় না, সাধনার এই তিনটি পথে যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁরাই জগত-বরণ্য মহাপুরুষ বলে পূজনীয় হয়েছেন। সাধারণতঃ বুদ্ধদেবের নির্বাণ-মুক্তির পথ ও বেদান্তের অদ্বৈত সাধনার বা ব্রহ্ম-নির্বাণ মুক্তির পথ এবং নিরীশ্বর কপিল-সাংখ্যের নির্দেশিত সাধনা বা কৈবল্য-মুক্তির পথকে জ্ঞানযোগ বলা যায়। পাতঞ্জল সাংখ্যের সাধনার পথকে কর্মযোগ বলা হয়েছে। জনক রাজা হচ্ছেন কর্মযোগীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যীশুখ্রীষ্ট ও শ্রীগৌরাঙ্গের ধর্মে আমরা প্রেমের-ক্ষেত্রের সাধনা বা ভক্তিযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানীরা সত্যের ও জ্ঞানের সন্ধানে গবেষণায় নিমগ্ন আছেন। কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিজ্ঞানের পথে ব্রহ্মের বা পরম সত্যের কিংবা সামগ্রিক জ্ঞানের উপলব্ধি সম্ভব নয়। কেন না বিজ্ঞানের ভিত্তিতে যে জ্ঞান বা সত্যের বিকাশ হয় তা দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ এবং মানুষের সীমিত বুদ্ধিবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই বলা হয়। জ্ঞানযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ অব্যক্ত বা নিরাকার ব্রহ্মের সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। গীতায় বলা হয়েছে—

'ক্লেশোঽধিক তর স্তেষাম ব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তাহি গতিদুঃখং দেহবদ্ভির ব্যাপ্যতে।'

'অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে; কারণ, দেহিগণ নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক নিষ্ঠা অতি কষ্টে লাভ করিয়া থাকে।'

প্রেমকে অবলম্বন করে যে সাধনা—তাই হলো আমাদের দেশের বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি। এই ধর্মে রাধা (জীবাত্মা রূপে ব্রহ্মের পরা প্রকৃতি) এবং কৃষ্ণর (ব্রহ্মস্বয়ং) প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পুরাণে এবং বিশেষতঃ ভাগবতে এই ধর্মের বিশদ বিবরণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা দেখা যায়। মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের পতনোন্মুখকালে আমাদের দেশে শক্তির ক্ষেত্র ও প্রেমের ক্ষেত্রর মিশ্রণে আর একটি সাধনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। শিব (ব্রহ্ম) এবং পার্বতী (পরাপ্রকৃতি) কে কেন্দ্র করে এই ধর্মের সাধনার রীতি প্রচলিত হয়েছে। ইহাকে তান্ত্রিক সাধনা বলা হয়। তান্ত্রিক সাধনায় উপাস্য অধিষ্ঠাত্রী দেবী হচ্ছেন—শ্যামা বা কালী (ব্রহ্মময়ী শিবজায়া অর্থাৎ ব্রহ্মের পরাপ্রকৃতি) কালী সাধারণতঃ শক্তির সংহার মূর্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য। বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে এ সাধনার বিস্তারিত বিবরণ ও তাত্ত্বিক আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এ সাধনার পদ্ধতি একপ্রকার সাধারণের নিকট গুপ্ত ও রহস্যে আবৃত। এ সাধনায় যারা সিদ্ধিলাভ করেন, তারা অনেক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হন—এরূপে জনশ্রুতি আছে। পাতঞ্জল দর্শনে যে যৌগিক সাধনার কথা আছে, তাতেও যারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁরাও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন,—এ বিবরণ তাতে লিপিবদ্ধ আছে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই অলৌকিক শক্তির উৎস কোথায়? পূর্বেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অব্যক্ত ব্রহ্ম আপনাকে ব্যক্ত করেছেন—বিশ্বরাজ্যের দুই ক্ষেত্রে—শক্তির ক্ষেত্রে ও প্রেমের ক্ষেত্রে। শক্তির ক্ষেত্রে তিনি আপন শক্তিকে নিয়মের বাঁধনে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন। জড়জগৎ হচ্ছে এর দৃষ্টান্ত। কবির ভাষায় বলা যায়—

'আপনি বিধাতা বাঁধা আছেন সৃষ্টি বাঁধন পরে।' বিজ্ঞানীরা এ-সব প্রাকৃতিক নিয়ম বা সত্যের আবিষ্কার করেন, তাঁদের গবেষণায়। কিন্তু যেখানে তিনি প্রেমের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যক্ত করেন যথা মানবাত্মা—যেখানে তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন ইচ্ছাকে ভক্তের ইচ্ছাধীন করেন। ইহাই প্রেমের ধর্ম। তাই ভক্তসাধক যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই বিধাতা ভক্তের ইচ্ছা পুরণ করতে দ্বিধা করেন না। অতএব, প্রকৃত নিষ্ঠাবান ভক্ত অনেক সময় ইচ্ছা করলে অঘটন ঘটাতে পারেন। অনেক ভক্তের জীবন চরিতে এরূপ অঘটন ও তাঁদের অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের দৃষ্টান্তের বহু বিবরণ আছে। ভক্তসাধক তার দুটি হাত উর্ধদিকে তুলে শূন্য হতে নানা ফল, মিষ্টিদ্রব্য, মূল্যবান শিল্পজাত

পদার্থ, ঔষধ ঔষধি ইত্যাদি বিবিধ বস্তু হস্তগত করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ লেখকও তারমধ্যে একজন। এ গুলিকে হস্ত কৌশল, যাদু বা সম্মোহনী বিদ্যা বলে গণ্য করার কোন প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। এখানে আমরা ভক্তের ইচ্ছা শক্তিতেই যে এসব অঘটন ঘটে কিংবা অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন দেখা দেয়, একথা বল্লে অত্যুক্তি হবে বলে মনে করি না। এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা অন্য কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ আছে কিনা জানি না।

অনেকেই হয়তো জানেন যে ফরাসী, জার্মান ও মার্কিন দেশে কোন কোন গির্জার পুরোহিত বহু দুঃসাধ্য ও দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত রুগীদের জন্য প্রার্থনা করে তাদের রোগমুক্ত করেন। এ-সম্বন্ধে বিশ্বাস বা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও দলিল পত্রাদি আছে। এ পদ্ধতিতে রোগ মুক্তিকে 'Christian healing' অর্থাৎ 'খ্রীষ্টিয় রোগ মুক্তি বলা হয়' অলৌকিক শক্তির ইহাও একটি দৃষ্টান্ত। নিরীশ্বরবাদী অনেক বৈজ্ঞানিকেরা এ প্রকার অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তিকে কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতে কুণ্ঠিত হন। কারণ বিজ্ঞানের মতে বিশ্বজগতে যা কিছু ঘটে তা সবই প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্তী এবং বিশ্বরাজ্যের সকল ঘটনা দেশ এবং কালে বিভক্ত কার্যকারণ শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত এবং প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। বিজ্ঞানের প্রকৃতির রাজ্যে কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীন ইচ্ছার স্থান নাই। কাজেই অলৌকিক শক্তি—যা প্রকৃতির নিয়মের অধীন নয় তার কোন অস্তিত্ব বিজ্ঞানের রাজ্যে থাকতে পারে না। বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শন মতে সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় ঈশ্বর বা একক অব্যক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বহু হবার ইচ্ছায় আপনাকে ব্যক্ত করলেন বিশ্বভুবন সৃষ্টি করে। এই একক, অব্যক্ত ঈশ্বরের 'পরা ও অপরা' নামে দুটি প্রকৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে।

একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে মানব জীবন দুঃখময়। মানুষ সারা জীবন দেহের ও মনের দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হয়ে দিন কাটায়। কিন্তু সুখ তাকে ফাঁকি দেয়। সাময়িকভাবে দুঃখের পরিত্রাণ ও সুখের উপভোগ হলেও তা চিরস্থায়ী হয় না। জন্মজন্মান্তরব্যাপী এই আত্যন্তিক দুঃখ হতে মুক্তি এবং শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের জন্য যুগযুগান্তর ধরে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও জ্ঞানীজন কঠোর সাধনা করে গেছেন। এই মুক্তিসাধনার বিভিন্ন ধারার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রহ্ম সংস্পর্শ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি হতে তারা জেনেছেন যে—এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়। এর ফলে দেহের সকল ক্লেশ ও গ্লানি এবং সংসারের সকল বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করে সাধক আনন্দরূপে অমৃতত্ব পায়—আনন্দরূপম অমৃতত্বম্ এবং চিরস্থায়ী আত্যন্তিক সুখ উপভোগ করে। এই আত্যন্তিক সুখের অবস্থার কথা গীতায় উল্লেখ করা আছে—

'সুখ মাত্যান্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতে তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুনাপি বিচাল্যতে ॥

'যে অবস্থায় যোগী বুদ্ধিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়াতীত আত্যন্তিক সুখ তাহা অনুভব করেন এবং যে অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচলিত হন না, এবং যাহা লাভ করিয়া অন্যলাভকে তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে করেন না এবং যাহাতে অবস্থিত থাকিয়া গুরুতর দুঃখেও বিচলিত

হন না তাহাই যোগ উপনিষদে আছে ভূমৈব সুখ, নাল্পে সুখমস্তি—ভূমাতেই (সম্পূর্ণেই) সুখ, অল্পে নয় ।

সাধনার এইসব ধারার প্রধান অঙ্গ—সেবা, ত্যাগ, অহিংসা, প্রেম, জীবে দয়া, সর্বভূতের কল্যাণ কামনা। ধ্যান ধারণা, নাম, জপ ও তপ ইত্যাদি। এ-মুক্তি সাধনা দুঃখ কষ্টেরই সাধনা—পৃথিবীতে যাঁরা মহাপুরুষ বলে বরণীয় ও পূজনীয় হয়েছেন তাঁরা সবাই দুঃখের অবতার। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজপুত্র সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব, ঈশামহাপ্রভু যীশু, St Fransis Assisi, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ দেব, স্বামীবিবেকানন্দ, পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ মহাপুরুষগণ। আগেই বলা হয়েছে, একক, অদ্বিতীয়, অব্যক্ত ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সৃষ্টিরাজ্যের তিন ভাগে আপনাকে ব্যক্ত করেছেন—জগতে, মানবসমাজে এবং মানবাত্মায়, এবং সৃষ্টি অপূর্ণ। এই অপূর্ণতাই হচ্ছে দুঃখ। সৃষ্টির তত্ত্ব আর দুঃখের তত্ত্ব একই সূত্রে গাঁথা। অপূর্ণ জগৎ অপূর্ণ মানব সম্পদ, এবং অপূর্ণ মানবাত্মা সবাই পূর্ণতার বা মুক্তির প্রয়াসী। তাই সৃষ্টির রাজ্যে ক্রমবিবর্তনের ধারা লক্ষিত হয়। ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মূল ভিত্তি। তাই দুঃখের ভিতর দিয়াই মানুষের মুক্তি। ইহাই দুঃখের মহিমা। এই প্রসঙ্গে খ্রীষ্টের উক্তি মনে আসে—Blessed are the poor in spirit, fortheiss is the kingdom of heaven.

এই অমৃতের বাণী প্রাচীন ভারতের এক মহিয়সী রমণীর মুখ হতে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল। উপনিষদের উপাখ্যানে ঋষি যাজ্ঞবাল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে প্রস্তুত হয়ে তাঁর পত্নী মৈত্রেয়ী দেবীকে বলেছিলেন—'দেখ, আমার ভূ-সম্পত্তি, বাসগৃহ, গরুবাছুর যা কিছু আছে সবই তোমাকে দান করে দিলাম।' তার উত্তরে মৈত্রেয়ীদেবী বল্লেন—'যেনাহম্ অমৃতাস্যাম্, তেনাহং কিং কুর্য্যাম ?'—যা পেলে আমি অমৃত হব না তা দিয়ে আমি কী করব ?' ইহাই ভারতভূমির বাণী। সাধনার সকল ধারারই ইহাই মূল কথা—'অমৃতত্ব লাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধি।'

সাধনা বলতে বোঝায় দুঃখ কষ্টকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে সিদ্ধিলাভ বা ব্রহ্ম উপলব্ধির জন্য প্রচেষ্টা। দুঃখের মূল্যদিয়াই আমরা ঈশ্বরের দানের বা কৃপার অধিকারী হতে পারি—তা হলেই উহা আমাদের স্বোপার্জিত হয়, নতুবা তা আমাদের ভিক্ষার দান হয়ে পড়ে। তাই মনুষ্যত্বের চরম অভিব্যক্তির (ব্রহ্ম উপলব্ধির) আমরা অধিকারী হতে পারি। কেবল দুঃখের মূল দিয়াই, অর্থাৎ সাধনার কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়াই। উপনিষদে আছে—কঠোর তপস্যার পর ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেছিলেন। এ কারণে বলা যায় সাধনার পথ হচ্ছে কঠোর তপস্যা। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তার অনুপম ও অননুকরণীয় ভাষায় যা ব্যক্ত করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করে প্রবন্ধের উপসংহার করি।

'উপনিষদে আছে ঈশ্বরের তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে বাহিরে যাহা কিছু সৃষ্টি করিতে যাই সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়। আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া, ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি, তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে। সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ, সেই জন্য আর এক দিকে বলা হইয়াছে—আনন্দাদ্ধ্যে খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হইতেই এই ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এতবড় দুঃখকে বহন করিবে কে ?……'খ্রীষ্টান শাস্ত্রে বলে ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকল প্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ। মানুষের নিতান্ত আপন সামগ্রী যে দুঃখ, প্রেমের দ্বারা তাহাকে ঈশ্বরও আপন করিয়া এই দুঃখ সংগমে মানুষের সঙ্গে মিলিয়াছেন—দুঃখকে অপরিসীম মুক্তিতেও আনন্দে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—ইহাই খ্রীষ্টান ধর্মের মর্মকথা।'

পরিশেষে এ কথা বল্লে কিছুমাত্র অসঙ্গত হবে না যে Darwin এর ক্রমবিবর্তনবাদ মতানুসারে বহির্জগতে জীবের চরম অভিব্যক্তি ঘটে মানুষে কিন্তু অন্তর্জগতে মানুষের চরম অভিব্যক্তি ঘটতে পারে মানবত্মার ব্রহ্মসংস্পর্শে বা ব্রহ্মনির্বাণে, যার ফলে সে তার আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিজনিত শাশ্বত শান্তি ও আনন্দের অবস্থায় উপনীত হবে।

আমাদের দেশে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হত—প্রথমভাগে বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শক্তি অর্জনের জন্য শিক্ষা বা জ্ঞান সাধনার ব্যবস্থা ছিল। একে জ্ঞানযোগ বলা যায়। মধ্যভাগে বা গার্হস্থ্যাশ্রমে বা সংসারের কর্ম ক্ষেত্রে ছিল সমাজ কল্যাণের জন্য মাঙ্গলিক কার্যের ব্যবস্থা—একে কর্মযোগ বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানে এবং কর্মে মানব জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে না, বা তার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই জীবনের শেষ ভাগে বা বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রেমের সাধনার ব্যবস্থা ছিল—একে ভক্তিযোগ বলা যায়।

আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের অনুশীলনকে জ্ঞানযোগ, এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে গণতান্ত্রিক সমাজবাদী ব্যবস্থাকে কর্মযোগ এবং খৃষ্টীয় ও বৈষ্ণবধর্মের প্রেমের সাধনাকে ভক্তিযোগের সঙ্গে তুলনা করা চলে। মানব জীবনের চরম লক্ষ্য যদি আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির ফলে শাশ্বত শান্তি ও আনন্দ লাভের অবস্থা হয়—তাহলে তা প্রেমের সাধনাতেই সহজলভ্য হতে পারে। তাই জগতের সকল মহাপুরুষ অহিংসা ও প্রেমের বাণী যাতে আত্মপর ভেদা ভেদ ঘুচে যায় এবং সকল মানুষে বা মানবাত্মাতে একই ঈশ্বরের বা পরম আত্মার অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় তারই মহিমা প্রচার করে গেছেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের রচনা

নারায়ণ দত্ত

ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন যখন মারা যান যান কিশোরীচাঁদের বয়স তখন মাত্র এগার। রামনারায়ণ সরকার গুরুমশায়ের পাঠশালার পাট চুকিয়ে তখন তিনি এক মুন্সীর কাছে ফার্সী পড়ছেন। হেয়ার স্কুলে তখনও ভর্তি করে দেননি বাবা রামনারায়ণ মিত্র মহাশয়। কাজেই কিশোর কিশোরীচাঁদের পক্ষে রামমোহনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই হয়। তবে কিশোরীচাঁদের বাবা রামমোহনের অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং তাঁর ধর্ম-পুস্তক ও ধর্ম-সঙ্গীতের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন বলে কিশোরীদের নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যে রামমোহনের ঝোড়ো হাওয়া বইত, সেটা অনুমান করা অন্যায় নয়। অবশ্য শুধু বাড়ীতে কেন, সারা বাঙলাদেশেই তখন রামমোহনের হাওয়া বইতে সুরু করেছে। তাঁর উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের আলোকচ্ছটায় বাঙলাদেশের আকাশ রঙীন। সেই আকর্ষণীয় মানবতা কিশোরীচাঁদকেও মাতিয়ে থাকবে।

বাতাসে উৎসবের গন্ধ। নীল আকাশে হালকা মেঘের ভেলায় কেমন যেন উড়ুউড়ু ভাব। অজস্র শিউলি ফুলে নেয়ে সাদা হয়ে গেছে গাছগুলো। উড়ুউড়ু ভাব হৌসের বাবুদের মনেও। তারা কাজ কামাই করে বাড়ীর জন্যে নানা জামাকাপড় প্রসাধনের সামগ্রীর মধ্যে নানা রঙের ঘুন্‌সি মায় চুঁচুড়ার মাথাঘষা পর্যন্ত কিনতে ব্যস্ত। আঠারশ পঁয়তাল্লিশ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন মাত্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড পণ্ডিত। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা বার করতে সুরু করেছেন। ওল্ড মিশন চার্চে পাদ্রী ওয়ার্লিট্র ডিকন মধুসূদনের মাথায় পুতঃনদীর জল ছিটিয়ে তাঁকে 'মাইকেল' করে ফেলেছেন। সেই ডামাডোলের বাজারে কিন্তু শহর কলকাতার বিদগ্ধজন যা' নিয়ে আলোচনা করছিলেন, সেটা আটত্রিশ পাতা দীর্ঘ একটি ইংরিজি রচনা। বেরিয়েছে 'ক্যালকাটা রিভ্যু'তে। কাগজটা সম্পাদনা করেন পাদ্রী ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডাফ সেকালের সাহেবদের পরিচালিত ইংরিজি কাগজ—'ইংলিশম্যান', 'হরকরা', 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'—সবাই লেখাটার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। যদিও সেকালের প্রথানুযায়ী লেখকের নাম ছিল না লেখার সঙ্গে, তবু কিছুই চাপা রইল না। সবাই সবিস্ময়ে শুনল লেখাটি এক বাঙালী ছোকরার। নাম কিশোরীচাঁদ মিত্র। বয়স তেইশ। যেমন তথ্যসংগ্রহ, তেমনি ভাষা। একেবারে মণিকাঞ্চনযোগ। একটা বাঙালী ছেলে যে এত ভালো ইংরিজি লিখতে পারে, সে যেন প্রত্যয় হয় না। ডাফ সাহেব কাগজের সেই সংখ্যার অন্য একটি লেখায় নিজেই লিখলেন: ইংরিজি শিক্ষা এদেশের ছেলেরা কতটা রপ্ত করতে পেরেছে, এই প্রবন্ধই তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এবং সেই প্রবন্ধের বিষয় ছিল রামমোহন রায়। এই ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার। 'কালকাটা রিভ্যু'তে সেকালে যে সব প্রবন্ধ বেরোত সেগুলি প্রায়ই সমালোচনা। এবং তাদের আলোচনা সূত্র সাধারণতঃ নেওয়া হত তৎসম্পর্কিত প্রকাশিত কিছু পুস্তক থেকে। তাদের ধরে শুকনো সমালোচনা না করে সেই বিষয় নিয়ে সুচিন্তিত, সুদীর্ঘ, মৌলিক সব প্রবন্ধ রচনা করা হত।

রামমোহনের মৃত্যুর পরবৎসরই কলকাতা থেকে প্রকাশিত—'Biographical Memoirs of the late Raja Rammohan Roy with a series of illustrative extracts from his writings:' দ্বিতীয়টি—'Translation of the Abridgement of the Vedanta or Resolution of all the Vedas.' এই বইটি ছাপা হয় লণ্ডনে। আঠারশ' সতেরয়। তৃতীয় বইটি বাংলা বারশ' আশি সালে বেরোয় কলকাতা থেকে রামমোহনের সংস্কৃত রচনার ওপর। নাম—'Apology for the pursuit of final Beautitude, independently of Brahmanical Observations.' এই তিনটি গ্রন্থের উপরে'ই কিশোরীচাঁদের সেই রচনাটি।

এই সব গ্রন্থের সূত্র থাকলেও রামমোহনের এক অপূর্ব সার্থক জীবনী রচনা করলেন কিশোরীচাঁদ। তাঁর প্রবন্ধের প্রস্তাবনায় রামমোহনের যুগটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'It might be called the age of enquiry and investigation',—এই অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই এই নাতিদীর্ঘ জীবনীটি রচনা করেছিলেন কিশোরীচাঁদ এবং বলাবাহুল্য, রামমোহনের অন্যতম আদি সার্থক জীবনীকার হিসাবে বাঙালীর চিরকালের আপনজন হয়ে রইলেন। 'হরকরা' লিখেছিলেন—'...It is altogether the best account we have ever seen of Rammohan.' বিশেষ করে রামমোহনের জীবনের প্রথমার্ধের এত ভাল বিবরণ আর কেউ আগে লিখেছেন বলে জানা যায়নি। রামমোহনের জীবনাকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সুবিপুল গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে কিশোরীচাঁদের কৃতিত্ব স্বীকার করেছেন বলে জানা যায়। রাজনারায়ণ বসুও তাঁর আত্মচরিতে কিশোরীচাঁদের এই রচনার কথা বলেছেন। লিখেছেন: আমি উক্ত জীবনী রচনায় বিলক্ষণ সাহায্য করি। রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় অনেক গল্প আমার পিতার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে দিই।'

এই লেখাই কিশোরীর সৌভাগ্য সূচনা করে। সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই লেখা পড়েই তাঁকে বিচার বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট করে দেন। সে কাহিনী অবশ্য আমাদের প্রবন্ধের বিষয় নয়। কিন্তু যেটা উল্লেখ্য, তার বৈষয়িক উন্নতি কিশোরীচাঁদকে লেখক জীবন থেকে সরিয়ে আনতে পারেনি। মাত্র একান্ন বছর বেঁচেছিলেন তিনি। কিন্তু সারা জীবনই তিনি লিখে গেছেন; যদিও, বলাবাহুল্য, কোন উন্নত রীতি সামনে না থাকার জন্যেই হোক বা দাদা প্যারীচাঁদের মত সামর্থ্য না থাকার জন্যেই হোক, বাঙলায় কখনও তিনি লেখেন নি। কিন্তু সেকালের নানা পত্রপত্রিকায় বিশেষ করে 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' কাগজ সম্পাদনার সময় বা কৃষ্ণদাস পালের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' বা গিরিশ ঘোষের 'বেঙ্গলী' বা লালবিহারীদে'র 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' নামে বা নাম না দিয়ে বহু লেখাই তাঁকে লিখতে হয়েছে এই অনুমান মিথ্যে নয়।

দুঃখের কথা, কিশোরীচাঁদের এই রচনা বা বক্তৃতা সংগ্রহের কোন সামগ্রিক আয়োজন কখনই করা হয়নি। তাঁর কিছু কিছু রচনা সঙ্কলনের কথা জানা যায়। শোনা যায়, মহেন্দ্র সরকার কিশোরীচাঁদের নাতনীকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচালে মিত্তির মশায় তাঁকে কিছু পুরস্কার দিতে চান। মহেন্দ্রলাল চান কিশোরীচাঁদের রচনা সংগ্রহ।

সে যাই হোক, কিশোরীচাঁদের রচনা ও বক্তৃতাগুলি বাঙালীর রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। সেগুলি থেকেই জানা যাবে বাঙালীর চিন্তাধারা কোন খাতে বইছিল; উগ্রপন্থী

তারাচাঁদ একদিকে, অন্যদিকে নরমপন্থীরা—মাঝে পথকেটে চলেছেন কিশোরীচাঁদের মত মধ্যপন্থীরা। এই লেখা আর বক্তৃতাগুলি এই খাতের হদিশ দেবে।

কিশোরীচাঁদের রচনার প্রথম একটি তালিকা তৈরীর চেষ্টা করা হয় 'হিন্দু প্যাট্রিয়টে।' তাঁর মৃত্যুর পর সেই কাগজে যে তালিকা ছাপা হয়, সেটি এই :—

'ক্যালকাটা রিভ্যু'তে প্রকাশিত রচনা :

(1) Hindoo Women (2) Phases of Hindooism (3) Orissa—Past and Present (4) Agriculture and Agricultural Exhibitions in Bengal (5) Rammohan Roy (6) Radhakanta Deb (7) Territorial Aristrocracy of Bengal (i) Burdwan Raj (April, 1872) (ii) Nadia Raj (July, 1872) (iii) Rajahs of Rajshye (iv) Kassimbazar Raj (July, 1873)

'ক্যালকাটা রিভ্যু'র জন্য লেখা কিন্তু কিশোরীচাঁদের মৃত্যুকাল অবধি যেগুলি ঐ কাগজে ছাপা হয়ে ওঠেনি সেগুলি হচ্ছে :

(1) Hindoo Drama (2) Territorial Aristrocracy of Bengal (i) Kuch Behar Raj (ii) Kandy House (3) Foundation stone of the Presidency College

লালবিহারী দে তাঁর বিখ্যাত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' কাগজ বার করেন ১৮৭২ সালের আগষ্ট মাস থেকে। এর যে 'প্রসপেকটাস' ছাপা হয়েছিল, তার মধ্যে যে লেখক তালিকা ছিল তাতে সপ্তম নামটি ছিল বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের। এই কাগজে মাত্র একটি প্রবন্ধটি লিখেছিলেন কিশোরীচাঁদ। লেখাটির সমালোচনা করে 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া (September 12, 1872) লিখেছিলেন : An article by Babu Kishorychand Mitter on Chaitanaya is good, but it is a repetition of what the author has already contributed elsewhere and we were rather surprised to find it in the Bengal Magazine for we were under the impression that the editor had himself written on the subject at some previous time and would have presented to its readers his own thoughts on one of the most interesting events in the history of India. However, it is in excellent hands, and this article alone is worth for more than the Magazine. It had the advantage moreover, in Mr. Day's magazine of reaching a quite different class of readers from any it had before and altogether it will prove of great interest and we believe do real good. ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া যে বলেছেন যে লেখকের এই রচনা পুনরাবৃত্তিমাত্র—সেটা ঠিক নয়। কেন না, এটা আগে কখনও লেখা হিসেবে বেরিয়েছিল বলে মনে হয় না। কিশোরীচাঁদ ডালহৌসী ইনস্টিটিউটে চৈতন্যের ওপরে একটা সারগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন মাত্র। বেঙ্গল ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যায় (September, 1872) চৈতন্যের ওপর কিশোরীচাঁদের এই প্রবন্ধ ছাপা হয়। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে আঠারশ' তেয়াত্তর সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় বেঙ্গল ম্যাগাজিনে (খণ্ড: ২, সংখ্যা: ২)

কিশোরীচাঁদের একটি মনোজ্ঞ জীবনী ছাপেন।

ইণ্ডিয়ান ফিল্ড কাগজে ছাপা কিশোরীচাঁদের লেখা :

(1) **Moffussil Police** [ধারাবাহিকভাবে তিনমাস ধরে (অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ১৮৫৯) বেরিয়ে পরে বই হিসেবে প্রকাশ পায়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'হিন্দুপ্যাট্রিয়টে' এর একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা ছাপেন—আটাশে জানুয়ারী, ১৮৬০]

(2) **Zaminder and Ryot**। এই লেখাগুলি ছাড়া হিন্দু প্যাট্রিয়টে তাঁর বক্তৃতার এক তালিকা দেওয়া হয়। সেটি এই

(ক) বড়বাজারের ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাবে বক্তৃতা :

(1) **on Motilall Seal**

(খ) হেয়ার স্মৃতিসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা :

(1) **on Hindoo College and its founder on 2nd June, 1862 ;**

(2) **on Dwarkanath Tagore**

(গ) আমড়াতলা লিটারারি ক্লাবের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা :

(1) **on Chaitanaya**

(ঘ) বেথুন সোসাইটিতে বক্তৃতা :

(1) **On Hindoo women and their connection with the improvement of the Country (on 11th December, 1862,)**

এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর 'বেথুন সোসাইটি' গ্রন্থে (পৃঃ ৬০-৬১) লিখেছেন—'সোসাইটির দ্বিতীয় অধিবেশন হইল ১১ই ডিসেম্বর, ১৮৬২ দিবসে। এদিন বক্তৃতা দিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। বক্তৃতার বিষয় Hindu women……country অর্থাৎ, হিন্দুনারী এবং ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কিশোরীচাঁদ স্ত্রীজাতির শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহ দান করিতেন। কাশীপুরে নিজবাটীতে তিনি বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহ আন্দোলনেরও তিনি ছিলেন সমর্থক। ভারতবর্ষের উন্নতি প্রচেষ্টায় নারীর সাহচর্য ও সহযোগিতার গুরুত্ব কিশোরীচাঁদ মনেপ্রাণে অনুধাবন করিয়াছিলেন। স্বদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সর্ববিধ উন্নতিতে নারীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উক্ত বক্তৃতায় বিশদরূপে বর্ণনা করেন। স্ত্রীশিক্ষার মাধ্যমে নারীচিত্তের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলেই তবে তাঁহারা পুরুষের সঙ্গে একযোগে স্বদেশের কল্যাণ কর্মে নিয়োজিত হইতে পারিবেন। এজন্য তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত বক্তৃতায় বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেন। একটি কবিতার দুইটি পঙক্তি উদ্ধার করিয়া তিনি তাঁহার মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত করিলেন :

'The Women's Cause is man's : they rise or sink
Together, dwarfed or god like, bond or free'

অর্থাৎ নর এবং নারী উভয়েরই সমস্যা এক ; তাহারা একত্রে উঠিবেন বা নাবিবেন দেবতার মত বা বামন হইয়া, দাস অথবা স্বাধীনরূপে।

এদিনকার সভায় দেশী-বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন—বঙ্গের ছোটলাট স্যার সিসিল বীডন, বড়লাটের আইনসভার সদস্য, পদস্থ কর্মচারী, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, দিগম্বর মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন সিসিল বীডন, রাজা কালীকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দ্বারকানাথ ঘোষ, যদুনাথ বসু, নবীনচন্দ্র বড়াল এবং যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। 'বাগলমশায়ের পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে শুধু এটাই সন্দেহ জনক কিশোরীচাঁদ কি বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন তাঁর কাশীপুরের বাড়ীতে? আরামবাগের চাকরি থেকে কলকাতায় বদলি হয়ে কিশোরীচাঁদ তাঁর পৈত্রিক নিমতলাঘাট বাড়ীতে না উঠে কাশীপুরের গঙ্গার তীরে এক বাগানবাড়ীতে থাকেন। কিন্তু আঠার শ' পঞ্চান্ন সালের সতেরই জুন তিনি পাইকপাড়ার এক নম্বর দমদম রোডের বাগানবাড়ীতে উঠে আসেন। এই নতুন বাড়ীটি তাঁর কেনা। আগেরটা বোধহয় ভাড়া। কাজেই কাশীপুরে তাঁর নিজবাটি এল কোত্থেকে?

(2) On Agriculture with special reference to the exhibition lately held at Alypore (on 10th March, 1864)

এই বক্তৃতাটি সম্বন্ধে যোগেশ বাগল মশায় তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন (পৃঃ ৬৯) তিনি বক্তৃতায় প্রাচীনকালে বিভিন্ন দেশের কৃষি অবস্থার উন্নতি এবং সেই সঙ্গে সভ্যতা সংস্কৃতি বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সাহিত্য-দর্শন ধর্মচিন্তা প্রভৃতি মূলে যে কৃষিকার্য কত রসদ জোগাইয়াছে তাহা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞানের কৌশলাদি, এই কৃষির দ্বারা উৎকর্ষলাভ করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের ভারতবর্ষ ইহার এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। সমাজের এতবড় হিতকর বিষয়ে তৎকালীন সরকার যে অবহিত হইয়াছেন তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেন যে, সরকার এ যাবৎ এই বিভাগে উল্লেখযোগ্য কিছুই করেন নাই।'···কিশোরীচাঁদের এই বক্তৃতার আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পাদ্রী ড্যাল, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, মহেন্দ্রলাল সোম, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, যদুনাথ ঘোষ এবং তৎকালীন সভাপতি পাদ্রীজোসেফ মুলেন্‌স। এঁরই স্ত্রী ক্যাথেরিণ মুলেন্‌স্ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ-এর লেখিকা।

(3) On Lessons of Famine (on 13th December, 1866)

যোগেশচন্দ্র এই সভার কথা বলেছেন। এটি বেথুন সোসাইটির চতুর্দ্দশতম বৎসরের দ্বিতীয় সভা। কিন্তু কিশোরীচাঁদের এই বক্তৃতার কথা তিনি উল্লেখ করেন নি।

(ঙ) বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স এ্যাসোসিয়েশনে (মিস মেরী কার্পেণ্টার ও রেভারেণ্ড লঙ্ এই 'বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞানসভা'র প্রতিষ্ঠা করেন) বক্তৃতা:

(1) On the progress of Education in Bengal (on 24th July, 1867)

(2) On the festivals of the Hindoos (on 30th January, 1868)

(চ) ডালহৌসী ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা:

(1) On Chaitanya

কিশোরীচাঁদের জনসভায় বক্তৃতার তালিকা:

(ক) শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা সভা—টাউন হল—দোসরা জুলাই, ১৮৭০

(খ) ছোটলাট সার জন পিটার গ্রাণ্টের সম্মানে আয়োজিত সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ষোলই এপ্রিল, ১৮৬২

(গ) সেক্রেটারী অফ ষ্টেট—সার চার্লস্ উডের সংবর্ধনা সভায় ঐ—সাতই মার্চ, ১৮৬৩

(ঘ) মিষ্টার ফসেট এম, পি ও ব্রাইটনের ভোটদাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাতার্থে অনুষ্ঠিত সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—ছাব্বিশে নভেম্বর, ১৮৭২

(ঙ) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের স্মৃতিসভা সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—উনত্রিশে অক্টোবর, ১৮৬৮

(চ) 'ব্ল্যাক অ্যাক্টের স্বপক্ষে সভা—টাউন হল, ৬ই এপ্রিল, ১৮৫৭। আঠারশ' পঞ্চাশ নাগাদ স্যার সিসিল বীডন, তৎকালীন ব্যবস্থা-সচিব চারটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন—

(1) Draft of an Act abolishing excmption from the Jurisdiction of the East India Company's criminal Courts

(2) Draft of an Act declaring the privileges of Her Majesty's European Subjects

(3) Draft of an Act for the protection of Judicial officers

(4) Draft of an Act for trial by jury in the Company's Courts.

বলাবাহুল্য, এ সবই কলকাতার ইংরাজ রাজপুরুষ ও ইংরাজ নাগরিকদের অপ্রতিহত প্রতাপ খর্বের সাধু প্রয়াস মাত্র। এইসব আইনের খসড়া থেকে এটাই দিবালোকের মত স্পষ্ট যে সেকালের 'ছোট' ইংরেজরা কেবলমাত্র প্রজাদের ওপর চাবুক চালিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে যে সব বাঙালীরা কোম্পানীর 'জুডিসিয়াল সার্বিসে' ঢুকতে পেরেছিলেন—হরচন্দ্র, তারাচাঁদ বা, কিশোরীচাদ প্রমুখ নব্য বাঙালীর দল—তাদেরও ধলা সাহেবদের অত্যাচার থেকে বাঁচাবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন আর কেউ নয়, ল' মেম্বার সিসিল বীডন স্বয়ং। সে যাই হোক, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে চারটে আইনের খসড়া পেশ হতেই ইংরেজরা ত তেলেবেগুনে জলে উঠল; বীডনের ওপর মহা খাপ্পা! তাদের বশম্বদ কাগজে এর বিরুদ্ধে কড়া লেখালিখি। আইনগুলোকে তারা বললে কালা আইন।

সরকারকে সমর্থন করতে যারা এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ। একটা চটি বই ছাপলেন—'A Few Remarks on Certain Draft Acts, commonly called Black Acts।' ইয়ং বেঙ্গল বেশ নাড়াচাড়া দিলেন। কিন্তু কিছুই হল না। লণ্ডনের নির্দেশে ওইসব আইন ধামাচাপা পড়ে গেল। সিসিল বীডন তো মারাই গেলেন। লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রে তাঁকে কবর দেওয়া হ'ল। এবং তাঁর সঙ্গেও, বলাবাহুল্য, তাঁর আইনের। মাঝ থেকে নিতান্ত অপমানজনকভাবে রামগোপাল ঘোষকে তাড়িয়ে দিলে সাহেবরা কেরি সাহেবের এগ্রিহর্টিকালচারাল সোসাইটি থেকে।

সে যাই হোক, যারা মনে করলেন, আগুন নিভে গেল, তাঁরা ভুল করলেন। ক্ষিপ্ত, অসহায়

বাঙালীরা প্রিন্স দ্বারকানাথের নেতৃত্বে করলে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোলডার্স এ্যাসোসিয়েশন আর রাধাকান্ত দেবকে সভাপতি করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। এটির উদ্যোক্তা প্রখ্যাত জননেতা জর্জ টমসন। এই দুটো সংস্থা নিয়েই হল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যার সম্পাদক হলেন দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। সরকারী চাকুরী যাওয়ার পর কিশোরীচাঁদও এর অন্যতম কর্মকর্তা হয়ে ওঠেন।

এখন, ব্ল্যাক আক্টের সমর্থনে বাঙালীর যে লড়াই—সেটা বীডন সাহেব মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একরকম চাপা পরে গেলেও আঠারশ' সাতান্নর সন্ধিক্ষণে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজে' লিখেছেন, 'কালা আইন (Black Acts) এর আন্দোলনের উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি। সে আন্দোলন একবার উঠিয়া থামিয়াছিল মাত্র। ১৮৫৭ সালের প্রারম্ভে আবার সেই আন্দোলন উঠে।...দেশের মান্যগণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল মাসে টাউন হলে এক সভা করিলেন। ঐ সভাতে কোর্ট অব ডাইরেক্টারদিগের নিকটে প্রেরণের জন্য এক আবেদন-পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদনপত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল।' (পৃঃ ২৮৫) (ছ) প্রসন্নাথ একাডেমীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভা... দীঘপাতিয়া, ছাব্বিশে জানুয়ারী, ১৮৫২। [এই বক্তৃতাটির বাঙলা অনুবাদ মন্মথনাথ ঘোষ তাঁর গ্রন্থে তুলে দিয়েছেন—পৃষ্ঠা ৮০-৮৪]। বলাবাহুল্য এই তালিকাটি কখনই সম্পূর্ণ নয়, কেন না, মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় তাঁর 'কর্মবীর কিশোরীচাঁদ' গ্রন্থে কিশোরীচাঁদের আরও কয়েকটি লেখা বা বক্তৃতার কথা উল্লেখই শুধু করেননি, সেগুলির বঙ্গানুবাদও করে দিয়েছেন। সেগুলি হচ্ছে :

(ক) হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড—২২শে জুন, ১৮৬১ (রচনা) (খ) রাধাকান্ত দেবের স্মৃতি-সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—১৪ই মে, ১৮৬৭ (বক্তৃতা) (গ) রামগোপাল ঘোষের স্মৃতি-সভা—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন—বাইশে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৮ (বক্তৃতা)।

মন্মথনাথ ঘোষ মশায় তাঁর গ্রন্থে কিশোরীচাঁদের আরও কয়েকটি রচনার হদিশ দিচ্ছেন। সেগুলি হল :

(ক) ইংলণ্ডে বিখ্যাত শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারতীয় শিল্প। (ক্যালকাটা রিভ্যু—১৮৫১) (খ) হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র ও মেডিক্যাল কলেজ (ক্যালকাটা রিভ্যু—১৮৬৬) (গ) রামমোহন রায় (দ্বিতীয় প্রস্তাব)। এটা মেরী কার্পেণ্টারের 'লাষ্ট ডেজ অফ রাজা রামমোহন' গ্রন্থের সমালোচনা ঐ—১৮৬৬ (ঘ) রামগোপাল ঘোষ (ক্যালকাটা রিভ্যু ১৮৬৮)। (ঙ) কুলীনের বহু-বিবাহ (ক্যালকাটা রিভ্যু ১৮৬৮)।

বলাবাহুল্য, এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। এবং এই তালিকা সম্পূর্ণ করার সবচেয়ে বড় অসুবিধা সেকালে রচনার তলায় বা সামনে লেখকদের নাম দেওয়ার রীতি ছিল না; কাজেই অন্যান্য 'রেফারেন্স' না পেলে সঠিক কিছু বলা শক্ত। তবে তলিয়ে দেখলে একটা যে কিছু করা যায় না, তা হয়ত নয়। এটা ঠিক, লেখক হিসাবে তিনি সেকালে বেশ কেউকেটা ছিলেন, নামী ছিলেন। তবে বাঙলায় কখনও লিখেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভায় অক্ষয় দত্ত মশায়ের বাঙলা লেখা শুনে তিনিই বাঙলা ভাষায় সভার কাজ চালাবার সুপারিশ করেছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মারা যাবার পর রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর কাগজ 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে'র

দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩) কিশোরীচাঁদের একটি জীবনী ছাপেন। তাতে কিশোরীচাঁদের ইংরিজি লেখার মুন্সীয়ানার কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'শত শত লেখাপড়া জানা বাঙালী যাঁরা সাময়িক পত্রের জন্যে ইংরিজি লেখেন, তাঁদের মধ্যে খুবই কম লোক এই দুরূহ ভাষা নির্ভুল ও সহজ করে লিখতে পারেন। এই মুষ্টিমেয় লোকেদের মধ্যে কিশোরীচাঁদ ছিলেন খুবই উচু মানের লিখিয়ে।' বলাবাহুল্য, লালবিহারী দেকে যাঁরা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সহজে এই প্রশংসা করার লোক ছিলেন না তিনি। এই একই সংখ্যাতেই বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষের' রূঢ় সমালোচনা করে তিনি বঙ্কিমের নাকি অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। এবং তার নিজের রচনা তখন সুদূর ইংলণ্ডে খাস ইংরেজদের কাছে অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে। এবং তাঁর মত দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যে হুট করে এই প্রশংসা করেননি কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বলা যায়, তাঁর রচনাও ছিল অনেক। তাঁর নিজের কাগজ ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের কথাই ধরা যাক। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' তাঁর রচনার যে তালিকাটি ছেপেছিল, তাতে দুইটা রচনা—'মফস্বল পুলিশ' এবং 'রায়ত ও জমিদারেরই' উল্লেখ আছে শুধু। কিন্তু এ' ছাড়াও অন্ততঃ তিনটি মননশীল প্রবন্ধ তিনি একাগজে লিখেছিলেন এবং এগুলি পরে একটি ছোট্ট কেতাবে সংকলন করেছিলেন। সেই লেখাগুলি হচ্ছে :

(ক) Observations of the Rent Law—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, মে ৭, ১৮৫৯ (খ) Observations on the new Sale Law—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড জুন ২৫, ১৮৫৯ (গ) Education in India—ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, জুলাই ১৬, ১৮৫৯।

এ' ছাড়া আরও রচনা এই কাগজে থাকা স্বাভাবিক। কেননা, এই কাগজে সম্পাদক হয়ে আসার আগেও কিশোরীচাঁদ যে এই কাগজে নিয়মিত লিখতেন, একথা নতুন নয়। এবং তাঁর রচনাশৈলীর সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কাগজের মালিকরা পাঁচশো টাকা মাইনে সম্পাদকের চাকরি তাঁকে কখনই যে দিতেন না, এটা অত্যন্ত সহজ সত্য। কিন্তু দুঃখের কথা, কোন কোন রচনা তাঁর, তার তালিকা তৈরী করা প্রায় অসম্ভব।

অসম্ভব তাঁর বক্তৃতারও একটা ত্রুটিহীন লিষ্ট তৈরী করা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসবার আগে বা পরে তিনি সেখানে অনেক কটা বক্তৃতা দিয়েছেন। তার কয়েকটি 'হিন্দু প্যাট্রিয়টের' তালিকায় আছে। এ' ছাড়াও ঐ সভায় তাঁর আরও অন্ততঃ চারিটি বিশিষ্ট ভাষণের সন্ধান পাওয়া গেছে।

[ক] লর্ড ক্যানিফাক্সকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন—একুশে এপ্রিল, ১৮৬৬ [খ] চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে —তেসরা এপ্রিল, ১৮৮১ [গ] শিক্ষা ও পথকর বিষয়ে—দোসরা জুলাই ১৮৬৮ [ঘ] শিক্ষা বিষয়ে দোসরা জুলাই, ১৮৭০।

এ ছাড়া, কিশোরীচাঁদ এই সভার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন আঠারশ' উনষাট সালে, তাঁর চাকরি যাবার পরেই। তাঁর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই সম্পর্কে ছেদ পড়েনি। এবং এই সভার নবম বার্ষিক অধিবেশন থেকে তিনি প্রায় নিয়মিতভাবে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং মিষ্টার ফসেটের সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাই তাঁর এখানে শেষ ভাষণ।

কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন তাঁর সুবিপুল কর্মক্ষেত্রের এক খণ্ডাংশ মাত্র। অমৃতবাজার

পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ মশায় কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'তিনি যেমন পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি উদ্যমবিশিষ্ট ছিলেন। যখন দেশের কোন মহৎ বিষয়ে সাধারণ্যে কোন সভা হইয়াছে, সেখানেই কিশোরীবাবু তাঁহাদের বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিয়াছেন। তাঁহার সকল শাস্ত্রে অধিকার ছিল। তিনি সুবক্তা ছিলেন, সুলেখক ছিলেন এবং অতিশয় রসিক ও বুদ্ধিমান ছিলেন।' (৩১শে শ্রাবণ, ১২৮০ সংখ্যা) কাজেই তাঁর বক্তৃতা বা লেখার তালিকা তৈরী করা সহজ কাজ ত নয়ই, পরন্তু অসম্ভব কাজ বলা অন্যায় নয়। তবে চেষ্টা করা যেতে পারে, এই মাত্র।

অবশ্য প্রশ্ন উঠবে, তাতে লাভ কি ? দীনবন্ধু তার সুরধুনী কাব্যে কিশোরীচাঁদ সম্বন্ধে বলেছেন

'সাহসী কিশোরীচাঁদ ফিল্ড সম্পাদক।
লিখিতে বলিতে পটু স্বদেশপালক ॥'

এই স্বদেশ পালনের জন্যেই তিনি লিখতেন বা বলতেন। সেই স্বদেশকে জানতে হলে উনবিংশ শতকের এই বিচিত্র বর্ণাঢ্যকালের মর্মোপলব্ধি করতে হলে কিশোরীচাঁদের এইসব রচনা বা ভাষণের সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। এর কোন অন্যথা নেই।

প্রবন্ধকার অবনীন্দ্রনাথ

মনোজিৎ বসু

শুধু শিল্পালোচনার ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দিক থেকেও অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' বিশেষ একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শিল্পকলারই বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব চেতনা, রসবোধ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অবাক হতে হয় তাঁর অননুকরণীয় ভাষাশৈলীর পরিচয় লাভ করে। প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হবে, এগুলি তো নিছক দুরূহ শিল্পতত্ত্বের আলোচনা নয়, তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার মতো এই শিল্প প্রবন্ধাবলীও যেন কতকগুলি রসচিত্র বা কথাচিত্র। কী অসাধারণ দক্ষতা থাকলে প্রবন্ধকে রসসাহিত্যে পরিণত করা যায়, 'বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী'র মধ্য দিয়ে গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তার উজ্জ্বল প্রমাণ রেখে গিয়েছেন।

শিল্পকলা সম্পর্কিত তাঁর প্রথম প্রবন্ধের বই হলো 'ভারত শিল্প'। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। কলকাতার হিতবাদী লাইব্রেরী কর্তৃক প্রকাশিত ৮৮ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রন্থের মূল্য ছিল মাত্র চার আনা। যে সাতটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল তা হলো—স্পষ্ট কথা; কি ও কেন?; পরিচয়; মানস চর্চা; শিল্পে ত্রিমূর্তি; শিল্পের ত্রিধারা; আর আর্ট ও আর্টিষ্ট।

এর দশ বছর পরে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বাংলার ব্রত'। তাতে ১২০ পৃষ্ঠার একবর্ণ আলপনা চিত্র এবং দুই পৃষ্ঠার বহুবর্ণ আলপনা চিত্রও সংযোজিত হয়েছিল। পরে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালায় সেই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী।

'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী' গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কিন্তু প্রবন্ধগুলি রচিত হয় তার বহু আগে, ১৯২১ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। আসলে এগুলি ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা বা ভাষণ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যমে এবং কুমার গুরুপ্রসাদ সিংহের অর্থানুকূল্যে পাঁচটি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হয়। তারই একটি ভারতীয় শিল্পকলা বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য 'রাণী বাগেশ্বরী অধ্যাপক' পদ। সেই পদটি সর্বপ্রথম অলংকৃত করেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, স্যার আশুতোষের একান্ত অনুরোধে ন বছর এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই অবশ্য তখনকার দিনের প্রখ্যাত সাময়িক পত্রাদিতে, যেমন 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী', 'বিচিত্রা' প্রভৃতিতে, আত্ম-প্রকাশ করে এবং বিদগ্ধসমাজে প্রাবন্ধিক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

অবনীন্দ্রনাথের আর দুটি উল্লেখযোগ্য শিল্পবিষয়ক প্রবন্ধের বই হলো 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' আর 'ভারতশিল্পে মূর্তি'। প্রথমটি প্রকাশিত হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের (১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসে, দ্বিতীয়টি জ্যৈষ্ঠে। দুটি বই-ই প্রকাশ করেন বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ' গ্রন্থে

ভূমিকাসহ যে দশটি প্রবন্ধ আছে, সেই প্রবন্ধাবলী বহু আগেই (১৩২১ বঙ্গাব্দে) 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মূল বাংলা প্রবন্ধাবলী এদেশে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই সেগুলি ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়ে গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং ইউরোপের শিল্পকলারসিক-সমাজে তা নিয়ে বেশ আলোড়নেরও সৃষ্টি হয়। 'ভারতশিল্পে মূর্তি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পূর্বে শুধু 'মূর্তি' এই নামে 'প্রবাসী'তে পর পর দুই সংখ্যায় (১৩২০ বঙ্গাব্দের পৌষ ও মাঘ মাসের প্রবাসী-তে) মুদ্রিত হয়েছিল।

'শিল্পায়ন' নামে অবনীন্দ্রনাথের আর যে প্রবন্ধের বই প্রকাশিত হয় (১৩৬১ বঙ্গাব্দে), সেটি কোনো নতুন প্রবন্ধ গ্রন্থ নয়; সেটি আসলে 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী'-র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কোনো অংশের অদল-বদলও করে গিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগেই। তিনি অবশ্য এই সংস্করণটি দেখে যেতে পারেন নি; কেন না, তার বছর দুই আগেই তিনি পরলোকগমন করেছেন।

'বাংলার ব্রত' গ্রন্থের পরিচায়িকা 'নিবেদন'-এ অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আজ দুই তিন বছর ধরে 'বিচিত্রা সভা'-র জন্য আমার ছাত্র ও বন্ধুদের সাহায্যে যতগুলি ব্রতের আলপনার নক্সা সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকলগুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা গেল। কি মণ্ডনচিত্র হিসাবে, কি স্বকীয়তা পরিকল্পনা এবং উদ্ভাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেয়েদের হাতের এই লেখা শিল্পীমাত্রেরই যে আদর পাবে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। নক্সাগুলি আমি যথাসম্ভব অবিকৃত ভাবে নকল করে প্রকাশ করলেম…।'

বাংলা অঞ্চলের মেয়েলী ব্রতকথা, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলপনাদির নক্সা সংগ্রহ করে, তিনি যেভাবে সেগুলির আলোচনা করেছেন,—তা থেকেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এ দেশে লোক-সাহিত্য ও লোকশিল্পের একেবারে গভীরে গিয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। ব্রতকথার ছড়াগুলির মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন এদেশের লোকসাহিত্যের অপূর্ব এক মাধুর্য, আর আলপনাদির মধ্যে আবিষ্কার করেছিলেন লৌকিক শিল্পকলার অফুরন্ত ঐশ্বর্য। শুধু পেয়ে বা আবিষ্কার করেই তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি, সে-বিষয়ে তাঁর যে আনন্দোপলব্ধি তার সমান ভাগ তিনি দিতে চেয়েছিলেন শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের সকলকে। সেদিক থেকে 'বাংলার ব্রত' বইখানির মূল্য যে অপরিসীম তা বলাই বাহুল্য।

বইখানি পড়লেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ব্রতাচারের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে তিনি কী পরিশ্রমই না করেছেন, এদেশের জাতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর অনুশীলনও ছিল কত গভীর। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ বিষয়ে আলোচনামূলক যে বিস্তৃত প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তা একদিকে যেমন জ্ঞানগর্ভ, অন্যদিকে তেমনি সরস তথ্যসমৃদ্ধ। শিল্পীর চোখ দিয়ে তিনি যে ব্রতাচার লক্ষ্য করেছেন, সাহিত্যিকের দৃষ্টিকোণ থেকেই তার বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। 'বাংলার ব্রত' বইখানি তাই তাঁর নিজস্ব রসমধুর প্রকাশভঙ্গিতে অনবদ্য হয়ে উঠেছে।

অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন: 'আমাদের দেশে দু-রকমের ব্রত চলিত রয়েছে দেখা যায়। কতকগুলি শাস্ত্রীয় ব্রত, আর কতকগুলি শাস্ত্রে যাকে বলেছে যোষিৎপ্রচলিত বা মেয়েলি ব্রত।'

এই যে মেয়েলি ব্রত, তাকে তিনি আবার দু-দিক থেকে বিচার করে দেখেছেন। এক ধরণের ব্রতকে তিনি বলেছেন, 'কুমারী-ব্রত', অর্থাৎ যে ব্রতগুলি 'পাঁচ-ছয় থেকে আট-নয় বছরের মেয়েরা' করে। আর অন্যগুলিকে তিনি ফেলেছেন 'নারীব্রত' পর্যায়ে, অর্থাৎ যে সব ব্রত বিয়ের পর থেকে বড়ো বড়ো মেয়েরা পালন করে থাকে। শাস্ত্রীয় ব্রত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন: 'প্রথমে সামান্যকাণ্ড—যেমন আচমন, স্বস্তিবাচন, কর্মারম্ভ, সংকল্প, ঘটস্থাপন, পঞ্চগব্যশোধন, শান্তিমন্ত্র, সামান্যার্ঘ, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, মাতৃকান্যাসাদি এবং বিশেষার্ঘস্থাপন। এর পরে ভুজ্জি-উৎসর্গ এবং ব্রাহ্মণকে দানদক্ষিণা দিয়ে কথা-শ্রবণ বা রোচনার্থে ফলশ্রুতি, ব্রতে যাতে রুচি জন্মায় সেজন্য ব্রতকথা শোনা। সামান্যকাণ্ড এবং ব্রতকথা এই দুই হল পৌরাণিক ব্রতকথার উপাদান।' অর্থাৎ, তাঁর মতে শাস্ত্রীয় ব্রতো হলো সেই সব ব্রত যেগুলি ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা উচ্চতর সমাজের বিভিন্ন নারীব্রতে পৌরহিত্য করলেও, আসলে সেগুলি নারীব্রতই—লোকাচার অনুসারে তাঁরা কেবল প্রচলিত প্রথায় পুজানুষ্ঠানই করেন; বাদবাকী আচার অনুষ্ঠান বাড়ির মেয়েদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পুজানুষ্ঠানের পর যে সব ক্ষেত্রে পুরোহিতরা ব্রতকথা পাঠ করেন না, সে সব ক্ষেত্রে মেয়েরাই তাঁদের আঞ্চলিক বা নিজস্ব ভাষায় রচিত ব্রতকথা পড়ে যান বা আবৃত্তি করে থাকেন। আসলে, এসব ব্রত শুধুমাত্র শাস্ত্রানুসারী আচার দ্বারা প্রভাবান্বিত, শাস্ত্রের কোনো সুনির্দিষ্ট বিধি এসব ব্রতের ভিত্তি রচনা করেনি।

তিনি লিখেছেন: 'বেশ বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রতমালাবিধান চিনির ডেলায় আকারে যেন কুইনিন পিল। লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দিয়ে রচনা করা হয়েছে। খাঁটি পুরাণগুলির ইতিহাস হিসাবে একটা দাম আছে। কিন্তু এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোকসাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়।'

'লোকের চেষ্টা ও লোকের চিন্তার ছাপ' অবনীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে আবিষ্কার করেছেন 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে'। তিনি লিখেছেন: 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই।' ব্রতের ছড়াগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ বেদের সুক্তির সমগোত্রীয় মনে করেছেন। কেন না, 'বেদের সুক্তিগুলিতে সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম উৎসাহ ফুটে উঠেছে···।' তিনি লক্ষ্য করেছেন মেয়েলি ব্রতেও নদী, সূর্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে ছড়া বলা হয়েছে। 'কিন্তু তাই বলে পুরাণ ভেঙে যেমন শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে, একথা একেবারেই বলা যায় না।' কেন না, ঐতিহাসিক সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি বলেছেন,—'সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু চন্দ্র সূর্য এঁরা উপাসিত হচ্ছেন—ভারতবর্ষ, ইজিপ্তে, মেক্সিকোতে। সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালি ঘরের জিনিষ বলে ধরা যেতে পারে······।' যেমন 'শাস্ত্রীয় ব্রত বলে মেয়েদের মধ্যে চলেছে তার একটি সূর্যস্তব'—

'নমঃ নমঃ দিবাকর ভক্তির কারণ,

ভক্তিরূপে নাও প্রভু জগৎকারণ।
ভক্তিরূপে প্রণাম করিলে তুয়া পায়,
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করেন প্রভু দেবরায়।'

আর, 'খাঁটি মেয়েলি ব্রতের ছড়াতে সূর্যকে উষাকে' লোকে বর্ণনা করেছে এইভাবে—

'উরু উরু দেখা যায় বড় বড় বাড়ি.
ঐ যে দেখা যায় সূর্যের মার বাড়ি!
সূর্যের মা লো! কি কর দুয়ারে বসিয়া।
তোমার সূর্য আসিতেছেন জোড় ঘোড়ায় চাপিয়া।'

বৈদিক সূক্তগুলির সঙ্গে ব্রতের ছড়াগুলির তুলনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ শুধু যে গভীর অন্তর্দৃষ্টিরই পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সত্যের সন্ধানে তাঁর মনটাও রীতিমতো সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় হিন্দুদের একটা সংস্কার হলো বেদ অপৌরুষেয়। অথচ, অবনীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন 'বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের,' আর 'ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের।' এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'একদিকে ভারতে প্রবাসী আর্যদের অনুষ্ঠান আর একদিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, একদল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন আর একদল নদীমাতৃক পল্লিগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাসী এবং নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং তারি বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে, তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্ফূর্তি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ এবং পুরাণের চেয়েও যা পুরানো এই সব লৌকিক ব্রত অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে—দুইদিকে দুটো বড় জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দল বিশেষের স্বপ্ন।

'আর্য এবং আর্য-পূর্ব......দুজনে ব্রত করছে যা কামনা করে সেটা দেখলে এটা স্পষ্টই বোঝা যাবে, কেবল পুরুষের চাওয়া আর মেয়েদের চাওয়া, বৈদিক অনুষ্ঠান পুরুষদের আর ব্রত অনুষ্ঠান মেয়েদের, এই যা প্রভেদ। ঋষিরা চাচ্ছেন--ইন্দ্র আমাদের সহায় হোন, তিনি আমাদের বিজয় দিন, শত্রুরা দূরে পলায়ন করুক ইত্যাদি; আর বাঙালির মেয়েরা চাইছে—'রণে রণে এয়ো হব, জনে জনে সুয়ো হব, আকালে লক্ষ্মী হব, সময়ে পুত্রবতী হব।'...

বৈদিক সূক্ত আর ব্রতের ছড়া-র তুলনা-প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সুন্দর একটি রসোপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'বৈদিক সূক্তগুলি আর ব্রতের ছড়াগুলিকে আমাদের রূপকথার বিহঙ্গম বিহঙ্গমা দুটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। দুজনেই পৃথিবীর কিন্তু বেদসূক্তগুলি ছাড়া ও স্বাধীন, বনের সবুজের উপরে নীল আকাশের গান, উদার পৃথিবীর গান, আর ব্রতের ছড়াগুলি যেন নীড়ের ধারে বসে ঘন-সবুজের আড়ালে পক্ষিমাতার মধুর কাকলি—কিন্তু দুই গানই পৃথিবীর সুরে বাঁধা।'

এই যে রসোপলব্ধি তার প্রকাশভঙ্গিটিও কেমন সুন্দর। গদ্যরীতিতে লিখিত এই যে প্রবন্ধ, তা একদিকে যেমন সহজ ও সরল, অন্যদিকে স্থানবিশেষে তেমনি কাব্যধর্মী। ভাষার বিশিষ্টতাই তাঁর প্রবন্ধাবলীকে পাঠমধুর তথা হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ মেয়েলি ব্রতের অন্তর্গত 'কুমারীব্রত' ও 'নারীব্রত' নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে সে গুলির তত্ত্বের দিক এবং শিল্প ও সাহিত্য রসের দিকটা এমন ভাবে প্রকাশ করেছেন তা পুরোপুরি তথ্যনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো ব্রত সম্পর্কে তিনি সংশ্লিষ্ট ছড়া এবং আচরণবিধি উল্লেখ করে এমন খুটিয়ে আলোচনা করেছেন যে, আগাগোড়া সমস্ত ব্রতটাই যেন পাঠকের চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠেছে। শুধু যে একাধারে শিল্পী ও সাহিত্যিক হওয়াতেই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে তা নয়, এ বিষয়ে তাঁর অনুশীলনের গভীরতা, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি এবং অনন্যকরণীয় প্রকাশভঙ্গিমাও বহুলাংশে দায়ী। বাংলার ব্রতাচারের সঙ্গে দেশ-বিদেশের লৌকিক ধর্মাচারের তুলনামূলক কিছু কিছু আলোচনা এবং অজস্র আলপনার অনুলিপি 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে।

প্রবন্ধ রচনা করতে বসে যে সব প্রবন্ধকার শুধু তত্ত্বালোচনা ও তথ্য-পরিবেশনের দিকেই তাঁদের সমস্ত উৎসাহ ও শক্তি ব্যয় করেন, বহু ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সেগুলি পাঠক মনে রেখাপাত করতে অসমর্থ হয়। অথচ প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে যেখানে প্রবন্ধকারের বাক্‌চাতুর্য ফুটে ওঠে, কঠিন বিষয়টিকে যেখানে সহজ করে বা গল্পচ্ছলে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, আর যেখানে থাকে সত্যিকারের সাহিত্যরস,—সে-সব প্রবন্ধ পাঠে নিছক গল্প-পাঠক বা উপন্যাস পাঠকেরাও আগ্রহী হয়ে ওঠেন। যেমন ঘটে প্রবন্ধকার অবনীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। প্রমাণস্বরূপ তাঁর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থ থেকেই বহু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বাহুল্য ভয়ে এখানে শুধু 'কুকুটীব্রত' প্রসঙ্গ থেকে উদ্ধৃত করছি :

'আর কতগুলি ব্রত ; যার নামটা রয়েছে পুরানো কিন্তু ভিতরের মালমসলা সমস্তই নূতন—যে ভাবে পেটেণ্ট ওষুধের নকল হয়ে থাকে কতকটা সেইরূপ। কুকুটী ব্রতটি নামে অহিন্দু এবং বাস্তবিক ছোটনাগপুরের পার্বত্য জাতির এ ব্রতটি ; কুকুটী হলেন তাদের দেবী ; এবং যেমন নানা অহিন্দু দেবতাকে, তেমনি কুকুটী দেবীকেও এককালে লোকে পুজো দিতে আরম্ভ করেছিল। মৃতবৎসা-দোষনিবারণ এবং তেজস্বী বহু সন্তান-লাভ হচ্ছে কুকুটীব্রতের ফল। আমাদের শাস্ত্র এটিকে যেমন করে গড়ে নিয়েছে তাতে ব্রতকথার সঙ্গে অনুষ্ঠানের যোগ নেই এবং অনুষ্ঠানে যে সংকল্প তার সঙ্গে ব্রতকথার যে কামনা তারও মিল নেই। সংস্কৃত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি অনুসারে সংকল্প হল, যথা—অদ্যেতাদি ভাদ্রে মাসি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যাস্তিথাবরভ্য যাবজ্জীবপর্যন্তম্ অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দেবী পাষণ্ডধর্মরহিত-পুত্রপৌত্র-ধনধান্যাতুলসর্বসম্পত্তিপ্রাপ্তিপূর্বকং শিবলোকপ্রাপ্তিকামা যথাশক্তি যথাজ্ঞানং ভবিষ্যপুরাণোক্ত-কুকুটীব্রতমহং করিষ্যে। পাছে কুকুটীব্রত করে অহিন্দু পুত্রসন্তান হয়, সেজন্য আগেই সাবধান দেওয়া হচ্ছে—'পাষণ্ডধর্মরহিত পুত্র' যেন হয়। তারপর 'শিবলোকপ্রাপ্তি'। সেখানে কুকুটের আদিপুরুষ যে ময়ূরের ছানা, তর্কের বেলায় চাই কি তাঁকে হাজির করা যেতে পারে......'

শুধু নীরস তথ্য পরিবেশন আর তত্ত্বালোচনা করলে যে সব মাটি হয়ে যাবে, এটা অবনীন্দ্রনাথ গভীরভাবে জানতেন বলেই তাঁর সমগ্র সাহিত্য-রচনার ধারাটাই অন্যের চাইতে একেবারে ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। গল্পই হোক, আর প্রবন্ধই হোক রচনারক্ষেত্রে তিনি তাঁর শিল্পী-দৃষ্টি আর সাহিত্যিক-মনটিকে সব সময় সজাগ ও সক্রিয় রাখতেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' এককথায় তুলনাহীন। আর্ট বা বা শিল্পকলা সম্পর্কে এমন একখানি সরস ও ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ এদেশে আর লেখা হয়নি। শিল্পশাস্ত্রের ব্যাখ্যা যে কত রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা যায় এই প্রবন্ধগুলিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র প্রথম দুটি প্রবন্ধের শিরোনাম 'শিল্পে অনধিকার' আর 'শিল্পে অধিকার'। শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে প্রবন্ধ দুটিতে তিনি কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। শুধু এ-প্রবন্ধ দুটিতেই নয়, গ্রন্থে সংযোজিত অন্যান্য প্রবন্ধেও তাঁর নিজস্ব শিল্পধারণাটাই প্রাধান্যলাভ করেছে। 'শিল্পে অনধিকার' প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন; 'রসবোধই নেই রসশাস্ত্র পড়তে চলায় যে ফল, শিল্পবোধ না নিয়ে শিল্প চর্চায় প্রায় ততটা ফলই পাওয়া যায়। এর উল্টোটা যদি হত, তবে সব কটা অলঙ্কারশাস্ত্রের পায়েস প্রস্তুত করে পান করলেই ল্যাটা চুকে যেত।' কত সহজভাবেই না কথাটা বলেছেন তিনি, অথচ কেমন জুতসই একটা তুলনা দিয়ে। অর্থাৎ, শিল্পবোধই যার নেই, শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে তার প্রবেশ অনধিকার-প্রবেশেরই সামিল। তারপর 'inspiration' -এর কথা উঠতেই লিখলেন: 'শিল্পে অধিকার জন্মালো না, চুপ করে বসে থাকা গেলো—ঘেঁটে-ঘুঁটে যা পেলাম তাই নিয়ে, সে ভাল। কিন্তু হঠাৎ মনে হল শিল্প-সংস্কার করতে হবে, কিংবা দ্বিতীয় একটা অজন্তা-বিহার কিংবা তাজমহলেরই একটা inspiration-এর চোটে অম্বলশূলের বেদনার মতো বুকের ভিতরটা জ্বলে উঠলো, অমনি লাটিমের মতো ঘুরতে লেগে গেলাম বোঁ-বোঁ শব্দে শিল্প-সংস্কার, শিল্পের foundation stone স্থাপনের কাজে—এ হলেই মুস্কিল! যে ঘোরে তার ততটা নয়, কিন্তু শিল্প যেটা অনাদরে পড়ে রয়েছে এবং মানুষ যারা চুপচাপ রয়েছে নিজের ঘরে, তাদেরই ভয় আর মুস্কিল তখন! Inspiration অমন হঠাৎ আসে না! মনাগুনের জ্বালায়, অম্বলশূলের জ্বালায় ভেদ আছে। শিল্পজ্ঞানের প্রদীপ হঠাৎ inspiration পেয়ে অমন রোগের জ্বালার মতো জ্বলে না, কাউকে জ্বালায়ও না, আগুন ধরিয়ে দিতে হয় সাবধানে—স্নেহভরা প্রদীপে, তবেই আলো হয় দপ করে। একেই বলে inspiration।—Inspiration কি অমনি আসে? অর্জন করলেম না, শিল্প-inspiration আপনি এলো ভিক্ষুকের কাছে রাজত্বের স্বপ্নের মতো, এ হবার যো নেই।… …' একটা তত্ত্বকথাকে কেমন হৃদয়গ্রাহী করে শ্রোতা বা পাঠকের মনে পৌঁছে দেওয়া যায়,—এই হলো তার একটা উদাহরণ। এ-রকম উদাহরণ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র পাতায় পাতায়।

শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ কারও কাছে ঋণী নন। তাঁর শিল্পভাবনা যেন তাঁর নিজেরই অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়েছে, এ-বিষয়ে তিনি অনন্যনির্ভর। শিল্পের অধিকার প্রসঙ্গে তাই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে পেরেছেন: 'শিল্পের অধিকার নিজেকে অর্জন করতে হয়। পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ধন যে আইনে আমাদের হয় তেমন করে শিল্প আমাদের হয় না। কেন না শিল্প হল 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা'; বিধাতার নিয়মের মধ্যেও ধরা দিতে চায় না সে। নিজের নিয়মে সে নিজে চলে, শিল্পীকেও চালায়; দায়ভাগের দোহাই তো তার কাছে খাটবে না।'

এ শুধু শিল্পে অধিকার-এর নিগূঢ় তত্ত্ব নয়, যে-কোনো রসসৃষ্টির ব্যাপারেই এ-কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। শিল্পী যেমন স্রষ্টা, কবি ও সাহিত্যিকও তেমনি স্রষ্টা। তাঁদের সৃজনধারার ব্যাপারে

তাঁরা অন্যের নির্দেশ পালন করতে চান না,—তাঁরা যেমন যেমন উপলব্ধি করেন তেমনটাই প্রকাশ করেন শিল্পে বা সাহিত্যে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্যই শিল্পী ও সাহিত্যিককে অহরহ অনুপ্রাণিত করে চলেছে এবং যিনি এই গুণের অধিকারী তাঁর পক্ষেই সার্থক শিল্পসৃষ্টি বা সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। অবনীন্দ্রনাথ উভয় ক্ষেত্রেই অত্যাশ্চর্যভাবে সার্থকতালাভ করেছিলেন।

শ্লেষাত্মক বাগভঙ্গিমায় অবনীন্দ্রনাথের যেন জুড়ি নেই। শিল্পসাধনা, শিল্পে অধিকার অর্জন—এসব না থাকা সত্ত্বেও শুধু অর্থকৌলীন্য নিয়েই যাঁরা শিল্প ব্যাপারে মাথা ঘামান, হৈ-চৈ লাগিয়ে দেন, তাঁদের কাণ্ড-কারখানা লক্ষ্য করেই তিনি শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লিখেছেন :

'...সাধনা অর্জনা ওসবে কি দরকার? টাকা ঢাললে বাঘের দুধও মেলে, শিল্প মিলবে না? কোনো ছবি মূর্তি, বসাও মিউজিয়াম ; খুলে দাও জাতীয় শিল্পের চেয়ার ; সেখান থেকে তাপমান-যন্ত্রে প্রত্যেকের রসের উত্তাপের ডিগ্রি মেপে দেওয়া হোক ডিপ্লোমা ; Library হোক রসশাস্ত্রের ; স্কুল হোক—সেখানে বয়স্ক ছেলেরা চিত্রকারি খোদকারি নানা কারিগরি শিখতে ; লিখতে লেগে যাক বড়-বড় 'থিসিস' শিল্পের উপরে ; ছাপা হয়ে চলে যাক সেগুলো ইংরাজীতে বিদেশে। আকাশের চাঁদকে পর্যন্ত ধরা যায় এমন বিরাট আয়োজন করে বসা যাক, শিল্প সুড়-সুড় করে আপনি আসবে। হায়, যে শিল্প বাতাসের ফাঁদ পেতে আকাশের চাঁদকে সত্যিই ধরে এনে খেলতে দিচ্ছে মানুষকে, তাকে তলব দেবো এমনি করে? হুজুরের তলব মজুরের উপরে? আর সে এসে হাজির হবে দুয়োরের বাহিরে জুতো রেখে সেলাম ঠুকতে-ঠুকতে?'

'শিল্পে অধিকার' প্রবন্ধে শিল্পকলা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন : '...খেলতে-খেলতে শিল্পের সঙ্গে পরিচয়, ক্রমে তার সঙ্গে পরিণয়—এই তো ঠিক! পড়তে-পড়তে খাটতে-খাটতে ভাবতে-ভাবতে যেটা হয় সেটা নীরস জ্ঞান,—শুধু শিল্পের ইতিহাস তত্ত্ব প্রবন্ধ কিংবা পোস্টার ও পোস্টেজ দেবার কাজে আসে। এই যে একভাবের শিল্পজ্ঞান একে লাভ করতে হলে নিশ্চয়ই তোড়জোড় ঢের দরকার। লেকচার হল থেকে লেকচারের ম্যাজিক লণ্ঠনটা পর্যন্ত না হলে চলবে না সেখানে। কিন্তু শিল্পজ্ঞান তো শুধু এই বহিরঙ্গন চর্চা ও প্রয়োগবিদ্যার দখল নয় ; রস, রসের স্ফূর্তি—এ সবের আয়োজন যে স্বতন্ত্র। 'অনন্যপরতন্ত্রা' শিল্প পাখিপড়ানোর খাঁচা, কসরতের আখড়ার দিকেও তো এগোয় না, রসপরতন্ত্রতাই হল তাকে আকর্ষণের প্রধান আয়োজন আর একমাত্র আয়োজন। শুধু এই নয়। স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র মানুষ, মানও তাদের রকম-রকম। রসও বিচিত্র ধরনের। আয়োজনও হল প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র প্রকারের। একজনের individuality, personality যে আয়োজন করলে, আর-একজন সেই আয়োজনের অনুকরণে চললেই যে অন্যপরতন্ত্রা এসে তাকে ধরা দেবেন, তা নয় ; তাঁর নিজের জন্যে তাঁকে স্বতন্ত্র প্রকারের আয়োজন করতে হবে।'

কথাটা যে নতুন তা নয়। সার্থক শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে এই স্বতন্ত্রতা যে অত্যাবশ্যক সে-কথা তাত্ত্বিক মাত্রেই স্বীকার করেন। কিন্তু, সেই কথাটাকেই অবনীন্দ্রনাথ যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠেছে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য কথাটি। তিনি বলেছেন—'মূলকথা হচ্ছে রসের তৃষ্ণা ; শিল্পের ইচ্ছা হল কি না, উপযুক্ত আয়োজন হল কি না—শিল্পের জন্যে বা রসের তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে—এটা একেবারেই ভাববার বিষয় নয়।......প্রয়োজন হলে আয়োজনের

অভাব ঘটে না কোনো দিন—এইটেই তারা (১) হরিণের শিং মাছের কাঁটার বাটালি একটুখানি পাথরের ছুরি এক টুকরো গেরি মাটি এই সব দিয়ে নানা কারুকার্য নানা শিল্প রচনা করে দিয়ে সপ্রমাণ করে গেছে।'

'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র অন্যান্য প্রবন্ধে শিল্পকলা সংক্রান্ত বহুবিধ সংজ্ঞা, তত্ত্বকথা, রসবোধ ইত্যাদি নিয়ে এই ধরনের সরস ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন অবনীন্দ্রনাথ। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

'কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিষকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাজের মানুষ দেখে কেম্বিসটা, পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়।' (দৃষ্টি ও সৃষ্টি)

'চীনেম্যানের কানের কাছে খুব চেঁচিয়ে সরস্বতীর স্তোত্র পাঠ করলেও সে বুঝবে না, কিন্তু ছবির ভাষার বেলায় সে অনেকখানি বুঝবে, কেননা ছবির ভাষা অনেকটা সার্বজনীন ভাষা।···কবির ভাষা চলেছে শব্দ চলাচলের পথ কানের রাস্তা ধরে মনের দিকে, ছবির ভাষা অভিনেতার ভাষা এরা চলেছে রূপ চলাচলের পথ আর চোখের দেখা অবলম্বন করে ইঙ্গিত করতে করতে, আবার এই কথিত ভাষা যেটা আসলে কানের বিষয় এখন সেটা ছাপার অক্ষরের মূর্তিতে চোখ দিয়েই যাচ্ছে সোজা মনের মধ্যে; 'নবঘনশ্যাম' এই কথাটা—ছাপা দেখলেই রূপ ও রঙ দুটোর উদ্রেক করে দিচ্ছে সঙ্গে-সঙ্গে!' (শিল্প ও ভাষা)

'বাচন করা চলে ঢেকে-ঢুকে আসল মনোভাব গোপন রেখে, কিন্তু বর্ণনা করা চলে না সে ভাবে, যেমন, মেয়েটি কালো কিন্তু তার ঘটকালিটারও লোভ আছে বলে কন্যাকে 'শ্যামাঙ্গী' বলে বাচন করা গেল, কিন্তু তুলনায় বর্ণনা করতে হলে, মনের ভাব গোপন থাকা শক্ত, ধরা পড়ে যায় ঘটক। কথার যেটুকু বা গোপন করার ফাঁক আছে ছবির তাও নেই; হুবহু বর্ণন, নয় মিথ্যা বর্ণন, দুই রাস্তা ছাড়া ছবির গতি নেই। ফটোগ্রাফ মেয়ের কালো রঙটার ফেলায় ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে, ছবি কিন্তু পারে না।' (শিল্পের সচলতা ও অচলতা)

'বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতরের দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুললো তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছল মন্দির এবং ভিতরের খবর বয়ে চললো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।' (সৌন্দর্যের সন্ধান)

(১) আদিম মানুষেরা

'ছবি যারা লেখে তারাই জানে রূপ রঙ ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটতে দিলে এবং সম্পূর্ণ না ফুটিয়ে দিলে একই বস্তুর দুটো ছবি দু রকম রস দেয় দর্শককে। পটখানির মধ্যে তলিয়ে আছে যে রূপ, আর পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে রূপ—দুটি দুরকম জিনিষ, কিন্তু দুটিই রূপের বাইরের জিনিষ নয় দুটিই রূপ একের ঘোমটা আছে অন্যের ঘোমটা নেই এই তফাৎ। জগৎশিল্প এই তলিয়ে-থাকা রূপ এবং ফুটে-ওঠা রূপ—এই দুই তটের মধ্যে ধরা। সব দেশের সব ধারা ধরা গেছে এই দুই কিনারার মধ্যে' (অরূপ না রূপ)

'শিল্পকার্য সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে যেটা রস ও ভাবের দিক। সেখানে ভাব উদয় হল, কবিতা লিখলেম ছবি লিখলেম গান গাইলেম নৃত্য করলেম ; ভাবের বশে কলম চললো তুলি চললো হাত চললো পা চললো। শীতের জন্য যে কাঁথা সেটা সুন্দর না হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না, কিন্তু তাকে যদি শুধু শীত নিবারণী না রেখে চিত্তহারীও করে দিতে চাই তবে খানিক কারুকার্য দিয়ে ভাবযুক্ত করা চাই, তবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্প-জগতে, না হলে সে রইলো কাজের জগতে খুব কাজের জিনিষ হয়ে পড়ে।' (ভাব)

'রঙে আর রূপে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। রূপ যেখানে রঙ সেখানে, রঙ যেখানে রূপ সেখানে, এই হল স্বভাবের নিয়ম।···বিশ্বজগতে রচনার কাজ এই নিয়মে চলেছে দেখি, মানুষের শিল্প রচনাতেও এই নিয়ম বলবৎ। খাতার শাদা পাতা সেটা খানিক শাদা রঙ মাত্র নয়, চতুষ্কোণ একটা রূপও আছে তার। কাগজের উপরে কালো পেন্সিলে ছবি দাগলেন—শাদা রঙ কালো রঙ, দুই রঙের মিলনে তবে রূপটি ফুটলো। এমনি কালো সেলেটে শাদা রূপ, নানা বর্ণের কাগজে নানা বর্ণ দিয়ে দাগা রূপ এই হল ছবির পত্তন। লাল নীলে কালোয় শাদায় হলুদে মিলিয়ে নিছক রঙের কাজ করলেম রূপ না ফুটিয়ে, এমনটি হবার যো নেই একেবারেই। পাঁচ রঙের হিজিবিজি সেও পাঁচ রঙা একটা রূপ।' (বর্ণিকাভঙ্গম)

এই সব উদ্ধৃত থেকেই অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ধারণা সম্পর্কে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যাবে। সেই ধারণা যে কত ব্যাপক ও স্বচ্ছ তা তাঁর এই প্রবন্ধাবলী না পড়লে বোঝা যাবে না। তিনি যে শুধু একজন রূপদক্ষ মহাশিল্পী ছিলেন তাই নয়,—শিল্পচিন্তাতে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-তে অবনীন্দ্রনাথ যে শিল্পব্যাখ্যা করেছেন তা নিছক কারুশিল্পের বা চারুশিল্পের তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের পটভূমিতে নিজের অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত যে সত্যদর্শন তারই সরস আলোচনা। তাঁর চিন্তাধারায় গোঁড়ামির কোনো প্রশ্রয় নেই এবং শিল্পের বিচারে তিনি ব্যক্তিগত রুচি ও বস্তুতান্ত্রিকতার উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর, সাহিত্যের বিচারে তাঁর এই বক্তৃতামূলক প্রবন্ধাবলী যে কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকেই রসজ্ঞ পাঠকেরা সহজেই তা বুঝে নিতে পারবেন। গল্প রচনায় তিনি যেমন মৌখিক ভাষার অনুসারী, দুরূহ শিল্পতত্ত্বের আলোচনামূলক প্রবন্ধ রচনাতেও তেমনি। তাঁর এই সব রচনাতেও তাঁর ভাষাশৈলীর মৌল লক্ষণটি পুরোপুরি বজায় আছে। তা হ'লো সহজ ও স্বাভাবিক কথনভঙ্গিতে ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার। অথচ, সে-ভাষায় তত্ত্বকথার বিশ্লেষণে বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটেনি, তাঁর বক্তব্যকে তিনি কোথাও কুয়াশাচ্ছন্ন রাখেন নি। শব্দ সম্পদেও অলঙ্কার প্রকরণে তিনি যে কত সমৃদ্ধ

ছিলেন, তাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এই সব প্রবন্ধে। সংস্কৃত-প্রাকৃত, দেশী-বিদেশী, তৎসম-তদ্ভব সমস্ত রকমের শব্দের রঙ দিয়ে তিনি যে অনায়াসভঙ্গিতে সাহিত্যচিত্র অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত সে-পরিচয় 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-তেও মেলে। আর্ট তথা শিল্পকলা বিষয়ে, বিশেষ করে প্রাচ্য তথা ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে চান এবং যাঁরা রসসমৃদ্ধ তত্ত্বকথা বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে আগ্রহী এই বই তাঁদের যে পূর্ণমাত্রায় তৃপ্তিবিধান করবে তাতে কোনো ভুল নেই।

'ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ' অবনীন্দ্রনাথের আর একখানি মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থ। এর কয়েকটি অধ্যায় পূর্বোক্ত 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' থেকে এখানে পুনঃসংযোজিত হলেও, 'চিত্রে ছন্দ ও রস', 'ভারত-ষড়ঙ্গ', 'প্রমাণ' ও 'ষড়ঙ্গদর্শন' সম্পূর্ণ নতুন। চীন ও ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থে যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন, তা তাঁর আগে বা পরে আর কেউ এমন করেন নি।

'ভারতশিল্পে মূর্তি'-ও আর একখানি প্রবন্ধের বই। এই প্রবন্ধ রচিত হয় ১৩২০ বঙ্গাব্দে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় প্রায় ৩৪ বৎসর পরে। এই প্রবন্ধ কিছুটা গুরুগম্ভীর এবং রচনারীতি ও বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলীর মতো নয়। এখানে তিনি মৌখিক ভাষারীতি অনুসরণ না করে তৎকালীন-লেখ্য সাধুরীতিকেই অনুসরণ করেছেন। যেমন :

'সকল মনুষ্যেরই দুই দুই হস্ত ও পদ, চক্ষু ও কর্ণ ইত্যাদি এবং ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মোটামুটি গঠনও একই রূপ সত্য, কিন্তু মানবজাতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা বিধায় নানা লোকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্য আমাদের এতই চোখে পড়ে যে, শিল্প হিসাবে দেহ-গঠনের একটা আদর্শ বাছিয়া লওয়া শিল্পীর পক্ষে দুর্ঘট হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতর জীবজন্তু এবং পুষ্প পল্লব ইত্যাদির জাতিগত আকৃতির সৌসাদৃশ্য আমাদের নিকট স্থির বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।—এই জন্যই বোধ হয় আমাদের শিল্পাচার্যগণ মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ডৌল অমুক মানুষের হস্তপদাদির তুল্য না বলিয়া অমুক পুষ্প অমুক বৃক্ষলতা ইত্যাদির অনুরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতিঃ, মুখের আকার কুক্কুট ডিম্বের ন্যায় গোল।—পানের মতো মুখ, পাঁচের মতো মুখ, এমন কি প্যাঁচার মতো যে মুখ, তাহাও এই অণ্ডাকারেরই ইতর বিশেষ।'

নিজস্ব গদ্যরীতি থেকে এই যে সরে আসা, সেটাও যেন অবনীন্দ্রনাথের একটা বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে 'ভারত-শিল্পে মূর্তি' প্রবন্ধ 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র অন্তত সাত-আট বছর আগে রচিত হয়েছিল। সাধু রীতি এবং চলিত রীতি, কিংবা পণ্ডিতী রীতি ও বৈঠকী রীতি—সব রীতিতেই নিজের বক্তব্যকে সরসভাবে প্রকাশ করবার দক্ষতা ছিল তাঁর। এইসব প্রবন্ধ পাঠ করলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অলঙ্কারশাস্ত্র, তিনি যেমন খুঁটিয়ে পড়েছিলেন, তেমনি পড়েছিলেন বৈষ্ণব-পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত, দেশবিদেশের শিল্প-কথা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যভারাক্রান্ত নানা গ্রন্থ। অলঙ্কারের এক-একটি সূত্র ধরে তিনি কী সুন্দরভাবেই না শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করেছেন (যেমনটা করেছেন 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী'-র বিভিন্ন প্রবন্ধে)। এমন করে যে শিল্পরচনার রসসমৃদ্ধ ব্যাখ্যা করা সম্ভব তাঁর আগে বোধকরি সে-কথা কেউ ভাবেন নি। শিল্পরচনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বহু ক্ষেত্রে কবীর-এর দোঁহা যেমন অবলম্বন করেছেন, তেমনি

আমাদের প্রাচীন কবিদের এমন কি রবীন্দ্রনাথেরও অনেক কবিতার অংশবিশেষকে সূত্র হিসাবে ধরে নিয়ে নিজের অভিমতকে জোরদার করেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের আরও অনেক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে সাময়িক পত্রিকার পাতায়। যেমন, নবদূর্বা (নবযুগ, ১৩১১); প্রশ্নোত্তর (ভাণ্ডার, ১৩১২); স্বর্গীয় রবিবর্মা (প্রবাসী, ১৩১৩); বিজাতীয় রকমে স্বদেশোন্নতি (প্রবাসী ১৩১৩); নামকরণ-রহস্য (বঙ্গদর্শন, ১৩১৬); শিল্পের দেবতা (প্রবাসী, ১৩১৬); শিল্পে ভক্তিমন্ত্র (ভারতী, ১৩১৭); ভাবসাধন (ভারতী, ১৩১৭), কালোর আলো (ভারতী, ১৩১৮); দুই দিক (ভারতী, ১৩১৮); পুরী-মাহাত্ম্য (১৩১৯); টাইটানিকের হিসাব নিকাশ (প্রবাসী, ১৩১৯; প্রাণপ্রতিষ্ঠা (ভারতী, ১৩২০); সূর্যিমামার ঘর (সন্দেশ, ১৩২০); যাওয়া-আসা (প্রবাসী, ১৩২০); পথে পথে (ভারতী, ১৩২২); আস্তিকালের ছবি (ভারতী, ১৩২২); ফাল্গুনী (প্রবাসী, ১৩২২); আলপনা (পার্বণী, ১৩২৫); রূপরেখা (ভারতী, ১৩২৫); শিল্প ও শিল্পী (ভারতী, ১৩২৫); পাটেল বিল (সবুজপত্র, ১৩২৫); দারুব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা (ভারত, ১৩২৬); উনো ছুনো (ভারতী, ১৩২৬); রস ও নীরস (ভারতী, ১৩২৭) শিল্পের অন্ধকার যুগ (প্রবর্তক, ১৩২৮); বাণী ও বীণা (প্রবর্তক, ১৩২৮) সঙ্গীতের পথ (ভারতী, ১৩২৯); ভালাসী (প্রবর্তক, ১৩২৯); রঙ্গালয়ের রঙ্গিন আলো (ভারতী, ১৩২৯); হাঁসুলি কি ফাঁসুলি (ভারতী, ১৩২৯); হাফেজ (প্রবর্তক, ১৩২৯); বর্তমান ও ভবিষ্যতের আর্ট, (প্রবর্তক, ১৩২৯); বাসন্তী পর্ব (ভারতী, ১৩২৯); উৎসবের কনসার্ট (প্রবাসী, ১৩৩০); ছেলেভুলানো ছড়া (ভারতী, ১৩৩০); মহা বংবুম হক্কী সিড়প প্রশ্নোত্তরমালা (ভারতী, ১৩৩০) শিল্প (প্রাচী, ১৩৩০); কারুছত্র (অয়ন, ১৩৩০); বড় লেখা ছোট লেখা (প্রাচী, ১৩৩০); রীতিমত শিল্পশিক্ষা (তরুণ, ১৩৩০); ছেলেমানুষী বিদ্যে (ভারতী, ১৩৩০); রস ও রচনার ধারা (বঙ্গবাণী, ১৩৩০); পথের বীণা (ভারতী, ১৩৩১), নববর্ষের আবদার (প্রবাসী, ১৩৩১); উন্নতি ও পরিণতি (মহিলা, ১৩৩১); নাচঘরের আবহাওয়া (নাচঘর, ১৩৩১); চংথা না বেহালা (শনিবারের চিঠি, ১৩৩১); বাংলার থিয়েটারের একটুকরো (নাচঘর, ১৩৩:); নির্ভাবনার দুর্ভাবনা (প্রবাসী, ১৩৩১); শিল্পের ক ও খ (বার্ষিক বসুমতী); রূপরেখার রূপকথা (প্রবাসী ১৩৩২); খাসিয়াদের শারদোৎসব (কল্লোল, ১৩৩২); দোতারা (উত্তরা, ১৩৩২); আশ্রমের উৎসব ও অনুষ্ঠান (প্রবর্তক, ১৩৩৩); আর্টের সহজ পথ (উত্তরা, ১৩৩৩); সাহিত্যে শুচিবিচার (ভারতী ১৩৩৩); জগদিন্দ্রনাথের স্মরণে (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৩); এম্ এ আর্টিষ্টের প্রশ্নমালা (কল্লোল, ১৩৩৪); নতুন ও পুরোনোর ছন্দ (বিচিত্রা, ১৩৩৪); কলি ও কাল (নওরোজ, ১৩৩৪); রসসৃষ্টি (নাচঘর, ১৩৩৪); যাত্রা ও থিয়েটার (জয়ন্তী উৎসর্গ, ১৩৩৮); সহজ মানুষকে নমস্কার (Acharya Ray Commemoration Volume 1932); নূতনে পুরাতনে (উদয়ন, ১৩৪০); উড়ো চিঠি (চার প্রস্থ, নাচঘর, ১৩৪০); ব্রহ্মদেশের নৃত্য (নাচঘর, ১৩৪০); 'পাউই নৃত্য' (নাচঘর, ১৩৪০); শিশুসাহিত্য (রংমশাল, ১৩৪৫); শিল্পীর খেয়াল (শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৩৪৬); দুই সন্ধানী (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯) শিশুসাহিত্য (প্রবাসী, ১৩৫১); মৌচাক

যেন আশ্রয় পেতে চাইল তাঁর কাছে। তাদের অসহায়তার বেদনা গুর্খাদের অত্যাচারে অপমানের জ্বালায় পরিণত হয়েছে। সেই জ্বালার অংশীদার হবার জন্য এণ্ডরুজ এসে দাঁড়িয়েছেন তাদের মধ্যে।

কিন্তু এণ্ডরুজ এও লক্ষ্য করলেন যে যে পরিমাণ অত্যাচার হয়েছে পরিস্থিতি সেই তুলনায় আশ্চর্যভাবে শান্ত। স্থানীয় কর্মীরা, নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে অবস্থা যে কোন মুহূর্তে আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। কিন্তু জেলা কংগ্রেস সভাপতি অখিলচন্দ্র দত্ত এবং সহ-সভাপতি হরদয়াল নাগের চেষ্টায় জনতা উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি।

নানা জেলা থেকে ভলান্টিয়ারের দল এসে পৌঁচেছে—কোন কষ্টই তারা সহ্য করতে অপারগ নয়। মৃত্যুর জ্বালার মধ্যে একটু প্রাণের আনন্দ আবেগ সঞ্চার করেছে তারা। চাঁদপুরের মানুষ, গোটা শহরটাই যেন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ঐ ছিন্নমূল কুলিদের পাশে। বর্ষা নেমেছে মাথায় আশ্রয় নেই তবু মানবহৃদয়ের উত্তাপটুকু থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয় সে চেষ্টা ক্রমাগতই করেছে চাঁদপুরের অধিবাসীরা। নিপীড়িতকে আশ্রয় দিতে গিয়ে সেদিন চাঁদপুরের মানুষ নিজের স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা ভুলেছিল, ভুলেছিল হিন্দু মুসলমান ভেদ। বিস্ময় বিমুগ্ধ এণ্ডরুজ উদার প্রশংসা করেছেন এই অবস্থার—

There appears to me something singularly beautiful in this fearless act of love, and it has given me an insight into the heart of East Bengal. The Mussalmans were entirely one with the Hindus in this supreme act of hospitality.

এদিকে অন্যসব কাজকর্ম বন্ধ। ধর্মঘট চলছে সহরে। পূর্ববাংলার অন্যান্য শহরে ধর্মঘট ছড়িয়ে যাচ্ছে। পত্রিকাগুলিতে প্রতিবাদের ভাষা ক্রমশঃ তীব্র হয়ে উঠছে। সেদিনকার বসুমতী লিখছেন—

'চাঁদপুরে যে কাণ্ড ঘটিল তাহাতে অতঃপর আর কেহ বলিতে পারেন না যে জালিয়ানওয়ালার পুনরভিনয় এ দেশে অসম্ভব।...যে হৃদয়বিদারক নিষ্ঠুর কাণ্ডের অভিনয় চাঁদপুরে অভিনীত হইয়াছে তাহাতে হৃদয়বান ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণ আকুলিবিকুলি করিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।...মহামতি এণ্ডরুজের মত নিরপেক্ষ ন্যায়বান লোক দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট হতভাগ্য কুলিদের অঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ এ অন্যায় অত্যাচারে কাঁদিয়া উঠিয়াছে।'

এণ্ডরুজ নিজেই বলেছেন যে আহত কুলিদের সেবা করতে পারলে তাঁর ভাল লাগতো, কিন্তু সেবা করার জন্য উৎসুক বহু তরুণ প্রাণ মিলেছিল এসে। তাই তাঁর কাজ অন্য জায়গায়। তিনি বুঝলেন যে সরকারকে সাধারণ মানুষের মনের কথাটা পৌঁছে দেবার লোক কেউ নেই। ২৬শে মে 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকা ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন we cannot understand why prominent leaders are not personally coming to the spot and arranging for the relief. দেশের সাধারণ মানুষ আর সরকারের মধ্যে সেদিন প্রথম এসে দাঁড়ালেন এণ্ডরুজ। সেই কাজই তিনি নিজের জন্যে বেছে নিলেন এবং বললেন সাধারণ মানুষের অপমানের জ্বালাটা আমি বুঝেছি তাই সেই জ্বালার খবরটাই সরকারী মহলে পৌঁছে দিতে চাই।

চাঁদপুরে কুলিদের অবস্থান, কলেরার আক্রমণ, রেল ষ্টীমারের ধর্মঘট এ সব কিছুই একটা গুরুতর রাজনৈতিক সংঘর্ষে পরিণত হল তার কারণ ঐ গুর্খা পুলিশের অতর্কিত আক্রমণ।

It cannot be made too plain, that it was the Gurkha outrage, in the Chandpur railway station which was the fountain head of all the subsequent disaster.

কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করার জন্য দার্জিলিঙে যাওয়া দরকার। সেখানে বোঝাতে হবে যে কুলিদের ফিরে যাবার জন্য যে সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল তা বন্ধ করে দিলে চলবে না। কিন্তু যাবার সময় হচ্ছে না। চাঁদপুরেই অবস্থা এত গোলমেলে যে এণ্ডরুজ ছেড়ে যেতে পারছেন না। নিজের দায়িত্বে কিছু কুলিকে পুরো ষ্টীমার ভাড়া দিয়েই পাঠিয়ে দিলেন দেশে। সরকারের কাছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকার সাহায্য চাইলেন। উত্তরে সরকার রেল ও ষ্টীমার কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন যে কুলিদের যেন কোন সাহায্য না দেওয়া হয়। ফলে হরতাল ও ধর্মঘটের জোয়ার সুরু হয়ে গেল—চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, নোয়াখালি, শিলচর, ফেণী—প্রতিবাদ উত্তাল হয়ে উঠলো। ২৬শে মে ওরই মধ্যে একটু সময় করে এণ্ডরুজ গেছেন দার্জিলিঙে।

সেখানে বাংলা-সরকারের বড় কর্তা স্যর হেনরী হুইলারের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, কলেরার প্রকোপ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে—আর মজুরদের দেশে ফেরার সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ বললেন যে কলেরার ব্যাপারটা স্বাস্থ্যবিভাগের ব্যাপার, তাঁদের কিছু করবার নেই। তবে রেল ও ষ্টীমার ভাড়ার কিছু সুবিধা দেওয়াই আছে—স্থানীয় কর্তৃপক্ষ না বুঝে চাঁদপুরে সেই সুবিধাগুলি বন্ধ করে দিয়েছে।

দার্জিলিঙ থেকে এলেন কলকাতায়। বেঙ্গল লেবর ফেডারেশন এক সভার আয়োজন করলেন। এই লেবর ফেডারেশনের সহ সভাপতি ছিলেন এণ্ডরুজ। ২৯শে মে'র ঐ সভায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেছিলেন। সেই সভায় এণ্ডরুজ বললেন যে সাধারণ মানুষ ভেবেছিল কুলিদের 'কনসেশন' দেওয়া হচ্ছে না। হুইলার বলেছেন যে কনশেসনে তিনি আপত্তি করেন নি। তাঁর আপত্তি সম্পূর্ণ বিনা ভাড়ায় যাওয়ায়। এণ্ডরুজ বলেছেন—

I am sorry he did not make his meaning more explicit to his own officials, for that one mistake in the official communications has probably been the cause of many lives being lost.

সভায় তিনি জানালেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যে সরকার চা শিল্পপতিদের তাঁবেদার ছাড়া আর কিছু নন। কায়েমী স্বার্থের পক্ষে এই সরকার—দরিদ্রের পক্ষে নয়। সভায় যা বলেছিলেন তার বিবৃতি পত্রিকায় বেরুলো

Government of Bengal living in the planters stronghold at Darjeeling with planting interests on everyside of them was confronted by the solid phalank on the planters opposition. Any action to assisst these labourers to have Chandpur was represented as 'taking sides against the planters.'

কলকাতার মানুষ সেদিন এণ্ডরুজের মুখ থেকেই জানতে পারলেন গুর্খাদের অত্যাচার কি পর্যায়ে পৌচেছিল। এক দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখলেন বেঙ্গলী পত্রিকা। আহ্বান করলেন সরকারকে যে এণ্ডরুজের এই চ্যালেঞ্জের উত্তর দাও। ইংলিশম্যান লিখলেন লালঝাণ্ডা ওড়ানো বলশেভিক নেতাদের চেলাগিরি করছেন এণ্ডরুজ। উত্তরে ১লা জুনের বেঙ্গলী লিখলেন

The flag Mr. Andrews holds up is that of truth and justice and it is this that has prompted him to speak out his mind with directuers and candour.

ইতিমধ্যে ২৪শে মে রেলকর্মচারীরা গুর্খা আক্রমণের প্রতিবাদে ধর্মঘট করে বসলো। তাদের নিজেদের দাবী পূরণের জন্য আন্দোলনের পথে অচিরেই নামতে হতো তাদের। কিন্তু নিজেদের জন্য নয়, নিরাশ্রয় কুলিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এই প্রথম ধর্মঘট হলো ভারতবর্ষে। বিশেষ কারো বুদ্ধিতে এটা ঘটে নি—স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্ষুব্ধ মানুষেরা রেলের চাকা বন্ধ করে দিলে। সেই ধর্মঘটের ছোঁওয়া লাগলো ষ্টীমার কর্মচারীদের মধ্যে। ষ্টীমারও বন্ধ হলো।

উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ধর্মঘটের ফল কি হতে পারে তা এণ্ডরুজ যেমন দূরদৃষ্টির সঙ্গে বুঝেছিলেন এমন আর কেউ বোঝেন নি। চাঁদপুরে যখন কয়েক হাজার কুলি কলেরার তাড়নায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৃত্যুর মুখোমুখী তখন রেল ও ষ্টীমারের পথ বন্ধ হলো। এণ্ডরুজের ভাষায় এই অবস্থার নাম Chandpur bottleneck. কুলিদের এই নরক থেকে উদ্ধার করার লড়াই চলছিল এতদিন শাসকদের সঙ্গে। বিস্মিত বিমূঢ় এণ্ডরুজ দেখলেন যে ধর্মঘটী রেল ও ষ্টীমার কর্মীরাই এবার কুলিদের মুক্তির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো

…the strike of the steamship employees stood directly and fatally in the way, blocking the exit. It was all our own doing and our regets on that account were very bitter.…we could not·· understand why it was regarded as necessary for ther steamers to go on striking in such a way as to keep those refugees themselves in Cholera stricken Chandpur.

পরে ধর্মঘটের মূল উদ্দেশ্য ভুলে গেল রেলষ্টীমার কর্মীরা। জিদের লড়াই প্রবল হলো—কুলিদের বেরুবার পথ বন্ধ হয়ে গেল। তবু এণ্ডরুজ মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন ধর্মঘটীদের। কী নিদারুণ কষ্ট তারা স্বীকার করে নিয়েছে কুলিদের সমবেদনায় কাজ বন্ধ করে। সংসার অচল হয়েছে, স্ত্রীপুত্র অভুক্ত থেকেছে তবু তাদের মধ্যে কেউ ফাঁকি দিয়ে কাজে যোগ দেয়নি। ধর্মঘটের উদ্দেশ্য পরিণতি যতই জটিল হয়ে পড়ুক সাধারণ মানুষের এই ভালবাসার শক্তিকে এণ্ডরুজ পরমানন্দে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর রচনায়।

ধর্মঘট ক্রমশঃ জীবনের লড়াই হয়ে দাঁড়ালো। উগ্র রাজনৈতিক নেতারা যাঁরা চাঁদপুর গোয়ালন্দে যান নি তাঁরা ধর্মঘটের রাজনৈতিক চেহারাটাকে বড় করে দেখলেন। এমন কথাও বলা হল 'ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বাধীনতার জন্য কলেরা ক্যাম্পে কয়েক হাজার কুলি বলি দিলেও ক্ষতি নেই।' আরও অভিযোগ হলো এণ্ডরুজ সব সময়ই ধর্মঘটের বিরুদ্ধে। এণ্ডরুজ তার উত্তরে

বললেন, 'আমি কখনোই সব ধর্মঘটকে অন্যায় বলিনি অসহযোগের আন্দোলন তো জাতীয় ধর্মঘট অন্যায়ের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি ক্ষুধার তাড়নায় মজুররা কিরকম হিংস্র হয়ে উঠছে।···আমরা যারা শিক্ষিত, দুঃখভোগ করা উচিত আমাদেরই। যারা দরিদ্র তাদের উপর দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয় আমাদের।' আমাদের নেতারা সেদিন কেউ এণ্ডরুজের কথায় কর্ণপাত করেন নি। যে অবস্থা তৈরী হলো তাতে বোধহয় ধর্মঘট মিটিয়ে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। কেবলমাত্র রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখলেন :

বাঘে মহিষে যুদ্ধে উলুবনের যে প্রাণ যাইতেছে। ধর্মঘট বশতঃ কুলি ষ্টীমারের দ্বারা চাঁদপুর ছাড়িয়া যাইতে পারিতেছে না; কলেরায় তাহাদের অনেকের ও তত্রত্য সাধারণ অধিবাসীর প্রাণ যাইতেছে। পরে নেতারা ষ্টীমারের বন্দোবস্ত করিলেও তৎপূর্বে যাহারা মরিয়াছে তাহারা আর ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে ধর্মঘট-সংঘটকদের জিৎ হইলেও তো আর স্বরাজ লাভ হইবে না; সুতরাং ছোট বিষয়ে জিদ্ বজায় রাখিবার জন্য মহা অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হয় নাই।

৩১শে কালীমোহন ঘোষকে সঙ্গী করে এণ্ডরুজ আবার পৌছলেন গোয়ালন্দে। তখনও সভা-সমিতি চলেছে চারদিকে, অর্থ সংগ্রহের আয়োজন চলছে নানা জায়গায়। এণ্ডরুজ ছুটেছেন। ডাক্তার, স্বেচ্ছাসেবক, কংগ্রেসকর্মী যারাই তাঁকে দেখছে তারাই শক্তি অনুভব করছে। আসামের বিশপ পাথেনহাম এসেছেন সেবার দায়িত্ব নিয়ে। তিনি লিখলেন—

He was the very embodiment of peace and quietness; his very presence was like balm in that excited and turblent atmosphere···He was the calm, happy spirit that lifted one above the turmoil into peace.

একজন মানুষ তার উপস্থিতির দ্বারাই অন্যদের সাহস দিচ্ছে, শক্তি দিচ্ছে এ রকম ঘটনা সংসারে বেশি ঘটে না। অর্থের জন্য নানা জায়গায় সভা হচ্ছে ইতিমধ্যে এণ্ডরুজ গেছেন চট্টগ্রামে। দলে দলে লোক এসেছে মোসলেম হল প্রাঙ্গণে তাঁকে দেখতে। সভায় কুলিদের দুঃখের বিবরণ দিয়ে এণ্ডরুজ অর্থের জন্য আবেদন জানালেন। তাঁর গলার মালা নীলামে তুলে দিলেন, তিনশো টাকা দাম পাওয়া গেল। 'তারপর এণ্ডরুজ তাঁহার গায়ের সার্টটি খুলিয়া দিয়া খোলা শরীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সার্টের দাম হইল ৫৫০ টাকা।' (প্রবাসী) এই জাতীয় আরও ঘটনার উল্লেখ সমসাময়িক পত্রিকা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে।

এত করেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটের জের মজুরদের ওপর এসে পড়লই। ঐ চাঁদপুরের bottleneck ভাঙ্গা গেল না। স্থানীয় লোকদের দয়াদাক্ষিণ্যের উপরে নির্ভর করে চা বাগানের মজুররা চাঁদপুরেই পড়ে রইল। বাংলা প্রবাদ 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়'—উদ্ধৃত করে এণ্ডরুজ বললেন—

The great 'kings' of the National Movement, on the one hand, and of the Government on the other, are now the combatants. But the poor people, who are like the grass, are in danger of being trodden down by both parties.

শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয়দের দ্বারা চালিত এক ষ্টীমারে শেষ পর্যন্ত ঐ অবরুদ্ধ মজুরদের উদ্ধার করে আনতে হল।

আজ এ আন্দোলনের কথা কারো বিশেষ মনে নেই। আশ্রয়চ্যুত আসাম চা বাগানের শ্রমিকদের পাশে সেদিন এণ্ডরুজ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন সাহস আর ধৈর্যের প্রতিমূর্তি হয়ে। আমাদের স্বদেশী নেতারা যখন ধর্মঘট করে প্রতিবাদ জানাবার উত্তেজনায় অধীর তখন বিদেশী শাসনের অভিশাপ আর দেশী নেতাদের ভ্রান্ত অধীরতার হাত থেকে বাঁচাতে এণ্ডরুজ সবচেয়ে সক্রিয় হয়েছিলেন।

'কুলি' কথার ব্যবহার এণ্ডরুজ সাহেব একেবারেই করতেন না। গান্ধীজীকেও লিখেছিলেন 'কুলি' কথার ব্যবহার না করতে। ইতিহাসের সমসাময়িকতা রক্ষার জন্য আমরা কথাটি ব্যবহার করেছি মাত্র।

বাংলার বিদ্বৎসমাজ। বিনয় ঘোষ। প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চাটুয্যে ষ্ট্রীট। দাম—৭·৫০ পৃ—১৭৮।

বুদ্ধিজীবী শব্দটার প্রকৃত অর্থ আজও জানা হোল না। নানা মুনির নানা মত। যখন ময়দানে লক্ষ লোকের মিছিল সমাবেশ করা যায় তখন দুটি বুদ্ধিজীবী একত্র হলেই কোলাহল শুরু হয়। যাযাবর একদা বলেছিলেন দুজন বাঙালী একত্র হলেই গঠন করে ক্লাব। অর্থাৎ মিলনক্ষেত্র, যোগরূঢ়ার্থে আড্ডা স্থল। আজকের উদাহরণ কফিহাউস, চায়ের দোকান, বাড়ির রক। বাঙালিদের এই সহজ প্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধিজীবী শব্দটার আত্মীয়তা কি এবং কতটুকু। সম্প্রতি শুদ্ধসত্ব বসু বলেছেন তিনি বুদ্ধিজীবী নন শব্দজীবী। অর্থাৎ কবি বা লেখকমাত্রেই কিছু বুদ্ধিজীবী নন। আগে কহ আর। অথচ বাঙালী মাত্রেই একটি স্বাভাবিক শ্রেণীভেদ বাঙালী লোক 'মছলি' খাতা হায় এবং বুদ্ধিজীবী (বা বক্‌বক্ করতা হায়)। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচুর অনায়াস আয় উপার্জনের ফলে 'বাবু' বাঙালীদের মধ্যে যে শিথিল ভোগ-বিলাস রয়েছিল তার ওপরে ছিল এই অর্থবন্যা আর গভীরে ছিল বিদ্যাবুদ্ধির ভড়ং। এ দুটি মিশিয়ে বহু ধনী তখন বাড়ির বৈঠকখানায় একটা 'কেলাব' করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর আগে বাঙালী ধনীদের কৃপাকটাক্ষে ভারতচন্দ্র প্রভৃতি পুঁথি নির্ভর কবি ভাঁড় গায়ক ইত্যাদিরা আশ্রয় পেতেন। অবশ্য বিলাসের ফাঁকে ছড়িয়ে ছিটেয়ে এই বুদ্ধিজীবী পোষণ সেকালে ধনীদের ধর্ম ছিল। ১৮০০ সাল নাগাদ ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়ের কৃপাকটাক্ষাধীন বাঙালী ধনীরাও এইভাবে টোল প্রভৃতি থেকে কুড়িয়ে আনা বুদ্ধিজীবীদের কেলাবের পক্ষপুটে আশ্রয় দিতেন। এ এক বিচিত্র মিশ্রণ।

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক—ধনী নাবালক কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভা। এখানে একদিকে বহু জ্ঞানী পণ্ডিতরা যখন কালীপ্রসন্নের আর্থিক সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ করছেন অন্যদিকে ইংরেজি সভ্যতার কুৎসিৎ অনুকরণে মদ্যপান ও আনুষঙ্গিক বিকৃতিতে বিদ্যোৎসাহিনী সভার দুষ্টলোকে নামকরণ করেছিল মদ্যোৎসাহিনী সভা।

বস্তুত এই একক উদাহরণে বাঙালী বুদ্ধিজীবী সমাজে (শ্রীঘোষ শ্রেণী বলতে নারাজ তাতে class interest এসে যায়, তিনি বিদ্বৎ সমাজ বলেছেন) এর প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। সম্প্রতি প্রকাশিত 'বাংলার বিদ্বৎ সমাজ' বইয়ে শ্রীঘোষ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের ভেতরে এই তথ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙলার বিদ্বৎসমাজ, বিদ্বৎসভা, বুদ্ধিজীবী ও তাদের ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন সমস্যা তিনি আলোচনা করার শেষে লিখেছেন সাম্প্রতিক বিদ্যার্থী ছাত্র বিদ্রোহ প্রসঙ্গে। বইটির শেষে দুটি মূল্যবান পরিশিষ্টে শ্রীঘোষ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের গত উনবিংশ শতাব্দীতে কি ভূমিকা ছিল এবং বাংলার বিদ্বৎসভা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করে পাঠকদের প্রভূত উপকার সাধন করেছেন।

বিনয় ঘোষ বইটি শেষ করেছেন একটি সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে। বিশেষত বাংলার আজ ছাত্র সমস্যার চেয়ে জটিলতর বোধকরি কোন সমস্যা আর কিছুই নেই। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবকটি সমস্যার সঙ্গেই এই ছাত্র সমস্যা জর্জরিত। বর্তমান ছাত্রদের উচ্ছৃংখলতা থেকেই জন্ম নিয়েছে সব কিছু। কিন্তু কেন বিদ্যার্থীরা হল বিদ্রোহী। সমাজ সংসারের সদস্য হয়েও তারা উচ্ছৃংখল বিকৃতির ঘোলাজলে গা এলিয়ে দিল কেন। সে কি নিছক বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির গাফিলতিতে! যে বিদ্যার শেষ কথা অর্থকরী। শিক্ষার লক্ষ্য যেখানে মূলত জ্ঞান নয় নিছক অর্থোপার্জন, একটি সংক্ষিপ্ত সীমার বৃত্তে অন্ধ বলদের মত শিক্ষা সেখানে ঘুরপাক খেয়ে মরে নিঃসন্দেহে। জ্ঞানের শেষ নেই তৃপ্তি নেই আরও আরও, জ্ঞান সমুদ্রে নুড়ি কুড়োনর বহুব্যবহৃত সক্রেটিস, উক্তি প্রসংগত উল্লেখ্য।

শ্রীঘোষ প্রশ্ন রেখেছেন : বিদ্যার্থী বিদ্রোহের সমাধান তবে কিসে? আমেরিকান সমাজশিক্ষক বলেছেন 'Students can change things if they want to because they have power to say No'। সত্যিই ছাত্রদের বিদ্রোহে আজ এই "No" নেতিবাদেরই প্রাধান্য। বলা বাহুল্য, সেই "No" আবার অনেক সময় সহিংস। অন্ধ আক্রোশে মাথা কুটে তারা হয়ত ভুলপথেই পা বাড়ায়, কারণ সঠিক পথের সহজ সন্ধান দেবার মত উগ্র নেতৃত্ব নেই সারা দেশে। এই উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহের মধ্যে ভঙ্গিটিও চোখ রাঙানো। কিন্তু শুধু ভঙ্গি দিয়ে চোখ ভুলিয়ে সার্থক বিদ্রোহের সন্ধান পাওয়া শক্ত।

তাই সুবিন্যস্ত পথে সবল নেতৃত্ব প্রয়োজন। উগ্র আধুনিক তর্ক বিতর্কে নয় 'সমাধান সম্ভব শতমুখী শোষণ পীড়নের সোপান বিন্যস্ত সমাজের আমূল পূর্ণবিন্যাসে এবং বহুযুগের শ্রেণীদাসত্ব থেকে বৃহত্তম মানবগোষ্ঠী পরিপূর্ণ মুক্তিতে। বিদ্যা বিধান বিদ্যালয় ও বিদ্যার্থীদের মুক্তি এখনই সম্ভব, তার আগে নয়।'

বলাবাহুল্য শ্রীঘোষ এই প্রসঙ্গে শ্রেণীদাসত্ব মুক্তি থেকে তথাকথিত শ্রেণীসাম্য আনতে চেয়েছেন। কিন্তু দেশ বিদেশের (বিশেষ করে ধনতান্ত্রিকদেশে) সকল গুণী কিন্তু সাম্যবাদকেই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান মনে করেন না। বিষয়টি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সাপেক্ষ। তবে শ্রীঘোষের প্রায় সকল মূলরচনাতেই যেমন শ্রেণীসাম্যের প্রশ্ন এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে তা কিন্তু সকল সমস্যা সমাধানের সর্বজন স্বীকৃত পরশপাথর না হতে পারে। যদিও শ্রীঘোষ তাই খুঁজে ফেরেন তবু বলা যায় তাঁর অনলস গবেষণায় একটু নুন ছিটিয়ে নিলেই প্রতিটি বাঙালী বুদ্ধিজীবী নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়ে থাকেন। বলাই বাহুল্য এহেন জ্ঞানবৃক্ষ আজকের জগতে হাতের কাছে সকল সময় পেতে গেলেই কিছুটা স্বীকার করতেই হবে বই কি।

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়

হাসাহাসি

মানসী দাশগুপ্ত

হাসির কারণ নিয়ে একদা দার্শনিকেরা বহু ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। কেন হাসি, হাসি ব্যাপারটার তাৎপর্য কী এইসব নানা রকম কথা এ পাশ ও পাশ ফিরিয়ে দেখা হতো সে সব আলোচনায়। এ বিষয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও কথা বলতে শোনা গেছে। এই সব দিকপালদের মতামত পুনরুদ্ধার করা এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, এঁদের বাণী এঁদের বচনেই সুখশ্রাব্য। এঁরা সকলে নিজ নিজ মত বলতে গিয়ে নানা কথা বলেছেন যার ভিতর দিয়ে একটি কথা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটি হলো যে রকম ব্যাখ্যা কান্না কিংবা খুশিতে দরকার নেই সেই রকম একটা ব্যাখ্যা কিন্তু হাসির জন্যে চাই। তার কারণ, হাসি একান্তই মানবিক দুর্বলতা, জীবজগতে কোথাও হাসি নেই। রাগ-ভয়-সুখ-দুঃখ সবই তার আছে, অথচ হাসির ব্যবস্থাটি নেই। মানব জগত থেকে জীবজগতের এই সামান্য ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা না করলেই নয়, দার্শনিকেরা তাই উঠেপড়ে লেগে গিয়েছিলেন। খুশির সঙ্গে হাসির তফাৎ এরা অনেকেই পেয়েছেন, অনেকে যা দেখেননি—কিংবা দেখতে পেলেও বলেননি তা হলো এই যে মানবিক জগতে হাসির গতি সর্বত্র অবারিত নয়। তিন মাসের শিশু এবং অতি বৃদ্ধ উচ্চহাস্য করে না। ঐ বয়সের সীমায় সুড়সুড়ি দিলেও মানুষের শরীরে অস্বস্তি দেখা যায় মাত্র, হাসি বেরোয় না। হাসির প্রকোপ তারুণ্যে প্রবল, যৌবনেও এর উপদ্রব দেখা যায়, ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে এর প্রাবল্য কমে আসে। এ ব্যাপারে অবশ্য পাত্রভেদে প্রতিক্রিয়াভেদ দেখা যায়। সাধারণভাবে দেখা যায় বালক ও তরুণদের চেয়ে বালিকা ও তরুণীগণ হাস্যে অধিকতর আন্দোলিত হন। বোকাদের চেয়ে বুদ্ধিমানেরা বেশি হাসেন কিনা এ প্রশ্নের তৈরি জবাব অবশ্য এখনি দেওয়া যাচ্ছে না, কেন না এটি পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয়নি এখনো। তা ছাড়া, পৌনঃপুন্যতার হিসেবে

বোকাদের বেশিবার হাসতে দেখা যায় এরকম একটা সাক্ষ্য প্রমাণ যদি মেলেও, সেই এক সাক্ষ্যেই বলে, মিহি রসিকতায় আদত হাসি হাসে বুদ্ধিমান—এসব কথায় আবার হাসির জাত বিচারে অন্ত বিবেচনা এসে যায়। এসব কথায় কান দেবার পূর্বে সকল প্রকার হাসির নমুনা যত্নপূর্বক সংগ্রহ করা দরকার। সে কাজের ভার অবশ্য গুরুতর হবে, কেন না হাসির যে মূল্য মানব প্রকৃতিতে রয়েছে তাকে লঘু করে ফেলবার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ভাষার মতোই মানবিক স্তরে হাসির আবির্ভাবের এক গূঢ় অর্থ আছে, যা এখনো কেউ সম্পূর্ণ ভেদ করে ফেলতে পারেনি।

হাসি যে বয়সে সুরু আর যে বয়সে নিশ্চিত শেষ এ দুই বয়সের সামান্য লক্ষণ লক্ষ্য করলে হাসির প্রাদুর্ভাবের কতকটা সঙ্গত ব্যাখ্যা মেলা সম্ভব। এইদিকে আমার পর্যবেক্ষণ প্রয়াস কতটা সাফল্য পেয়েছিল, একটি দুটি শিশুর হাস্যবেগের ক্রমবিবর্তন আমি খুব কাছে থেকে নিরীক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। একটির বর্ণনা দেয়া যাক।

প্রথম হাসলো আজ—শব্দ করে—অ—র হাসিমুখ দেখে, তারপরে দেয়ালে ক্যালেণ্ডারে নৃত্যরতা মেয়ের রঙীন ছবিকে কাঁপতে দেখে হাসলো আবার। যতবার ঘুরতে ফিরতে সেই ক্যালেণ্ডার চোখে পড়ছে, হেসে উঠছে শব্দ করে আপন মনে। কোলে করে ক্যালেণ্ডারের কাছে নিয়ে গেলে হাসি নেই। হাত ধরে নিজে নাড়তে পেলো যেদিন থেকে ছবিটাকে, দেয়ালে দূর থেকে দেখলেও আর হাসলো না তারপরে।...হেসে ওঠা এখন কেবল মানুষের মুখের হাসি কিংবা খেলার উপরেই নির্ভর করছে।

এ বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করতে এর সঙ্গে আরো অনেক তথ্য জুড়তে হবে, যথা এই হাসির আবির্ভাব শিশুর বহির্জগত চেতনার কোন স্তরে এলো, নিজের আঙুল ধরা আর কারো চটিজুতো চেপে ধরা প্রভেদ তার কাছে কতটুকু স্পষ্ট। এর অন্যদিকে রাখতে হবে সেই জাতকের বর্ণনা যে প্রৌঢ়কাল অবধি কতকাংশে নিজের স্বভাবী হাসির বেগ বইয়ে দিতে পেরেছে। তার হাসি কেমন করে কখন সম্পূর্ণ মুছে গেল এর রেখাচিত্র ধরতে পারলে নিশ্চয় দেখতে পাওয়া যাবে জাতকের হাসি কী ভাবে কাছের থেকে দূরের মানুষে ব্যাপ্ত হচ্ছে, তারপরে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে-হাসি একেবারে ভুলে যাওয়া প্রতিক্রিয়ার স্তরে। আমাদের প্রত্যেকের সীমিত অভিজ্ঞতায় এ ক্রমাবলুপ্তি ধরা পড়ে। কিশোর খেলার অবসানের অসংখ্য লক্ষণের ভিতরে হাসতে ভুলে যাওয়া একটি, চেয়ে দেখতে চাই না বলেই এটি আমরা লক্ষ্য করি না, আস্তে আস্তে হাসির সূত্র ছিঁড়ে যায়। এ সূত্র অপরের সক্রিয় সান্নিধ্যের সূত্র,—সেই সান্নিধ্যে আমাদের কৌতুক। জাতকের সঙ্গে মানবজগতের যোগ শুধু প্রয়োজনে নয় কৌতুকে।

অপরকে অপর বলে যখন প্রথম জানা যায়, এ জ্ঞান যতদিন থাকে, সেই একই কাল অপরের ব্যবহার যে নিজের শক্তির গণ্ডীর ভিতরে নাই এ বোধ যখন আসে এবং যতদিন রয়ে যায়, তখন এবং ততদিন আয়ত্তের অতীত সেই অপরের গতিবিধিতে জাতকের হাসি পায়। অপরের গতিবিধি যে কোনো মুহূর্তে হাস্যকরতার পর্যায় পার হয়ে ভয়াবহ, শোকাবহ, কিংবা ক্রোধের কারণ হয়ে উঠতে পারে। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, যতক্ষণ অপরের চলমান ব্যবহারের নিজ প্রয়োজনমতো সুখ-দুঃখ রাগ দ্বেষ ভয় ভালবাসার ব্যঞ্জনায় ব্যাখ্যা না মিলেছে, ততক্ষণ তাদের দেখলে জাতকের হাসি পায়।

জীবজগতে হাসি নেই কেন না জীবজগতে এই অপর-প্রত্যক্ষ মানবিক চেতনার অনুরূপ বোধে উদ্ভাসিত নয়। জীবজগতে অপর জীবের স্বার্থ বন্ধনে বিন্যস্ত, অপর তাকে ভক্ষণ করে, আর নয়তো তার ভক্ষ্য হয়, আঘাত করে নতুবা আহত হয়, ব্যবহার করে অথবা ব্যবহৃত হয়, প্রয়োজন সাধনের বিন্যাসে জীব ও তার পরিপার্শ্ব পরস্পর বিন্যস্ত, তার বাইরে অপর তার কাছে অর্থহীন, অবান্তর। মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিকতার এমন পূর্বনির্ধারিত নয়, অপরের সীমা তাকে নিজেকে আবিষ্কার করে নিতে হয়, সেই আবিষ্কারের পদ্ধতিতে অপর প্রতিটি জাতকের কাছে বিশিষ্ট রূপ ধরে। অপরের উপর শক্তি বা প্রভাব বিস্তার করা যে জাতকের পক্ষে যতো কঠিন, তার তত হাসির মাত্রা বাড়ে। কেন না অপরের কর্মকাণ্ড সবই তার আয়ত্তের বাইরে, দুদণ্ড ভালো করে দেখে বুঝে নিতে না নিতে তা বদলে যেতে থাকে, 'ওরে থাম থাম' বলে সে হেসে আকুল হয়ে যায়, এই হাসি শিশুর খেলার হাসি। এ খেলা বেশিদিন সম্পূর্ণত খেলা থাকে না, অপরের গতিপ্রকৃতি ধীরে ধীরে অনেকখানি অর্থবহ হয়ে ওঠে। আর অর্থ যেই আসে অমনি ভালো আর মন্দ লাগার অনর্থ সুরু হয়ে যায়, অর্থহীন কৌতুক বিদায় নিয়ে যায় জাতকের কাছ থেকে। তবু, বারে বারে নতুন মানুষ তথা নবীন অপর দেখা দেয় জাতকের জীবনে, সেই সঙ্গে দেখা দেয় কৌতুকের নব সম্ভাবনা, এমনি করে শিশু বড় হয়ে ওঠে যতদিন না শেষ পর্যন্ত সে বার্ধক্যে উপনীত হয়—নতুন আর নতুন লাগে না, অপরে আর নিজেতে ভেদের রেখা নিত্য ব্যবহারে যখন বহুল ব্যবহারে মোটা হয়ে আসে,—কোনো সূক্ষ্মতা যেখানে আপন চিহ্ন ফেলতে পারে না। অপর তখন শুধু প্রয়োজন, আর প্রয়োজন তখন বিভীষিকা। হাস্য সেখানে অশ্রুতপূর্ব শব্দের মতো বিভ্রান্তিকর।

উচ্চহাস্যের এ গতি কি কেবল জাতকের উপর দিয়ে বয়ে যায়, জাতক কি উচ্চহাস্যকে ব্যবহার করে না? করে, আর সেইজন্যই সুরুতে যা থাকে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি, তা রূপান্তরিত হয়ে যায় হাসাহাসিতে। হাসাহাসি নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা অপরের সান্নিধ্যে ও সহযোগিতায় প্রস্তুত। হাসাহাসির জন্য হাসি এলো বলে হেসে ফেলার বদলে কাজে লাগানোর জন্যে হাসি তৈরী করে নিতে হয়। সম্পূর্ণ হিসেব করে তৈরি হলে সে হাসিকে কাষ্ঠহাসি বলে চিনে নেওয়া যায়, কিন্তু অর্ধচেতনার মিশ্রণে প্রস্তুত ক্ষেপণাস্ত্র হিসেবে ব্যবহারযোগ্য হাসিকে স্বভাবী উচ্চহাস্য থেকে সহসা তফাৎ করা যায় না।

হাসি দিয়ে অপরকে ঘায়েল করা যায়—সমাজের এই আবিষ্কারের মূল্য অপরিসীম। হাসির এ আয়ুধ চরিত্র এক অসাধারণ যৌথ আবিষ্কার। অপরের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য করলে তার ফল কী দাঁড়ায় তা আমাদের মোটামুটি সকলেরই জানা আছে এবং এ জ্ঞান আমরা সকলেই সামাজিক পরিবেশে লাভ করেছি। ঠিক কোন বয়সে হাসাহাসি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়-এ বিষয়ে সামাজিক বীক্ষার সম্ভাবনাকে গবেষকেরা এখনো কাজে লাগাননি। সাধারণভাবে দেখা যায় অপরের উপরে জাতকের এ কথা অস্পষ্টভাবে অনুভব করবার পর থেকে বালকবালিকারা হাসিকে এইভাবে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে। বয়োবৃদ্ধি ও দক্ষতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাসাহাসির নৈপুণ্য ও সূক্ষ্মতা বাড়ে। সরাসরি উগ্রতা প্রকাশ ও অধিকার স্থাপন যেখানে অনুমোদিত, সেখানে হাসাহাসির ব্যবহার ক্রমে কমে আসে। এ অনুমোদন একদিকে সমাজবিন্যাসের উপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনি নির্ভরশীল

শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের উপরে। প্রতি পক্ষকে যুক্তিসহ তর্কে কিংবা গায়ের জোরে কাবু করবার আশা যার মনে যত অনুজ্জ্বল, সে ততো হাসাহাসি করে প্রতি পক্ষকে নস্যাৎ করে দিতে চায়। মেয়েদের হাসাহাসি করবার অভ্যাস যে সহজে মরতে চায় না, এটি তার কারণ হতে পারে। অপরদিকে, সাধু অথবা সাধ্বীগণ—যাঁদের মহিমা সকল প্রশ্নের অতীত, চারিত্র্য মহিমাতেই যাঁরা সকল অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছেন—হাসাহাসি করবেন এমন কথা ভাবা যায় না।

প্রত্যক্ষ ক্ষমতা প্রাপ্তির সুযোগ এলে, অপরকে নিজের আয়ত্তাধীনে এনে ফেলা গেলে, হাসাহাসির বেগ সম্ভবত কমে যায়। বয়স যেমন বাড়ে, অপরের উপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা বেড়ে বেড়ে যায়, না বাড়লেও বাড়বার আশায় ক্ষমতা শানানোর চেষ্টা চলে। হাসাহাসির জোর কমে বাগবিতণ্ডা বাড়ে। যতদিনে এ চেষ্টার সারশূন্যতা ধরা পড়ে, জানা যায় কার প্রভাব কতদূর, তখন ব্যঙ্গ তিক্ত হয়ে গেছে, তখন হাসাহাসির জন্য অপরের সান্নিধ্য সন্ধানে ফিরবার সাধ্যও ফুরিয়ে এসেছে। হাসাহাসিতে যোগ দেওয়া কঠিন হয়ে ওঠে পদে পদে হাসাহাসি থেমে যায়।

ক্ষমতা প্রভাব ইত্যাদির ছায়ায় হাসাহাসি কমে আসে এ কথা সম্ভবত সমাজ জীবনে সাধারণভাবে সত্য। নইলে দেশে দেশে অধুনা নতুন হাসির গল্পের এতো অনটন হবে কেন? অপরের উপরে ব্যক্তিগত প্রভাব বৃদ্ধির সুযোগ বেড়ে গিয়ে থাক চা-ই না থাক, বাড়বার সম্ভাবনা আছে এই বোধ, অপরকে ডিঙিয়ে যাবার প্রবল চেষ্টা এমন সম্পূর্ণভাবে সাম্প্রতিক জাতকদের মন অধিকার করেছে, অন্যান্য আয়ুধ নিয়ে সৃজনশীল মানুষ এত চিন্তিত, ব্যস্ত, যে হাসির হাওয়া এদের আকাশে একেবারে পড়ে গেছে। মনকে মজার আকাশে উড়িয়ে দেবার সুযোগই মিলছে না আর কিছুতে।

আঠারো শতকে মেদিনীপুর ও সাহিত্যসাধনা

প্রণব রায়

সাহিত্যসাধনা সুনির্দিষ্ট কোন সীমারেখা বা গণ্ডীর আবর্তের মধ্যে আবদ্ধ না থাকলেও বিহার-উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে যে বিকাশ লাভ করেছিল তা বেশ বোঝা যায়। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার এই 'বিশেষ' অঞ্চলটি হ'লো উত্তরপূর্বাংশ যা একান্তভাবেই রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল এককালে। নিবিড় বনভূমি বেষ্টিত পশ্চিমাংশ (যা পূর্বে জঙ্গলমহাল নামে পরিচিত ছিল) এবং পূর্ব-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যথাক্রমে বিহার ও উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকায় এসব অঞ্চলে বাঙলা সাহিত্যের গতিপথ যে কিছুটা রুদ্ধ হয়ে থাকবে তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই জেলার বেশির ভাগ অংশই উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত থাকায় উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাব সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় যে অবশ্যম্ভাবী ছিল তাতে সন্দেহ নেই। সুপ্রাচীন তাম্রলিপ্ত রাজ্যের পতনের পর থেকে (আনুমানিক দ্বাদশ শতকের প্রথম ভাগ) তাম্রলিপ্ত সহ মেদিনীপুরের সুবিস্তীর্ণ দক্ষিণাঞ্চল উৎকল বা উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের অধীনে আসার পর থেকে এ অঞ্চলে স্থায়িভাবে উড়িষ্যার শাসন প্রবর্তিত হয় এবং তা ক্রমশ পশ্চিমাংশ বরাবর উত্তর দিকের কিছু অংশে বিস্তার লাভ করে। উড়িয়ারা এসব অঞ্চলে প্রায় সাড়ে চার শ বছর আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।১ আফগানদের সময়ে এই জেলার উত্তরপূর্ব-ভূভাগের কিছু অংশ সরকার মান্দারণের এবং অবশিষ্টাংশ সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোগল বিজয়ের পরও মেদিনীপুর জেলার বেশির ভাগই উড়িষ্যা সুবার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ শুজার আমলে সরকার জলেশ্বরকে উড়িষ্যা থেকে বিচ্যুত করে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে সরকার জলেশ্বর উড়িষ্যার অংশ বলেই পরিগণিত হতো। আকবরের রাজস্বসচিব তোডর মল্লের সময়ে বর্তমান মেদিনীপুরের বেশিরভাগই ছিল উড়িষ্যার পাঁচটি সরকারের অন্যতম জলেশ্বর সরকারের অন্তর্ভুক্ত এবং বাঙলার সরকার মান্দারনের ষোলটি মহালের মধ্যে চিতুয়া, সাহাপুর, মহিষাদল ও হাভেলি মান্দারুণ (চন্দ্রকোণা ও বরদা পরগণা ও হুগলী জেলার কিয়দাংশ) এই চারটি মহাল ছিল মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মীরকাশিম ইংরেজদিগকে যে সনন্দ দেন তাতে মেদিনীপুরের বগড়ী, ব্রাহ্মণভুম, চন্দ্রকোণা, বরদা ও চিতুয়া এবং হুগলীর জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) এবং হাওড়ার মণ্ডলঘাট, খারিজা মণ্ডলঘাট ও ভুরশুট পরগণা চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং চাকলা মেদিনীপুর বলতে তখন কাশীজোড়া প্রভৃতি চুয়াল্লটি পরগণা ছিল। পরে এসব পরগণার কিছু কিছু অন্য জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়।

এইভাবে সংযুক্তিকরণ ও পৃথকীকরণের মধ্যে বর্তমান মেদিনীপুর জেলার একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সৃষ্টি হলেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী সাহিত্য সাধনায় রাঢ়ীয় প্রভাব যতখানি লক্ষ্য করা যায় উৎকলীয় প্রভাব তদনুপাতে নেই বললেই চলে। তার একটা কারণ বোধ হয় মধ্যযুগের কয়েকজন খ্যাতনামা কবির আবির্ভাব ঘটেছিল এই জেলার পূর্বোক্ত সরকার মান্দারনের অঞ্চল সমূহের মধ্যে, যেগুলি

উৎকলীয় সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিল বরাবর। এইসব শক্তিশালী কবির প্রভাবে উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এই জেলার অবশিষ্টাংশের সাহিত্যচর্চা স্বাভাবিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত হতো বলে ভাষার মধ্যে ওড়িয়ার আধিপত্য একপ্রকার নেই বললেই চলে। প্রাচীন পুথিপত্র ভালোভাবে লক্ষ্য করলে সাহিত্যের ভাষার এই আশ্চর্য রকমের বিশুদ্ধতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। (অবশ্য অল্প কিছু অংশে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়) মেদিনীপুর অঞ্চলের মধ্যযুগীয় কবিদের সাহিত্যিক ভাষা ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে গবেষণার বিষয় হলেও মোটামুটিভাবে দক্ষিণরাঢ়ে বহুল প্রচলিত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে যে বড়ো রকমের কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না, তা বলা যায়। আজ পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে যে সব প্রাচীন পুথিপত্র পাওয়া গেছে সেগুলির বেশির ভাগের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। অতিসম্প্রতি চেতুয়ার দাসপুর অঞ্চলে প্রাচীন পুথির অনুসন্ধানকালে লেখক কর্তৃক প্রাপ্ত জগন্নাথ দাসের 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' (লিপিকাল ১১৭১ বঙ্গাব্দ) একটি পুথিতে বাঙলা-ওড়িয়ার মিশ্রণ-জাত এক ভাষা লক্ষ্য করা গেছে। এ ধরণের পুথি অনুসন্ধান করলে হয়ত আরও পাওয়া যেতে পারে। 'রাসপঞ্চাধ্যায়ের' এই পুথিটির মধ্যে কবির একটি ভণিতা হলো—

কৃষ্ণ হোইলা অন্তধ্যান ॥ বোলই দাস জগন্নাথ।
বলে নিরোপি কৃষ্ণপন্থ।

এ ধরণের পুথির মেদিনীপুরের চেতুয়া অঞ্চলে (যা পুরাপুরিভাবে রাঢ়দেশের অন্তবর্তী) যে পঠনপাঠন হতো, তা থেকে এ কথা বলা যেতে পারে যে উৎকলীয় ভাষার প্রভাব বাঙলায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সাহিত্যের ভাষায় গৌড়ীয় প্রভাব এবং রীতিকেই মেনে নিতে হয়, যার সঙ্গে সমগ্র রাঢ়ের. যোগসূত্র অবিচ্ছিন্ন ছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত গবেষণা সাপেক্ষে সাহিত্যসম্পর্কে এ কথাটা মোটামুটি বলা যেতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, মন্দিরস্থাপত্যভাস্কর্যে একটি উৎকলীয় শৈলী সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হতে দেখা যায়। এ জেলার সীমান্ত বরাবর অঞ্চলসমূহে ও দক্ষিণাঞ্চলে, যার প্রভাব উত্তর-পূর্বাংশে বিশেষভাবে পড়েছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি উৎকলীয় শৈলীর সৃষ্টিত হয়ই নি, বরং তা অনুপস্থিত ও গৌণই থেকে গেছে। কিন্তু দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ভাষার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভাষার (অবশ্য ধ্বনি ও উচ্চারণের দিক থেকে) এক সুস্পষ্ট পার্থক্য চোখে পড়ে!

মেদিনীপুর জেলার সাহিত্যসম্পর্কে এই কথাগুলি মনে রেখে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। আর এটাও ঠিক সরকার মান্দারনের তথা পরবর্তিকালে চাকলা বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত বর্তমান মেদিনী-পুরের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত মেদিনীপুর, ব্রাহ্মণভূম, চন্দ্রকোণা বাগড়ী, বরদা, চিতুয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যে খ্যাতনামা ও অখ্যাতনামা কবিদের আবির্ভাব হয়েছিল বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরাই স্থায়ী কীর্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ এসব অঞ্চলে আদি বাসিন্দা ছিলেন না, যেমন, ষোল শতকের শেষদিকের খ্যাতনামা কবি মুকুন্দরাম, ব্রাহ্মণভূমের আরড়াগড়ে এসেছিলেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা থেকে, আঠারো শতকের গোড়ার দিকের কবি রামেশ্বর এসেছিলেন কর্ণগড়ে বরদা পরগণার যদুপুর থেকে।

ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে যেমন সাহিত্যসাধনা সীমাবদ্ধ থাকে না, তেমনি সাহিত্যকে কোন যুগের এক বিশেষ আবর্তেও ফেলা যায় না। বস্তুত পক্ষে, আঠারো বা উনিশ শতকীয় সাহিত্য

শুধুমাত্র কাল্পনিক বিভাগ মাত্র। ধর্মীয়, সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে সমাজের সার্বিক চিরাচরিত অবস্থার পরিবর্তনে সাহিত্য, শিল্পের মধ্যে নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায় কোন বিশেষ কাল বা যুগে। এর ফলে পরিবর্তন একটা হয় এবং তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় সমৃদ্ধির পথে, যেমন ষোল শতকে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙলা সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি হয়েছিল। সতেরো আঠারো শতকে তারই অনুস্মৃতি। উনিশ শতকে ইংরেজ সাহচর্যে সাহিত্যে নবযুগ লক্ষ্য করা যায় এবং আধুনিক সাহিত্যে এর পর কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষিত হয় নি।

আঠারো শতকের সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। কারণ, শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবিত চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের গতিপথ এক নতুনদিকে প্রবাহিত হ'লো এবং সেই প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বয়ে চললো আঠারো শতকের শেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে শক্তিশালী অনেক কবির আবির্ভাব হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের সকলের শক্তির উৎসমুখ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ষোল সতেরো শতকের সন্ধিক্ষণে বা তার কিছু আগে, যার প্রবাহপথ ধরে পরবর্তীকালের সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে।

বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ শেষ হয় আঠারো শতকে। মুদ্রণ যন্ত্রের সাহায্যে বাঙলা অক্ষরে হ্যালহেডের বাঙলা ব্যাকরণ ছাপা হল ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। বাঙলা গদ্যে আইনের বই ছাপা হল ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর পর ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরি-মার্শম্যান-ওয়ার্ডের উদ্যোগে শ্রীরামপুর মিশন ও মিশন প্রেস স্থাপিত হল। প্রাচীন পুথিপত্র আস্তে আস্তে বিদায় নিতে লাগলো আর তার সঙ্গে বিদায় নিলেন মধ্যযুগের কবিরা। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আঠারো শতকীয় সাহিত্য সাধনা কয়েকটি দিক দিয়ে উল্লেখ-যোগ্য। এক, অশান্তি-বিদ্রোহের মধ্যে এ শতকের শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত একটানা অরাজকতার মধ্যে এ শতকের সাহিত্যসাধনা অবিচ্ছিন্ন গতিতে চলেছিল। দুই, মঙ্গলকাব্যধারার অন্যতম দুটি ভাগ শিবমঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের অভাবনীয় উন্নতি যা মেদিনীপুর জেলার কয়েকজন কবি করেছিলেন। রামেশ্বর ও নিত্যানন্দ ছাড়া শীতলামঙ্গল কাব্যধারার অনেক কবিই এ ধরণের কাব্যে তাঁদের উৎকর্ষ দেখিয়েছেন, যেমন চেতুয়া পরগণার কলাইকুণ্ডা গ্রামের কবি শঙ্কর দে এবং এই পরগণার কবি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।

মেদিনীপুর জেলার আঠারো শতকের বাঙলা সাহিত্য বলতে যদি কিছু বোঝায় তাহলে বোধ হয় এই জেলার চেতুয়া ও বরদা পরগণাই মুখ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে। উপযুক্ত রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই দুই পরগণার অনেক কবির ভাগ্যে খ্যাতি হয়তো জুটে নি, কিন্তু কালের করাল হস্তক্ষেপ ছাড়িয়ে এসব কবির যে সব পুথি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি গভীরভাবে অনুধাবন করলে সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও তা থেকে এ অঞ্চলের অনেক কথা জানা যেতে পারে। 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি'র গত বৎসর সংখ্যায় ('মেদিনীপুরের আঠারো শতকের সাহিত্য' নিবন্ধে, পৃঃ ৭২-৭৮) এ শতকের যেসব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাছাড়া আরও কয়েকজন শক্তিশালী কবির পুথি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব কবির নাম ও পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হোল—

(১) **শঙ্কর দে :** ১১৪৪ বঙ্গাব্দে 'শীতলামঙ্গলে'র লক্ষাপূজাপালা রচনা করেন। আদিনিবাস ছিল চেতুয়া পরগণায় কংসাবতী তীরে পশ্চিম মালিকাগ্রামে। পরে কবি বর্তমান দাসপুর থানার

কলাইকুণ্ডা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন। এ গ্রামটিও চেতুয়া পরগণায় অবস্থিত। কবির পিতার নাম কৃষ্ণদাস ও মাতার নাম মাধবী। কবি শঙ্করের 'শীতলামঙ্গলে'র চারখানি পালা ছাড়াও দিগ্‌বন্দনা, পঞ্চাননের গান, গঙ্গামঙ্গল, কামাক্ষার গীত, ফেস্তাবার পালার পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে।(২) 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের জন্যেই কবি ঐ অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি সে সময়ে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত কুলিয়া গ্রামের জমিদার ঠাকুর দাস চৌধুরীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন।

(২) **শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর :** চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত ক্ষেপুতের নিকটবর্তী হাড়োয়াচক গ্রামে কবির বাস ছিল। পরে ক্ষেপুত গ্রামের কাছাকাছি 'কিষ্টবাটী' গ্রামে এসে কবি বাস করেন। তিনি 'শীতলামঙ্গলে'র চারখানি পালা (লঙ্কাপূজা, বরুণপূজা, ইন্দ্রপূজা, রাবণপূজা) ছাড়াও কবি 'পঞ্চাননমঙ্গল', 'লক্ষ্মীচরিত্র'(৩), 'সত্যনারায়ণের সাতভাই দুঃখীর পালা' রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থে কবি স্বয়ং রচনাকাল উল্লেখ করেছেন ১১৯৫ সাল। 'পঞ্চাননমঙ্গল সম্ভবত' ১১৮০ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। পূর্বোক্ত কবি শঙ্করের মতো কৃষ্ণকিঙ্কর সম্ভবত হাওড়া জেলার আমতা থানার কুলিয়া গ্রামের জমিদার বাঞ্ছারাম চৌধুরীর আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। এছাড়া তাঁর কাব্যে বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্রের উল্লেখ আছে। কিঙ্করের কাব্যে সে যুগে ঐ অঞ্চলের অনেক ইতিহাস জানা যায়। (৪)

(৩) **শ্রীবল্লভ :** শীতলামঙ্গলের রচয়িতারূপে পরিচিত হলেও (চারটি পালা 'লবকুশের পালা' 'পাতালবর্গ', নন্দালয় বা 'গোকুলপালা', 'চন্দ্রকেতুপালা') তাঁর 'দক্ষিণরায় উপাখ্যান' নামে কাব্যের এক পুথি অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। (৫) আত্মপরিচয়ে জানা যায় কবির পিতা শ্রীগোপাল মান্দারণ সরকারের অন্তর্গত বন্দিপুর গ্রামে বাস করলেও তাঁর পিতামহ অভিরাম থেকে উর্ধতন আরও দুই পুরুষ শ্রীলোচন ও শ্রীরঘুবল্লভ দীর্ঘকাল চেতুয়ায় বাস করেছিলেন।(৬) এছাড়া কবির আরও একটি পুথির নাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল'। ডঃ সুকুমার সেনের মতে শ্রীবল্লভ আঠারো শতকের কবি।

(৪) **মাধবীলতা :** মহিলা কবি। সম্ভবত আঠারো শতকের শেষভাগে মেদিনীপুর জেলার কোন স্থানে আবির্ভূত হন। মাধবীলতার একটি পুথি বর্তমান লেখকের কাছে আছে। পুথির নাম 'সুবচনীর পালা'।(৭)

(৫) **দ্বিজ বাঞ্ছারাম :** বরদা অঞ্চল থেকে এই কবি রচিত অনেকগুলি পদ্য ও দ্বাদশ গোপনের অন্যতম খানাকুল কৃষ্ণনগরের অভিরাম গোঁসাই-এর কাহিনী অবলম্বন ক'রে 'গোপীনাথের কীর্তনে'র এক পাতার (দুই পৃষ্ঠায় লেখা) একটি পুথি লেখক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন ক'রে বাঞ্ছারাম অনেকগুলি পদ্য ও রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বনে এক দীর্ঘ চৌতিশা রচনা করেন।(৮)

এছাড়া বরদা পরগণার কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী (১৮ শতকের প্রথম ভাগ থেকে শেষ) ও রামেশ্বর চক্রবর্তী (কর্ণগড়রাজসভা—সতেরো শতকের শেষ থেকে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ), কাশীজোড়ার নিত্যানন্দ চক্রবর্তী ও অন্যান্য আরও কবিরা আঠারো শতকের কাব্যচর্চাকে গৌরবমণ্ডিত করেছিলেন। (এদের সম্পর্কে 'ইতিহাস ও সংস্কৃতির' গত বৎসরের সংখ্যায় আলোচিত হয়েছে)। আঞ্চলিক সীমারেখার কথা বাদ দিলে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় অন্তর্গত বেলডিহাগ্রামের

(বেলটে) প্রসিদ্ধ কবি মাণিকরাম গাঙ্গুলী ধর্মমঙ্গল রচনা করেন ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে। মাণিকগাঙ্গুলীর। একটি শীতলামঙ্গলও পাওয়া যায়।

১ Bengal District Gazetteers, Midnapure : L. S. S. O'malley—P 22

২ মূল পুথি দাসপুর হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীত্রিপুরা বসুর কাছে আছে।

৩ মূলপুথি—লেখককর্তৃক প্রাপ্ত। সম্পূর্ণ পত্রসংখ্যা ১—১৮, লিপিকাল ১২৪৭ সাল

৪ 'মঙ্গলকাব্যের এক বিস্মৃত কবি', 'সমকালীন'/জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯, পৃঃ ১০৪—১০৮ : ত্রিপুরা বসু

৫ মূল পুথি, ত্রিপুরা বসু কর্তৃক প্রাপ্ত

৬ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ১৯৬৫ সং, পৃঃ ৪৪৬—৪৪৭ : ডঃ সুকুমার সেন।

৭ 'প্রাচীন বাঙলার কয়েকজন অপরিচিত কবি', 'সমকালীন'/অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯ পৃঃ ৩৯৩—৪০১ : প্রণব রায়

৮ ঐ ঐ

সার্ত্রে: স্বাধিকার

সলীল বিশ্বাস

সমাজের শুভাশ্রয়—পরিচিতি নির্ভর প্রতিটি মানুষই কি সামাজিক?—এই বিতর্কিত প্রশ্নের প্রথম উন্মেষ মুহূর্ত থেকে বিতর্ক বেজে উঠলেও—মানুষের স্বাধিকার চেতনা এবং স্বীকৃতির প্রেক্ষিতে বিতর্ক আরও জটিল এবং ফেনিল।—একদিন মানুষ ছিল মুক্ত' এবং 'আজ তার হাতে এবং পায়ে'—যে নানান বাঁধন জড়িয়ে গেছে—তার সাক্ষ্য প্রতিষ্ঠা এবং মুক্তি প্রয়াসের ভেতর দিয়েই দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে এসেছে।—এবং সেই ঘনায়িত সংঘর্ষের আজও কোন অবসান নেই।

'ব্যক্তি'—মানুষের নির্মুক্ত স্বাধিকারের অপরিসীমতার স্বীকৃতির অনুকূলে শতাব্দী চিহ্নিত অনেক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অকপট সমর্থন প্রতিকূল প্রতিবাদের আঘাতে স্ব-ভিত কেঁপে উঠেছে। ইতিহাস—এই সাক্ষ্যের অনেক দলিল আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে।

'মানুষের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ পাশবিক'—এই মতাদর্শের প্রতিবাদী বলছেন,—'ব্যক্তি স্বাধিকার যদি সীমা—চিহ্নিত এবং সামাজিক প্রভাত প্রবাহের প্রতি প্রতিশ্রুত না হয়—তা' হলে বিশ্ব-শৃংখলা বিনষ্ট হবে।'—'এমন কিছু পদ্ধতি আছে যার ওপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই,—অথচ সেই পদ্ধতি-ই সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করেছে'—বলে অজ্ঞেয়বাদীরা এই দুই প্রতিমুখীন শিবিরের মধ্যে আপাত সেতুবন্ধন রচনা করতে চেয়েছেন। অজ্ঞেয়বাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক হার্বার্ট স্পেনসার 'মানুষের দুর্জ্ঞেয়'-এই শক্তিকে 'Inscrutable Power in Nature'—বলে অভিহিত করেছেন।

ইমান্যুয়েল কাণ্ট-ই প্রথম ব্যক্তি—স্বাধিকারের অনুকূলে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ তুলেছেন। 'মানুষ অনিবার্য-ই মুক্ত'—এই প্রাক ধারনার ওপরেই কান্টিয় স্বাধিকার চেতনার ভিত গেঁথে উঠেছে। যে পারিবেশিক অবস্থাতেই যদি ব্যক্তির নির্মুক্ত স্বাধিকার স্বীকৃত না হয়,—তা' হলে 'অন্যে'-র প্রতি তার কোন নৈতিক বা ব্যবহারিক দায়িত্ব থাকে না। 'ব্যক্তি' কোন যদি তার ইচ্ছাকৃত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারে তা হলে তার অনুসৃত কোন কার্যকলাপের জন্যে তাকে নিন্দা বা প্রশংসার কোন প্রশ্ন-ই ওঠে না। কারণ, যথার্থ অর্থে, তিনি যা করলেন,—তার জন্যে তিনি-ই সম্পূর্ণতঃ দায়ী নন। এ কথার অন্তরালে, 'ব্যক্তি'-র একচ্ছত্র ইচ্ছা এবং আত্মভূতিক স্বাধিকার চেতনার কথাই ঘোষিত হয়। কিন্তু স্বাধিকার চেতনার অগ্নিদহনে ফরাসী বিপ্লবের স্রষ্টা-পুরুষ রুশোর দর্শনেও ব্যক্তি—স্বাধিকারের সীমা চিহ্নিত হয়েছে। তিনি বলছেন,—'কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি-ই তার একক 'ইচ্ছা নিয়ে বাঁচতে পারে না,—সমাজের চলমানতায় তা মিলিয়ে দিতে হয়। কারণ, সমাজের 'ইচ্ছা'-ই হলো সার্বজনীন এবং অবিভাজ্য। ব্যক্তি-বিশেষ তার 'একক ইচ্ছা'র তখনই স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেন—যখন তিনি 'স্ব-ইচ্ছা'কে সমাজের 'সার্বজনীন ইচ্ছার'-ই অবিচ্ছিন্ন অংশের স্বশ্রদ্ধ-স্বীকৃতি স্বীকার করেন। ভাববাদী দার্শনিক হেগেল এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব স্পিনোজাও এই সীমাবাদের স্বীকৃতি উচ্চারণ করেছেন।

মার্কসবাদী লৌকিকতায় ব্যক্তি-স্বাধিকারের নির্মুক্ত স্বীকৃতি শ্রেণী—সংঘর্ষের প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। মার্কসবাদের মূল-পর্ব যদি ; 'স্বরাট' মানুষের প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে সংগ্রামী হয়, তাহলে 'অনিবার্যত মুক্ত' মানুষের স্বাধিকারের 'সীমা-চিহ্নিত'-মার্কসীয় বক্তব্যে—এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের গর্ভে আর একটি 'দ্বন্দ্বের' প্রজন্ম ঘনিয়ে আসে। মার্কসবাদীরা বলছেন, 'অপরিহার্য বিস্ফোরণের যন্ত্রণা' থেকেই মার্কসবাদ স্বাধিকারের সীমা বেঁধে দিতে চায়। এ প্রসঙ্গে একটি সাধারণ কথা মনে আসে। সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি-ই যদি নির্মুক্ত স্বাধিকারের ক্ষেত্রে 'স্বরাট' হয়, —তা হলে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অন্য ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধিকার—সংঘাত অপরিহার্যভাবে বেজে উঠবে। সেই সংঘাত উত্তরণের অনিবার্য পথ হিসেবেই প্রত্যেক ব্যক্তি—বিশেষকে—'প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'—ব্রত গ্রহণ করা-ই উচিত। সেই জন্যেই 'প্রত্যেক কে তার প্রাপ্যটুকু'—পুরিয়ে দেবার জন্যে ব্যক্তি মানুষের নির্মুক্ত স্বাধিকারের সীমা টেনে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদী শ্রেণী সংঘর্ষের অনুমোদিত বিধি মেনে নেওয়া যায় না।

কিন্তু 'মানুষ অনিবার্যত-ই মুক্ত'—কান্টের এই স্বীকোরোক্তিকে যদি স্বীকার করতে হয় (অন্ততঃ কান্ট প্রত্যাহার করতে রাজি নন)—তাহলে স্বাধিকার সীমারিতির কোন প্রশ্ন-ই আসে না। প্রশ্ন যে 'আসে না'—তার অন্যতম বলিষ্ঠ চেতনা—জ্যাপল—সাত্রে। কান্ট যদিও তার প্রথম বক্তব্য প্রত্যাহার না করেই ব্যক্তিক স্বাধিকারের 'প্রতিশ্রুতি' স্বীকার করেছেন,—কিন্তু সাত্রে কোন 'প্রতিশ্রুতি' বা 'সীমা' মেনে নিতে প্রস্তুত নন। সাত্রের স্বাধিকার-চেতনা সীমা ছেড়ে অসীমের পথে বাউল।

মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা এবং ভালোবাসার উর্বর ভূমিতল হতেই সাত্রের দর্শনের সত্য সতেজ পল্লবিত হয়ে উঠেছে। তিনি মানুষের 'স্বাধিকার'-প্রসঙ্গে যে কোন সীমাবাদের যেমনি বিরোধিতা করেছেন, তেমনি 'বুদ্ধিবাদী'দের তির্যক ক্ষেত্র থেকেও মানুষকে ছিনিয়ে আনতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। প্লেটোর যুগ থেকে বুদ্ধিবাদীদের দ্বারা শাসিত মানুষের কাছে সাত্রের মানবতাবাদ এবং স্বাধিকার চেতনা 'নন্দনের সংবাদ'—বহন করেই এনেছে। অনেক সমালোচকের দৃষ্টিতে যা—'নাটকীয়।' সাত্রের দর্শনে—মানুষ নির্জন-নিরানন্দ,—যা অনিবার্য উদ্বিগ্নতার শিহরণ-ই বহন করে আনে। এই নির্জন মানুষ-ই তার স্বাধিকারের 'যন্ত্রণা' থেকেই প্রশ্ন সচেতন এবং স্বাতন্ত্র্য তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। এ কথা খুবই যথার্থ যে, একজন মানুষ কখন-ই অন্য একজন মানুষের সত্তার প্রতিরূপ হতে পারে না। সাত্রে বলছেন,—'বাস্তবের নিষেধাজ্ঞায় মানুষ নিরবচ্ছিন্ন গতিতে অবিরাম তার ভবিষ্যতের প্রতিকূলে অবস্থান এবং অনির্দেশ্য শূন্যতার মধ্যে আনুভূতিক পরিকল্পনাকেই অনুসরণ করছে।'

'স্বাধিকার'—একটি অপরিহার্য স্থিতধী—কল্পনা এবং পালনীয় ;—এই 'পালনীয়তা'র নির্মুক্তির জন্যেও স্থিতধী কর্ম-সাধনা প্রয়োজন ; এবং এই 'কর্ম-সাধনা' অপরিহার্য 'পালনীয়তা'র সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগের ভেতর দিয়েই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। জীবনের প্রেক্ষাভূমিতে মানুষ কখন একই চিহ্নিত সময়ে সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় সত্তার অবিচ্ছিন্ন প্রতিভূ হতে পারে না। কোন স্বচ্ছ যুক্তিতেই আরিষ্টটলের Law of Contradiction,' হেগেলীয় 'Law of Identity of Opposites. অথবা এঙ্গেলসের

'Anti—Duchring'—ব্যাখ্যার অসম্ভব সম্ভাবনাকে মানতে পারছিনে বলেই এই প্রমূর্ত সত্যিকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মানুষ প্রতিটি মুহূর্তেই নিজের রচয়িতা, এ ভিন্ন তার অন্য কোন পরিচিতি নেই এবং আর কিছু হতেও পারে না। মানুষ কখন-ই বিচ্ছিন্ন দর্শক নয়,—স্ব-চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন অভিনেতা। সার্ত্রে বলছেন, কোন নিষ্ক্রিয় মানুষও 'তিনি এবং তার স্বাধিকারের'-মধ্যে তার 'স্বাধিকার'-কেই বেছে নেবেন। স্বাধিকার বা স্বাধীনতা—নবীনতর পরিবর্তনের সূচনা করে। এই পরিবর্তন ব্যক্তির সীমা থেকে বিশ্বের অসীমে প্রসারিত।

সার্ত্রের প্রসঙ্গে সিমনের (Semone de Beauvoir) অধিকতর প্রসন্ন। তিনি বল্ছেন,—'মানুষ প্রতিভা মুক্ত ধরে নিয়েই তার স্বাধিকার বাস্তব ও সুরক্ষিত করে তুলতে তাকে প্রতিশ্রুত হ'তেই হ'বে।'—সার্ত্রে বল্ছেন,—'মানুষ অবশ্যই, নির্মুক্তি নির্বাচনে অ-বদ্ধ, নিজের 'হবার' জন্যেই যার স্বকীয় রচনার প্রয়াস, যে নিজেই 'স্ব-মান' (worthy), অনিঃশেষ নির্মুক্তিই তার ধ্রুপদী জীবন-ধারার ভিত্তি হ'বে।'—সার্ত্রের 'L,a,ge de raison', এ ডানিয়েল তাই 'নিজের ওপরেই বিশ্বাস রেখে'—আত্মবিশ্বস্ত , এবং 'Le Sang Des Autres'-এ ব্লোমার্ট আত্মসম্পূর্ণতার প্রবৃদ্ধির জন্যেই বন্ধু বার্ট্রাণ্ড্-এর প্রশংসা কুড়িয়েছে।

বিশ্বের অলৌকিক রহস্যঘন শক্তির অনিবার্যতায় বিশ্বাসীরা একটি স্ব-নির্বাচিত নিরাপদ দূরত্ব থেকে মানব-স্বাধিকারের খরস্রোত ধারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন। কান্ট যেমনি আগেই সার্ত্রেকে ছুঁয়েছেন,—তেমনি এঁরাও 'নীতিবাদী'-র পরিচ্ছদে অজ্ঞেয়বাদীদের স্পর্শ করে গেছেন।—'নীতিবাদী'-রা এমন এক প্রাকৃত আদর্শ বা প্রমূল্যের কথা বল্ছেন,—'যা প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়',—এবং মানুষ তার সৃষ্টি বা পরিবর্তন কিছুই করতে পারে না। অস্তিবাদী সার্ত্রে এই—'প্রদত্ত এবং অপরিবর্তনীয়'—নীতিবন্ধের ভ্রূকুটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এই কোটিতে সার্ত্রে হার্সাল্সের—'প্রপঞ্চবাদ'-কে (phenomenalism) শুধু অনুসরণ-ই করেন নি, তাঁর, 'Intentionality'-র বলিষ্ঠ প্রভাবকেও অস্বীকার করতে পারেন নি। হার্সাল্স্—ভাষ্যে, অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত সত্যের নির্যাস-ই 'Intentionality'-র রচনা করে এবং অভিজ্ঞতা কিছু 'নির্বাচন' করে। প্রতিটি অভিজ্ঞতার ভেতরেই 'পূর্ব ও উত্তরায়ও জ্ঞানলব্ধ চেতনা'—(Exfra Empirical and Trans—Empirical consciousness) নিহিত থাকে। এই প্রেক্ষিতে, প্রতিটি অভিজ্ঞতাই এক একটি উৎকর্ষ—প্রসঙ্গ নির্ভর। সার্ত্রের এই সিদ্ধান্ত অনুসারে……'intention aims at 'not—yet', that which is not, not that which is latent, but that which is future'. সেই জন্যেই আত্ম সচেতন 'গরিয়সী চেতনা'-ই সংলব্ধ প্রমূল্যের ঘোষণা জানাতে পারে। 'নীতিবাদী'দের তীব্র আঘাত হেনে সার্ত্রে বলছেন যে, প্রমূল্য কখন-ও 'প্রদত্ত বা অপরিবর্তনীয়' নয় ;—'because values never is', মানুষ তা-ই, যেভাবে এবং যথার্থ রূপে সে নিজেকে রচনা করবে ;—মানুষ তাই কখন কখন প্রমূল্যের রচয়িতা এবং বাস্তবের রূপান্তর সাধক। মানুষের চেতনা, প্রয়োজন এবং প্রয়োজন—পূরনীয়ের দ্বারাই প্রমূল্য চিহ্নিত বা গঠিত।—সার্ত্রের স্বাধিকার চেতনার স্বরূপ—নির্নিতিতে অনুসৃত উদ্ধৃতিগুলি অকৃত্রিম পাথেয় :

১. We have either behind us, nor before us, in a luminous realm of

valdes, any means of justification or excuse, we are left alone without excuse ;

২. Nothing can guarantee me against myself. Cut of from the world and of my essence by this, nothing that I am, I have to realise the meaning of the world of my essence. I decide it alone injustificable and without excuse ;

৩. All barries and railling collapse, annhiliated by the consciousness of my liberty.

সাত্রের এই অকৃপণ অভিভাষণে জগতের অপরিবর্তনীয় ধ্রুপদী নিয়ন্ত্রণে আস্থাভাজন রক্ষণশীলরা শিহরিত হ'য়ে উঠ্‌বেন। স্বাধিকারের এই স্বরূপকে তাঁরা মৃত্যু জাগর স্বাধীনতা (Dreadful liberty) বল্‌বেন। কিন্তু সাত্রে স্বাধিকার কল্পনায় মানুষকে কোন অবলুপ্তি-মুখীন ভীষণতা উপহার দিতে চান নি। মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসার নিবিড়তার ভূমিতল থেকে যে স্বাধিকার চেতনা স্ফূর্ত হ'য়েছে,—তার যথার্থ অনুধাবন সহজ-গ্রাহ্য নয়। মানবিক স্বাধিকারের স্বীকৃতি-লিখনে কাণ্ট সাত্রের নৈকট্যে অবস্থান করেও ব্যক্তি স্বাধিকারের অক্ষুণ্ণার্থে বৃহত্তর প্রতিশ্রুতি বহনের কথা স্বীকার করে 'understanding maketh nature possible'-র কথা বলছেন। কাণ্ট মানুষ মুক্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব এবং অর্থ স্বীকার করেন না এবং তিনি মানুষকেই বিশ্বের রচয়িতা এবং মূল্যায়ক বলে মনে করেন। কাণ্টীয় ভাষ্যে,—মানুষ নীতিগত অর্থে মুক্ত এবং মানুষ স্ব-রচিত সব রকম অবস্থা-আশ্রয়ে, এবং সব রকম সম্ভাব্য-প্রেক্ষিতে আবেদন মূলক নিয়ম ও আদর্শের মেলবন্ধন রচনা করে কাজ করে যায়। সুতরাং মানুষ তার স্বাধিকারে—'স্বরাট'। কাণ্ট 'স্ব' (self)-এর নিমিত্ত 'স্ব'-(self) নিরূপিত স্বকীয় সীমানাকেই (intrinsic determination) 'স্বাধীনতা' আখ্যা দিয়েছেন। এই সংজ্ঞার্থকে স্বীকার করলে এ সত্য মানতেই হয় যে, কোন 'স্ব'-(self)-এর নিয়ন্ত্রণে যে কোন শক্তি বা নিয়মের নিয়োজন-ই অনুচিত। এখানেই কাণ্ট এবং সাত্রের স্বাধিকার বোধ আত্মীয় হ'য়ে ওঠে এবং উভয়ের বিভাজন সুকঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এই দুই ব্যক্তিত্বের চিহ্নিত সরণি বেয়ে একটু গভীরে প্রবেশ করলে 'উভয়ের বিভাজন কঠিন'—ধারণা যে বিশ্লেষকের ভ্রান্তিজাত সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না। এই দু'টি ধারণার চিহ্নিত পার্থক্যের—'আদি সূত্রের'—অস্তিত্বকে ভুলে গেলেই এই ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সচেতন ভাবে কাণ্টের স্বাধিকার চেতনা নিরীক্ষণ করি তা' হ'লে সাম্প্রতিক দর্শন জগতের অপরিহার্য একটি মৌলিক সত্যের দেখা-ই মাত্র পাব না,—সেই প্রস্তরিত পথ বেয়েই আমরা কাণ্ট সম্পর্কে সাত্রের স্বাধিকার চেতনার নির্মুক্ত এবং ভয়ঙ্কর বোধ বিক্ষেপন থেকে সরে আসব। মানুষ চেতনা উপলব্ধিতে নির্বিরোধ, কিন্তু সেই চেতনার অযৌক্তিক ভিত্তি-স্থিতি কাণ্টীয় দর্শনে বর্জিত। 'মুক্ত-ইচ্ছা' কারণ নির্ভর ; এবং যৌক্তিকতা ও স্বাধিকার আত্মলীন। কাণ্টীয় দর্শনে অযৌক্তিক স্বাধিকার মূল্যহীন। সুতরাং, 'মানুষ অনিবার্যত মুক্ত'—এই অভিজ্ঞতা 'মানুষ অনিবার্যত সামাজিক'—এই প্রতিষ্ঠিত চেতনায় লীন হ'য়ে গেছে। এখানেই কাণ্ট স্বকীয় গতিতে সাত্রে থেকে সরে আসছেন।

কিন্তু অস্তিবাদীরা যৌক্তিকতাকে জীবনের একটি দিক হিসেবে আপাত মেনে নিয়েও—সত্যের সন্ধানে তা' অতিক্রম করে যান। তাঁরা জানেন যে, যৌক্তিকতা শুধু বাস্তবকে বিকৃত-ই করে না,—যৌক্তিকতা '...Untrust worthy path to understanding' পিশাক্যল রূপকাঙ্গে (Alligori-cally) বলছেন যে, সব কিছুর কারণের মত—'অন্তরেরও কারণ আছে এবং যা' চিরন্তন অজ্ঞাত।' —সার্ত্রে কেন্দ্রভূমি অধিকৃতিতে সেই মানুষকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, যে মানুষ অনুভূতি, আবেগ, অপরাধিত্ব এবং নৈতিকতাবোধে গতিশীল এবং সজীব। কান্টের বিপরীতার্থ—সংজ্ঞায়িত এই মানুষ অবিচ্ছিন্ন 'সামাজিক' নয়। 'মানুষ অনিবার্যত সামাজিক'—কান্টের এই ধারণাকে অস্বীকার করে সার্ত্রে অকপট স্বীকৃতি দিচ্ছেন যে, মানুষ কখন কখন 'অনিবার্যত অসামাজিক।'

অপলাপ বা উন্নীতির প্রেক্ষিতে যদি কখন-ও মানুষের জীবনে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়—তবে তা' নিশ্চয়-ই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হ'বে; এমন কি তার সীমা এবং প্রমূল্যও—যা' তা'র সার্থকতা এবং অসার্থকতা প্রসঙ্গে স্থিরিকৃত হ'বে। এই ধারণায় ঝুঁকি এবং হতাশা অনিবার্য; কিন্তু ঝুঁকি আর হতাশার প্রতিকূলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ভেতর দিয়েই জীবনের সত্য স্বাক্ষর সূচিত হয়। 'মানুষ একটি অপ্রয়োজনীয় আবেগ'—বলে সার্ত্রে আকস্মিক নাটকীয় ভঙ্গীতে ছেদ টানছেন।

মানুষের স্বাধিকার চেতনায় সার্ত্রের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বলিষ্ঠ হলেও--নাট্য রস সিক্তি। সার্ত্রের নাটকের পাঠক বা দর্শক হিসেবে আমরা যখন দেখি যে তাঁর নায়ক অ-বদ্ধ স্বাধিকার প্রমত্ততায় বলছে: (১) সমস্ত, বাঁধন এবং অন্ধ-সীমানা আমার স্বাধিকার চেতনায় বিলুপ্ত হয়েছে; এবং (২) আমার সম্পর্কে, কিছুই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না...শুধু আমি-ই, বিচার এবং কৈফিয়ৎহীন ভাবে নির্ধারণ করব'—তখন আমাদের গহন থেকে এক শীতল প্রীতিধারা উৎসারিত হলেও তীক্ষ্ণধার বাস্তবের আঘাতে এই প্রজ্ঞান কেঁপে ওঠে। এই প্রজ্ঞান আমদের গতদৈনিকের প্রবহ জীবনের কাছে অনাত্মীয়;—বলা যেতে পারে 'অসামাজিক' এবং যা 'অসামাজিক মানুষের' ক্ষেত্রেই—সত্যি।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ

গোরাচাঁদ মিত্র

ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন, রাজনীতিক চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যে কবি চিত্তরঞ্জনও ছিলেন সে বিষয়ে আমাদের জানার পরিধি সীমিত। এই সীমিত জানার কারণ তাঁর রাজনৈতিক জীবন অনেকখানি আড়াল করে রেখেছে তাঁর কবিসত্তার পরিচিতি। কবি হিসেবে তাঁর জীবনে প্রতিষ্ঠা এসেছিল। মালঞ্চ, মালা, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী ও কিশোর-কিশোরী নামে তিনি পাঁচটি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেছিলেন। অবশ্য কালের বিচারে সেগুলি কতখানি রসোত্তীর্ণ সে প্রশ্ন ভিন্ন। কিন্তু তিনি যে কাব্য ও সাহিত্য পিপাসু মনের অধিকারী ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং সেই আন্তরিক তাগিদেই তিনি একটি বাংলা মাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বাঙলা ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে—ইংরেজী ১৯১৪ সালের শেষাশেষি। পত্রিকার নাম ছিল নারায়ণ, আয়ুষ্কাল চার বছর। চিত্তরঞ্জনের কাব্যিক মানসের মূল্যায়ণে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি আলোচনা প্রকাশিত হলেও, নারায়ণ পত্রিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আজও হয়নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারায়ণ পত্রিকার দান কতটুকু এবং নারায়ণের কষ্টিপাথরে সাধারণে অল্পপরিজ্ঞাত, চিত্তরঞ্জনের সম্পাদকীয় ভূমিকার মূল্যায়ণ-এ প্রবন্ধের বিচার্য।

নারায়ণ পত্রিকার কার্যালয় ছিল ২০৮/২ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে। ২০নং পটুয়াটোলা লেনের বিজয়া প্রেস থেকে পত্রিকাটি মুদ্রিত হত। মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন রমেশচন্দ্র চৌধুরী। প্রত্যেক সংখ্যার দাম ছিল পাঁচ আনা, ডাকমাশুল এক আনা। ডাকমাশুল সহ বার্ষিক মূল্য ছিল সাড়ে তিনটাকা। নারায়ণ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় বিষয়সূচী ও লেখকগণ হলেন—(১) স্তব সম্পাদক, (২) অন্তর্যামী (কবিতা)—সম্পাদক, (৩) নূতনে পুরাতনে (প্রবন্ধ)—বিপিনচন্দ্র পাল, (৪) মৃণালের কথা (গল্প)—বিপিনচন্দ্র পাল, (৫) বৌদ্ধধর্ম (প্রবন্ধ)—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (৬) হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব (প্রবন্ধ)—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, (৭) পৌরাণিকী কথা (প্রবন্ধ)—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) বৃন্দাবন (ভ্রমণ কাহিনী)—জলধর সেন, (৯) আমার শিল্প (প্রবন্ধ)—সরযূবালা দাশগুপ্তা। প্রথম সংখ্যায় কোন সম্পাদকীয় রচনা ছিল না। সাধারণতঃ নতুন কোন পত্রিকা প্রকাশিত হলে পত্রিকা সম্পাদক প্রথম সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন—কেউ কুণ্ঠিতভাবে, কেউবা সগর্বে। 'নারায়ণ' এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অবশ্য 'নারায়ণের' কোন সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় পাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে না। তাই চিত্তরঞ্জনের ভাষায় 'নারায়ণ' প্রকাশের উদ্দেশ্য আমাদের অজ্ঞাত থেকে যায়। দেশবন্ধু দুহিতা অপর্ণাদেবী তাঁর 'মানুষ চিত্তরঞ্জন' স্মৃতিকথামূলক রচনায় অবশ্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখছেন—'বাংলার প্রাণধারার সন্ধান নেবার এবং দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই এ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আমাদের তথাকথিত ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে তখন বাংলা সংস্কৃতির আদর ছিল না; বিশেষ করে দেশের সংস্কৃতির দিকে এ সমাজের তেমন দৃষ্টি ছিল না বললেও চলে।

তাই বাবা নারায়ণ পত্রিকা বার করে সমাজের এ অংশটিকে সচেতন করার এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকে একটা নতুন রূপ দিয়ে তার হৃতমান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান। এই পত্রিকার মাধ্যমেই আমাদের দেশের নাটক, কাব্য, ধর্ম, সঙ্গীত, চারুকলা, সংস্কৃতি, অনুবাদ সাহিত্য ও সমালোচনা সাহিত্য জাতির সামনে এক নতুন দৃষ্টিতে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্যরূপকে আবেগহীন অথচ দৃঢ়ভাষায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে'। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে অপর্ণা দেবীর বক্তব্য কিছুটা অতিশয়োক্তি মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাংলা সাহিত্যের সাময়িক পত্রের জগতে তখন ভারতী সবুজপত্র—প্রবাসীর কাল। সাহিত্যকালের মধ্যগগনে রবীন্দ্রনাথ। তথাপি নারায়ণ পত্রিকা যে বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছে, তা অবশ্যই স্বীকার্য। নারায়ণ প্রকাশকালে ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের প্রত্যহিক দিনগুলি ছিল কর্মমুখর। ব্যবহারজীবী মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা তখন সর্বোচ্চ শিখরে। আমার অনুমান—ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জনের সমগ্র দিনে সাহিত্য চর্চার জন্য অবসর মিলতো খুব সামান্যই। কিন্তু তিনি ছিলেন যথার্থ সাহিত্য প্রেমী এবং সেই কারণেই প্রকাশ করেছিলেন নারায়ণ পত্রিকা। তাঁর মনে হয়তো এ আত্মবিশ্বাসের অভাব ছিল কর্মব্যস্ত জীবন থেকে সাহিত্যচর্চার অবসর খুঁজে নিয়ে কতদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে তিনি নারায়ণের মাধ্যমে বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে যাবেন। তাই বোধহয় স্বভাব বিনয়ী চিত্তরঞ্জন 'বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিব, উন্নতি করিব' ইত্যাদি (তাঁর কাছে অহংকারসুলভ) সম্পাদকীয় সযত্নে পরিহার করেছেন। পরিবর্তে নরনারায়ণের পাদপদ্মে প্রণামাঞ্জলি নিবেদন করে শুরু করেছেন নারায়ণ পত্রিকা। আত্মোৎসর্গ করেছেন সেই অসীম পুরুষের কাছে, প্রথম রচনা স্তব—এর মাধ্যমে। তাঁর দৃষ্টিতে নারায়ণ হলেন—'তুমিই জীবের জীবনভূমি। সকল জীবের তুমি একমাত্র উপায়, একমাত্র অবলম্বন।...তুমি ভিন্ন সকল সৃষ্টি মিথ্যা, সকল জীব মায়া পুত্তলিকা।...তুমি দেহ, তুমিই আত্মা; তুমি সাধনা, তুমিই সিদ্ধি; আদি তুমি, অনাদি তুমি; অন্ত তুমি, সান্ত তুমি।' নারায়ণ পত্রিকাকেও বোধহয় তিনি স্তব এর মাধ্যমে 'সীমার-মাঝে-অসীম-তুমির' পায়ে উৎসর্গ করেছিলেন।

সাহিত্য পত্রিকার নাম নারায়ণ—হয়ত আমাদের কানে অভ্যস্ত নয়। এক্ষেত্রেও ক্রিয়াশীল তাঁর ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তিমানস। পরবর্তী রচনা 'অন্তর্যামী' কবিতাতেও আমরা তাঁর ঈশ্বর সন্ধানী মনের গভীর আকুতির পরিচয় পাই। বৈষ্ণবীয় রীতিতে তিনি মিলিত হতে চেয়েছেন পরমাত্মার সঙ্গে।

...প্রমোদের দীপ জ্বালি খুঁজেছি তোমারে
যৌবনে সকল মনে আপনা বিকাই,
পুষ্পিত, ঝঙ্কৃত সেই আলোক আগারে
আমার সুখের মাঝে সুখ খুঁজি নাই,
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে, তোমারে শুধু! পাই বা না পাই,—
বঁধু হে, বঁধু হে! আমি তোমারেই চাই
যে পথেই লয়ে যাও! সে পথেই যাই।

'নারায়ণে'র আরও কয়েকটি সংখ্যায় চিত্তরঞ্জন একই শিরোনামে আরও কয়েকটি কবিতা লেখেন এবং প্রত্যেকটিই ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'অন্তর্যামী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৩-১৪ সালে মাত্র একবছরের মধ্যে চিত্তরঞ্জনের মা ও বাবা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন। এঘটনা তাঁর ব্যক্তিজীবন ও কবিমন উভয়কেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। তারই বহিঃপ্রকাশ 'অন্তর্যামী' শীর্ষক কবিতাগুলি। নারায়ণের প্রথম সংখ্যা থেকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পৌরাণিকী কথা' প্রবন্ধ দু'টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রবন্ধ-শিরোনামেই প্রবন্ধকারগণের বক্তব্যের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট। 'হিন্দুর প্রকৃত হিন্দুত্ব' প্রবন্ধে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সুচারু বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—"ইংরাজীতে এক কথায় হিন্দুর বিশেষত্বের বা হিন্দুত্বের মূলসূত্রটি ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে—দি হিন্দু নট্ ঔন্লি স্টার্‌ট্‌স্ ফ্রম এক্সপিরিয়েন্স' অ্যাজ এ হমোজীনিঅ্যাস্ হোল্, বাট্ অলওয়েজ্ ইন্ ইন্‌ভেস্‌টিগেটিং দি ম্যানিফোলড্ ইন্ দি রিয়েল্ ওয়ার্ল্ড, রিটার্নস্ টু দি অ্যাক্‌চিউঅ্যাল্ সিন্থেটিক্ ইউনিটি ইন্ দি 'আত্মা'.. "। 'নূতনে-পুরাতনে' প্রবন্ধে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পালের বিচার্য নতুন-পুরাতনের সমন্বয় আমাদের সমাজে কী ছাপ রেখে গেছে বা যাচ্ছে। নিজের সংস্কৃতিকে অবহেলা করে একদিন পাশ্চাত্যসভ্যতার দিকে আমরা ছুটেছিলাম। পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জিজ্ঞাসু করেছে। সেই সভ্যতার রীতিনীতিগুলো নেড়ে চেড়ে বিচার করে দেখেছি। খুঁজে পাইনি মুক্তির পথ! তাই আবার ফিরে এসেছি নিজের ঘরেই। কিন্তু এই নতুনের স্পর্শে আমদের মধ্যে জন্মেছে সংস্কার বর্জনের ক্ষমতা। লাভ করেছি বিচারের অধিকার এবং এই বিচারের মাপ কাঠিতে আজ নিজেদের সনাতন সভ্যতার ভালমন্দ নির্ণয় করে সত্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে সমন্বয় ঘটাচ্ছি সার্বভৌমিক বিশ্বসমস্যার।

'নারায়ণে'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথা গল্পটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য। 'মৃণালের কথা' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত স্ত্রীর পত্রকে ব্যঙ্গ করে লেখা। স্ত্রীর পত্রের নারীপ্রগতি চেতনাকে নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছিলেন গল্পকার। এই গল্প প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম সংখ্যা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নারায়ণের রবীন্দ্র-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী। প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীর পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। বিপিনচন্দ্রের মৃণালের কথা প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ মাসে। স্ত্রীর পত্রের ঘটনা যেখানে শেষ, মৃণালের কথা সেখান থেকে শুরু। 'মৃণালের কথা' আজ পর্যন্ত অনালোচিত, তাই এ বিষয়ে কিছু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। মৃণাল আর কোনদিন ২৭নং মাখন বড়ালের গলিতে ফিরে আসবে না—এ সংবাদ পেয়ে মৃণালের ননদ তার ঠাকুরপো নরেনকে পাঠালো পুরীতে মৃণালের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গোয়েন্দাগিরি করতে এবং দাদাকে (অর্থাৎ মৃণালের স্বামীকে) সান্ত্বনা দিল মৃণাল অবশ্যই ফিরে আসতে বাধ্য হবে। ঘটনাচক্রে নরেন পুরীতে মৃণালের বাসাতেই বসবাস শুরু করে, আত্মপরিচয় গোপন রেখে। নরেন ও মৃণালের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে স্নেহের 'দিদি—ভাই' সম্পর্ক। মৃণালের কবি-কবি ভাব নরেনের মনে বিরূপতা সৃষ্টি করে। ইতিমধ্যে মৃণালের ভাই শরতের মারফৎ গল্পে উপস্থিত বিলেত ফেরতা এক নব্য কবি। তাঁকে পেয়ে মৃণালের কাব্যচর্চা বা 'কবিতার পাগলামি' যেমন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলল, তেমনি নব্যকবি

পরকীয়া প্রেমে মেতে উঠলেন। নরেনের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নব্যকবি একদিন মৃণালকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলেন। ডিটেকটিভ নরেনও পিছু নিল। নরেন বৌদিকে চিঠিতে লিখছে—'হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কাণে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখি, ঐ লোকটা তোমার মেজবউকে অপমান করার চেষ্টা কচ্ছে'। নরেনের হাতে জুতো পেটা খেয়ে নব্যকবি পালালেন। বাড়ী ফিরে মৃণাল অসুস্থ হয়ে পড়ল। নরেনের পরিচয় ইতিমধ্যে প্রকাশ পেল। বাড়ী ফিরে যাবার জন্য নরেনের পীড়াপীড়ি মৃণালকে টলাতে পারল না। যে বিন্দুর আত্মহত্যার খবর পেয়ে মৃণাল পুরী চলে এসেছিল, কলকাতা থেকে খবর এল বিন্দুর মৃত্যুসংবাদ ভুল। বিন্দু চিঠিও লিখল মৃণালকে সে এখন স্বামী-সোহাগিনী এবং মৃণালকে স্বামীর কাছে ফিরে যেতে অনুরোধ করল। মৃণালের মন পরিবর্তন হয়েছে। স্বামী আসছেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য। নিজের দোষ স্বীকার করে স্বামীকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখল মৃণাল। 'মৃণালের কথা' এখানেই শেষ। মৃণালের কথা পড়ে আমরা দুঃখিত হই তিনটি কারণে। প্রথমতঃ এটি বিপিনচন্দ্রের মত একজন সর্বজনশ্রদ্ধেয় মনস্বীর লেখা বলে। দ্বিতীয়তঃ যে চিত্তরঞ্জন তাঁর কন্যা অপর্ণাদেবীর অসবর্ণ বিয়ে দিয়ে সমাজে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তাঁর সম্পাদিত পত্রিকাতেই এই নারীপ্রগতি বিরোধী ব্যঙ্গগল্প প্রকাশিত হতে দেখে। তৃতীয় কারণ, মৃণালের কথা পড়ে আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না যে ঝরঝরে সহজ সাবলীল ভাষায় সুন্দর গল্প লেখার ক্ষমতা বিপিনচন্দ্রের করায়ত্ত ছিল, কিন্তু তিনি কয়েকটি রবীন্দ্রগল্প বিরোধী 'ব্যঙ্গগল্প' রচনা করা ছাড়া আর কোন গল্প লেখেননি। বিপিনচন্দ্র তাঁর মৃণালের কথায় প্রথম থেকেই এই প্রমাণে ব্যস্ত, যে নিজের সংসার সম্বন্ধে যে ধারণা মৃণালের হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুল। মৃণালকে দিয়ে তা' গল্পের শেষাংশে স্বীকার ও করিয়েছেন।

নারায়ণ পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রবন্ধের তালিকায় যুক্ত হয় যথাক্রমে বিপিনচন্দ্রের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতির স্মৃতিকথা 'সেকালের স্মৃতি—বঙ্কিমচন্দ্র'। দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের পূর্বকথা' প্রবন্ধের দ্বারা প্রবন্ধকার শরচ্চন্দ্র ঘোষাল প্রথম বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস অন্বেষণে সচেষ্ট হন। নাটক বিষয়ে তাঁর আরও দুটি প্রবন্ধ 'প্রাচীন বাঙ্গালা নাটক' ও 'বাঙ্গালার আদি নাটক' নারায়ণের তৃতীয় ও পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কবি চিত্তরঞ্জন সম্পাদিত পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় 'ডালিম' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন। দুশ্চরিত্র বড়লোক নায়ক ও এক বারবিলাসিনীর প্রেমকথা এ কাহিনীর উপজীব্য গল্পটি বিয়োগান্তক। চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থে 'ডালিমের' আলোচনা থাকায়, এ বিষয়ে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। নারায়ণের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত অপর দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ—বিপিনচন্দ্রের 'ভাষার কথা' ও তরুণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'শক ও শকাব্দ'। সাধুভাষা ও চলিত ভাষার—কোনটি বাঙ্গলা সাহিত্যে ব্যবহৃত হবে, এ প্রশ্নে সে যুগে প্রবল বিতর্ক চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধটি রচিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য মৃণালের কথায় বিপিনচন্দ্র চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। বিপিনচন্দ্রের মতে যুগ বিবর্তনের সঙ্গে ভাষাও পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন স্তব্ধ হয়ে গেলে বুঝতে হবে হয় সংশ্লিষ্ট জাতি বা সমাজের সাহিত্যসৃষ্টি ও জ্ঞানার্জনের শক্তি লোপ পেয়েছে নতুবা প্রাত্যহিক জীবনের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার দুস্তর

ব্যবধান। আমাদের নিজের ভাষাতেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের 'এবারৎ' বা ষ্টাইল, এবং 'তারপরে রবীন্দ্রনাথ যে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালা গদ্য এবারতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ সকলের মধ্যে কত প্রভেদ'। বিপিনচন্দ্র কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির উচ্চপ্রশংসা লক্ষণীয়। ব্যাকরণের কাঁটা কম্পাস দিয়ে লিখলে রচনা বিশুদ্ধ হলেও, তা সরস ও জীবন্ত হতে পারে না। তাই ভাষার পরিবর্তনে ভয়ের কিছু নেই। এ কথার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতাকে সমর্থন নয়। প্রত্যেক ভাষার যে নিজস্বতা আছে তা' অপরিবর্তনীয়। এবং এই স্বকীয়তা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধযোগ্য। নারায়ণের তৃতীয় সংখ্যায় একই শিরোনামে আর একটি রচনায় মন্মথনাথ বসুর মত 'ভাষাতে লোকে প্রাণ খোঁজে, পোষাক নহে'। কাজেই লেখক যে রকম ভাষাতেই লিখুন না কেন, সৃষ্টি মহত্তর হলে তা সর্বজনগ্রাহ্য। 'শক ও শকাব্দ' প্রবন্ধে শকজাতির আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, কবে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করল ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে ব্রতী সেদিনের তরুণ ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রবন্ধ শেষে পাদটীকায় তিনি স্পষ্ট লিখেছিলেন তাঁর অভিমত তিনি পাঠকদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চান না—প্রবন্ধটি তাঁর ব্যক্তিগত মতামতের দর্পণ। লেখক তালিকায় রমেশচন্দ্রের নাম দেখে বোঝা যায়, পত্রিকা সম্পাদক তরুণ লেখকদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন।

'নারায়ণে'র চতুর্থ সংখ্যায় অর্থাৎ ফাল্গুন মাসে তিনটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—হরিপদ কাব্য-স্মৃতি মীমাংসাতীর্থ মহাশয়ের 'চার্বাক দর্শন', বিপিনচন্দ্রের 'বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও 'দেবোপাসনা' এবং সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের 'কবিতার কথা'। সাহিত্যক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মূলতঃ কবি। তাই কবির ভাষ্যে কবিতার কথা শোনার আগ্রহ উপেক্ষণীয় নয়। তদুপরি, সমকালীন কবিদের কবিতা সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত সাধারণ অভিমত ও কবিতার কথায় ধরা পড়েছে। এ প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জনের আক্ষেপ আধুনিক কবিতায় আর প্রাণের 'পরশ' মেলে না। কারণ জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে আধুনিক কবিদের সংযোগ নেই। 'জীবন লইয়াই কবিতা। যে শুধু ছোবড়া খায়, সে কখনও ফলের স্বাদ পায় না। যে জীবনের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া অন্তঃপ্রকৃতির সন্ধান না পায় সে কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। আর যে ছোবরা না ছাড়াইয়া ফল খাইতে চায়, সেও ফলের স্বাদ পায় না। সে জীবনের অন্তঃপ্রকৃতির একটা মনগড়া কল্পিত লোক সৃজন করে মাত্র। শূন্য আকাশে যেমন গৃহনির্মাণ করা যায় না, সেইরূপ এই কল্পিতলোকে কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না'। আধুনিক কবিদের ত্রুটী এখানেই। চিত্তরঞ্জন বলছেন—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস থেকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী, নিধুবাবু পর্যন্ত কবিতায় মহাজীবনের ইঙ্গিত মিলত, আজ তা কোথায় হারিয়ে গেল। কবি বা কবিতার আদর্শ সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের অভিমতের বিরুদ্ধমত প্রকাশ সম্ভব নয়. তথাপি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের সঙ্গে একই, আসনে বসার অধিকারী কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী ও নিধুবাবু নন নিশ্চয়। চিত্তরঞ্জন স্ব-আদর্শ অনুযায়ী কবি বা কবিতার বিভাগীয় বিভাজনে নিজেই অক্ষম। চণ্ডীদাসের 'সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম…' এই বহুশ্রুত পদটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ না করে তাঁর 'ভালবেসে সখি! নিভৃত যতনে/আমার নামটি লিখিয়ো তোমার/মনের মন্দিরে।/আমার পরাণে যে গান বাজিছে/তাহারি তালটি শিখিয়ো তোমার/চরণ-মঞ্জীরে' কবিতার তুলনা করে চিত্তরঞ্জন এই

সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন শেষোক্ত কবিতায় প্রাণের স্পন্দন নেই, আকুলতা নেই, জীবন বা মহামিলন মন্দির থেকে তা' দূরে বহুদূরে। চিত্তরঞ্জন যখন রবীন্দ্রনাথের লেখা উপরিউক্ত পঙক্তিগুলোয় প্রাণের স্পন্দন খুঁজে পান না, তখন আমাদের দুঃখিত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কবি ও কবিতা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের সঠিক ধারণা থাকলেও, তাঁর ব্যক্তিগত ভাল-লাগা, মন্দ-লাগা সেই ধারণা বা সংজ্ঞা নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেনি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ স্বনামধন্য পুরুষদের সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন 'নারায়ণ' পত্রিকার ষষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩২২সালের বৈশাখ সংখ্যা বিশেষ বঙ্কিম-স্মৃতি সংখ্যারূপে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিবিশেষ ছিলেন না, ছিলেন একটি যুগ (অপর্ণাদেবী: মানুষ চিত্তরঞ্জন)। বঙ্কিমের সাহিত্যকীর্তি ও হিন্দুজাতীয়ত্ববোধ চিত্তরঞ্জনকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যায় অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদক চিত্তরঞ্জন বিদগ্ধ মননশীল লেখকদের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও ব্যক্তিমানস বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন। অদ্যাবধি বাঙলা সাময়িক পত্রের জগতে যে ক'টি বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে নারায়ণের আলোচ্য সংখ্যাটি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। আমার বক্তব্যের ·সমর্থনে ·বঙ্কিম স্মৃতি সংখ্যার বিষয়সূচী ও লেখকগণের নাম উদ্ধৃত করলাম। (১) বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, (২) বঙ্কিমবাবু ও উত্তরচরিত—ঐ, (৩) অর্জ্জুনা পুষ্করিণী—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট ভাই), (৪) বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যকথা—ঐ, (৫) বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারাম—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, (৬) সেকালের স্মৃতি: বঙ্কিমচন্দ্র—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, (৭) ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, (৮) রজনী (সমালোচনা)—জ্ঞানাঞ্জন পাল, (৯) বঙ্কিমবাবু—ললিতচন্দ্র মিত্র (দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র), (১০) বঙ্কিমমণ্ডল বা বঙ্গদর্শন (কবিতা)—বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র, (১১) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ ও গীতার কথা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (১২) বঙ্কিমস্মৃতি—চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৩) বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার দ্বারবান পাঠক—জ্যোতিষচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (১৪) ঐতিহাসিক গবেষণায় বঙ্কিমচন্দ্র—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, (১৫) চরিত চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র—বিপিনচন্দ্র পাল, (১৬) স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়—৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ। পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছিল ছ'পৃষ্ঠা ব্যাপী বঙ্কিমের হস্তলিপি। এ সংখ্যায় ১৩টি মূল্যবান আর্ট প্লেটও ছিল। প্রত্যেকটি রচনাই স্বকীয়তায় উজ্জ্বল হলেও, বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ-গীতার কথা' প্রবন্ধ থেকে একটি তথ্য এখানে উদ্ধৃত করলাম, সাধারণে অল্পজ্ঞাত বলে। হীরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বঙ্কিমবাবু গীতার বিশেষ আলোচনা করিতেছিলেন। কেবল ধর্মতত্ত্ব ও কৃষ্ণচরিত্র নহে তিনি বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজের··জন্য গীতার এক অভিনব ভাষ্যও রচনা করিতেছিলেন। এবং ইহার কিয়দংশ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিতও হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন যে তাঁহার ধারণা এই যে গীতার শেষ ছয় অধ্যায় পরবর্তীকালের যোজনা। উহারা মৌলিক গীতার অন্তর্গত নহে।··· ঐদিন বঙ্কিমবাবুর সহিত গীতার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন যে, তদানীন্তন ভারতীয় সুধীসমাজে কর্মবাদ, জ্ঞানবাদ ও ভক্তিবাদ নামে যে সাধন প্রণালী প্রচলিত ছিল, গীতাকার

অদ্ভুত প্রতিভাবলে তাহার অপূর্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর মুখে এই প্রথম গীতার সমন্বয়বাদের সন্ধান পাইলাম'। আমাদের দুর্ভাগ্য, গীতা ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় বঙ্কিমচন্দ্র পাননি। 'নারায়ণে'র প্রথম বর্ষের প্রথম খণ্ডের অর্থাৎ প্রথম ছয়টি সংখ্যার আলোচনা এখানেই শেষ।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২ সাল) প্রকাশিত তিনটি মূল্যবান রচনা হল—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত—খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভাষার কথা—প্রফুল্লকুমার সরকার, শঙ্করাচার্য কর্তৃক জৈনমত খণ্ডন—শ্রীদ্বিজদাস দত্ত। ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রবন্ধটি ১৩২২ সালের ১লা বৈশাখ ভবানীপুর সাহিত্য সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে খগেন্দ্রনাথ মিত্র পাঠ করেন। তাঁর ভ্রমণের দূরত্ব মাত্র বর্ধমান পর্যন্ত, 'লোটা কম্বল লইয়া জলধরদাদার (সেন) মত গঙ্গোত্রীর পথে' তাঁর যাত্রা সম্ভব হয়নি। তথাপি এই ক্ষুদ্র ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়েই একটি সুন্দর রম্যরচনা উপস্থাপিত করেছেন খগেন্দ্রনাথ। 'ভাষার কথা' প্রবন্ধে প্রফুল্লকুমার লিখেছেন—বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালীর সাহিত্য করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতার বা ঢাকার আটপৌরে ভাষায় রচনা করিলে চলিবে না। তাহাকে সমগ্র বাঙ্গালীর সেব্য ও উপভোগ্য সার্বজনীন বাঙ্গালা ভাষাতেই আকার দিতে হইবে। এখনকার লিখিত ভাষাই সেই সার্বজনীন ভাষা'। 'ভাষার কথা' শিরোনামে যতীন্দ্রমোহন সিংহ তৃতীয় সংখ্যায় আর একটি প্রবন্ধ লেখেন। এটি ছিল উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরীর অভিভাষণের সমালোচনা। প্রমথ চৌধুরীর ভাষণটি সবুজপত্রে ১৩২১ সালের ফাল্গুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনাটি দীর্ঘ হলেও যতীন্দ্রমোহন স্পষ্টভাষায় একবারও তাঁর নিজের মত প্রকাশ করেন নি। সমালোচনাটি ছিল অনেকটা 'ধরিমাছ না ছুঁই পানি' গোছের। যদিও বুঝে নিতে কষ্ট হয় না তিনি সাধুভাষার সমর্থক। ভাষার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন অহেতুক রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর অভিযোগ 'রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে চিন্তা করেন, বাংলায় কবিতা রচনা করেন'। (অন্ধ বিরোধিতার বোধহয় এটিই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।) রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবোধ্য। তিনি লিখছেন—'রবীন্দ্রনাথের পুলক যদি গাছে গাছে না নাচিয়া নরনারীর গাত্রে কদম্ব কুসুমের ন্যায় বিকশিত হইত, তাঁহার সঙ্গীত যদি আকাশে না ঘুমাইয়া নরনারীর কণ্ঠে সুরতান লয় যোগে মুখরিত হইত, তাঁহার ক্রন্দন যদি কাহারও পিছে পিছে না ধাইয়া নরনারীর বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিয়া অশ্রুধারারূপে বিগলিত হইত, তবে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত পণ্ডিতমূর্খ সকলেই তাঁহার কথা বুঝিতে পারিত'। প্রমথ চৌধুরী আষাঢ় সংখ্যার সবুজ পত্রেই যতীন্দ্রমোহনের সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করেছেন, পরিশেষে রবীন্দ্রকাব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—'তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে. কিন্তু তাঁর না বোঝবার ক্ষমতা অসীম'।

'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষের অবশিষ্ট সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল-কথা সাহিত্য—সুখরঞ্জন রায় (২য় সংখ্যা), মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা—দীননাথ সান্যাল, গতি ও স্থিতি—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (৩য় সংখ্যা), কবিতার কষ্টিপাথর—বিপিনচন্দ্র পাল, কালিদাসের মেয়ে দেখান—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৪র্থ সংখ্যা), নাটকে রামনারায়ণ—নলিনীকান্ত ভট্টশালী (৫ম সংখ্যা), বাঙ্গালীর প্রতিমা পূজা ও দুর্গোৎসব—বিপিনচন্দ্র পাল; সঙ্গীতে বিজ্ঞান—

শিশিরকুমার মিত্র ও দুর্গোৎসবে নব পত্রিকা—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (৬ষ্ঠ সংখ্যা)। নারায়ণের ১ম বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যায় প্রথম 'জীবনে পণে' শীর্ষক একটি নাটক প্রকাশিত হয়। মঞ্চোপযোগী নাটক নয়, পরিবর্তে নাট্যকার সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের ভাষায় 'কথানাট্য'। 'মরণে জয়', 'আঁধার ঘরে', 'হাসির দাম' নামে আরও তিনটি সত্যেন্দ্রকৃষ্ণের কথানাট্য নারায়ণের ২য় খণ্ডের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'কবিতার কষ্টিপাথর' প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র মাইকেল মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনাগীতির 'নাচিছে কদম্বমূলে বাজায়ে মুরলী রে ! /রাধিকারমণ/চল সখি ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের ছবি/ব্রজের রতন'—এই লাইনগুলির সঙ্গে গিরিশ ঘোষের 'যাই গো, ওই বাঁজায় বাঁশী/প্রাণ কেমন করে। /না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চলে যাবে/মান ভরে'—এই কবিতা-পঙক্তির তুলনা করে বলছেন—'মধুসূদনের পঙক্তিতে বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নাই। তিনি বই পড়ে এই রচনা সৃষ্টি করেছেন। অন্যদিকে গিরীশ ঘোষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাই তাঁর গানে যে শক্তি, যে সত্য, যে সৌন্দর্য, যে রস ফুটিয়াছে, মধুসূদনের গীতিতে তাহা ফোটে নাই'। গিরীশ ঘোষের কি ভাবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল জানা নেই। বিপিনচন্দ্র আরও লিখছেন—'কিন্তু আমি যখন ব্রজাঙ্গনা পড়ি তখন একাল ভাবি না। আমি দেখি তার সুর। আমি দেখি তার শব্দ সম্পদ। আমি দেখি তার ছন্দ। আমি মজিয়া যাই তার অপূর্ব ঝংকারে। এই ঝংকারটি বড় মিষ্ট। তারই জন্য ব্রজাঙ্গনাকে এমন মিষ্ট বলি। তুমি খোঁজ শব্দ নয় অর্থ। তুমি চাও ছন্দ নয়, রস। এই জন্যই আমার যা মিষ্ট লাগে, তোমার তাহা মিষ্ট লাগে না'। কবিতা পাঠকের মানসিকতার বিভিন্নতার দরুণ, একই কবিতা প্রত্যেকের ভাল বা মন্দ লাগতে পারে না। বিপিনচন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে দ্বিমত না হয়েও, তাঁর কাব্য বিশ্লেষণে পরস্পরবিরোধী মতের প্রাধান্য লক্ষণীয়। 'সঙ্গীতে বিজ্ঞান' নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ। শব্দ, কম্পন, তরঙ্গ আকৃতি, কানের অভ্যন্তরস্থ গঠন প্রণালী, সা রে গা ম' পা ধা নি—এই সপ্তকের মধ্যে সাতটি সুরের কম্পনের অনুপাত ইত্যাদি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় নিয়ে প্রবন্ধকার শিশিরকুমার মিত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। পূর্বে অনুল্লিখিত আর একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধ হল 'নবীনচন্দ্রের শৈলজা'। 'শৈলজা' নবীনচন্দ্রের নিজস্ব মানস-দুহিতা। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস—এই তিনটি পৃথক কাব্যগ্রন্থ বা একত্রে অখণ্ড মহাকাব্যের ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে কি ভাবে নাগরাজ চন্দ্রচূড় কন্যা শৈলজার চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে লেখক জীবেন্দ্রকুমার দত্ত তাই দেখিয়েছেন। নারায়ণে প্রকাশিত বিষয়ের এই গুরুগম্ভীরতার পাশে দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ব্যঙ্গ কবিতা সহজেই মন আকৃষ্ট করে। 'গিন্নী' শীর্ষক এই কবিতাটির রচয়িতা দরবেশ ছদ্মনামের আড়ালে কোন বিশিষ্ট কবি। আমি ব্যক্তিগতভাবে কবিতাটি প্রথম শুনি স্বর্গত কবি নরেন্দ্র দেবের কাছে। তাঁর পরিহাস রসিক মনের সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। আমার ধারণা দরবেশ নামের আভাসে কবি নরেন্দ্র দেবই ছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে কখনও এ দাবী করেন নি। কবিতাটি থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করা অসম্ভব।

গিন্নী তুমি হে আমার সর্ব ;
উদ্যতফণা জাগ্রত সদা নাশিতে সকল গর্ব।

…তুমি হে আমার সান্ধ্যভ্রমণে ছড়ির আকারে ছাতা,
দুপুরের ধুপে, বরষার ঝুপে খুঁজেও মিলে না কোথা।
…তুমি হে আমার আয়েসের কালে রবিঠাকুরের কাব্য,
কত যে হেঁয়ালী কিছুই বুঝি না পড়িয়া যেতেছি দিব্য।
বঙ্কিম তব বঙ্কিম রসে শঙ্কিত হয়ে অতি
আসমান-ছাঁকা আসমানী রূপে করেছে তোমারে নতি।
তব হাসিমুখ, যখন আমার বাক্যেতে ঝন্‌ঝন্
প্রলয়মূর্তি তখনি তোমার, যবে করে ঠন্‌ঠন্।
…এস এস প্রিয়ে, ভুবন ছাপায়ে, এস হে সন্নিকট
তুমি আমি দুই, সংসারে সঙ, মন্ত্রশেষের ফট।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে 'নারায়ণ' পত্রিকা ও চিত্তরঞ্জন প্রসঙ্গে লিখছেন—'ব্রাহ্মধর্মের মতবাদ, ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিবাদ সমালোচনাই হইল এই পত্রিকার প্রধান কার্য। চিত্তরঞ্জন নারায়ণ পত্রিকা বাহির করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিবার সময় কোথায়? তিনি তো তখন হাইকোর্টের প্রধান ভারতীয় ব্যারিষ্টারদের অন্যতম। তাই তিনি অর্থ দিয়া কয়েকজন প্রতিভাশালী লেখককে এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন; ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল স্বনামধন্য'। যদিও নারায়ণ পত্রিকায় হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ প্রাধান্য পেয়েছিল, ভাষা ও কবিতার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখগণ নারায়ণ কর্তৃক আক্রান্তও হয়েছিলেন, তথাপি ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোখে পড়ে না। লেখবার সময়ও চিত্তরঞ্জনের ছিল। নারায়ণের প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই চিত্তরঞ্জনের লেখা প্রকাশিত হত। লেখক ভাড়া করার যে কারণ শ্রীমুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন তা ভুল এবং আদৌ কোন লেখক ভাড়া করা হয়েছিল কি না সে সম্পর্কে কোথাও কোন প্রমাণ চিত্তরঞ্জনের জীবনী গ্রন্থগুলিতে নেই। বিপিনচন্দ্র 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনায় চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সহায়ক ছিলেন—এ কথা অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

কাঁথির করণ সমাজ

পূর্ণচন্দ্র দাস

যেকালে সমাজে জীবিকা ভিত্তিক সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সেকালে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের জীবিকায় হস্তক্ষেপ করাকে পাপ বা অন্যায় বলে মনে করতেন। কবে থেকে এই নিয়ম চালু হয়েছিল সে কথা ঠিক বলা না গেলেও করণিক বৃত্তির মাধ্যমেই যে সেই একই সময়ে করণ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। সেবাকে ধর্ম বলে মনে করে যে সব মানুষ সমাজ সেবায় নিজেদের বিলিয়ে বিকিয়ে দিয়েছিলেন কালক্রমে তাঁরাই সেবক বা দাস বলে ঘৃণ্য ও অপাক্তেয় হয়ে উঠলেন সমাজের কাছে। বিদ্যা ও বুদ্ধির একত্র সমাবেশে করণ সম্প্রদায় হয়ে উঠলেন সমাজের সর্বেসর্বা। গানে, গল্পে, ছড়ায়, ধাঁধায় সব সময় পল্লী মুখরিত হয়ে থাকতো করণ সম্প্রদায়ে গুণগানে। কখনও বা তাঁরা নিজেরাই মুখর হয়ে উঠতেন নিজেদের আত্মশ্লাঘায়।

চারি চৌদ্দ উপর চার,
গিরি যাইচন লই সেপার,
যদি তু করণ পুতন হবু,
গিরি নাম ধরি ডাকি আনিবু।

চারকে চৌদ্দ দ্বারা গুণ করে, গুণফলের সঙ্গে চার যোগ দিলে ষাট হয়। সংস্কৃতে ষাটকে ষষ্ঠী বলে। ষষ্ঠী গিরি নদীর ওপারে গেছেন। আগন্তুক গৃহস্বামীর নাম ও তিনি কোথায় গেছেন এই কথা জানতে চাওয়ায় গৃহ কর্তার প্রতিভূ আগন্তুকের পরিচয় ও তিনি যে করণ সম্প্রদায়ের একথা জানতে পেরে উপরোক্ত ধাঁধাটি বলেন। আর বলেন যদি তুমি করণের ছেলে হও তবে গিরির নাম ধরে ডেকে আনবে।)

সত্যই এককালে করনিকজ্ঞান না থাকলে নিজেকে করণ বংশীয় বলে পরিচয় দেওয়ায় অনুপযুক্ত বলে গণ্য হতো।

করণ সম্প্রদায়ের চারিটি শাখা। কৃষিজীবী, মসীজীবী, লাউলী ও করণ পদবী ধারী করণ। উড়িষ্যার করণ, বাংলার কায়স্থ ও বিহারের লালা, স্থান ভেদে নামের পার্থক্য ছাড়া সকলেই একই গোষ্ঠীভুক্ত বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু সন্ধানীর দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখা যায় এঁদের মধ্যে জীবিকার সাম্যতা থাকলেও সামাজিক সংস্কৃতির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। লাউলী শাখার করণদের উপনয়ন হয় ব্রাহ্মণদের মত। করণ ও কায়স্থদের মধ্যে জন্মাশৌচ একুশ সূর্যে ত্যাজ্য হলেও বিবাহের বেলায় মঙ্গল বিয়েকে বাদ দিলে, বিয়ে, বাসি-বিয়ে, ফুল-শয্যা বা বৌভাত—এই তিন দিনে বিবাহ উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে, কিন্তু করণদের বিবাহে অষ্ট মঙ্গল রুক্মিনী মত। আট দিন চলে বিবাহ উৎসব। আবার মৃতাশৌচ পালনের বেলায় করণদের দশ সূর্যে পবিত্র আর কায়স্থদের চলে একমাস।

করণ জাতির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত 'পৃথিবীর ইতিহাস' থেকে জানা যায় যাঁহারা যথা সময়ে উপনয়ন সংস্কার না করেন তাঁহাদের ব্রাত্য বলে। ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের সবর্ণা

গর্ভজ তনয় দেশে বিদেশে সপ্তবিধ আখ্যা পাইয়া থাকে। ঝল্ল, মল্ল, লিচ্ছবি, নট, করণ, খশ, দ্রাবিড়। করণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মনু সংহিতায় দেখা যায় 'উহারা ব্রাত্যক্ষত্রিয়।' আবার অনেকে বলেন এঁরা চিত্রগুপ্তের (যম রাজের হিসাব রক্ষক) বংশধর, ব্রহ্মার চক্ষু হইতে জাত। করণ পদবীধারী করণদের সঙ্গে উড়িষ্যার করণদের সামাজিক সংস্কৃতির কোন মিল নাই বললেও অত্যুক্তি হয় না—

সম্ভবত খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে নিম্নবঙ্গের হিজলী অঞ্চলে উড়িষ্যা থেকে করণরা প্রথম আগমন করেন। এই শতকেই স্বনামধন্য মসনদ আলির আবির্ভাব। তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ জনমানসে বিশেষ রেখাপাত করে। মসনদ আলিকে স্থানীয় লোকেরা 'বাবা মেছেন্দালী' বলেন। হিজলীতে তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি কুলাপড়ার হরি সাউর কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁর বেশ-ভূষার কোন পারিপাট্য ছিল না। বাংলা দেশের নকৃসা কাটা কাঁথা গায়ে দিয়েই ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর সম্বন্ধে এখনও নানা রকম লোক সঙ্গীত গীত হয়।

'চারিদিকে পুনাপানি—
        মধ্যেতে হিজলী।
তার মধ্যে বাস করেন—
        বাবা মেছেন্দলী।
ফকির আইলরে আইলরে
        ছিঁড়া কাঁথা গায়।'
হরি সাউ নামে তিনি
        কুলা পাড়ায় ঘর
তার কন্যা রূপমতী
        দেখতে মনোহর।
দিনান্তে জোটে না ভাত
        তেল বেচে তিনি
তার কন্যা বিভা করেন
        বাবা মেছেন্দালী
ফকির আইলরে আইলরে
        ছিঁড়া কাথা গায়।'

মসনদ আলির কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমিত বিক্রম সেকেন্দর আলি অগ্রপত্তন (এগ্রা) থেকে হিজলী পর্য্যন্ত বিরাট নিম্নাঞ্চল কৃষি ও বসবাস উপযোগী করে তুলেন। পাঠ (ডুবদা বেসিন) থেকে সমুদ্র কূল পর্য্যন্ত বিরাট বাঁধ মেছেন্দলী সাহেবের ভ্যাড়া বলে পরিচিত। তাঁর রাজধানী পূর্বে জুনপুট পশ্চিমে অগ্রপত্তন, উত্তরে মহিষাদল, দক্ষিণে সমুদ্র। সেকেন্দর আলির লোহার ছড়ি এখনও হিজলীর বাবা সাহেবের কোট গোড়ায় সুরক্ষিত। প্রবাদ আছে আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে ভক্তি না করে কেহ যদি অহমিকা প্রকাশ করে এই ছড়ি তুলতে যায় তাহলে সে কিছুতেই এই ছড়ি তুলতে পারবে না। মসনদ আলি তাঁর রাজধানী দেখাশুনার জন্য প্রথম তাঁর দেওয়ান ভীমসেন মহাপাত্রকে

উড়িষ্যা থেকে আনেন। ভীমসেন মহাপাত্রের দুই কন্যা ছিলেন। দেওয়ানজী মেয়ে দুটিকে বিয়ে দেওয়ার জন্য উপযুক্ত করণ পাত্র না পেয়ে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনি পরগণে বাহিরি মুঠায় ভীম সাগর নামে বিরাট পুকুর কেটে পুকুরের মধ্যে দেউল প্রতিষ্ঠা করেন, ও এই দেউলের মধ্যেই সজ্ঞানে জীবন্ত সমাধি গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল ঐ পুকুরে কেউ নাবেনি তাই জনসাধারণের অজ্ঞাত ছিল। বর্তমানে ভীম সাগরের তীরে বাহিরী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় পুকুরটি সংস্কার করতে গিয়ে সমস্ত ইতিহাস জনসাধারণের গোচরে আসে। ভীমসেন মহাপাত্র মৃত্যুর পূর্বে তাঁর গর্গ উপাধিধারী দরোয়ানকে মহিষাদলের জমিদারী দান করেন। আর বাকি পঁচিশটি পরগণা দান করেন রাঁধুনী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ পাণ্ডাকে। কৃষ্ণ পাণ্ডা ভীমসেন মহাপাত্রের খানসামা ঈশ্বরী পট্টনায়ককে সুজামুঠা ইত্যাদি বারটি পরগণা দান করেন। জলামুঠা ইত্যাদি তেরটি পরগণা তিনি নিজে রাখেন। ঈশ্বরী পট্টনায়ক তাঁর জমিদারীর কাজ পরিচালনা করার জন্য গড়বাড়ী করেন কিশোর নগরে। বর্তমানে কিশোর নগর গড়ের উত্তরাধিকারী মিত্ররা ঈশ্বরী পট্টনায়কের দৌহিত্র। কৃষ্ণ পাণ্ডা তাঁর জমিদারী পরিচালনার জন্য গড়বাড়ী স্থাপন করেন বাসুদেবপুরে। জমিদারী দেখাশুনার জন্য তিনি তাঁর নিজ পিতৃভূমি উড়িষ্যা থেকে চারটি করণ পরিবারকে উড়িষ্যা থেকে নিয়ে আসেন। এই লেখকের পূর্বপুরুষ স্বনামধন্য ৺বংশীলোচন দাস বকসীর পদে ও অপর দুইজন ব্যবর্তা ও মুন্সীর পদে বহাল হন। (বকসী (হিসাব রক্ষক) ব্যবর্তা (ব্যবস্থাপক) মুনসী (শিক্ষক)) খাস নবীশের পদ অলঙ্কৃত করেন যিনি তাঁর পুরুষ ছিলেন রনজিত মহাপাত্র দাঁতনের কাছে রাইবনিয়া গড়ের রাজা, তিনি বিয়ে করেছিলেন ষোলটা। মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি দেহত্যাগ করেন। ষোলজন স্ত্রী রনজিত মহাপাত্রের মৃত্যুর পর যে যার বাপের বাড়ী চলে যান। দাস পদবী সম্ভবত সমগ্র ভারতবর্ষেই ছিল না—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পরেই 'ঈশ্বরের দাস' এই ভাবোন্মাদনায় নিজ নিজ পদবীর পরিবর্তন করেন।

আগেকার দিনে যেমন দেবতা ও ব্রাহ্মণের নিষ্কর দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল করণদের জন্যও ঠিক তেমনি নিষ্কর 'করনি মহাত্রাণ', ভূমির ব্যবস্থা ছিল।

কৃষ্ণ পাণ্ডা এই করণ পরিবারগুলির নিষ্কর করণি মহাত্রাণ ভূমির ব্যবস্থা করেন।

কৃষিজীবি করণরা কৃষিকাজের জন্য হল কর্ষণ করেন ও ঘরের এঁড়ে বাছুরকে নির্বীর্য করে বলদে পরিণত করেন। এছাড়া লাউলী ও মসীজীবিদের সঙ্গে এঁদের কোনও সাংস্কৃতিক পার্থক্য নাই। স্থানীয় লোকেরা কৃষিজীবি করণদের 'উড়িয়া' বলেন। কাগজে কলমে সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে এঁরা করণ বলেই উল্লেখ্য হন।

বাক্যের মাঝখানে পদগুলি যেমন অর্থপূর্ণ—সমাজের মাঝখানে পদবীগুলিও তেমনি অর্থপূর্ণ ও তথ্যপূর্ণ ইতিহাস বহন করে। শিক্ষক যদি সমাজের শ্রেষ্ঠ সমাজবন্ধু হন তবে করণ সমাজই বর্তমান শিক্ষাধারার প্রবর্তক। বর্তমানকালের স্কুলগুলি আমাদের ছেলেবেলায় পাঠশালা নামে অভিহিত ছিল। শিক্ষক মহাশয়রা মাহাতি নামে পরিচিত হতেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ আমলে এই মাহাতিই মাইতি (Maity) নামে পরিচিত হতে থাকের। উড়িষ্যার মহান্তি পদবীধারী করণেরা শিক্ষাদান কার্যে ব্রতী ছিলেন। মহাতি এই মহান্তি শব্দ থেকেই রূপান্তরিত। হিন্দু রাজত্বকালে রাজার প্রধান

উপদেষ্টা বা প্রধান মন্ত্রী করণ সমাজের মহাপাত্র পদবীধারীদের পূর্বপুরুষ। মহা-নায়ক বা প্রধান সেনাপতি করণ সমাজের নায়ক ও পট্টনায়কদেরই আদিপুরুষ। বলে-বিক্রমে বিদ্যা-বুদ্ধিতে মুসলমানদের বিতাড়িত করে এঁদের মধ্যেই অনেকে রাজা হয়ে রায় পদবী গ্রহণ করেন। চৈতন্য যুগে এই করণ সমাজেরই কেউ কেউ মঠের সেবায়েত হয়ে, দাস, অধিকারী, দাস-অধিকারী···ইত্যাদি পদবীতে নিজেদের পদবী রূপান্তরিত করেন। মুসলমান রাজত্বের ডামা-ডোলার সময় দু একজন করণ নিজেদের স্বাধীন ঘোষণা করে ভূঁঞ্যা উপাধি ধারণ করেন।

সমাজ উন্নয়নে করণ সম্প্রদায়ের অবদান একান্ত স্মরণীয়। উপকারী পশুবলে গরু হিন্দুসমাজের কাছে দেবতার স্থান পেয়েছে। মূল্যায়নে গরু একটি সম্পদ। এই গো সম্পদের উন্নতির জন্য করণ সমাজ এখন তাঁদের বাড়ীর এঁড়ে বাছুরকে নিবীর্য করে বলদে পরিণত করেন না। মহাদেবের নামে ত্রিশুল চিহ্নিত করে ছেড়ে দেন। 'গো বীজ হন্তার রৌরব নরকেও স্থান নাই!' এই ধারণা হিন্দু করণ সমাজের ধর্মীয় সংস্কৃতির মূল কথা। গাঁয়ে এখনও কোন ছেলে যদি কোন কাজ করতে না পারে বা করে না বা কথা শোনে না তখন তাকে বলে 'করণ ঘর ষঁড়', (করণের বাড়ীর ষাঁড় যেমন কোন কাজ করে না খায়-দায় ঘুরে বেড়ায় সেই রকম।) বলে তিরস্কার করেন।

এখনও যদি পাড়ার একজন আর একজনকে তার অমনোনীত বা অবাঞ্ছিত উপদেশ দিতে আসেন তবে শ্রোতা তার উপদেষ্টাকে বলেন, 'করণ ষাঁড় আইলে' (করণ সমাজপতি এলেন।) বলে শ্লেষোক্তি করেন। করণরা সাধারণতঃ রাজবাড়ী বা জমিদার বাড়ীতে করণিকের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। গ্রামের প্রজা সাধারণের উপর কার্যত তাঁদের একটি প্রচ্ছন্ন আধিপত্য থাকতো। করণ সমাজপতিরা কখনও সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন না। সমাজের জনসাধারণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ বা তাঁদের অভাব অভিযোগ মেটানোর কাজে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করতেন। তাছাড়া জমিদারের মাধ্যমে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য বড় বড় পুষ্করণী খনন, জল-নিকাশ ও চাষ-বাসের সুবিধা সুযোগ করানো, নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার প্রভৃতি জনহিতকর কাজগুলির সুব্যবস্থা করাতেন। এর দ্বারা লোকের জীবিকা অর্জনের পথও সুগম হতো।

গ্রামে বুদ্ধিমত্তার দুর্বোধ্য চাল-চলনকে 'করণিয়া' চাল বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এককালে মন্ত্রীত্বের বিদ্যা করণদেরই অধিগত ছিল। 'মন্ত্রগুপ্তি বা ষড়কান মন্ত্রভেদ', বিদ্যায় করণদের সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। গোপনীয় সংবাদ সংগ্রহ বা গুপ্তচর বৃত্তিতে করণরা ছিলেন একচেটিয়া। তাঁদের চাল-চলন ও কথাবার্তা প্রায়শঃ চাণক্য-নীতি পরিচালিত ছিল। মন্ত্রভেদ করা ছিল দুরূহ। গোপনীয় সংবাদ চারিটি কাণ ছাড়া ছয়টি কাণে পরিবেশিত হত না।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'লো, পারসী পড়ল তাঁতী।
বাঘ পালাল বিড়াল এল, শিকার করতে হাতী॥

আবার চাকা ঘুরলো, মুসলমান রাজত্বের অবসান হল, ইংরাজ রাজত্ব শুরু হল। পারসী ছেড়ে আবার ইংরাজী অনুকরণের পালা—যে পারসী ভাষা একদিন অন্দরে, অন্তরে, বাহিরে দৈবানুগ্রহছিল পিতামাতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন, জামাতা ও পুত্র এরা সব যেন পারসী বিশেষজ্ঞ হন। কন্যার প্রার্থনা ছিল সমস্ত দেব-দেবীকে এড়িয়ে তার প্রতিবিম্বিত হওয়ার আর্শির কাছে। 'আরশি!

আরশি ! আমার বর যেন পড়ে পায়শি।' বিপরীত ধর্মী স্রোতে সব ভেসে গেল। জমিদারী সব হয়ে গেল কোর্ট অফ ওয়ার্ড, রাজাদের রাজকীয় প্রতাপ ও চাল-চলন সব গেল তলিয়ে। কত লোক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন, ইংরাজী নবীশ হলেন। গাড়ী, বাড়ী, ব্লাডপ্রেসার নিয়ে কুলীন হয়ে উঠলেন। করণিক বৃত্তি হারিয়ে করণ হল আপনহারা কিন্তু হারাতে চাইল না তার অধিকার। যে বিদ্যা, শৌর্য্য, দাক্ষ, বল ও ধৈর্য্য এই পঞ্চমিত্রকে অবলম্বন করে তাঁদের পূর্ব-পুরুষেরা একদিন সমাজে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি আদায় ও আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন উত্তরাধিকারীরা পরবর্তীকালে সেই সব সদগুণ হারিয়ে প্রভুত্বের আকাঙ্খায় অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়কে অত্যন্ত হীন চোখে দেখতে লাগলেন। পূর্বপুরুষের মাহাত্ম্য বজায় রাখার চেষ্টা না করে তার ঐতিহাসিক স্মৃতি পর্যন্ত ভুলে গেলেন। এক প্রতিভা শূণ্য অনুকরণ শুরু হল। স্বাতন্ত্র্য ও স্বাভাবিক গতিস্রোত গেল হারিয়ে মানুষকে ছোট করে সমাজকে করল বড়। দীর্ঘকাল অনায়াস লব্ধ জীবিকার ফলে পরিশ্রম করার ক্ষমতা পূর্ব হতেই হারিয়ে ফেলেছিলেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মসীজীবী ও লাউলী করণের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যতা ছিল এই যে তাঁরা, হল কর্ষণ করতেন না, ঘরে এঁড়ে বাছুরকে নিবীর্য করতেন না। মাথায় বা বাঁকে করে মোট বহন করা বা কারুর বাড়ীতে মজুর খাটা তাঁদের সামাজিক নিষেধ ছিল। এমন কি কারুর মাথায় বোঝা তুলে দিলেও সামাজিক অচল হতেন। কৃষিজীবী ও লাউলীদের কন্যার আদান প্রদান ও হুঁকোর চল ছিল না। জীবিকাহীন সম্প্রদায় সামাজিক ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে পূর্বসঞ্চিত সম্পদ সব হারিয়ে অনেকে পৈতৃক ভিটে-মাটি বিক্রি করে দূর দেশে হীন জীবিকা অর্জন করতে শুরু করলেন—সমাজ তাতে বড় হল না নিস্ফল হয়েগেল।

ব্রত উৎসব– কুমার পূর্ণিমা থেকে রাস-পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস চলে কার্তিক ব্রত। করণ সম্প্রদায়ের বিধবাদের এই ব্রত অবশ্যই কর্তব্য। যাঁরা ব্রত করেন তাঁরা প্রত্যেকদিন প্রাতঃস্নান ও হবিষ্যান্ন করেন। প্রাতঃস্নানের পরেই তুলসী পূজা করা হয়। প্রথমে তুলসী তলায় দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বারো আঙুল পরিমিত একটি চৌকো গর্ত খোঁড়া হয়। এটিকে পুকুর কল্পনা করে এর পাড়ে একটি গোবরের শিব তৈরী করে তার মাথায় একটি নতুন ধানের শিষ গুজে দিয়ে বসিয়ে দেয়। এরপর শিবের কাছে গণেশাদি পঞ্চদেবতার কল্পনায় পাঁচটি বালির পিণ্ড করে পিণ্ডগুলি ও শিবকে ফুল চন্দন ফল মূল সহ পূজা করে। পূজার শেষে একটি থালায় পাঁচ মুঠো আতপ চাল এবং হরতকী, বিভিতকী, আমলকী, নারিকেলের গুটি ও সুপারী এই পাঁচ রকমের পাঁচটি ফল রেখে তার উপর একটি প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া হয়। ব্রতীরা এই থালাটিকে ধরে সূর্য বন্দনা করেন। বন্দনার সময় যে সমস্ত ছড়া বলেন সেই সমস্ত ছড়াগুলিতে সূর্যরূপী বিষ্ণুর রথের গতি ও প্রত্যেক দেবপুরীতে তাঁর উপস্থিতি আর সেখানকার মেয়েরা এই রথকে যে সাদর অভ্যর্থনা জানান সেই কথা রয়েছে। প্রথম বন্দনার ছড়ায় রথের কৈলাস নগরীতে যাত্রা :—

'রথ সাজ রথ সাজ পড়িগলা গুল,
রথ যাই লাগিলা সে কৈলাস নগর।
কৈলাস নগরে যেতে নারী ম্যালে থিলে,
পঞ্চ মাণিক দেই রথ বন্দ্যাইন লেলে।'

ছড়াটির অর্থ—রথ সাজাও রথ সাজাও বলে হৈ হল্লোড় পড়ে গেল। রথ কৈলাস নগরে উপস্থিত হল ও সেখানকার মেয়েরা পাঁচটি মাণিক দিয়ে প্রণাম করে অভ্যর্থনা জানালেন।

পর পর বৈকুণ্ঠপুরী, ইন্দ্রপুরী, কুবের নগর প্রভৃতিতে যাওয়ার সময় কেবল গন্তব্য স্থলের নামের পরিবর্তন হয়, আর সব ছত্র একই থাকে। বন্দনার পর চলে অর্ঘ্য। অর্ঘ্যর ছড়াগুলিতে গঙ্গাজল ও হরিতকী বাদ দিয়ে সব কিছুই অপবিত্র দেখান হয়েছে। দুধ বাছুরের এটো, গুড়ে পিপড়ের এটো ও ফল বাদুরের এঁটো।

ছড়াটি :—

দুধ দেই অর্ঘ্যস্থানে বাছুরি ওঁইঠা, (এঁটো)
গুড় দেই অর্ঘ্য স্থানে পিপিড়ি ওঁইটা,
ফল দেই অর্ঘ্য স্থানে বাদুড়ি ওঁইঠা,
গঙ্গাজল, কষাফল সবুনু পদিষ্ঠা। (পবিত্র)

ছড়াটি বলার পর গঙ্গাজল ও হরিতকী দিয়ে জোরে জল ঢেলে দেওয়া হয়। বালির পিণ্ডসহ সবকিছু ধুয়ে মুছে পড়ে সেই কল্পিত পুকুরে। এই নিয়ম সারা মাস চলে।

কুমার বা কার্তিক ব্রতের শেষের পাঁচ দিনের ব্রতকে পঞ্চক ব্রত বলে। মাসের পচিশ দিন হবিষ্যান্ন করলেও শেষের এই পাঁচদিনের শাস্ত্রীয় উপবাসের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। একাদশীতে গোময়, ত্রয়োদশীতে ঘৃত, চতুর্দশীতে দধি ও পুর্ণিমায় দুগ্ধ পান করার নিয়ম। বর্তমানে এইসব নিয়ম পালন করতে না পারলেও ভাত একেবারে বন্ধ। ব্রতীরা কেবল ফল মূল খেয়ে থাকেন। পুরোমাস কার্ত্তিক মহাত্ম্য পাঠের সঙ্গে সঙ্গে শেষের পাঁচদিন পঞ্চক মহাত্ম্য পাঠ হয়।

মেয়ে, মা, শাশুড়ী, বউমা এমনকি ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরাও এই পঞ্চক ব্রতে উৎসাহী। এক কথায় গৃহস্থের প্রায় সব মেয়েই পঞ্চক ব্রত করেন। একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে পঞ্চক ব্রত। 'সধবার একাদশী' যদিও ব্যাঙ্গোক্তি তবুও পঞ্চক একাদশীতে সধবার একাদশীতে দোষ নেই। পঞ্চকের প্রথম দিনের গল্পটি 'একাদশী মাহাত্ম্য। এটি অনেকটা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গবাসের মত। একাদশীর পুণ্যের ফলে কাঞ্চীপুরের রাজা সুবাহু ও তাঁর রাণী সশরীরে স্বর্গের পথে যেতে হঠাৎ রথ অধোগামী হয়ে মল্ল রাজ্যের মধ্যে অবতরণ করে। এমন সময় দৈববাণী হয় একাদশী করেছেন এমন কেউ রথটাকে স্পর্শ করলে রথ আবার উপরে উঠতে পারে। ঐ রাজ্যের জয়ন্ত সদাগরের সাত ছেলের সাত বউর মধ্যে অনাচারী ছিল ছোট বউ। তাঁরা তাকে একাদশীর দিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন সে বনের মধ্যে কোনও প্রকার খাদ্যের যোগাড় করতে না পেরে একটু জল খেয়ে দিন কাটিয়েছিল। একাদশীর দিন উপবাসী ঐ বউ রথ ছোয়া মাত্রই রথ আবার উর্ধ্বগামী হয়ে স্বর্গে পৌছাল। অজ্ঞাতসারেও যদি কেউ একাদশীতে উপবাস করে তাতেও মুক্তি আছে, এই হল মূল বক্তব্য। বাকি চারটি গল্প সবগুলিই পঞ্চক ব্রতের সম্বন্ধে। আসল কথা পঞ্চক ব্রত করলেই মুক্তি।

কার্তিক মাস ধর্মের মাস। পিণ্ড বা ভোজ্য দিয়ে মহালয়ার দিন যে সমস্ত পিতৃলোককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাঁদের যেন অন্ধকারে কষ্ট পেতে না হয় তার জন্য 'স্বর্গদীপ' (আকাশ প্রদীপ)

ব্যবস্থা। একটি হাঁড়িকে পিটুলীর জলে সাদা করে নিয়ে তার চার দিকে ছোট ছোট ছিদ্রকরে, যাতে হাঁড়ির ভিতর থেকে আলো বাহিরে বেরিয়ে আসতে পারে। গায়ে দেয় স্বস্তিকা চিহ্নের আলপনা। হাঁড়ির মধ্যে আতপ চালের তুঁষ দিয়ে তার উপর একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। হাঁড়ির উপরে একটি সরাকেও ঐ রকম রাঙিয়ে ঢাকা দেয়। তুলসী মঞ্চের কাছে একটি লম্বা বাঁশ পুঁতে হাঁড়িটাকে দড়ি ও সিকের সাহায্যে কপিকলের মত ব্যবস্থায় উপরে বাঁশের ডগায় তুলে দেওয়া হয়। সারা মাস এই স্বর্গদীপ দেওয়া হয়। মাসের শেষে পুরোহিত ঠাকুর দড়ি, হাঁড়ি, সরা, বাঁশ সব বিসর্জনী ব্যবস্থায় গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে একটি সিদে (একজনের আহার উপযোগী চাল, ডাল তরি-তরকারী, লবণ ইত্যাদি) বাড়ী নিয়ে যান। এটি করণদের একটি কুলধর্ম। এই ব্যবস্থা আসলে বংশে বাতি দেওয়া ব্যবস্থা।

'গয়ায় না হয় পয়ায়।' তর্পণ পক্ষের পনের দিন তিলতর্পণ করে মহালয়ায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। তর্পণ পক্ষশুরু থেকে পিতৃপুরুষ স্বর্গথেকে নেমে আসেন মর্তে। ক্ষমতা বা সুবিধা থাকলে মহালয়ায় গয়ায় পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ দিতে হয় না পারলে দীপান্বিতায় শ্রাদ্ধ দিতে হয়। পিতৃপুরুষ এই শ্রদ্ধার অর্ঘ গ্রহণ করে পুনরায় স্বস্থানে গমন করেন। দীপান্বিতা অমাবস্যাকে 'পায়াজালা উয়াস ; বলে। একে ভূতঅমাবস্যাও বলে। ঐ দিন হয় অলক্ষ্মীপুজা বা ভূত পূজা। এই কারণে এর নাম ভূত-অমাবস্যা। সকালে হয় চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধ আর অলক্ষ্মী পূজা। যেখানে ঘরের চালার জল পড়ে সেই জায়গাটাকে বলা হয় 'উলচাগাড়ি'। উলচাগড়িতে হয় পূজার অনুষ্ঠান। ভাঙা ধুমুচি, ভাঙা কুলো, ভাঙা চুপড়ি এগুলো হয় বাদ্যযন্ত্র। ভোগ বা ভোজ্য হয় কলার খোসা, পানীয় হয় ব্রাহ্মণের পা-ধোওয়া জল। পূজোয় প্রদীপ জ্বালানোর পরিবর্তে পাট-কাঠি জ্বালায়। রাত্রের বেলায় পুকুরের চারদিকে পাট-কাঠির ছোট ছোল আঁটি জ্বালিয়ে পুঁতে দেয়। বিসর্জনের সময় বলা হয় 'লক্ষ্মী আইলা অলক্ষ্মী পলা'-এর অর্থ—লক্ষ্মী এসেছে, অলক্ষ্মী পালাও।

ডাক-সংক্রান্তিতে স্বর্গদীপ জ্বালানোর দিন যেমন সাত-শাকের (সাত রকম শাকের) ভাজা খেতে হয় তেমনি দীপান্বিতার দীপ নেবানোর দিনও চৌদ্দ শাকের ভাজা খেতে হয়।

শ্যামা পূজার পরের দিন 'দর্পণ দর্শন' উৎসব, একে বলে পড়িয়ঁন। পড়িয়ঁনের দিন নরসুন্দরেরা কাংস-দর্পণ দেখিয়ে কাপড়, জামা, পয়সা ইত্যাদি বখশিশ আদায় করে। ছোট শিশু থেকে আরম্ভ করে আশি বছরের বুড়ো পর্যন্ত সকলকেই দর্পণ দর্শন করতে হয়। এই কাংস দর্শন দেখলে নাকি পরমায়ু বাড়ে পূর্বস্মৃতি জেগে ওঠে। পড়িয়নের দিন কাক ডাকার আগে অন্ধকার থাকতে থাকতে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালিয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের গায়ে হলুদ মাখানো হয়, ভোর হতে না হতেই কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোখে কাজল, ভ্রুর দক্ষিণ প্রান্তে 'রক্ষা টিপ' নিয়ে, পোড়া পিঠে খেয়ে বেরিয়ে পড়ে পাড়ায়। কে আগে সেজেছে, কার সাজ-সজ্জা ভাল হয়েছে দেখানোর জন্য। কাক ডাকার আগে না সাজলে কাক সব রূপ হরণ করে নেয়, লোক প্রবাদ। বাড়ী থেকে বেরোবার আগে মা, বাঁ হাতের কেড়ে আঙুলটি কামড়িয়ে উদ্দিষ্ট করে দেন, পাছে ছেলের উপর লোকের কু-দৃষ্টি পড়ে। ঐদিন হলুদ গায়ে দিয়ে গা থেকে যে ময়লা বের হয় সেই ময়লা বা মলকুটি দুর্বোঘাসের উপর ফেলা হয়। ধারণা এই ব্যবস্থায় ছেলের স্বাস্থ্যও দিনে দিনে কচি দুর্বোর মত

সুকোমল ও নধর হয়ে উঠবে।

ডাক-সংক্রান্তি ও পড়িয়নের দিন পোড়া-পিঠে অবশ্যই করণীয়। আতপ চালের গুড়ো একটা বড় কড়াইতে দিয়ে উনানে চাপিয়ে নাড়তে হয়, যতক্ষণ সেটি ভালভাবে শুকিয়ে না যায় ততক্ষণ। তারপর সেটি একটি বড় থালায় ঢেলে গরম জল দিয়ে আটা মাখার মত মেখে নেয়। একে বলে 'থলিকাড়া'। প্রথমে একটি কড়ার মধ্যে কলাপাতা পেতে নিয়ে তার উপরে এই থলি দিয়ে বেশ করে চেপে দেয়। তার উপর আবার কলাপাতা দিয়ে এই কলাপাতার উপরে কাঠ কয়লার আউরা বা আগুন ঢেলে দিয়ে কড়াইটিকে উনানের উপর বসিয়ে দেওয়া হয়। কড়াইয়ের তলায়ও থাকে আগুন উপরেও থাকে আগুন। মৃদুমন্দ আগুনে পিটেটি সু-সিদ্ধ হয়। দক্ষ কারিগর না হলে আগুনের মাপ না জানলে হয় পিঠে বেশী পুরে যায় অথবা কাঁচা থেকে যায়।

পড়িয়ন উৎসবের ঠিক সাত দিন পরেই 'পড়ুয়া অষ্টমী', পড়ুয়া শব্দের অর্থ প্রথম। বাপ-মায়ের প্রথম সন্তানের এই তিথিতে জন্মোৎসব পালন করে, জাতকের গায়ে হলুদ মাখিয়ে মাথায় চন্দনের ফোঁটা দিয়ে হলুদ রঙের জামা কাপড় পড়িয়ে সাজানো হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে কল্পনা করে তিনটি গোবরের মূর্তি তৈরী করেও এই মূর্তিগুলির মাথায় নতুন ধানের শিষ গুজে দেয়। এদিনও লক্ষীপুজা করা হয়। নৈবদ্য হয় পরমান্ন।

কার্তিকের পর 'মকশির মাস' (অগ্রহায়ণ) লক্ষীর নাম, ঘরের বউ হলেন গৃহলক্ষী। তিনি যেখানে থাকুন না কেন তাঁকে নিজের বাড়িতে আনতেই হবে, প্রথম বৃহস্পতিবারে ধান্য স্থাপনের জন্য। ধান্য স্থাপনের দিন লক্ষীর আসনের সমস্ত পুরাতন জিনিস জলে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে সাজাতে হয়। নতুন ঘটে আম্র-পল্লব ও তার মাঝখানে একটি আস্ত কাঁচা সুপারী দিয়ে তাতে চুয়া, চন্দন, সিঁদুর দিয়ে সাজানোর পর মনে হয় যেন একটি ছোট্ট কচি মুখ, ঘটের সামনে তিনটি বেতের তৈরী কুনকেতে সাদা বীজ ভর্তি করে ওগুলোর উপরেও আস্ত কাঁচা সুপারি দিয়ে সাজায়। আসনের সামনে একটি নতুন চুপড়িতে সাদা ধান ভরে অনুরূপভাবে সাজিয়ে রাখে। লক্ষীর ডানদিকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কল্পনা করে তিনটে গোবরের মূর্তি তৈরী করে মাথায় গুজে দেয় তিনটি ধানের শিষ। বাহিরের উঠানের দিক থেকে ঘরের চৌকাট পর্যন্ত পিটুলিগোলা জল দিয়ে কমল বনের ভিতর দিয়ে কমলার আগমনের পদ-চিহ্নের আল্পনা দেওয়া হয়, ফলমূল ইত্যাদি নৈবেদ্যাদি সহ পুজার শেষে ধান ভর্তি চুপরিটিকে গোলার ভিতরের পুরাতন ধানের চুপড়িকে বের করে তার জায়গায় নতুনটিকে স্থাপন করে। আবার যেদিন খরচের জন্য গোলা থেকে ধান বেরোবে সেদিন প্রথমে চুপড়িকে বের করে গোলার নীচে রাখে, পরে প্রয়োজন মত ধান গোলাতে থেকে বের করে নিয়ে পুনরায় ওটিকে গোলার মধ্যে যথাস্থানে রাখে ও খরচের ধান থেকে তিনমুঠো ধান তুলে নিয়ে গোলার মধ্যে ফেলে দেন। এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের নাম 'অগ'। অগ শব্দের অর্থ অগ্র ভাগ। বছরের প্রথম যেদিন গোলা থেকে খরচের ধান বেরোয় তাকে বলে 'মচা অনকুল'। মচা শব্দের অর্থ গোলা, অনকুল শব্দের অর্থ আরম্ভ। এককথায় গোলা থেকে প্রথম ধান বের করার দিনকে মচা অনকুল বলে। ঐদিন বাড়ির মেয়েরা নিরামিষ হবিষ্যান্ন করেন। দ্বিতীয় বৃহস্পতিবারে 'ভরল' (পায়সান্ন) ভক্ষণ। তৃতীয় বৃহস্পতিবারে পিষ্টক ভক্ষণ ও চতুর্থ বৃহস্পতিবারে উপবাস।

মকশির মাসে নবান্ন অবশ্য করণীয়। নতুন হাঁড়িতে নতুন চাল দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ভাত রাঁধে। নবান্ন শব্দের নব শব্দকে নবম অর্থ করে ন'রকমের তরকারী রান্না হয়। প্রথমে রান্না ঘরের ঈশান কোনে কৃষি দেবতা ঈশান-শিবের উদ্দেশ্যে একটি কলাপাতায় ভাত ও সমস্ত তরিতরকারী নিবেদন করা হয়। পরে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধে দেয় নবান্ন পিণ্ড (আতপ চাল, কলা, দুধ, গুড় বা মধু, ঘৃত এই সব একত্রে গোল্লা পাকান)। ইত্যাদি কৌলিক প্রথা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন সাধ্যমত প্রতিবেশিদের নিমন্ত্রণ করা হয়। নবান্ন গ্রহণের পূর্বে গো-গ্রাস (একটি থালায় ভাত সাজিয়ে দিয়ে গরুকে দেওয়া।) পরে পরস্পর গুরুজনদের অনুমতি গ্রহণ করে নবান্ন গ্রহণ করা হয়।

ভাদ্র মাসে হয় অরাঁধ উৎসব। অরাঁধ শব্দের অর্থ অরন্ধন। ঘরের কোনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের দিন একটি কাঠের পিঁড়িতে আলপনা দিয়ে তার উপরে কিয়াঘড়ি (ছোট্ট কেয়াগাছ) চাপটাদল (শ্যামাজাতীয় ঘাস।) কাল কচুর গাছ, ধানগাছ, হেঁসাতি (তেশিরা ঘাস, যেগুলোতে চাটাইজাতীয় মাদুর তৈরী হয়।) বাঁশপাতা, জু-ডাল (শাঁই গাছের ডাল)। এই সাত রকমের পাতা একখানি হলদে ন্যাকড়ায় বেঁধে পিঁড়েটির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। তার পাশে রাখা হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া, একটি পুতা, (শিলের নড়াকে পুতা বলে।) পুতাটিকে কল্পনা করা হয় পুত্র। সামনে রাখা হয় তালপাতা আর লেখনী। বাড়ীর মেয়েরাই এই ষষ্ঠী পূজা করেন। ঐদিন উনানও জ্বলে না। উল্লিখিত সপ্তপত্রীর আর একটি ভাগ উনানের মধ্যে রেখে উনান পূজা করা হয়। আগের দিন রাতে নতুন মাটির হাঁড়িতে আতপ চালের ভাত রান্না করে। ভাতে দেওয়া হয়—কুমড়ো, লাউ, চাল-কুমড়োর খণ্ড, চালতা ইত্যাদি। অন্যান্য ফলমূল ও নৈবেদ্যের সঙ্গে পান্তার হাঁড়িও নৈবেদ্য দেওয়া হয়। উনান পূজার সময় তার চার পাশে সাতটি চালকুমড়োর পাতার উপর ঐ পান্তা ও ভাতে দেওয়া কুমড়ো লাউ ইত্যাদির এক একটু অংশ সাজিয়ে তার উপর আর একটি করে চাল কুমড়ার ফুল উপুড় করে দিতে হয়। ঐদিন মনসা পূজাও হয়।

মহাবিষুব সংক্রান্তি বা চৈত্র সংক্রান্তিকে বলা হয় আইক্ষণ। আইক্ষণ শব্দের অর্থ অয়ঃক্ষণ বা এই মুহূর্ত। ভালবাসার মাধ্যমে মুহূর্তটিকে গাছ-পালা, পশু-পাখী, আত্মীয়-স্বজন সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে নব-বর্ষের উদ্বোধনের জন্য প্রস্তুত হন। ভোর হতে না হতেই, বনে, বাগানে, ঝোপে-ঝাড়ে, ক্ষেতে খামারে, শুকনা ঝরা পাতা জড় করে হরিধ্বনি দিতে দিতে দেয় আগুন লাগিয়ে শস্যের অনিষ্টকারী কীট পতঙ্গ সব যায় মরে। বাঁশের ঝাড়ে গাছের গোড়ায় নতুন মাটি দেওয়া হয়। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে ও গভীরতায় বিঘৎখানিক একটি গর্ত করে তার মধ্যে ঘুঁটে জালিয়ে আগুন করে একটি কাস্তে ফেলে দেয়। সেই উত্তপ্ত কাস্তের ডগা নিয়ে ভোরের বেলা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নাভির তলায় দেয় ছেঁকিয়ে। ছেঁকানোর সঙ্গে সঙ্গে চমকে ওঠে তারা, সমস্ত স্নায়ু হয়ে ওঠে চঞ্চল, পুরাতন বৎসরের অসাড়তা যায় দূর হয়ে, হঠাৎ কোনও কঠিন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করে না। এরপর সমস্ত গরু বাছুরকে নাইয়ে দেয়, নিজেরাও নেয়ে আসে। বুড়ো বুড়ীরা বিল্ব, অশ্বত্থ, বট, তুলসী, মনসা প্রভৃতি দেব-দেবী কল্পিত বৃক্ষগুলিতে দেওয়া হয় ঝরা। একটি ঠেকির (এক সের দু'সের জল ধরে, এরকম ছোট্ট ছোট্ট ভাঁড়।) তলদেশে একটি ছোট্ট ছিদ্র করে তাতে দুর্বোঘাস গুঁজে দিয়ে জল ধরে, ভর্তি করে গাছের গোড়ায় টাঙিয়ে দেয়। ফোঁটা ফোটা করে জল ঝরতে থাকে। সারা

বৈশাখ মাস ধরে ঝরায় জল দেওয়া ধর্মের কাজ এতে পুণ্য হয়। এর পরই ঘটভর্তি জল ও সরা ভর্তি যবের ছাতু দিয়ে ঘট উৎসর্গ করা হয়। ঐ পাট যাত্রা হয়। সমস্ত পূজা-পার্বণের পাট শেষ হয়। পাট যাত্রার আগের দিন নীল-শিবের পূজা হয়। একে বড় পূজা বলা হয়। মেয়েরা সমস্ত দিন নির্জলা উপোশের পর শিবের মাথায় পঞ্চামৃত ঢেলে তারপর ফলমূল ভক্ষণ করেন।

অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা মণ্ডা বা পুর-পিঠা করেন। এই পিঠার আকৃতি গোলাকার গেণ্ডুয়ার মত। তাই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা একে গেণ্ডুলি পিঠা বলে। 'খলি' কেড়ে, ঐ খলি দিয়ে এক ছটাক দেড় ছটাক করে এক একটা গোল গোল ডেলা পাকায়। নারিকেল আর গুড় জল দিয়ে ছাঁই তৈরী করে। এক একটি ডেলার মধ্যে চাপ দিয়ে গর্ত করে প্রয়োজন মত ছাঁই ঢুকিয়ে মুখ করে দেয়। একে গেণ্ডুলি পিঠা বলে। তা ছাড়া নানান্ প্রকারের পুর পিঠা বানানো হয়। কোনটা সিঙ্গাড়ার মত ত্রিকোণাকার, আবার কোনটা সাতপুরী আকারের। কতগুলোর মধ্যে আবার পুর দেওয়া হয় না, পুর না দেওয়া পিঠাকে বলা হয় বাঁজ পিঠা। আবার পলাশ পাতার উপর খলি দিয়ে তার উপর আবার একটা পলাশ পাতা দিয়ে চাপা দেয়। সম্পূর্ণ পত্রাকৃতি পিঠাটিকে 'পতর পিঠা' বলে। অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট একটি বড় (চাল ধোয়া হাঁড়ির মত হাঁড়ির ভিতরে তার আয়তনের মাপে ছোট পাট কাঠির টুকরা পেতে দিয়ে তার উপর পিঠাগুলি সাজিয়ে দেওয়া হয়, যাতে হাঁড়ির ছিদ্রগুলি পিঠার চাপে বন্ধ না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। পিঠেগুলি হাঁড়ির মধ্যে পুরে মুখটা একটা সরা দিয়ে বন্ধ করা হয়। থাই শব্দের অর্থ ছিদ্র, এই হাঁড়িটির নাম 'থাই-হাঁড়ি'। একটি জলের হাঁড়ি উনানে বসিয়ে তলায় জাল দিতে থাকে আর এই হাঁড়ির উপরে বসিয়ে দেয় থাই-হাঁড়ি। উভয় হাঁড়ির সংযোগ স্থল আটা দিয়ে এমন ভাবে আটকে দেয় যাতে বাষ্প না বেরিয়ে যায়। আগুনের তাপে নীচের হাঁড়ির জল বাষ্প হয়ে থাই-হাঁড়ির ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে উপরের হাঁড়ির সু-সিদ্ধ করে। এই ভাবে পুর-পিঠা তৈরী হয়। ঝুলন পূর্ণিমা বা রাখী পূর্ণিমাকে বলা হয় গো'-মা পূর্ণিমা। গোমা পূর্ণিমার দিন গোয়ালে গরু পূজার উৎসব হয়। গোবর দিয়ে গড়া হয় শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। আর পরিয়ে দেওয়া হয় হলুদ দিয়ে রঙীন কাপড়। গরু পূজার সঙ্গে সঙ্গে এদেরও পূজা করা হয়। পূজায় অতি অবশ্যই প্রয়োজন হয় ন'নআঁনি (নাগ-নাগিনী) ফুল ও শোন ফুল। ফলমূল সাধারণ পূজার মতই। গাই-গরুর মাথায় সিন্দুর আর এড়ে গরুর মাথায় চন্দনের ফোঁটা ও শিঙে দেয় বেশী করে সর্ষে তৈল মাখিয়ে। ঐদিন গরুকে খাওয়ান হয় আঁসকে পিঠে। পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রে। ভাইফোঁটার সঙ্গে গোমা পূর্ণিমার খুব নিকট সম্বন্ধ। এই দুটি পর্বের আদান প্রদানের ফলে আত্মীয়তার বুনিয়াদ গড়ে ওঠে। ভাই যদি গো-মা পূর্ণিমার দিন তত্ত্ব পাঠায় বোনের বাড়ি তবে বোনও ভাই ফোঁটার দিন ভাইয়ের বাড়ি তত্ত্ব পাঠাবে। এই সম্বন্ধে একটি বিদ্রূপাত্মক ছড়া প্রচলিত আছে।

কাঁহির কালে থিলে ভাই,
আজ আইলে গো-মা পুনাই।

ছড়াটির তাৎপর্য এই যে, সারা বছরের পূজা-পার্বনের দেখা-সাক্ষাৎ নাই, আজ কেবল গো-মা পূর্ণিমায় পাওনা-গণ্ডার বেলায় এসে হাজির। এই দিন যে সমস্ত ব্রাহ্মণ যজন-যাজন করেন তাঁরা

কিছু দক্ষিণার বিনিময়ে ছেলে, বুড়া, বুড়ি সকলের হাতে রাখি বেঁধে দেন।

লক্ষীপূজা সাধারণতঃ মেয়েরাই করেন কিন্তু পৌষ-সংক্রান্তির লক্ষীপূজা মেয়েদের করণীয় নয়। পুরুষরাই এই পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তিকে বলা হয় মকর সংক্রান্তি। পূজার নৈবেদ্যে ঐদিন মকরের প্রাধান্যই বেশী। আতপ চাল, গুড়, কলা, রাঙালু, সাঁকালু, নারিকেল, আদা ইত্যাদির সংমিশ্রণকে মকর বলে। অনেক সময় আতপ চালের পরিবর্তে চিড়া ব্যবহার করা হয়। উত্তরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে দিবামানের বৃদ্ধি শুরু হলেও 'মকর খেলে চকর বাড়ে', এই কথাটি প্রচলিত আছে। পৌষ-সংক্রান্তি না গেলে মকর না খেলে যেন দিবামাণ বড় হবে না, এই ধারণা। খামারকে বলে 'খোলা'। এই জন্য এর আর এক নাম 'খোলা-পূজা'। উৎসবান্তে পাড়া-প্রতিবেশী সকলের বাড়ীতে মকর বিতরণ করা হয়। ঘর-দোর খামার-উঠোন সবই ঐদিন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে আল্পনা দেওয়া হয়। মেহির গোড়ায়ও ধামা, কুলো, কুনকে প্রভৃতি ধান মাপা বা পরিষ্কার করার জন্য প্রয়োজন হয় সেগুলো যে যার আল্পনার উপর রাখা হয়। আর মেহীর গায় ঠেসান দিয়ে বেঁধে দেয় 'শুক্রবীড়া' ও 'ক্ষেত-গুড়ানী'। প্রথম ধান্য ছেদনের দিন আড়াই মুঠো ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'শুক্রবাড়ী'। ধান্য ছেদনের শেষের দিন, আড়াই গোছ ধানগাছ দিয়ে যে আঁটি বাঁধা হয় তাকে বলে 'ক্ষেত-গুড়ানী'। লোকে বলে এইভাবে ধান্য ছেদন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন 'ভীম'। অন্যান্য পূজারীর মত পূজক 'গৃহ-কর্ত্তা' ভাত না খেয়ে সেদিন ফল-মূল খান্। খোলা পূজার এইসব উদ্যোগ সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক করে রাখে।

এই সমস্ত পূজার আয়োজন লক্ষীপূজার মত এবং এই পূজাকে পৌষ সংক্রান্তি মকর সংক্রান্তির লক্ষীপূজা বলা হলেও পূজারী কিন্তু প্রথমে লক্ষীপূজা না করে শেয়াল (শিবা) পূজার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন, কখন শেয়াল ডাকবে। শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খধ্বনি করেন মহিলারা, আর পূজক গঙ্গাজলের ঘটি নিয়ে ছড়া ফেলতে ফেলতে মেহীকে কেন্দ্র করে সাত পাক ঘোরেন বৃত্ত-রেখার উপর। এইভাবে তিনবার শেয়াল ডাকার প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। প্রবাদ আছে যেদিকে প্রথম শেয়াল ডাকে সেই দিকেই ধান ভাল হয়। ঐদিন শেয়াল অত্যন্ত বরেণ্য দেবতা। পাছে তার সম্মান ক্ষুণ্ণ হয় তাই সারাদিন তার নাম ধরে ডাকে না, বলে 'সার ডাকছে'। গঙ্গাজলের ছড়া দিয়ে ঐভাবে পাক খাওয়াকে বলা হয় 'সার ধরা'। সার ধরার পরে বাস্তু পূজা ও শেষে লক্ষীপূজা। লক্ষী পূজার পর আরম্ভ হয় কৌতুকপ্রদ ধান মাপা। পূজার পূর্বে কিছু সাদা ধান জড় করে রাখা হয়, ধান মাপার জন্য ধামা, কাঠা, কুনকে প্রভৃতি যে সমস্ত মাপক বস্তু সেখানে থাকে ঐগুলো দিয়ে ধান মাপ করতে শুরু করে দেন পূজক। মালকোঁচা মেরে ডান হাঁটুটা মাটিতে গেড়ে, বাম হাঁটুটা বুকের কাছে রেখে, ভীমের আসন অনুকরণে চলে মাপ। কাঠা, কুনকে, ধামা প্রভৃতি মাপক বস্তুগুলিকে উবুড় করে ঐ পেছন দিক দিয়ে দু'বার করে মেপে মাপক পাত্র সহ ধান মেহীর দিকে ফেলে দেয়। এক এক বারের মাপকে গোনে 'এক কুড়ি', 'দুই বিশি' ইত্যাদি। ছোট ছোট ধামাকে কাঠা বলে। এক কাঠায় পাঁচ সের ধান ধরে। ষোল কাঠাতে এক কুড়ি হয়। কুড়ি কুড়িতে এক 'বিশি'। মাপক যন্ত্র সহ ধান খোলায় পড়ে থাকে সেই রাতটা। এইভাবে শেষ হয় খোলা পূজা। তারপর পাড়া-পড়শী সবাইকে মকর বাঁটা হয়।

আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

যদিও আন্তর্জাতিক আইন বর্তমান সময়েই এমনভাবে পল্লবে পুষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে সুগঠিত হয়ে উঠেছে তথাপি এর উৎস অনুসন্ধান করতে হবে ফেলে আসা এক অতীত যুগে। এর উদ্ভবের কাল দূরবর্তী হয়েছে আজ থেকে ২০০০ হাজার বছর আগে। ইহুদীরা সন্ধি পালনের আইন সৃষ্টি করেছিলেন এবং রাজদূতের প্রতি তাঁরা গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। ইহুদীরা তাঁদের দেশে বহিরাগত এবং নিজেদের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই-রকম আইন কানুন প্রয়োগ করতেন। তাঁরা বলতেন, 'বিদেশীদের ভালোবাসো, কেন না বিস্ময় ভূখণ্ডে তোমরাও বিদেশী ছিলে।'

হিন্দুরা বিষাক্ত এবং মারণাস্ত্র ব্যবহার থেকে অতীতকালেই বিরত ছিলেন। আত্মসমর্পণকারী বা আহত ব্যক্তিকে তাঁরা আক্রমণ করা বা হত্যা করাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না। শরণাগতের প্রতি তাঁদের চিরকালই ছিল এক গভীর কর্তব্য বোধ। যুদ্ধের বন্দীদের এবং অসামরিক ব্যক্তিদের হিন্দুরা গভীর মর্যাদা দেখাতেন। রাজদূতকে অত্যন্ত সমাদর করতেন। তাঁরই মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আদান প্রদান চালু রাখতেন। সন্ধিগুলির উপর গভীর শ্রদ্ধা ছিল তাঁদের। সন্ধির সর্তগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা।

ইসলামের জন্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অমুসলিম রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুদ্ধ করাকে তাদের অধিকার বলে মনে করতো। অমুসলিম রাষ্ট্রগুলি ইসলাম ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করলেই তাদের বিরুদ্ধে শুরু হতো জেহাদ। কিন্তু এই জেহাদের সময়ই শিশু, বৃদ্ধ এবং মুমূর্ষদের রক্ষা করবার রীতি যে বর্তমান ছিল তা' ক্রুশেডের ইতিহাস যারাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করবেন তারাই একবাক্যে স্বীকার করবেন। অবশ্য এই জেহাদে বন্দীদের হত্যা করা হতো কিংবা ক্রীতদাসেও পরিণত করা হতো।

গ্রীকরা ভালোমন্দ সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিধানকেই মেনে চলতেন। অঘোষিত যুদ্ধে তাদের বরাবরই অনীহা ছিল। যুদ্ধের বন্দীদের তারা ক্রীতদাস করতেন / অথবা নিজেদেরই ভৃত্যে পরিণত করতেন। তবু যারা চাহিদা অনুযায়ী অর্থ দান করতে পারেন তাদের মুক্তিও দেওয়া হতো। তারা চিরকালই মন্দির ও ধর্মস্থানগুলিকে সুগভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে এসেছেন। যাজক, পুরোহিত কিংবা কোন ধার্মিক ব্যক্তি শত্রুদলের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার উপরে কোন প্রকারের আঘাত হানা হতো না। আন্তঃরাজ্যের কলহ সালিশীর জন্য সুপারিশ করা হতো। সন্ধি সংগঠন ও পূর্ণ বিবেচনায় রীতি প্রচলিত ছিল এবং তার শর্তগুলিকে যথার্থ মর্যাদাও দেওয়া হতো। রাজদূত বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। গ্রীক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই একথা একবাক্যে স্বীকার করবেন।

রোমান সাম্রাজ্যের ২০ জন পুরোহিত বা 'ফেটিয়ালিস্' নিযুক্ত ছিলেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনার জন্য। প্রাচীন রোমে 'জাস জেনটিয়াম' বিধি ছিল রোম ও অন্যান্য দেশ ও বিদেশীদের মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের সংহিতা। গ্রীকদের মতন রোমানরাও পূর্ব ঘোষণার দ্বারা যুদ্ধ

ঘোষণা করতেন। অতর্কিত আক্রমণ তারাও ঘৃণার চোখে দেখতেন। কোন মৈত্রী চুক্তি, আত্মসমর্পণ বা বিজয়ের মধ্যেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটতো। যদি কোন দেশ আত্মসমর্পণ করতো তবে সেই দেশের কোনরূপ সম্পত্তি গ্রহণ বা জনক্ষয় করাকে প্রথাসিদ্ধ বলে কখনোই মনে করতেন না রোমানরা। কিন্তু বিজিত দেশের জনসংরক্ষণ বা সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সম্পর্কে কোন বিধি বা আইন ছিল না। তিন রকমের সন্ধিতে তাঁরা স্বাক্ষর করতেন—মৈত্রী সন্ধি, আঁতাতের সন্ধি ও আতিথ্যের সন্ধি। কোন সন্ধিকে অগ্রাহ্য অথবা বাতিল করতে হলেও পূর্বেকার ঘোষণার প্রয়োজন হতো। রোমানদের এই বৈদেশিক সম্পর্ক সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থা (২০ জন পুরোহিত) এবং নানাবিধ রীতিনীতি বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে অনিবার্যরূপে সহায়তা করেছে সন্দেহ নেই। সুসভ্য রোমই হলো অনাগতকালের সকল উদ্ভবের স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণ যার অনুপ্রেরণায় ইতিহাসের পর্বে পর্বে মানুষের প্রয়োজনের স্বর্ণগর্ভ ফসলের ক্ষেত নির্মিত হয়েছে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, আন্তর্জাতিক আইন তার গঠনের পথে তিনটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। প্রথম স্তরের সূচনা আদিমতম দিন থেকে, শেষ খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ায়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো রাষ্ট্রগুলি একে অন্যকে তখনই আনুগত্য জানিয়েছে যখন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহের জাতিগুলিও এক থেকেছে। যতদূর জানা যায়, দ্বিতীয় স্তরের সূচনা প্রথম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। সমাপ্তি ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারের সময়। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রগুলির সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করেছে একজন 'সাধারণ ঐক্যবিধায়ক।' তিনি এই রাষ্ট্রগুলি সকলের দৃষ্টিতেই, তাঁর উদার ও নিরপেক্ষ মনোভাবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হয়েছেন। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে পোপ এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পবিত্র রোমান সম্রাট (অস্থায়ী ক্ষেত্রে) এই শ্রেষ্ঠত্বের পদে সমাসীন ছিলেন। তৃতীয় স্তরের সূত্রপাত রোমান সাম্রাজ্যের সংস্কার আন্দোলনেরই গোড়ার দিকে এবং আজ পর্যন্তও তা' অব্যাহত। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য হলো সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহ তাদের এক বৃহৎ সমাজের অংশ বলে মনে করে এবং তাদের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য আছে বলে স্বীকার করে থাকে। বলা যেতে পারে তৃতীয় স্তরের চেতনাতেই নিহিত ছিল বর্তমানের লীগ অফ নেশানস ও জাতিসংঘের অংকুর।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে অনেক বিষয়ই আন্তর্জাতিক আইনকে গড়ে উঠতে সহায়তা করেছে। মহাকালের উজানে, উচ্ছ্বাসে রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে গেছে। লুপ্ত হয়েছে সকল খ্রীষ্টীয় রাজ্যের ঐক্যমত। তার ফলে একাধিক রাষ্ট্র আপন আপন স্বাধিকারে প্রমত্ত হয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তারা প্রত্যেকেই স্থায়ী সৈন্যদল মোতায়েন রাখতে উৎসুক। বিভিন্ন সংস্থা সুগঠিত হয়েছে। ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নানা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পাকাপাকি-ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের জন্যই প্রয়োজন হয়েছে সব আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ। তারপরই উপস্থিত হয়েছেন বিচারক মণ্ডলী। যতদূর জানা যায়, আন্তর্জাতিক আইন সংগঠন ও সংরক্ষণের কাজে প্রথম যিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম হলো জেন্টিলেস। জেন্টিলেস ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর অক্সফোর্ডের একজন পৌর আইনের অধ্যাপক। বিশিষ্ট আইনবিদ ও চিন্তানায়ক স্টার্কের মতে, তারপর যিনি এলেন অর্থাৎ সেই বিশ্রুত চিন্তানায়ক হুগো গ্রোটিয়াস, তিনিই হলেন প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক আইনের প্রথম দিক দিশারী। আন্তর্জাতিক আইনের

ইতিহাসে তাঁর চিরস্থায়ী প্রভাব অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করলো হুগো গ্রোটিয়াসের প্রখ্যাত গ্রন্থ 'সংগ্রাম ও শান্তির আইন।' এই গ্রন্থখানি থেকেই ধারাবদ্ধভাবে একটা আন্তর্জাতিক আইনের দিক নির্দেশিত হলো।

তিরিশ বছর ব্যাপী যুদ্ধের অবসান ঘটলো ওয়েস্টফেলিয়ার শান্তিচুক্তির ফলে। যুদ্ধে যারা পরাজিত হলো, তারা হলো পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য, ক্যাথলিক চার্চ ও স্পেন। জয়লাভ করলো ইংলণ্ড ও ফ্রান্স। এর ফলে রোমান সম্রাট ও ক্যাথলিক চার্চের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক চুক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্ক সংঘটিত হলো। এই সকল সন্ধি, চুক্তি ও পারস্পরিক সম্পর্কই ত্বরান্বিত করে দিল আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবিকাশকে। তাই কোন কোন আইনবিদের মতে, আজকে আন্তর্জাতিক আইন বলতে আমরা যা' বুঝি তার প্রথম সুসংগত উল্লেখ নাকি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে করেছিলেন জার্মি বেনথাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধেই আন্তর্জাতিক আইনকে এক সুসংগত পরিণতি দেবার দিকে ঝোঁক দেখা যায়।

যা হোক্। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তেমন কোন ঝড় ঝাপটা দেখা গেল না। কেবল এই সময় একটা পার্থক্য নির্ণয় করা হলো বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার বিষয়ে। নিরপেক্ষ শক্তি সম্পর্কে যে আইন অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল সপ্তদশ শতাব্দীতে, এই সময়ে তা দানা বেঁধে উঠলো। একটা তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল প্রাকৃতিক আইনের বিরুদ্ধে। প্রাকৃতিক আইনের সমর্থকদের যিনি নেতৃস্থানীয় ছিলেন, তিনি হলেন সামুয়েল পুফেনড্রফ। তাঁর মতে, রাষ্ট্রগুলি পরস্পরের প্রতি তাদের স্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক কারণেই করতে বাধ্য কেন না তাদের কোন সাধারণ শ্রেষ্ঠ নিয়ামক নেই। পুফেনড্রফের সমর্থকদের বলা হতো প্রকৃতিবাদী। প্রকৃতিবাদীদের বিরোধিতা করতে আর এক গোষ্ঠী মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। এঁরা অস্বীকার করলেন প্রাকৃতিক আইনের অস্তিত্বকে। বললেন, আন্তর্জাতিক আইনও উদ্ভূত হয়েছে আচার আচরণ ও পারস্পরিক সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি থেকে। এরা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষবাদী গোষ্ঠী বলে বিশেষভাবে চিহ্নিত হলেন। এই গোষ্ঠীর পুরোধা ছিলেন বাইনকারশোয়েক ও জন জ্যাকব মোজার। আর একটি গোষ্ঠীও ছিলেন যাদের বলা হতো গ্রোটিয়পন্থী। এরা আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ভবের ব্যাপারে এক মাঝামাঝি মত মেনে চলতেন। এদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন যথাক্রমে ক্রিশ্চিয়ান উলফ্ এবং এমারিক দ্য ভ্যাট্টেল। বলা যেতে পারে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণেই আইন নিয়ে রীতিমত চিন্তা শুরু হয়ে গেছে। ১৭৮৯/৯৯ ঘটে গেল ফরাসী বিপ্লব। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলো তাতে। প্রজাসাধারণ সম্পর্কে সকল রাষ্ট্রের চিন্তাধারা পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত করলো এই বিপ্লব। এই শতাব্দীতেই সমস্ত বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সন্ধিসমূহের কালানুক্রমিক ও বিধিবদ্ধ সংরক্ষণ শুরু হলো। তারপর এলো এক সময় উনবিংশ শতাব্দীর স্বর্ণ প্রভাত।

উনবিংশ শতাব্দীতে একাধিক নোতুন রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, আন্তঃসাগরের বুকে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রসার, যানবাহনের ক্রমোন্নতি আন্তর্জাতিক আইনের প্রগতিকেও পথ দেখালো। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে নানা পুরস্কার প্রদান করেছেন বারবার এবং বারবার আইন প্রণয়নকারী সন্ধিসমূহ সংস্থাপিত হয়েছে। ১৮১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো ভিয়েনা কংগ্রেস। এই কংগ্রেসের চেষ্টা

ছিল জাতি সমূহের বিধিবিধানকে পারস্পরিক ক্ষেত্রে মেনে চলার পথ নির্দেশ। বলা যেতে পারে এই কংগ্রেসই হলো সর্বপ্রথম ইউরোপীয় জাতি সমূহের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এখানেই ঠিক করা হয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলপথে বাণিজ্য ও যাতায়াতের নিয়ম কানুন। ১৮৫৬ সালে প্যারিসের ঘোষণা সমুদ্রপথে যুদ্ধের একাধিক ধারাকে সংকলিত করেছে। ১৮৬৪ এবং ১৯০৬-এর জেনেভা সম্মেলনদ্বয় স্থলপথ ও জলপথের যুদ্ধে অসুস্থ এবং আহতের সম্পর্কে অনেক বিবেচ্যবিষয় লিপিবদ্ধ করেছে। ১৮৬৮ সালের সেন্ট পিটাসবুর্গের ঘোষণায় যুদ্ধে বিস্ফোরক বুলেটের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। অতঃপর প্রত্যক্ষবাদী আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ ভ মারটিনস, হেফটার; ফিল্লিমোর; সেইন এবং ওয়েস্টলেক প্রমুখ লেখকদের জনকল্যাণমূলক মতামতের উপরেও বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা হয়। হল, ওপেনহিয়েম, লরেন্স, হাইড, হুইটন, এবং ব্লুন্টশ্লি প্রমুখ লেখকদের লেখাও আন্তর্জাতিক আইনের গতি প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ১৮৯৯ সালের হেস সম্মেলনেও স্থলযুদ্ধের আইনকানুন স্থির করা হয়। ১৯০৭ সালের দ্বিতীয় হেস সম্মেলনে বোম ফাটানো সম্পর্কে অনেক, বিধিনিষেধ নির্দ্ধারিত হয়। নিরস্ত্র জনতাও নিরপেক্ষ শক্তির উপরে যুদ্ধকালীন কোন আঘাত হানা সম্পর্কেও আইনকানুন লিপিবদ্ধ হয় হেস সম্মেলনে। হেস সম্মেলনেই একটি চিরস্থায়ী সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯১৪-১৮র বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেল যে বারবার আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধগুলি লঙ্ঘিত হলো। তাই যুদ্ধের শেষেই আন্তর্জাতিক আইনকে শক্তিশালী করে গঠন করার কথা চিন্তা করতে হলো। ১৯১৯ সালে ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হলো এবং তাতে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। ২৮শে জুন ১৯১৯ সালেই গঠিত হলো জাতিসংঘ (লীগ অফ নেশানস্), ১৯২০ সালেই গঠিত হলো চিরস্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয়। ১৯২৫ সালের ১৬ই নভেম্বর সংগঠিত হলো লোকার্না চুক্তি। এই চুক্তিতেই শান্তিপূর্ণভাবে কলহ নিষ্পত্তির বিষয়সমূহ গৃহীত হয়। বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর সীমান্ত সংক্রান্ত বিষয়টিকে ব্রিটেন ও ইটালী মেনে নেয়। কিলোস ব্রায়ান্ড চুক্তি অথবা ১৯২৮ এর প্যারিস চুক্তি জাতীয় নীতিরূপে যুদ্ধকে ধিক্কার হানে। চুক্তিবদ্ধ জাতিসমূহ শান্তিপূর্ণভাবেই সকল আন্তজাতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ঐক্যমত হয়। ১৯২৯ সালের জেনেভা বৈঠক আন্তর্জাতিক আইন গঠনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই চুক্তির ফলে প্রতিশোধ গ্রহণ, যুদ্ধ বন্দীদের উপরে নির্দয় ব্যবহার, কোন একজন ব্যক্তির দোষে সমষ্টির উপরে আঘাত হানা ইত্যাদি বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হয়। এতেই ঠিক হয় যে চিকিৎসক সংস্থা ও আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষাকারী দলকে অনাক্রম্যতা দান করতে হবে। উপরন্তু এও ঠিক হয় যে যুদ্ধে হতাহত ব্যক্তিদের এবং যুদ্ধ বন্দীদের উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করতে হবে। বলাই বাহুল্য জাতি সংঘের প্রতিষ্ঠার পরই আন্তর্জাতিক আইনের অনেক রীতি নীতিকে বিধি বদ্ধ করা হয়। ইতিস্তত বিক্ষিপ্ত অনেক বিধিবিধান, আচার নীতি ও প্রস্তাব সমূহ আইন আকারে লিপিবদ্ধ হবার উদ্যোগ দেখা দেয়।

কিন্তু ১৯৩৯-৪৫ সালের মহাযুদ্ধ ব্যাপকভাবে লঙ্ঘন করে আন্তর্জাতিক আইনের বিধি। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও চিন্তানায়করা প্রমাদ গোণেন। উপলব্ধি করেন যে জাতি সংঘ আন্তর্জাতিক

সম্পর্ককে স্থির রেখে ঝড়ের কেন্দ্রকে শান্ত রাখতে পারেন নি। তাই যুদ্ধান্তে ১৯৪৫ সালের ২৬ শে জুনই স্যানফ্রানসিসকোতে ৫০টি রাষ্ট্র মিলে এক সনদে সই করলো। ঐ বছরই ২৪ শে অক্টোবর সম্মিলিত জাতি সংঘ বা ইউ, এন ও পৃথিবীর আলোর মুখ দেখলো। ১৯৪৬ সালে আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয়ের অপসারণ ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের। ১৯৪৮ সালে মানবিক অধিকারের নিখিল ঘোষণা গৃহীত হলো। ১৯৫০ সালে মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষায় ইউরোপীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোটকথা, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উত্তাল তরঙ্গ সমস্ত পৃথিবীতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বর পুনরায় গৃহীত হয় সম্মিলিত জাতি সংঘ কর্তৃক শান্তির স্বপক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রতিজ্ঞা। মোটকথা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেখা যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সংগঠিত হতে চলেছে। সংগঠিত হয়েছে। হচ্ছে এবং আগামী ভবিষ্যতে হবে বলেই আশা করবো।

মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক আইন অবশ্যই লঙ্ঘিত হয়েছে। হচ্ছে। পৌর আইনও লঙ্ঘিত হয়। জেনে না জেনে নানান ভাবেই মানুষ আইনকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। সকল সময় অপরাধ প্রবণ মন থেকেই যে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়, এ কথা সত্য নয়। শতাব্দীভর মানুষের যে শুভাকাঙ্ক্ষা অতন্দ্রজনীর পরিশ্রম দিয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে সংগঠিত করেছে সেই কোন শৈশবকাল থেকে তাতে সে আজ যৌবন প্রাপ্ত হয় নি, এ কথা বলা মানে সত্যেরই অপলাপ। রাষ্ট্রসমূহ ক্রমশই চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে; স্থানে স্থানে কালে কালে গড়ে তুলছে শিক্ষা সংস্কৃতি বিজ্ঞান ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে পারস্পরিক আদান প্রদানের সংস্থা ও শিবিরগুলি তা দেখেও কি উৎসাহ বোধ করবো না? নাকি দিগন্তে সহসা ঘনায়মান মেঘমালা দেখেই মনে করবো আর সূর্যোদয়ের কোনই আশা নেই? সমস্ত বিশ্বই বুঝি তার প্রাণসম্পদে দেউলে হয়ে গেছে? এর থেকে আর নিষ্ঠুর মনোবিকার কিছুই হতে পারে না।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

সমালোচনা

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা—সম্পাদক : রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। ছয় টাকা।

কবি নরেন্দ্র দেব স্মরণিকা—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সম্পাদিত। সাহিত্য তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। পাঁচ টাকা।

কবি কুমুদরঞ্জন ছিলেন খাঁটি মানুষ, তাঁর জীবন ছিল, সহজ, সরল, অনাড়ম্বর। আর এই সারল্য ছিল মহিমা ও মাধুর্যে মণ্ডিত। তাঁর কবিতাতে তাঁর এই পরিচয়ই আমরা পাই এবং তাঁর কবিতার প্রকৃতিও এই। তাঁর নিজের ভাষাতে কবির সম্বন্ধে বলতে পারি—'লোকটা ছিল খাসা'। তাঁর কবিতায় নানা রস তরঙ্গায়িত হলেও যে রস সব চেয়ে বেশী উৎসারিত সেটি শান্তরস। এইখানে ওয়র্ডসোয়র্থের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাদৃশ্য চোখে পড়ে, যে ওয়র্ডসোয়র্থের কবিতা ছাত্রাবস্থায় কুমুদরঞ্জনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ওয়র্ডসোয়র্থ কাব্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—ভাবাবেগ শান্তিতে সমাহিত হলে কাব্যের উৎপত্তি। এ কথা সব কবির কাব্য সম্বন্ধে বলা চলে না কিন্তু ওয়র্ডসোয়র্থ ও কুমুদরঞ্জনের কাব্য সম্পর্কে সমভাবে প্রযোজ্য। কবিশেখর কালিদাস রায় তাই কুমুদরঞ্জনের সহজিয়া রচনাভঙ্গিকে 'অনুদ্ধত, সুকুমার, শান্তশুচি, স্নিগ্ধ ও কমনীয়' বলে বর্ণনা করেছেন।

কুমুদরঞ্জনের মৃত্যুর দু বছর পরে প্রকাশিত 'কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক স্মরণিকা' কবির প্রতি উপযুক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি কারণ এই সংকলনেরও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর 'অনুদ্ধত' ও 'সুকুমার' ভাব। এই গ্রন্থে মহাকাব্যের বিরাটত্ব ও গাম্ভীর্য না থাকলেও উদ্ভট শ্লোকের স্নিগ্ধতা ও সৌন্দর্য আছে, যেটা কুমুদরঞ্জন রিক্স গাড়ীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন—'সহজিয়া চায় পথ সহজ সরল'।

'স্মরণিকা'—সম্পর্কে সম্পাদক শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক লিখেছেন—'কুমুদরঞ্জনের কবিজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের চিত্র ও চরিত্র নানাজনের নানাদিকের দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে তারই যতটা সম্ভব সংকলন আলোচ্য স্মরণিকায় সংগৃহীত হল।' এইসব আলোচনা যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে বহু বিশিষ্ট নাম রয়েছে। কয়েকজন বিশিষ্ট কবির কুমুদরঞ্জন সম্পর্কিত কবিতাও সংযোজিত হয়েছে। প্রায় সব কটি লেখার মধ্যেই কবির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পূর্ণ প্রকাশ রয়েছে। সাহিত্য-সমালোচনার দিক থেকে কয়েকটি লেখা গুরুত্বপূর্ণ। সম্পাদক-রচিত 'কবি কুমুদরঞ্জন ও তাঁর কাব্যচৈতন্য' প্রবন্ধটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

নরেন্দ্রদেব তাঁর নিবন্ধে কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও কুমুদরঞ্জনের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের কবিতা নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। শ্রীকালিদাস রায় কুমুদরঞ্জনকে তাঁর উপগুরু-রূপে বর্ণনা করেছেন (রবীন্দ্রনাথ গুরু)। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কুমুদরঞ্জনকে 'অন্যতম শেষ প্রাচীন কবি' মনে করেন। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর নিজের ও কবি নজরুলের সঙ্গে কুমুদরঞ্জনের সম্পর্ক

আলোচনা করেছেন। ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কবির রচনারীতির সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল কবিতায় উপমামালা প্রয়োগ। শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুমুদ-তীর্থে' রচনায় 'ভাব-পাগল, আত্মভোলা' কবি ও তাঁর গৃহস্থালীর সুন্দর একটি চিত্র ফুটে উঠেছে।

এইসব লেখা ছাড়াও বহু মূল্যবান রচনার সমাবেশ ঘটেছে 'স্মরণিকা'তে যে গুলিতে স্মৃতিচারণের পাশাপাশি রয়েছে কাব্যবিচার। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রার্থনা কবি' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। কবিপুত্র শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক কুমুদরঞ্জনের রচনায় কিপলিঙের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কবির দিনলিপির কিছু অংশ আমাদের উপহার দিয়েছেন। কুমুদরঞ্জনের একটি গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে। কবির বহু চিঠিপত্র এবং কয়েকটি আলোকচিত্র স্মরণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কিন্তু এগুলির সবগুলি মুদ্রিত না করে কিছু চিঠি ও ছবি বিশেষভাবে নির্বাচিত করে দিলে ভালো হত। কবির দিনলিপির সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য। একই বিষয়ের বারংবার পুনরাবৃত্তি ও পুনরুক্তি সংকলিত নিবন্ধগুলির মধ্যে দেখা যায়। এ ব্যাপারে একটু সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। যে দু-একটি রচনাতে কুমুদরঞ্জনের চেয়ে রচনার লেখক নিজে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন সে রচনাগুলি বর্জন করলে, এবং মুদ্রণশুদ্ধির দিকে আর একটু দৃষ্টি রাখলে, 'স্মরণিকা' সুন্দরতর হতে পারত। তবে এই সব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাপিয়ে যেটা আমাদের প্রশংসা আকর্ষণ সেটা সংকলন-গ্রন্থের সযত্ন ও সশ্রদ্ধ সম্পাদনা। পাতায় পাতায় পরিচ্ছন্নতা ও সুরুচি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই শতাধিক পৃষ্ঠার এই সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থটির পরিবেশনায় জন্য সাহিত্যতীর্থ—কুমুদরঞ্জন এক সময় এই প্রতিষ্ঠানের তীর্থপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন—সকলের ধন্যবাদ অর্জন করবেন।

সারা জীবন কবি নরেন্দ্র দেব জীবনের খেলাঘরে খেলেছেন, খেলেছেন প্রকৃত খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে। জেতা বা হারা তাঁর কাছে বড় কথা ছিল না, খেলাটাই ছিল আসল। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন—'এগিয়ে আসে যাবার বেলা'। খেলাভাঙার খেলার কথা তখন তাঁর মনে। তাই তিনি লিখলেন—'এবার তবে গুটোও পাশা সাঙ্গর করে দাও হে খেলা'। তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরভিমানী, না হলে ল্যাণ্ডর-এর মতো লিখতে পারতেন—

> I strove with none ; for none was worth my strife ;
> Nature I loved, and, next to Nature, Art ;
> I warmed both hands before the fire of life ;
> It sinks and I am ready to depart.

ল্যাণ্ডর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক বাদ-বিসংবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্র দেব ছিলেন অজাতশত্রু। জীবনের আলো নিবে আসছে দেখে তিনি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিলেন, অভিভূত হয়ে পড়েন নি—'সন্ধ্যাবেলা আমার ঘরে নামছে এখন অন্ধকার।' তখন বিহঙ্গের যাবার সময় আগতপ্রায় কুলায় রিক্ত হতে দেরী নেই।

নরেন্দ্র দেব বঙ্গের বিদগ্ধ-সমাজে একটি প্রিয় নাম। সাহিত্যিক রূপে তিনি যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে বেশী যেটা অর্জন করেছিলেন সেটা ছোটো-বড় সকলের অকুণ্ঠ

ভালোবাসা। তিনি নিজেও ছিলেন স্নেহপরায়ণ, সকলকে আপনার করে নিতে পারতেন। সহধর্মিণী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে নিয়ে তিনি যে সুখনীড় রচনা করেছিলেন, তার নামকরণ করেছিলেন 'ভালোবাসা'। এই নামকরণ সার্থক, কারণ আজীবন তিনি, রবার্ট ব্রাউনিঙের মতো, ভালোবাসারই সাধনা করে গেছেন।

সাহিত্যতীর্থ প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় তীর্থপতি নরেন্দ্র দেবের মৃত্যুর পরে তাঁর গুণমুগ্ধ সাহিত্যিকেরা তাঁর সম্বন্ধে যে সব স্মৃতিচারণা করেছেন সেগুলিকে একটি সুন্দর ও সুসম্পাদিত রূপ দিয়েছেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক। তাঁর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি আরম্ভ করেছেন এই ভাবে—'পরিপূর্ণভাবে সাহিত্যপ্রাণ সহৃদয় সামাজিক পুরুষ ছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব।' 'স্মরণিকা'র পাতায় পাতায় নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও সামাজিকতা পরিস্ফুট। তাঁর অনুরাগী সত্তা বনফুলের 'নরেনদা—আমাদের নরেনদা' কবিতায় উজ্জ্বল—

নরেনদা চলে গেলেন: সারা জীবন একটি কথাই বলে গেলেন—'ভালোবাসি,/ভালোবাসি তোমাদের হাসি/তোমাদের আনন্দ/তোমাদের মুক্ত-প্রাণের ছন্দ।'

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলিতেও নরেনদার এই দিকটির কথা বলেছেন, কারণ তিনি ছিলেন, প্রকৃত অর্থে সকলের নরেনদা। তাঁকে সহজেই জলধর সেনের সঙ্গে তুলনা করা চলে।

'স্মরণিকা'তে বহু খ্যাতনামা লেখক কবিতা ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে নরেনদাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁর স্নেহ-ভালোবাসা-উদারতার বহু কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে নরেনদার কি সম্পর্ক ছিল এবং নরেনদার কাছে তাঁরা কতভাবে উপকৃত তাও তাঁরা অকপটে ব্যক্ত করেছেন। গ্রন্থটিতে নরেন্দ্র দেবের নিজের লেখাও কিছু কিছু সংযোজিত হয়েছে, তার সঙ্গে বহু আলোকচিত্র। শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর কয়েকটি স্বরচিত কবিতা রয়েছে, সেগুলিতে তাঁর শোকগ্রস্থ হৃদয়ের বেদনা উন্মথিত—

আবার সমুদ্র এলো দুজনার মাঝে।
এপারে ওপারে দুটি বিচ্ছিন্ন হৃদয়।
কুটিল কল্লোলে নাচে অপার সময়—
মনে হয়, এ সময় শেষ হবে না যে।

কবিকন্যা শ্রীমতী নবীনতা দেব সেন লিখেছেন 'পিতৃস্মৃতি'। গ্রন্থশেষে 'নরেন্দ্র দেব গ্রন্থপঞ্জী' দেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যের বহু বিভাগে নরেন্দ্র দেবের দান রয়েছে, অনুবাদের ক্ষেত্রে তো বিশেষভাবে। পত্রিকা সম্পাদনেও তিনি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'স্মরণিকা' গ্রন্থটিতে কিন্তু নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যের মূল্যায়ণের কোনো প্রচেষ্টা চোখে পড়ল না। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনা থেকে অবশ্য এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে—'নরেনদা কত বড় মানুষ ছিলেন সবিস্ময় এ উপলব্ধির পাশে তিনি কত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সে বিচার তুচ্ছ হয়ে গেছে।' আশাকরি 'স্মরণিকা'র দ্বিতীয় সংস্করণে নরেন্দ্র দেবের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়

অক্ষয়কুমার দত্তের শিক্ষাচিন্তা

নবেন্দু সেন

উনিশ শতকের মহত্তম মানুষ রামমোহন ; কিন্তু বুদ্ধিজীবি মহলের অন্যতম প্রধান ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। কেবল ধর্ম বোধে নয়, সামাজিক অন্যান্য সংস্কার ও উন্নতির ক্ষেত্রেও তিনি পুরোপুরি প্রগতিবাদী ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা চিন্তার আলোচনা থেকে এই বক্তব্য স্পষ্ট হবে। অবশ্য ঐতিহাসিক দিক থেকে রামমোহনই প্রথম আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে সমকালীন কর্তৃপক্ষকে তাঁর মতামত জানিয়েছিলেন। লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা রামমোহনের সেই অতি বিখ্যাত এবং বহুল কথিত চিঠিটির অংশ বিশেষে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

'In the same manner the sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the govt, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of education, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry, Astronomy with other useful sciences.……'

রামমোহনের এই উক্তির কাল ১৮২৩। অর্থাৎ ইতিমধ্যে ফোর্টউইলিয়ম কলেজ পুরোনো হয়ে গেছে ; হিন্দু কলেজ (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; স্কুলবুক সোসাইটি (১৮১৭) ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটিও (১৮১৮) ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'ও (১৮১৫) ততদিনে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি ক'রেছে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিস্ময় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের (১৮০০) কর্তৃপক্ষরা কেউ কিন্তু এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে তেমন উৎসাহ দেখান নি। যদিও

ফোর্টউইলিয়ম কলেজই ভারতের প্রথম পাশ্চাত্যরীতির একটি বৃহৎ শিক্ষায়তন। কেবল শিক্ষায়তন নয় এটিই প্রথম ভারতীয় বিশ্ববিত্তালয়, 'Indian oxford' ছিল। গিলক্রাইষ্ট, এডমনস্টোন, জি. এইচ. বার্লো, জে. এইচ, হ্যারিংটন, ডবলু, কার্ক প্যাট্রিক, উইলিয়ম কেরী প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তিরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ; কিন্তু কেউই ভারতের জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্বন্ধে পৃথকভাবে অথবা একত্রে কোন পরিকল্পনা করেন নি। অবশ্য ফোর্টউইলিয়ম কলেজ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য এবং ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ ও স্বতন্ত্র ছিল। এঁদের নিকট থেকে ঠিক রামমোহন, বিত্তাসাগরের চিন্তার মত কোন চিন্তা আশা করাও বোধ হয় সঙ্গত নয় ; কিন্তু লর্ড ওয়েলিসলী এবং উইলিয়ম কেরী, টমাস বা মার্শমানের মত উদার মানসিকতার লোকেদের প্রেরণায় যদি এ ধরণের কোন জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারত তাহলে কোন বিস্ময় সৃষ্টি হত না। বোধহয় সেটা বাঞ্ছিত ও হত।

যাই হোক, রামমোহনের পরে বিত্তাসাগরের হাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল, আমরা জানি। অবশ্য যে আক্ষেপ ফোর্টউইলিয়ম কলেজগোষ্ঠীর প্রতি আমাদের আছে তা এই সময়ে অন্যান্য ইয়োরোপীয় উদার চিত্ত ব্যক্তিদের উৎসাহ, উদ্দীপনায়, কাজে, কর্মে সহযোগিতার মাধ্যমে বহুলাংশে মিটে যায়। জে, এফ মুয়াট, রেভারেন্ড লঙ, বেথুন সাহেব, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ভারত বন্ধুদের সহায়তায় বিত্তাসাগরের মত উত্তমী ও তেজস্বী পণ্ডিতের পক্ষে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছিল ; তাতে সন্দেহ নেই। Organaisational সফলতা রামমোহন অপেক্ষা বিত্তাসাগরের বেশী এসেছিল প্রধানত এই সহযোগিতার জন্যে ; অবশ্য ততদিনে সমাজের Intelligentia'র ও প্রতিষ্ঠা ভাল হয়েছিল। Ladies Society (1824), Calcutta Ladies association for native female Education'র (1825) পরে তত্ত্বোধিনী সভা (১৮৩৯), Anglo Indian Hindu Associatoin (1830), জ্ঞান সন্দীপন সভা (১৮৩০), সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮) সমিতিগুলি তখন রীতিমত জাগ্রত। বস্তুত ১৮২৮-১৮৪০'র মধ্যে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবিরা নানা স্থানে সচেতনভাবে তখন নানা সভা সমিতির মাধ্যমে একটি সামাজিক বুদ্ধির দিগন্ত সৃষ্টি করেছিলেন। হয়ত এই চাঞ্চল্যের মধ্যে অনেকটাই হুজুগপ্রিয়তা ছিল। হয়ত উৎসাহের সঙ্গে উৎচ্ছৃঙ্খলতা ছিল অনেক বেশী—Indeed the spirit of discussion became a perfect mania ; and its manifestation, both in freqnency and variety, was carried to a prodijious excess.'১

এ কথা সব সময়েই মনে রাখা দরকার যে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের সুযোগ ডিরোজিও হিন্দু কলেজে প্রবর্তিত করে গিয়েছিলেন তার শক্তি এই সমস্ত সভাসমিতিগুলিতেও বাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এবং ডাফ্ সাহেব ঠিকই লক্ষ্য করেছিলেন—'But the most striking feature in the whole was the freedom with which all the subjects were discussed.' এই পরিবেশে, শিক্ষার ক্ষেত্রে বিত্তাসাগর অনেক পরিবর্তন সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে কাজ করার সময় শিক্ষা বিষয়ক বড় বড় কতকগুলি কাজ করতে পেরেছিলেন।২ যেমন : ১। জাতি নির্বিশেষে সকল ছাত্রের জন্য সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

২। এই শিক্ষালাভের জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সংস্কৃত কলেজে ভর্তির অধিকার পেল

৩। ছাত্র বেতন প্রবর্ত্তিত হল।

৪। উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ, প্রভৃতি পাঠ্য পুস্তক রচনা করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতের জ্ঞান অর্জনের পথ সুগম করা হল।

৫। সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদ করে সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনের ব্যবস্থা করা হল।

৬। ২ মাস গ্রীষ্মাবকাশ প্রবর্তন।

৭। সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজী ভাষা চর্চার ব্যবস্থা।

৮। গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন।

৯। মডেল স্কুল স্থাপন।

১৮৪৯-এ বেথুন কর্তৃক প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হলে বিদ্যাসাগর সেই স্কুলের সম্পাদক হয়েছিলেন।৩ ভারতবর্ষে স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের জন্যে বেথুনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের নাম ও একত্রে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ইংরেজ সরকার এ দেশীয়দের শিক্ষিত করে তুলতে চান নি। শাসন কর্ম চালানোর জন্যে যতটুকু না হলে নয় ততটুকু পড়াশুনোর কাজ চালানোর ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ দেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজন নিয়ে বেথুন ও বিদ্যাসাগর যখন কর্মতৎপর হয়ে উঠেছিলেন কর্তৃস্থানীয়দের বিরাগভাজন হন এবং ১৮৫৮'র স্কুল পরিদর্শকের সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগের সেকালীন ডিরেক্টর মিষ্টার গর্ডন ইয়ং'র সঙ্গে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার নিয়ে বিদ্যাসাগরের মনান্তরও অনিবায হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশে স্ত্রী শিক্ষা আটকে রাখা সম্ভব হয় নি। নতুন স্ত্রী শিক্ষায় আলোকিত সমাজের চেহারায়ও বদল লক্ষিত হল।

'এখন ছুঁড়ি গুলো তুড়ি মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে সবে,
এখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে
বিলিতি বোল কবেই কবে।
একা বেথুন এসে শেষ করেছে
আর কী তাদের তেমন পাবে ?'৪

অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের সমবয়সী ছিলেন (১৮২০)। যে সামাজিক পরিবেশে উভয়ের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল তারও বিস্তৃত পরিচয় জানা আবশ্যক। অক্ষয় দত্তও কলকাতার সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেন তাঁর বছর দশেক বয়সে। অর্থাৎ ১৮৩০-এ। ১৮৩০ থেকে ১৮৫০।৫৫'র মধ্যে উভয়ের কর্ম ও সৃষ্টিশীলতার পরিচয় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অক্ষয়কুমারের ভাবনা চিন্তার সঠিক মূল্য-বিচার করা হল না। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ওদিকে মধুসূদন ও রাজনারায়ণ বসুর প্রখর ব্যক্তিত্বের নিকট জ্ঞাননিষ্ঠ, সাধক বুদ্ধিজীবি অক্ষয়কুমারের নিভৃত কর্মসাধনা উচ্চরবে জাহির করা হয় নি। অথচ এই জ্ঞান তাপসের কর্মময় জীবনের বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব কারো অপেক্ষা কম ছিল না। স্বল্পকালের ব্যবধানে ইনিই প্রথম রামমোহন রায়ের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন; নীলচাষ সম্পর্কে জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশ করেছিলেন, বেদের অভ্রান্তবাদ সম্বন্ধে বাস্তবযুক্তি প্রয়োগ করে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসে পরিবর্তন এনেছিলেন। আবার ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের

সামাজিক পরিচয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপস্থিত করেই কেবল নিজের জ্ঞান মণীষার পরিচয় দেন নি চারুপাঠের মত popular science'র বই লিখে শিক্ষার জগতে প্রভূত উপকার সাধন করেছিলেন, উপকার করেছিলেন একাদিক্রমে বারোবৎসর (১৮৪৩—১৮৫৫) ধরে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাটি সম্পাদনা করে। ১৮২৮—৩০'র Intelligentia আন্দোলনের চাঞ্চল্য স্থিত হওয়ার পরে বিদ্বৎসমাজের আসল গুণটি ধরা পড়েছিল যে সমস্ত ব্যক্তি, সংগঠন ও পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তার মধ্যে অক্ষয় দত্তের ব্যক্তিত্ব ও তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের ছেলেমেয়েরা মিশনারী স্কুল ছাড়াও স্বদেশী স্কুলে যাতে নিরাপদে পড়াশুনো করতে পারে তার জন্যে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করতেও তিনি সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু নিজেও যে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কত গভীর ভাবে চিন্তা করেছিলেন এবং এত দীর্ঘকাল পরেও তার মূল্য সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায়নি এটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অনালোচিত দিক বলে বিচার্য। অক্ষয় দত্তের শিক্ষা-চিন্তার পরিচয় প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি তথ্য পটভূমি হিসাবে জানা উচিত। যেমন রক্ষণশীল দলের নেতা রাধাকান্ত দেবও স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন এবং তিনি গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ক রচনা লিখতে (১৮২২) সাহায্যও করেছিলেন। এর পূর্বে ১৮১৯-এ The Female Juvenile Society প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিতও হয়েছে। ('গৌর বাড়ীতে' প্রথম এই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল)। ১৮৩২-এ সোসাইটির সংখ্যা বেড়ে গিয়ে Calcutta Baptist Female School Society নামে প্রচলিত হয়। চার্চ মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও বেশ কিছু সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ সময়। মেরী ম্যানকুক এঁদের মধ্যে এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী কর্মী ছিলেন। বেথুনের স্কুলটিও এতদিনে বেশ নাম করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কন্যা সৌদামিনী ঠাকুরকে এই স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল।৬

১৮৫১'র সৌদামিনীকে ভর্তি করা হয়েছিল। ১৮৫০-এ বিদ্যাসাগর এই স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন ; ১৮৫৪'র Court এদেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি 'সূত্র' প্রয়োগ করেন। ১৮৫৭'র ছোটলাট ফ্রেডারিক হ্যালিডে এই সূত্র অনুযায়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন ; এবং বিদ্যাসাগরকে Model girls school স্থাপন করতে অনুরোধ জানান।

এই সময়ের মধ্যে (১৮৫৭) অক্ষয় দত্তের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন তাঁর 'ভূগোল' (১৮৪১), 'ডেভিড সাহেবের…বক্তৃতা' (১৮৪৫), বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ ভাগ ১৮৫১, ২ ভাগ ১৮৫৩), চারু পাঠ (১ ভাগ ১৮৫৩, ২ ভাগ ১৮৫৪), বাষ্পীয়র আরোহী (১৮৫৫), ধর্মোন্নতি সংশোধন বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫), ধর্মনীতি (১৮৫৬) এবং পদার্থ বিদ্যা (১৮৫৬)।

১৮৪০'র জুন মাসে দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায়' ভূগোল ও 'পদার্থবিদ্যা'র শিক্ষক রূপে অক্ষয়কুমার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। স্কুলের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে অক্ষয়কুমার বক্তৃতা করেছিলেন, ইংরেজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্মকে পৈতৃক ধর্মরূপে গ্রহণ—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে

ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা'র নিমিত্ত তত্ত্ব বোধিনী সভা অত্র ১২৬৫ সালের বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালা-রূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।'৭

১৮৪১-এ প্রকাশিত তাঁর 'ভূগোল' বইয়ের ভূমিকাতেও লিখেছিলেন,—'ইদানীং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের দৃঢ় উদযোগে স্থানে স্থানে যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদ্বারা বালক দিগকে সুচারুরূপে শিক্ষাপ্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এই অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভী উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া, বহু ক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল প্রস্তুত করিয়াছি।'৮

এই দুটি মন্তব্য থেকে অক্ষয়কুমারের শিক্ষানুরাগ এবং শিক্ষা চিন্তা সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায়। বাংলা তথা মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়া আবশ্যক বলে তিনিও বিশ্বাস করতেন। তাঁর পদার্থ-বিদ্যা, 'চারুপাঠ' এবং 'ভূগোল' বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকরূপে পড়ানো হত। এই গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু বিচার করলে দেখা যাবে অক্ষয়কুমার বিজ্ঞানকে বাংলাভাষার মাধ্যমে বালক বালিকাদের সহজ, বোধগম্য ক'রে শিক্ষার বিষয়রূপে উপস্থিত করেছিলেন। উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রভূত প্রশংসার যোগ্য ছিল। কারণ বিষয়বস্তুই কেবল এদেশে নতুন ছিল না, তার প্রকাশ মাধ্যমটিও সদ্য প্রসূত ছিল। গদ্যের বয়স তখনো ৫০ বৎসর পূর্ণ হয়নি। তাতে বৈজ্ঞানিক গদ্য সৃষ্টি এক কঠিন সাধনা সাপেক্ষ বিষয় ছিল। অক্ষয় দত্তের হাতে সেই সাধনার সিদ্ধিই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আসল বিস্ময় অন্যত্র। 'ধর্মনীতি' (১৮৫৬) গ্রন্থের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে অক্ষয়কুমারের শিক্ষা বিষয়ক যে গভীর ভাবনা চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে বিস্ময় সেখানে। এই চিন্তাধারাকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে আলোচনা করা সম্ভব। প্রথমত সাধারণভাবে শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের যে পরিকল্পনা ছিল, তাই। দ্বিতীয়ত স্ত্রী শিক্ষা এবং তৃতীয়ত শিক্ষা, সাহিত্য ও অন্যান্য বিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা।

অক্ষয়কুমার আমাদের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী।

'সকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদর্শী হওয়া সম্ভাবিত নহে, এবং নিতান্ত আবশ্যকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় স্থূলরূপে শিক্ষা করা অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং যাহার যে যে বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিরুচি আছে, তাঁদের সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান করা কর্তব্য।৯'

সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষাদানের স্বাধীনতা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে থাকা যে নিতান্ত উচিত; একথা উন্নত প্রত্যেকটি দেশের সরকারই এখন স্বীকার করেন এবং সেই মত জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন করেন। কিন্তু আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে বিদেশী শাসকের অধীনে থেকেও অক্ষয়কুমার দত্ত সেই প্রয়োজনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করেছিলেন। অক্ষয়কুমারের

বিশ্বাসের মূল্য আজকের সমাজজীবনেও কম নয়। যে কারিগরী বিদ্যা বুনিয়াদী শিক্ষা এবং job oriented educetion'র কথা এখন আমরা বলি তার পরিপ্রেক্ষিতে অক্ষয়কুমারের এই শিক্ষাপদ্ধতির গুরুত্ব নতুন করে বিবেচনা করার সুযোগ অবশ্যই আছে বলে মনে করি।

সভ্য মানুষের জীবনে শিক্ষা বিষয়টির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সঠিক শিক্ষার মাধ্যমেই একটি জাতির সর্ব প্রকার উন্নতি ঘটে। অক্ষয়কুমার এই কঠিন বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 'শিক্ষাদান যেমন গুরুতর বিষয়, তাহা সম্পন্ন করা তদনুরূপ কঠিন কার্য।' এই 'গুরুতর বিষয়টি'র আরম্ভ সম্বন্ধে তাঁর দ্বিমত বা দ্বিধা ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন 'সুকুমার ক্রোড়ই যথার্থ বিদ্যাস্থান।' শৈশবে বিদ্যারম্ভ হবে। শিশুর ২ বৎসর বয়সেই এই কঠিন কাজের সূত্রপাত হবে। কিন্তু বিদ্যালয় তখন শিশুর ক্রীড়াস্থল। অক্ষয়কুমার তাই শিক্ষাদানের জন্যে তিনটি স্তরের কথা প্রথমে বলেছেন।

১। শিশুর দুই থেকে ছয় বৎসর বয়স পর্যন্ত একটি স্তর।

২। বালকের চোদ্দ | পোনের থেকে কুড়ি | বাইশ বৎসর পর্যন্ত আর একটি স্তর।

৩। তৃতীয় স্তরের আরম্ভ কুড়ি | বাইশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের নিয়ে।

প্রথম স্তরের শিক্ষার পরিবেশ সম্বন্ধে দশটি মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছেন। যথা—

(ক) 'পাঠ গৃহ প্রশস্ত' ও 'পরিশ্রুত' হবে।

(খ) 'পুষ্প শোভিত' ক্রীড়া ব্যবস্থা সমন্বিত বিদ্যালয় বাঞ্ছনীয়।

(গ) শিশু | বালক, বালিকাদের সঙ্গে 'সুমিষ্ট ব্যবহার' করতে হবে।

(ঘ) অঙ্গ-সঞ্চালন সম্ভব এরূপ ব্যায়মাদির চর্চা করা।

(ঙ) শুনিয়ে, দেখিয়ে নানা কথোপকথনের মাধ্যমে পারস্পরিক ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

(চ) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

(ছ) কীট পতঙ্গাদি ধরে শিশুরা যেন না খেলাধুলা করে।

(জ) শ্রদ্ধা, ভক্তি, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি সুকুমার মানবিক প্রবৃত্তিগুলি জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করা

(ঝ) ভূত, প্রেতের ভয় না দেখানো উচিত।

(ঞ) শারীরিক শক্তি সাধনের ব্যবস্থা করা।

এই বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখে এই স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশু শিক্ষার্থীদের কৌতূহল চরিতার্থ করাই মুখ্য কর্তব্য বলে অক্ষয়কুমার মনে করেছেন। এই সুপারিশগুলির মূল্য বিচার করলে দেখা যাবে এখনকার কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের যে ব্যবস্থাদি আছে তার চেয়েও উন্নততর শিক্ষার পরিবেশের উপরেই অক্ষয়কুমার গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। যেখানে শিশু প্রথম তার জ্ঞানলোকে উদ্ভাসিত হতে যাবে সেখানে আলোর ব্যবস্থাদি প্রথম বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত। অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, অপরিচ্ছন্ন গৃহে শিক্ষা সম্পন্ন হয় না। যে পরিবেশে মন উন্মুক্ত না হতে পারে। যেখানে শিশুর অপার কৌতূহল চরিতার্থ না হয় সেখানে তার শিক্ষারম্ভ না হওয়াই উচিত। পাঠগৃহ প্রশস্ত হবে; 'পরিশ্রুত' হবে। 'পুষ্প শোভিত' হবে। যেখানে সুস্থভাবে ছুটাছুটি করে খেলাধুলার মাধ্যমে আচার

আচরণ শিখতে পারে এই বয়সের শিশু শিক্ষার্থীরা তারই প্রতি নজর দিতে বলেছেন অক্ষয়কুমার। লক্ষ্য করার বিষয় এই স্তরের শিশুদের জন্যে পাঠ:ক্রমের কোন সুপারিশ নেই Naturalway তে যতটা সম্ভব শিশুকে বাড়তে দেওয়ার চেষ্টাই এই পদ্ধতিতে রয়েছে। Audiovisual Education'র সুপারিশ অক্ষয়কুমার করেছেন। বলাবাহুল্য এইসব পদ্ধতি এখনো নতুন। অথচ উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নে ব'সে অক্ষয়কুমার কত গভীর ভাবে এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তা করে গেছেন। শিক্ষার জগতে বেথুন, ডাফ, হেয়ার সাহেব, সটক্লিফ, মিল, এণ্ডরুজ, বিদ্যাসাগর, প্রভৃতির নাম আমরা করি; কিন্তু অক্ষয় দত্তের কথা কেউ বলেন না! অথচ কেবল উল্লেখ নয় যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে এই বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। অক্ষয়কুমারের ভাবনা চিন্তায় সঠিক পরিচয় এবং তার মূল্য বিচারের আবশ্যকতা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। বাংলার বিদ্বৎ সমাজের পরিচয় প্রসঙ্গেও এর গুরুত্ব সমধিক। যাই হোক দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় অক্ষয়কুমার পূর্ববৎ খোলামেলা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশের কথাই বলেছেন। 'চিত্তরঞ্জনে'র সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীদের 'অনুরাগ' জন্মায় শিক্ষাদানের সময় তার প্রতি নজর রাখা উচিত মনে করেছেন। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্যে পাঠ:ক্রমেরও উল্লেখ করেছেন।

নীতিসার (moral lesson)
পদার্থ বিদ্যা (physics)
বিজ্ঞান শাস্ত্র (general science)
পরীক্ষাগার (Laboratory work)
উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany) (সচিত্র পাঠ)
চিত্র সংগ্রহ (collection of illustration)
রাজকার্যাদি (politics ?)

দেখা যাচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ও থিওরেটিকাল উভয় দিক থেকেই বিজ্ঞান চর্চার উপর এই স্তরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেবল বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রেই এই স্তরের পড়াশুনা সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা সেটা এখনকার শিক্ষা প্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে বিচার্য; এবং হয়ত এই সুপারিশ এখন গ্রাহ্যও নয়। তথাপি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান চর্চার আবশ্যকতা সম্পর্কে এখনো দ্বিমত নেই। একটা বয়স পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল প্রভৃতিও বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য পাঠ্য বলে হয়ত এখনকার শিক্ষাবিদরা সুপারিশ করেন। অক্ষয়কুমার সেক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় স্তরেই 'চিকিৎসা বিদ্যা, গৃহ নির্মাণ, পোত নির্মাণ, যন্ত্র নির্মাণ' শিক্ষা চালু করার পক্ষপাতী ছিলেন।[১০]

তৃতীয় স্তরে যখন 'মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি দিন দিন পরিপক্ব হইতে থাকে' তখন উল্লিখিত বিষয়গুলির ব্যাপক ও সূক্ষ্ম চর্চা করা দরকার। এই সময় 'জ্যোতিষ' এবং 'আন্বীক্ষিকী', 'গণিত' বিদ্যাও চর্চা করা উচিত বলে মনে করেছেন। এছাড়া ছাত্র পাঠ্য পুস্তকাদি, 'হিতকর ও জ্ঞানকর' পুস্তক, ধর্মানুরাগ সৃষ্টির জন্যে ধর্মপুস্তক পাঠ, চরিত্র দোষ, লোভ যাতে না জন্মায় তার প্রতি নজর রাখা এবং যুযুৎসাদি ব্যায়ামে মন নিবেশ করা, এবং বিশ্ব পতির বিশ্ব কার্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান সঞ্চয়ন করা এই স্তরের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া উচিত বলে সুপারিশ করেছেন।

এই তিন স্তরের শিক্ষা চিন্তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে অক্ষয়কুমার শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটেই কাল্পনিক ছিলেন না। তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় ছিল যথেষ্ট। শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের যে গভীর সম্পর্ক আছে অক্ষয়কুমার তারই প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সমধিক। মানুষরূপে বাস্তবপৃথিবীতে আমাদের দাঁড়াতে হবে। তার জন্যে প্রয়োজন যে শিক্ষার সেই শিক্ষার কথাই তিনি বার বার ভেবেছেন। যে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণের জীবনের সম্পর্ক নেই অক্ষয়-কুমার সেই শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবেন নি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন

'গ্রামে গ্রামে কৃষি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদ্ব্যতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্য দশা দূরীভূত হওয়া কোন মতেই সম্ভাবিত নহে।'১১

স্বাধীন ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রথম থেকেই এই দুটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দেশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ ক'রে তোলার সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী নিঃসন্দেহে প্রয়োজন ভিত্তিক। অক্ষয়কুমারের মানসিকতায় এই দিকটি বহুকাল পূর্বেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প বিদ্যার প্রয়োজন আজো স্বীকৃত হচ্ছে। অক্ষয়কুমারের প্রস্তাব আজ কার্যকরী হয়েছে ঠিকই কিন্তু কেউ তার নামও জানে না। বুনিয়াদী শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পরিচিত; কিন্তু অক্ষয়কুমারের পরিচয় নেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' অথবা 'সহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারে'র পৃষ্ঠাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। আমাদের জ্ঞান, কৌতূহল ও গুরুভক্তি কতদূর এক দেশদর্শী এ তারই চূড়ান্ত পরিচয় মাত্র।

অক্ষয়কুমার দত্ত বিশ্বাস করতেন 'ভাষা—শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান শিক্ষার উপায় মাত্র। ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাণ্ডারের দ্বার স্বরূপ। সেই দ্বার উদঘাটন করিয়া জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে হয়। চির জীবনই কেবল দ্বার দেশে দণ্ডায়মান থাকিলে, কিরূপে জ্ঞান রূপ মহারত্ন লাভের সম্ভাবনা থাকে।'

তাঁর ধারণা ছিল ভাষা শিক্ষার জন্যে ঐ ভাষার 'পুস্তক পাঠ' 'লিপি-অভ্যাস' এবং 'প্রস্তাব রচনা' করা নিতান্ত দরকার। কেননা এই তিন উপায়েই ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার করবার অধিকার জন্মায়।

বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে গণিত, জ্যোতিষ ও 'শিল্প-বিদ্যাদি' অধ্যয়ন প্রথম সোপান হিসাবে গণ্য করতেন। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক মানসিকতায় ভূগোল চর্চা বরাবরই প্রাধান্য লাভ করেছে। নিজে স্কুলে পাঠ্য 'ভূগোল, (১৮৪১) লিখেওছিলেন। ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যটিও বেশ উল্লেখযোগ্য। লিখেছেন,

'ভূগোল বিদ্যা অভ্যাস করিয়া দেশ, প্রদেশ, নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির স্বভাবসিদ্ধ ও মনুষ্য কল্পিত চতুঃসীমা অবগত হওয়া উচিত, এবং প্রত্যেকে দেশের জল, বায়ু ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, এবং আচার ব্যবহার ও রাজ্যশাসনের কিরূপ প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক।'১২

ভূগোল বিদ্যার মাধ্যমে মানুষের জানার কৌতূহল নিবৃত্ত হয়। জ্ঞানার্জনের মধ্যেই চিত্তের ঔদার্য সৃষ্টি হয়। অক্ষয়কুমারের তথ্য-নিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা এই বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে

সম্পৃক্ত ছিল। উনিশ শতকে অক্ষয়কুমারের সমসাময়িককালে তাঁর চেয়ে বেশী জানতেন এমন বিদ্বৎজন খুব বেশী ছিলেন না। অগাধ জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। এবং অক্ষয়কুমারের এই জানার পদ্ধতিতেও ফাঁক ছিল কম। প্রত্যক্ষ জ্ঞানার্জনের প্রতিই তাঁর অধিক ঝোঁক ছিল। তিনি বলতেন, 'যে সকল সামগ্রীর বর্ণনাপাঠ করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্তব্য।'১৩ উত্তরকালে এই পদ্ধতিতেই শিক্ষাদান করা উচিত বলে রবীন্দ্রনাথ বার বার উল্লেখ করেছেন। তাঁর 'শিক্ষার মিলন' (১৯২১), 'শিক্ষার হের ফের' (১৮৯২) জাতীয় প্রবন্ধগুলির বক্তব্য প্রসঙ্গে সহজেই মনে আসে।

সাহিত্য-শিক্ষার প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার সাহিত্য-পাঠের উপযোগিতা সম্বন্ধে যা লিখেছেন তাতে তাঁর নন্দনতত্ত্বের বিশ্বাসকেই সমর্থন করেছে। 'অপার আনন্দ' ভোগের চূড়ান্ত কথাই ব্যক্ত ক'রেছেন। এক ধরণের mental pargation'র কথা এতে এসে পড়ে। অক্ষয়কুমার অবশ্য 'পরম পবিত্র পারমার্থিক' বর্ণনার ক্ষেত্রেই এই pargation'র উল্লেখ করেছেন। 'সাহিত্য-পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের বর্ণনা থাকে, তাহা অন্তঃকরণস্থ সৎ প্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত ও পরিশোধিত হইয়া অপার আনন্দ উদ্ভাবনা করে।'

অক্ষয়কুমার ভাবনা চিন্তার জগতে প্রকৃতই যে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন তথা প্রগতিবাদী ছিলেন তার অন্যতম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্ত্রী শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে। স্ত্রী জাতি স্বভাব কোমল বলে কঠিন কাজে অক্ষম বলে মনে করা অসঙ্গত। স্ত্রী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন আছে বলে তাঁর ধারণা। প্রাচীনকালে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এবং এখনো নিম্নলিখিত কারণের জন্যে নিম্নরূপ বিষয়ে স্ত্রী জাতির বিদ্যা-শিক্ষা প্রয়োজন বলে অক্ষয়কুমার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।১৪

	বিদ্যার প্রয়োজন	বিদ্যার বিষয়
(১)	মাতৃত্ব বিকাশের জন্যে	শারীরিক বিদ্যা
(২)	”	নিয়ম শিক্ষা
(৩)	সন্তানকে সুন্দর করবার জন্যে	মনোবিদ্যা, ধর্মনীতি
(৪)	শিশু যা দেখে তাতেই কৌতূহলী হয়। তার কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য।	বিশ্বব্যাপারে মায়ের ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা কর্তব্য।

অতএব 'স্ত্রীগণের রীতিমত বিদ্যা-শিক্ষার প্রথা প্রচলিত না করিলে, কোনরূপেই আর ভদ্রস্থতা নাই।' 'মাতার প্রথমাবধি সন্তানকে বিনীত করা কর্তব্য। সুকুমার ক্রোড়ই তার যথার্থ বিদ্যাস্থান।'

আজ সামাজিক চেহারার প্রভূত বদল হয়েছে। স্ত্রী জাতির সামাজিক ভূমিকাও পাল্টেছে। এখন নারী কেবল সন্তানের জননী নন। এখন বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষ। কোথাও কোথাও বেশী। এখন স্ত্রী শিক্ষা পৃথক কোন সমস্যা নয়। এখন শিক্ষাই সমস্যা। সে সমস্যা জটিলতর। স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই; কারণ এখানকার জটিলতর জীবন যাত্রা। শিক্ষা এখন জীবন মুখীন। কিন্তু সারা দুনিয়ার যখন শিক্ষার গুরুত্ব জাতির সমস্যার সঙ্গে বিচার করে তার নব

মূল্য ধার্য করা হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সমস্তাকে কিন্তু এখনো জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্ব দিয়ে সঠিক মূল্য দেওয়া হচ্ছে না বলেই মনে হয়। এখনো এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কেবল গিনি পিগ্-পরীক্ষা করেই চলা হচ্ছে। যে বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে শতবর্ষ আগে অক্ষয়কুমার এত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন তা নিয়ে এখানকার শিক্ষাবিদ্‌রা কী কিছু ভাবছেন? যদি ভাবেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে অক্ষয়কুমারের চিন্তাসূত্রগুলিও বিচার করে দেখেন একবার তাহলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অখ্যাতনামা শিক্ষাবিদের প্রতি হয়তো অনেকখানি সুবিচার করবেন। এবং এই সমস্ত সঙ্গত কারণেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডাফ্, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, গুরুসদয় দত্ত প্রমুখ শিক্ষাবিদ্‌দের সঙ্গে অক্ষয় দত্তের নামও পরিচিত হওয়া উচিত।

১. Duff., A., India and Indian missions (Edin : 1879), appendix
   দ্রঃ বিনয় ঘোষ, বাংলার বিদ্বৎসমাজ, (১৯৭৩), ৭৭
২. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ সংস্করণ (১৯৫৫), ১৯০।
৩. ১৮৫৭-৫৮'র (নভেম্বর—মে) মধ্যে ৩৫টি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত করেন।
৪. ঈশ্বরগুপ্ত, গ্রন্থাবলী।
৫. Bagol, J. C., Beginnings of modern Education in Bengal : women's Edin, appendix, 70
   দ্রঃ তদেব, বাংলার স্ত্রী শিক্ষা : বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ৮৫ সংখ্যক, (১৯৫০), ১।
৬. 'আমি বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।'
৭. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, (১) ৪৫ সংখ্যা
৮. দ্রঃ সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য' (১৯৩৪), ৫২।
৯. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি (১৮৫৬), ১২৬।
১০. অক্ষয়কুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১৬৩।
১১. অক্ষয়কুমার দত্ত, পূর্বে উল্লিখিত, ১৬৪।
১২. তদেব, ১২১।
১৩. তদেব,।
১৪. অক্ষয়কুমার, পূর্বে উল্লিখিত, ১২৭-১৩১।

লোকচিত্রের ভাষা

অজিতকুমার মিত্র

লোক সাহিত্য গাথা গীতিকা কথা কিংবদন্তীর মতই লোকচিত্রেরও ভাষা আছে। এই চিত্রগুলির প্রতি বাঙালী জীবনের মোহও কম নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতির পর্যালোচনা করলে লৌকিক চিত্রাংকন রীতির যে ধারা ও ধারণা প্রতিভাত হয়ে ওঠে তা ভাবতে গেলে বিস্ময়াভিভূত হতে হয়। নাচ গানে ভরা বাঙালী জীবনে মরমী শিল্পীমন লৌকিক চিত্র রচনার ক্ষেত্রেও যে তন্ময়তার সৃষ্টি করে তার তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কোন বিস্মৃতকাল হতে প্রবাহিত চিত্রাংকন ধারায় বাঙালী মননের বিভিন্ন অভিপ্রায় আশা আকাংক্ষা সুপ্তশয়ান রয়েছে।

বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি এবং প্রচলিত বিভিন্ন ক্রিয়া কাণ্ডে তেল সিন্দুরের ছবি, হলুদ বাঁটার সাংকেতিক চিহ্নাদি অংকন কখনও বা গৃহসজ্জার চিত্রাদির চিত্রণ করা হয়। পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের দুয়ারের চৌকাঠে ছবি আঁকবার প্রথা আছে। এই সব চিত্রগুলি বহুকাল থেকে একই ধারায় প্রচলিত। এমন কি একই রংয়ে একই চিত্রাদি চিত্রিত করার রীতি আছে। আভিচারিক ক্রিয়াকাণ্ডে মন্ত্রচর্য্যার সময় বিভিন্ন লৌকিক ছবি তেল কালিতে, কাজল কালিতে আঁকবার প্রথা এখনও গ্রাম বাঙলায় দেখা যায়। জলপূর্ণ মংগল কলসে তেল সিন্দুরে নানা প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করা হয়। ঘট বারিতে লোক দেবীকে আহ্বান করে ঐ ঘটে মনসা গাছের শাখার টুকরো বা আমের পল্লব দিয়ে নতুন লাল কাপড়ে বোঁমা সাজিয়ে দেবীর ঘটস্থাপন করা হয়। ঘটের গায়ে নানা রকম নক্সার সাথে একজড়া সাংকেতিক চিহ্ন অংকন করা হয়। এই চিহ্নকে অনেক গ্রামে 'পুতুলা' বলে। কোথাও কোথাও 'পুত্‌ভলা' ও বলে। খড়িমাটি দিয়ে সমস্ত ঘর নিকানোর পর আদিবাসীরা ঘরের বাইরে ও ভেতরে নানা রকম নক্সার সাথে গিরি পাথর ঘসার রং দিয়ে এই সাংকেতিক ছবি দুটি অংকন করে।

কি আদিবাসীর গৃহ সজ্জায় কি গ্রামের গৃহস্থের বিভিন্ন প্রকার লৌকিক চিত্রাংকনের সময় এমন কি কুল-বধূদের আলপনা দেওয়ার রীতিতে একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে একই মাপের দুটি ছাতার বাঁটের মত প্রান্ত বাঁকা ছোট লম্বা দাগ বাঁকা প্রান্ত দুটিকে সংলগ্ন করা হয়। তারপর ঐ লম্বা দাগের মাঝ খানে হাতের মত দু'পাশে দুটি করে দাগ দেওয়া হয়। ভেতরের দিকের বাহুর মত দাগ দুটি পরস্পর মিশে যায়। ঐ বাহু দুটি ডানার মত আবার সমগ্র ছবিকে মানুষ ভাবলে ঐ দাগ দুটিকে হাতের মত মনে হয়। ছবি দুটিকে জড়াজড়ি দুটি মানুষের মত কল্পনা করা অসমীচিন নয়। তেল সিন্দুরে, হলুদ বাঁটা, পিঠুলি বাঁটায়, লাল কাল রং এই ছবি অংকন করা হয়। আদিবাসীদের গৃহ সজ্জায় তো এই ছবিদুটি আঁকা থাকবেই। সাঁওতালরা তাদের পূজা উৎসবে নানা রকম চিত্রাংকনের মধ্যে এই ছবি আঁকতে ভোলে না। কিন্তু ছবি দুটির অর্থ কেউ বলতে পারে না। কোন্ বিস্মৃত কাল থেকে লোক প্রচলিত এই চিত্রাংকন ধারা আজও মানুষ বজায় রেখেছে। সমাজের পুরুষ পরম্পরায় যুগ থেকে যুগে এই সাংকেতিক চিত্রাংকন ধারা প্রবাহিত।

আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাও মহলী, মানা, ধাওর-কোঁড়া প্রভৃতি জাতির সমাজ জীবনে নানা প্রকার চিত্রাংকনের মাঝে এই সাংকেতিক চিহ্ন অবশ্যই আঁকা হবে। তাদের পূজার সময় এমন কি বলিদানের কাঠে তেল সিন্দুরে আঁকা থাকে এই যুগল চিহ্ন। ভূতুড়ে খ্যাওড়া ঝোঁপের শূন্য বেদীতে হলুদ বাঁটার এই ছবি তৈরী করা হয়। পণ্ডিতরা বলেন সন্তান ও শস্যের কামনা মানুষের আদিম আকাংখা। এই কামনাই সমাজ গঠনের জন্য প্রমোদিত করে। অন্তর্নিহিত আদিম কামনা মানুষের সভ্যতা সৃষ্টির মূল উৎস। এই আদিম চিত্রাংকন ধারা পর্যালোচনা করলে একথা অবিসম্বাদিত যে ঐ রেখাংকিত সাংকেতিক চিহ্ন দুটি নরনারীর। একটি পুরুষের প্রতি একটি নারীর টান আর একটি নারীর প্রতি একটি পুরুষের টান ঐ সাংকেতিক চিত্রাংকন ধারার মর্মকথা। দাম্পত্যই মানুষের আদিম কামনা। কোন আদিম কাল হতে এই ছবি আঁকা হয়। কাল হতে কালে এই সাংকেতিক চিহ্ন আকার রীতি প্রচলিত থেকে আদিম সমাজ হতে বিভিন্ন সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। তাই দাম্পত্যই মানুষের আদিম কামনা। সন্তান এই মিলনের পরিণাম মাত্র। সন্তানের কামনা মানুষের প্রথম বাসনা নয়। কেন না সম্ভোগ প্রক্রিয়া মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়। অসচেতন কোন অকস্মাৎ মুহূর্তে মানুষ সৃষ্টির তাগিদে হঠাৎ যৌনচরিতার্থতার আস্বাদন পায়। আর শস্যের আকাংখা এই দাম্পত্যকে অটুট রাখার উপায় মাত্র।

সাংকেতিক চিহ্ন দুটি যে আদিবাসী সমাজেই প্রথম উদ্ভাবিত হয় তার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। সাঁওতালী লোক পুরাণে পৃথিবীর জন্মের আদিতে দেখা যায় কেবল জল আর জল। মাটি ছিল না কোন জীবজন্তুও ছিল না। এমন কি মানুষের জন্মও হয় নি। দুটি সাদা হাঁস কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের পর সমুদ্র পেরিয়ে সাঁতার কেটে আসছিল। সর্বত্র কেবল জল আর জল। ভীত চকিত হাস দুটি প্রায় যেন পাগল হয়ে যায়। কেন না হাস হাঁসিল বিশ্রামের কোন স্থল পাচ্ছিল না। প্রলয় পয়োধি জলে যেন দুটী সাদা বিন্দু। এই বিন্দুই সৃষ্টির আদিম রহস্য। এই বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু যেন কল্লোলিত। প্রায় ক্লান্ত হয়ে এসেছে হাঁস হাঁসিল এমন সময় তারা মাটির সন্ধান পেল। সৃষ্টিকে রক্ষার তাগিদে মাটি জেগে উঠেছে। মাটির অস্তিত্ব পেয়ে জীবনের আনন্দ সূর্যের আলোয় আলোয় বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে। সেই আশ্রয় স্থলকে প্রণাম জানিয়ে বললে তারা—নোওা। অর্থাৎ আশ্রয় দাতা। তারপর হাস হাঁসিল বনে জংগলে আনন্দে লুটোপুটি করে বেড়াতে লাগলো। আনন্দের হুল্লোড় বয়ে যায়। তারা বাসা বাঁধে। এবার তারা সম্ভোগের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করলো হঠাৎ। নিবিড় আশ্রয়ে একটি ডিম পাড়লো হাঁসিল। ঐ ডিমটি থেকে দুটী মানুষ জন্মালো। একটী নর আর একটী নারী। অন্য সাঁওতালী লোক কথায় জানা যায়—চটরে মারাং রারা তাহাকানা। মারাং রারা পাতালার ডেবার ফেডো আই। উনজুথান মারাং রুরু দঃ দাকাইয়া। পৃথিবী জলে জলময় ছিল। মারাং রুরু আর মারাং রুরুর স্ত্রী ছাড়া এই পৃথিবীতে আর কেউ ছিল না। এই গল্পে ত একটি পুরুষ আর একটি নারী ছাড়া আর কেউ নেই। পৃথিবী শুধু জলময়। কিভাবে একটি থেকে দুটি হলো তার কথাই মানুষের আদিম কৌতুহল। লোক কথাগুলি এমনভাবে পরিকল্পিত যে বারে বারে একটি পুরুষ আর একটি নারীর কথাই শোনা যায়। পৃথিবী তো জলে জলময়। খাওয়া-দাওয়া ভুলে ঠাকুর কিন্তু ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। ঠাকরুণ খাবার নিয়ে বসে আছে। ঠাকুরের আর পাত্তা নেই। ঠাকরুণ আর

সহ্য করতে পারলো না। ক্রোধে ফেটে পড়লো। তাড়াতাড়ি এসে ঠাকুরের ঘুড্ডিটা দু' টুকরো করে দিলো। যেই না দু' টুকরো করা অমনি টুকরো দুটি গুড্ডু পাখী হয়ে আকাশে উড়ে বেড়াতে লাগলো। তারপর তাদের আশ্রয়ের জন্য ভগবানকে মাটি সৃষ্টি করতে হলো। গাছ-পালা বন-জংগল খাবার সব সৃষ্টি করতে হলো কত প্রক্রিয়ায়। তারপর গুড্ডু পাখী একটী ডিম পাড়লো। ঐ ডিম ফুটে জন্ম হলো পিলচু হারাম আর পিলচু বুড়ির। সেই দুটি মানুষের কথা। তাদের আবার সাত জোড়া ছেলেমেয়ে হলো। জোড়ায় জোড়ায় পৃথিবীতে সাতটি গোত্রের সূত্রপাত করলো ঐ ছেলেমেয়েরা—যথা হাঁসদা, মুর্মু, কিসকু, হেমব্রম, মাণ্ডি, সরেণ, টুডু।

মানুষের মিলিত হওয়ার বাসনা যে কত দুর্দমনীয় তা' কল্পনা করা যায় না। আদিবাসী লোক রচনায় এই মিলিত হওয়ার অনেক কথা কাহিনী গাথা গল্প প্রচুর ছড়িয়ে আছে। পিলচু হারাম পিলচু বুড়ির ছেলে আর মেয়েরা ভাই বোন, তবুও তাদের মিলন হলো। এছাড়া কোন উপায় ছিল না ঠাকুর মারাং রুরুর। কেন না এইভাবে তাকে মানুষ সৃষ্টি করতে হয়েছে। আর মিলিত থাকার জন্যে নানারকম গাছের শেকড় আর মহুয়ার নির্যাস দিয়ে মদ তৈরী করে সেই মদ খাওয়াতে হয়েছে তাদের। মদ না খেলে সম্ভোগের উন্মাদনা আসবে কি করে। মদ খেয়ে তারা হুল্লোড় করেছে :—

যুবকেরা যুবতীদের বলে :—

মুচকু মাকু দুংগু দুংগু দঃ।
বাপবারি লাতার ডের রিকু
দুংগু দুংগু দঃ॥

যুবতীরা আবার যুবকদের বলে :—

বুনম্ দানাং রেঃইয়া ঝিক্ দঃ।
তিননার ওরেজা ঝিক্ দঃ॥
লেরদা হসর রেইয়া ঝিক্ দঃ॥

হৈহুল্লোড় আরম্ভ হলো। গানের হুল্লোড়ে বনের পাখীরা কলরব করতে করতে উড়ে উড়ে বেড়াতে লাগলো। শ্বাপদ জন্তুরা ভয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানে পালাতে থাকে। একটি পুরুষ আর একটি নারীর মিলনের অপূর্ব গাথা সঞ্চিত হয়।

হিন্দুদের পুরুষ প্রকৃতির কথা সর্বজন বিদিত। এখানে হরহরি এক দেহে অর্ধনারীশ্বর। হরগৌরী কি আদিম বাসনার চিরন্তন মিলনের শাশ্বত রূপ নয়। আমাদের সাহিত্য এবং ধর্ম কথায় দু'জনের মিলিত থাকা একাকার হয়ে আছে। আদম আর ইভ তো চিরকাল মিলিত থাকতে চেয়েছিল। নিষিদ্ধ ফলের কাথ জারিয়ে আরক হয় কিন্তু। সেই নিষিদ্ধ ফলের নির্যাসে কি নেশা। কি অনুতাপ মানুষের। নিষিদ্ধ ফলের নির্যাস খেয়ে মানুষ কামের জ্বালায় অস্থির হয়ে গেছে। সে কি যন্ত্রণা। তারই জ্বালা ছুটে বেড়াচ্ছে আকাশে-অন্তরীক্ষে, জলে স্থলে এমন কি পাতালে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় শিশুদের মধ্যে পুতুল তৈরীর প্রবণতা রয়েছে। একটি বৌ আর একটি স্বামী তৈরী করবার জন্য শিশুরা উন্মুখ। তারা সাধারণতঃ মাটি দিয়ে পুতুল তৈরী করে। ন্যাকড়ার পুটলী দিয়েও পুতুল তৈরী করার রীতি প্রচলিত। গৃহ সজ্জার ছবিতে, আলপনায়,

দেবস্থানের মাংগলিক চিহ্ন ঘটে, পটে হাঁড়িতে মংগল কলসে আঁকা সাংকেতিক চিহ্ন ছুটি যদি নর-নারীর ছবি হয় তা' হলে একথা একথা বিশেষ ভাবে বলা যায় যে শিশুদের পুতুল খেলায় তারা এক রকমের পুতুল তৈরী করে যা' দেখলে ঐ সাংকেতির চিহ্ন ছুটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অমনি বাঁকা বাঁকা হাত আর পুতুল ছুটির মুখ সামনে দিকে ঈষৎ বাঁকানো। বুক আর পুতুলের শেষ প্রান্ত এক রকমই। পা' ছুটি নেই। কোমরের নীচে থেকে পায়ের অংশ সরু হয়ে পায়ের পাতার অংশ বেশ মোটা। দাঁড় করিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে যায়। পুতুল ছুটি বসানো থাকলে আলোচ্য ছবির মত মনে হয়। অনেক সময় ন্যাকড়া দিয়ে তৈরী পুতুলের আকৃতিও শিশুরা ঐ ছবির মত তৈরী করে। পুতুল তৈরীর পুরোনো ধারা এখনও শাশ্বত শিশুমনে বেঁচে আছে। এই ধারা হয়তো ঐ চিত্রাংকন ধারার সাথে একই উৎস থেকে উদ্ভূত। এ কথা চিন্তা করা অসমীচিন নয়। মানুষের মিলিত থাকার ইচ্ছা আদিম কালেই চিত্রে, ভাস্কর্য্যে প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তার মূল্যে কিন্তু লৌকিক প্রেরণা প্রমোদনা সৃষ্টি করে তা' এই চিত্রাংকন রীতি আলেচনা করলে বিশেষ ভাবে জানতে পারা যায়।

বাঙালী জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে তাই আদিম বাসনা একত্র থাকার। একটি পুরুষ আর একটি নারী পরস্পরকে চেয়েছিল প্রথম কোন বিস্তৃত অতীতে। ছু'জনেই পরস্পরকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল একান্ত বিস্ময়ে। এত বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার পৃথিবীতে আর কিছু নেই। পুরুষ নারীকে খুঁজে বের করেছিল বৈজ্ঞানিক মননশীলতায় ভাল লেগেছিল তাই ভালোবেসেছিল। মনুষ্য জাতির বিবর্তনের ইতিহাস তাই এই ছু'জনের ইতিহাস। ঈশ্বর এক থেকে নাকি বহু হয়েছিল। কিন্তু এক থেকে ছুই না হলে বহু হওয়া যায় না। তাই তিনি এক থেকে ছুই হয়েছিলেন। এই ছু'জনই বহু জন হয়ে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়। লোকচিত্রের রেখায় রেখায় তাই এই ছু'জনের ছবি তাদের লৌকিক জীবনে অক্ষয় হয়ে আছে এখনও তার ব্যত্যয় দেখা যায় না।

মলিয়ের ও বাংলা নাটক

জগন্নাথ ঘোষ

শুধু ফরাসী নাট্যসাহিত্যে নয় বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে মলিয়ের (১৬২২-১৬৭৩) একটি উজ্জ্বল নাম। ফরাসী রঙ্গালয়ে তাঁর আবির্ভাব নাট্যকার ও প্রযোজক রূপে। বলতে দ্বিধা নেই ফরাসী রঙ্গালয়কে তিনিই জনপ্রিয় করে তোলেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মলিয়ের ফরাসী রঙ্গালয়ের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন। যৌবনেই তিনি স্বদেশে অপমানিত হয়ে বিভিন্ন প্রদেশে নিজস্ব একটি থিয়েটার গড়ে অভিনয় করে বেড়াতেন। ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মলিয়ের-এর জীবন এইভাবে কাটে। অবশেষে তিনি দেশে ফিরে আসেন। তখন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই তাঁকে রাজন্যবর্গের সম্মুখে অভিনয় করার উপর অনুমতি দান করেন। রঙ্গালয়ের গরুড় ক্ষুধা মেটাবার জন্য মলিয়ের নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় মলিয়ের-এর আসল নাম Jean Baptista Poquelie' থিয়েটারী নাম মলিয়ের।

মলিয়ের যাবতীয় নাট্যরচনাই কমেডি। তাঁর কমেডিগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে তৎকালীন সমাজের অসংগতি ভণ্ডামি, অজ্ঞানতাও অন্ধকুসংস্কার। এক কথায় সামাজিক অন্যায় ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে মলিয়ের-এর সোচ্চার বিদ্রোহ তাঁর কমেডিগুলো।

উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বাংলা নাট্যসাহিত্য নব নব সৃষ্টির সম্ভারে ভরে উঠতে লাগল তখন সেখানেও সামাজিক ভণ্ডামি, ব্যাভিচার কুসংস্কার অজ্ঞানতার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ পুনঃপুনঃ ঘোষিত হতে থাকল। বাংলা প্রহসনগুলোর পুঁজি ছিল ওই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ। প্রহসনকারেরা উনবিংশ শতকের উত্তাল মুহূর্তে দাঁড়িয়েও সপ্তদশ শতকের ফরাসী প্রহসনকার মলিয়েরের কথা স্মরণে না এনে পারেন নি।

কাগজে কলমে বাংলা প্রহসনে মলিয়েরের উপস্থিতি বোধহয় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ। ঐ বছর প্রকাশিত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এই প্রহসনখানি মলিয়েরের তারত্যুফ (Tartuffe) প্রহসনের দ্বারা প্রভাবিত। অবশ্য ডঃ অজিতকুমার ঘোষ এই প্রভাবের কথা স্বীকার করেন না। (১) তবে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁর উপর 'তারত্যুফের' প্রভাব একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মলিয়ের বাংলা নাট্যসাহিত্যে আপন আসন পাকা করে নিলেও নাট্যমোদী—বাঙালী মলিয়েরের নাম তারও ৭৫ বছর পূর্বেই শুনেছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে হেরাসীম লেবেডফ তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দুখানি ইংরেজী নাটকের বঙ্গানুবাদ করেন। এই দুখানি নাটকের নাম 'ডিজগাইজ' এবং লাভ ইজদি বেকট ডকটর। শেষোক্ত খানির অভিনয়ের খবর পাওয়া না গেলেও একথা জানা গেছে যে এখানি মূলতঃ মলিয়েরের লা আমোর মেদিসিন নামক প্রহসনের ইংরেজী অনুবাদ। অবশ্য একথা লেবেডফ উল্লেখ করেন নি।(২) তবে উল্লেখ না করাটাই বড় কথা নয়। লেবেডফ তাঁর বাংলা শিক্ষক গোলকনাথ দাসের সহায়তায় 'ডিস্‌গাইজ' ও 'লাভ ইজ দি

বেষ্ট ডক্টরের বাংলা অনুবাদ করেন। 'লাভ ইজ দি বেষ্ট ডক্টরের' বঙ্গানুবাদটি পাওয়া যায়নি। ১১২ বছর পরে এই নাটকটির দ্বিতীয়বার অনুবাদ হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের হাতে। তিনি তাঁর অনুবাদের নাম দেন 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' (১৯০৭)। গিরিশচন্দ্রের এই অনুবাদ সম্পর্কে ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'মলিয়ের-এর কমেডির মূল কাহিনী গিরিশ ধরেছেন, Sganarel (সম্পত্তির ভয়ে কন্যা বিবাহদানে ভীত পিতা), Lucinda (নায়িকা) ও Lysetta (পরিচারিকা ও নায়িকার সখী এবং Physicians চরিত্রগুলির ভাব গিরিশের প্রহসনে মোটামুটি বজায় আছে। তবে মলিয়রের নাটকে কোন গরব প্রণয়ী মানিক নেই, নৃত্যগীত বিশেষ নেই। গিরিশচন্দ্র মলিয়রের সংযত কটাক্ষ বাকচাতুর্য কিছু ফোটেনি।"

গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'র জনপ্রিয়তা আজও হ্রাস পায়নি। এই ১৯৭৩ সালেও এই প্রহসনটি সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখা। বলতে দ্বিধা নেই, 'য্যায়সা কা ত্যায়সা'র জনপ্রিয়তা প্রকারান্তরে মলিয়েরেরই জনপ্রিয়তাকেই প্রমাণিত করে।

নাট্যকার দীনবন্ধুর উপর মলিয়েরের প্রভাব আছে কিনা, সে বিষয়ে প্রত্যক্ষভাবে কিছু জানা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রহসন রচনা করার মানসিকতা মলিয়ের ও দীনবন্ধু মিত্রের সমান ছিল।৪

বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়েরকে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর দুখানা বিশিষ্ট প্রহসন 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪) এবং 'দায়ে পড়ে দার গ্রহ' (১৯০২)। 'হঠাৎ নবাব' মলিয়েরের Le Burgeois Gentil homme এর অনুবাদ। Le Burgeois Gentil homme একখানি musical comedy। এটি রচিত হয় ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই এর নির্দেশে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই প্রহসনটি অনুবাদের সময় ফরাসী প্রহসনটির চরিত্রগুলির নামের ধ্বনি সংগতি রক্ষা করেছেন। Jourolian, Cleonte, Lucile, Coviclle প্রভৃতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের হাতে হয়েছে যথাক্রমে জুর্দন খাঁ, রোষনী, কবলু খাঁ। এমন কি মলিয়েরের প্রহসনের অঙ্ক বিভাগ প্রণালী ও গান সন্নিবেশের কৌশলও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হুবহু গ্রহণ করেছেন।

মলিয়েরের মারিয়াজ ফোর্সে অবলম্বনে রচিত হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দায়ে পড়ে দার গ্রহ'। 'দায়ে পড়ে দার গ্রহে' ফরাসী প্রহসনের নাম চরিত্রগুলির পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়া ন্যায়রত্ন ও বেদান্তবাগীশ এই দুইজন টুলো পণ্ডিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনে নতুন আমদানী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অলীকবাবু মলিয়েরের অনুসরণে রচিত না হলেও মলিয়েরের নাট্যাদর্শে যে রচিত তাতে দ্বিমত থাকার কথা নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পর যেসব নাট্যকার ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মলিয়েরের প্রহসনের অনুবাদ এবং ছায়া অবলম্বনে নাট্যরচনায় লিপ্ত ছিলেন তাঁরা হলেন গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু, অতুলকৃষ্ণ মিত্র। গিরিশচন্দ্রের 'য্যায়সা কি ত্যায়সা'র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। রসরাজ অমৃতলাল বসু মলিয়েরের L' E'cole desfemmes (The School for wives) ও L' Avare (The Miser) এই দুখানি প্রহসনের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন যথাক্রমে 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১৮৭৬) ও 'কৃপণের ধন' (১৯০০)। অবশ্য কৃপণের ধনে শেক্সপীয়রের মারচ্যান্ট অব ভেনিসের প্রভাবও রয়েছে।

'চোরের উপর বাটপাড়ি' সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন 'প্রহসন খানার ঘটনার সমস্ত জটিলতা এবং রুচি-গর্হিতি, পাশ্চাত্য প্রহসন বিশেষ করিয়া মলিয়েরের প্রহসনের সম্ভাব্য প্রভাব মনে করাইয়া দেয়। আলোচ্য প্রহসনের মধ্যে কৌতুকের চমৎকারিত্ব এইখানে যে, নারায়ণ অঘোরের কাছে 'রসোদগার' করিয়াছে, অথচ অঘোর তাহাকে ধরিতে যাইয়া প্রতিবারই ব্যর্থ এবং বেয়াকুব হইয়াছে। মলিয়েরের The School for wives (L' E'cole desfemmes) প্রহসনে ঠিক এইরূপ একটি ব্যাপার আছে।'৫

'কৃপণের ধন' প্রহসনে মলিয়েরের প্রহসনের প্রভাব সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 'কৃপণের ধন' মলিয়েরের 'The Miser (L' Avare) নামক প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত। মলিয়েরের প্রহসনে Harpagon এর কার্পণ্য-দোষের সহিত তাহার ইন্দ্রিয় পরায়ণতা দেখানো এবং পরস্পর সংযুক্ত জটিল প্রেম কাহিনীও সেই সঙ্গে রহিয়াছে। কৃপণের ধন এও হলধরের কার্পণ্য এবং নারী সম্পর্কিত দুর্বলতা এইপ্রকার দোষ বিদ্যমান এবং মন্মথ ও কুন্তলার প্রণয় ব্যাপার হলধরের কাহিনীর সহিত যুক্ত হইয়াছে।'৬

গিরিশযুগের অন্যতম স্মরণীয় নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্রের 'তুফানী' (১৯০৮) 'প্রাণের টান' (১৯১২) প্রহসন দুখানি যথাক্রমে মলিয়েরের L' E'tourdi প্রহসনটির Mascarille চরিত্রটিই অতুলকৃষ্ণকে তাঁর তুফানী চরিত্র আঁকতে অনুপ্রাণিত করে। তুফানীও একজন সুদক্ষ ভৃত্য।

'প্রাণের টান' প্রহসনের ভূমিকায় অতুলকৃষ্ণ লিখেছেন, 'সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার (Moliére) মোলেয়ারের (Le D'epit Amoveess or Lover's quarrels) নাটিকার ছায়া অবলম্বনে রচিত।' 'প্রাণের টান' এ লম্বোদর ও কৃশাঙ্গ নামে দুটি ভৃত্য চরিত্র আঁকা হয়েছে। বলাবাহুল্য, তুফানী রচনার পর অতুলকৃষ্ণ যতগুলি প্রহসন লিখেছেন, প্রায় সবগুলিতেই তুফানীর মত ভৃত্যজাতীয় চরিত্র লক্ষিত হয়। প্রকারান্তরে এ চরিত্রগুলি মলিয়ারের প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়। রংরাজ-এর (১৯০৯) রংরাজ, ঠিকে ভুল-এর (১৯১০) সমরু, প্রভৃতি চরিত্র এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অতুলকৃষ্ণ উল্লেখ না করলেও আমাদের জানতে বাকি থাকে না যে, তাঁর দমবাজ (১৯০৮) নাট্যরঙ্গটি মলিয়েরের তার্তুফ এর ভাবানুসরণে রচিত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রহসনগুলিতে অগ্রাধিকার পেয়েছে নব্যহিন্দু, ব্রাহ্ম, গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত, বিলাতফেরত, স্ত্রীশিক্ষার বাড়াবাড়ি প্রভৃতি। এই প্রহসনগুলি রচনায় প্রত্যক্ষভাবে নাট্যকার যার কাছ থেকেই সাহায্য পান বা প্রভাবিত হোন না কেন, মলিয়েরের প্রভাব যে সেখানে লুকিয়ে আছে, সে কথা স্বীকার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে মলিয়েরের প্রভাবের কথা জানা না গেলেও রবীন্দ্র পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে কম বেশি মলিয়েরের প্রভাব চোখে পড়ে।

প্রমথনাথ বিশীর প্রহসনে হাস্যকৌতুকের সংগে মিশে আছে অপূর্ব প্রণয়মাধুর্য। বলাবাহুল্য এই আদর্শ মলিয়েরের আদর্শকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তার 'ঋণং কৃত্বা' ও ঘৃতং পিবেৎ এই দুখানি প্রহসন আলোচনা করলে তা জানা যাবে। 'ঋণং কৃত্বা'য় প্রধান ঘটনা সনৎকুমারের ঋণ শোধ স্কুল প্রতিষ্ঠা এবং সেই স্কুলে মহাজনের ঋণ পরিশোধ না করার শিক্ষাদান। কিন্তু প্রহসনটিতে এই ঘটনাই

প্রাধান্য পায়নি। পেয়েছে সনৎ মঞ্জরী ও ললিত-মণিকার প্রণয় ঘটিত সমস্যায় জটিলতা, এই জটিল সমস্যার সমাধানে প্রহসনটির সমাপ্তি ঘটেছে। মলিয়ের তাঁর নাটকেও এইরকম যুগল চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের ক্রিয়াকলাপ ও বাগজালবিস্তারের দ্বারা কৌতুক রস পরিবেশন করেছেন। প্রমথনাথও মলিয়েরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর প্রথম প্রহসন 'ঋণং কৃত্বা' রচনা করেছেন। ঋণং কৃত্বার পরবর্তী প্রহসন 'ঘৃতং পিবেৎ'। এই প্রহসনটি মলিয়েরের The cit Turned gentleman' প্রহসনটির আদর্শে রচিত। মলিয়েরের প্রহসনে যেমন রয়েছে ঘটনার সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্য প্রমথনাথের 'ঘৃতং পিবেৎ' এও অনুরূপ পরিবেশ রচিত হয়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রহসনে (ভাড়াটে চাই, বারোভূতে) লক্ষিত হবে তীক্ষ্ণ শাণিত সংলাপ, জটিল কৌতুককর পরিবেশ সৃষ্টি। কোন প্রসঙ্গের আকস্মিক উত্থাপন প্রভৃতি। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের সংগে বিশেষভাবে পরিচিত এই নাট্যকার যে মলিয়েরের নাট্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিককালে 'এপিক' নাট্যগোষ্ঠী মলিয়েরের বিখ্যাত প্রহসন 'তার্ত্যুফ এর বঙ্গানুবাদ 'মহাত্মা' অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। উক্ত অনুবাদটি করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য। সপ্তদশ শতকের ফ্রান্সের ধর্মীয় ভণ্ডামিকে আক্রমণ করার জন্য মলিয়ের রচনা করেছিলেন 'তার্ত্যুফ। তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্য বকধার্মিকতা, গির্জা বা ধর্ম নয়। লোকনাথের 'মহাত্মায়' এই বকধার্মিকতাকেই আক্রমণ করা হয়েছে। 'মহাত্মা' সম্পর্কে অভিনয় পত্রিকার (ডিসেম্বর ১৯৭১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২) মন্তব্যটি স্মরণীয় 'স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী লোকনাথ ভট্টাচার্য অনূদিত এ-নাটিকাটি তার তিন শতাব্দী পূর্বেকার কাব্যকায়াটি হারিয়েছে বটে কিন্তু তার কাব্যিক মেজাজ ও Commedia dell arte এর স্টাইলটি মলিয়ের নির্ধারিত মসৃণতা নিয়ে, বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সাজ পরে উপস্থিত হয়েছে।'

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে মলিয়ের একটি স্মরণীয় নাম। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আজ পর্যন্ত বাঙালী মলিয়েরকে ভুলতে পারে নি। বোধহয় কোনদিন পারবেও না। কারণ বাঙালী মানসিকতার সংগে মলিয়েরের মনোধর্মের মিল আছে। এই মিলকে খুঁজে পেয়েছিলেন হেরাসীম লেবেডফ এবং তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষক গোলকনাথ দাস। লেবেডফের পর বিভিন্ন যুগের স্মরণীয় বাঙালী নাট্যকারগণ প্রহসন রচনায় নাটকে রঙ্গব্যঙ্গ পরিবেশনকালে বারবার মলিয়েরের দ্বারস্থ হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র শেকসপীয়রকে ভুললেও মলিয়েরকে কোনওদিন ভুলবে না। এই মলিয়েরের প্রতিসম্মান প্রদর্শন শুধু তার নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে করা হলেও বাংলা ভাষায় তাঁর যাবতীয় রচনার অনুবাদ হওয়া উচিত। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়েরের প্রভাব এবং অবদান সম্পর্কেও বিস্তৃত গবেষণা হওয়া দরকার। এই দরকারী কথাটাকে বাঙালীর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে।

১. মাইকেল মলিয়ের হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। (বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। ৫ম সংস্করণ ১৯৭০, পৃষ্ঠা ১০১—১০২)

২. 'ফরাসী নাট্যকার মলোয়ারের 'লাভ আমোর মেডিসিন' নামক একটি প্রহসন আছে। Love is the Best Doctor তাহার ইংরেজি অনুবাদ হওয়া অসম্ভব নহে।' পৃঃ ৫৫০।

৩. গিরিশ রচনাবলী (১ম) গিরিশচন্দ্র ঘোষ: সাহিত্য সাধনা পৃঃ ৬৯—৭০। সাহিত্যসম্পাদ।

৪. ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়েরের আদর্শ নায়ক হয়তো অ্যালসেসাটিস। যে পৃথিবীকে ও মানবসমাজকে অকৃত্রিম অকপট ও পরিশোধিত দেখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু যাহারা কৃত্রিম ভণ্ড, অমুদার তাহাদের নিয়াই মলিয়েরের চিত্ত উল্লসিত থাকিত। আমাদের দীনবন্ধু যখন কোন আদর্শ সৎ ও মহৎ চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াছেন তখন তাহার মন সায় দিয়াছে বটে, কিন্তু চিত্ত সাড়া দেয় নাই। কিন্তু যখন জলধর নিমচাঁদ, রাজমাণিক্য কেনারাম, রজীব, বগলা, বিন্দুবাসিনী প্রভৃতি তাঁহার নাটকের আসরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাদের সহিত মিশিয়া বিচিত্র রঙ্গরসে জমিয়া গিয়াছেন।' (বাংলা নাটকের ইতিহাস ডঃ অজিতকুমার ঘোষ পৃঃ ১০৫)।

৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস: ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৬—৪৭)।

৬. বাংলা নাটকের ইতিহাস: ডঃ অজিতকুমার ঘোষ। পৃঃ ২৪৮

৭. Mascritta the comic servent of L' Etowide—Molicre's ownpart is a real creation—A History of Western Literature: J. M. Coten Page—185.

৮. সমাজ বিভ্রাট ও কল্কি অবতার (১৮৯৫), বিরহ (১৮৯৭) পরিবার (১৯০০) ত্র্যহস্পর্শ বা সুখী। প্রায়শ্চিত্ত (১৯০২) পুনর্জন্ম (১৯১১) এবং আনন্দ বিদায় (১৯১২)।

রামকৃষ্ণ কাব্যের উপেক্ষিত

হরতোষ চক্রবর্তী

যুগাবতার রামকৃষ্ণ। মানবজীবনের চরমতম এবং পরমতম উৎকর্ষের প্রতীক। যুগান্তকারী তাঁর ধীমান শিষ্য বিবেকানন্দ—তেজে, বীর্যে, দীপ্ত, অনন্ত। এই দুই অত্যুজ্জ্বল আলোর চোখ ধাঁধানো ছটায়, পাদপ্রদীপের তলায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার মতো, লোকদৃষ্টির বাইরে অবহেলিত, বিস্মৃতির পথে অবলুপ্ত হ'তে চলেছেন একজন, যাঁর মহামানবত্বের দাবী নেই, দোষে গুণে যিনি সাধারণ মানুষের অনেকটা নাগালের মধ্যে, অথচ যাঁকে ছাড়া রামকৃষ্ণ কাব্য রূপায়ণ হয়তো কোনোদিনই সম্ভব হ'তো না। রামকৃষ্ণ-আলো মাথায় নিয়ে দিকে দিকে তার জ্যোতি ছড়িয়েছেন বিবেকানন্দ। তাঁকে যদি বলি লাইটহাউস্, তাহ'লে যে কঠিন অথচ স্বচ্ছ আবরণ এই আলোকে বুক দিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছে বাইরের শত ঝঞ্ঝা থেকে, তার সাথে তুলনা করতে হয় মথুরানাথ বিশ্বাসের।

কিন্তু ছুৎ-মার্গী মন আমাদের খুঁত খুঁত করে। মথুরানাথ বিলাস-ব্যসনাসক্ত, মথুরানাথ অত্যাচারী জমিদার, মথুরানাথ অনিন্দ্য-চরিত্র নন। তাই, রামকৃষ্ণ মহিমা কীর্তনে তাঁর ছোঁয়াচ, যতটা সম্ভব, বাঁচিয়ে চলা দরকার, পাছে, ঐ কলঙ্কের দাগ ঠাকুরের গায়ে লাগে। নেহাৎ রামকৃষ্ণ জীবনী রচনায় তাঁর অনুল্লেখ সম্ভব নয়, তাই, রসদদার হিসাবে কোনো রকমে তাঁর পরিচয় দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়া, রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তাঁর ইষ্টদর্শন হয়েছিল, এটা ঠাকুরের মুখ থেকেই শোনা গেছে বটে, তবে এই অহৈতুকী কৃপার কারণও তো ঠাকুরই নিজে মুখে বলে গেছেন: মথুর কি আর সাধে এত যত্ন আত্তি করত? মা এই যোগটার মধ্যে তাকে অনেক কিছু দেখিয়েছিলেন। সুতরাং মথুরানাথ যে ঠাকুরের রসদ-দার নির্বাচিত হয়েছিলেন এই তাঁর পরম ভাগ্য। তাঁকে নিয়ে আর বিস্তৃত আলোচনার দরকার নেই।

মহাপুরুষ-উক্তি বোঝা সহজ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন তাঁকে 'বকলমা' দেওয়ার কথা বলেছিলেন, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন গিরীশচন্দ্র, ভেবেছিলেন—বাঁচলাম। পরে টের পেয়েছিলেন ঐ আপাতসহজ 'বকলমা' কথাটি কতো কঠিন। রামকৃষ্ণদেব হয়তো মথুরের উল্লেখ করে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন: "মথুর আমার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিল। তোমরা চেষ্টা করলে তোমরাও পারবে। আমাকে যে মানুষটি দেখছ, আমি শুধু সেই রক্তমাংসের মানুষটি-ই নই। আমার স্বরূপ সত্তা অনেক বড়ো।" মথুর যাকে তাঁকে যত্ন করে, সেই জন্যেই মা তাকে অমন দেখিয়েছিলেন—' রামকৃষ্ণদেবের কথার এই অর্থ নিশ্চয়ই ছিল না। সাধারণ সাধকের সম্মোহন বিদ্যাপ্রয়োগে বশীকরণের মতো, অলৌকিক দর্শন করিয়ে নিজের রসদ-দার যোগাড় করা, বা তাঁর নিজের আকর্ষণ বজায় রাখার মতো হীন বুদ্ধি ঐ দেবসদৃশ পুরুষের থাকতেই পারে না।

রামকৃষ্ণদেহে নিজ ইষ্ট দর্শনে, মথুরানাথের যে তাঁর উপরে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বেড়ে গিয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্তরের প্রস্তুতি কি তাঁর আগে থেকেই ছিল না? কি ছিল সেদিন সেই উনিশ বছরের গেঁয়ো, আধ-পাগলা ছেলেটি, যেদিন তাঁর দাদা তাঁকে হাত ধরে

আনলেন গ্রাম থেকে কলকাতায়, আখেরের বন্দোবস্ত করতে ? কে পাত্তা দিয়েছিল সেই অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তানকে চালকলা যোগাড়ের বিদ্যাও ছিল না যাঁর ভাঁড়ারে ? অথচ তাঁকে দেখেই মথুরানাথের —এবং একমাত্র মথুরানাথেরই—মনে হলো, 'এই সেই আধার, যিনি পারেন পাষাণ প্রতিমায় প্রাণ সঞ্চার করতে।' এ অন্তর্দৃষ্টি কি সহজ তপস্যার ফল ? এ সেই অন্তর্দৃষ্টি, যার বলে তিনি ধরতে পেরেছিলেন রামকৃষ্ণদেবের প্রকৃত অবস্থা, যখন মহিম্ন স্তোত্র পড়তে গিয়ে তিনি শিবের কাঁধে চড়ে বসেছিলেন, শ্যামা মাকে ভোগ নিবেদন করতে গিয়ে ভোগ তুলে দিয়েছিলেন নিজের-ই মুখে, বুঝেছিলেন, ভাবমুখে ভক্ত ও ভগবান এক হয়ে গেছেন, বাঘের মতো দাঁড়িয়ে থেকে রক্ষা করেছিলেন ভাবোন্মাদ সাধককে তথাকথিত পণ্ডিত ও আচার-বিচার-ধর্মী শাস্ত্রের ধ্বজাধারীদের অত্যাচার থেকে।

'কৃপা অহৈতুকী', এ কথাটি বৈষ্ণবীয় বিনয়ের। যিনি কৃপা লাভ করেন তাঁর অহং বুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়। তাই তাঁর মনে হয়, যে কৃপা পেলাম আমি তার যোগ্য নই। সত্যিই যদি কৃপা অহৈতুকী হতো, তাহলে ভগবান পক্ষপাতদুষ্ট হতেন, কৃপার যোগ্য হলে তবেই কৃপালাভ সম্ভব। যদি বলা যায়, কৃপার বাতাস সব সময়ই বইছে, তাহলেও সে কৃপার সাহায্য পেতে, পাল তুলে দিতে হয়। মথুরানাথের নৌকায় নিশ্চয় সে পাল তোলা ছিল।

বিষয়ীর ছায়া পর্যন্ত যাঁর সহ্য হয় না, সেই ঠাকুর দীর্ঘ এক যুগ কাটিয়ে দিলেন এমন একজনের আশ্রয়ে, জমিদারীর প্রয়োজনে যাঁকে নরহত্যা পর্যন্ত করাতে হয়। কাম কাঞ্চন-ভোগীর স্পর্শে যাঁর দেহে জ্বালা ধরে যেত, তিনি কিনা মথুরানাথের মতো কামী পুরুষের সাথে কাটালেন দিনের পর দিন শুধু একই ঘরে নয়, অনেক সময় এক শয্যায়ও। স্বামী-চরিত্রে সন্দিহান জগদম্বা রামকৃষ্ণদেবকে পাঠালেন স্বামীর সাথে পাহারা হিসাবে তার সান্ধ্য ভ্রমণকালে। মথুরানাথ দিব্যি তাঁকে নিয়ে যথা স্থানে গেলেন, বসিয়ে রাখলেন তাঁকে নীচের এক কুঠরিতে, আবার খানিক বাদে নেমে এসে তাঁকে নিয়ে ফিরলেন বাড়িতে। অথচ এহেন ব্যক্তির সাথে একই ফীটনে ফিরতে রামকৃষ্ণদেবের গায়ে ফোস্কা পড়ল না। কি এর রহস্য ? ঠাকুর কি আশ্রয় চ্যুতির ভয়ে চুপ করে ছিলেন, নাকি কামাকাঞ্চন-সেবীর স্পর্শে তাঁর যে দৈহিকবিকার পর্যন্ত দেখা দিত, সেটা নেহাৎ-ই ভাণ ?

ঈশ্বর ভাবগ্রাহী। আধ্যাত্মিক জগতে দৈহিক আচরণের চেয়ে অনেক বড়ো, অন্তরের ভাব। গীতায় আছে—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

'অতি দুরাচারীও যদি অনন্য চিত্তে আমার ভজনা করে, তাকে সাধু ব'লেই জানবে, কারণ তার সংকল্প অতি সাধু।'

পরিষ্কার বোঝা যায়, মথুরানাথ যত অনাচারী-ই হোন, তিনি সত্য-সংকল্প ছিলেন। মনকে চোখ ঠেরে, লোকচক্ষুর আড়ালে পাপে প্রবৃত্ত হ'য়ে লোকসমাজে সাধুর মুখোশ প'রে ঘুরে বেড়াবার মতো শঠতা তাঁর ছিল না। রামকৃষ্ণদেব যে স্বয়ং ঈশ্বর, এ বোধ তাঁর দৃঢ় ছিল। লোকচক্ষু এড়ানো যায়, ভগবানের চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যায় না। 'তুমি জানো আমি কি। রাখতে হয় রাখো, মারতে হয় মারো, দরকার হয়, বদলে নাও'—বুঝতে কষ্ট হয় না, এই ছিল মথুরানাথের অন্তরের ভাব।

আর তাঁর এই অনন্ত ভক্তিতেই বাঁধা পড়েছিলেন ঠাকুর।

অন্তরে যে ভক্ত, নিজের কল্যাণের দিকে সে কখনো তাকায় না। ইষ্টের সুখ-স্বচ্ছন্দ তার কাছে তার নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চেয়ে অনেক বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়। গোপিনীরা তাই কৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করবেন জেনে তাঁর মস্তকে পদধূলি দিতে কুণ্ঠিতা হন নি। কুণ্ঠিত হন নি মথুরানাথও। তাঁর যখন মনে হ'লো, 'বাবার অখণ্ড ব্রহ্মচর্যের ফলে হয়তো বাবার মাথা খারাপ হ'তে চলেছে, ব্রহ্মচর্য নষ্ট হ'লে হয়তো তিনি স্বাভাবিক হ'তে পারেন', তখন-ই বিনা দ্বিধায় তাঁকে নিয়ে গেলেন বেশ্যালয়ে। একবারও নিজের ভালো-মন্দের কথা ভাবলেন না, চিন্তাও করলেন না, অবতার সদৃশ মহাপুরুষের নৈতিক অধঃপতনের কারণ হ'লে তিনি নিজে সবংশে ধ্বংস হ'তে পারেন। এমন সুদুর্লভ ভাবের অধিকারী যিনি, দেহে মনে যিনি এমন সত্যনিষ্ঠ, শতবার পাঁকে ডুবলেও পাঁকাল মাছের মতোই তিনি থাকেন পাঁক মুক্ত। তাই তাঁর স্পর্শে কালুষ্যবোধ হয় নি পরমপুরুষের।

এমন ইঙ্গিতও করা হয় যে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর থেকে মথুরানাথের প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে যায়, রাণী রাসমণির জমিদারীতে তিনিই হ'য়ে ওঠেন সর্বেসর্বা, আর তাই ঠাকুরের উপর তাঁর শ্রদ্ধাভক্তি বেড়ে যায়। যারা অর্থলোভী তারা স্বভাবতঃই অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হয়, সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ যতই হোক না কেন। মথুরানাথের বেলায় কিন্তু দেখা যায় উল্টো। রামকৃষ্ণদেবের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় ক'রেছেন তিনি। মধুর ভাবের সাধনায় যখন রামকৃষ্ণদেব মগ্ন, কিনে দিয়েছেন মহামূল্য শাড়ী, অলঙ্কার, তীর্থ যাত্রায় তখনকার দিনে খরচ করেছেন পঁচাশী হাজার টাকা। একবার মাত্র তিনি প্রতিবাদ ক'রেছিলেন। কাশী যাবার পথে বৈদ্যনাথের কাছে বহু দুঃস্থ লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থার জন্য যখন ধ'রে বসলেন ঠাকুর, মথুরানাথ ব'লে ফেলেছিলেন: 'বাবা, তুমি তো সংসারী লোক নও টাকার কদর বোঝো না। তীর্থ যাত্রায় অনেক টাকার দরকার।' কিন্তু যে-ই রামকৃষ্ণদেবে'র 'যা শালা, আমি তোর কাশী যাব না, এখানে এদের মাঝেই থাকব' বলে, বেঁকে ব'সলেন, অমনি ঠাকুরের ইচ্ছা পূরণে লেগে গেলেন। এর থেকে মথুরানাথের যে ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেকি কোনো অর্থলোলুপ হিসেবী লোকের, না এক স্নেহশীল পিতার, পরমপ্রিয় অবুঝ ছেলের সব আবদার যিনি মুখ বুজে সহ্য করছেন?

ঠাকুরের উপর তাঁর এই বাৎসল্য ভাবের পরিচয়ই পাই যখন দেখি, ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুতে বিষাদাচ্ছন্ন রামকৃষ্ণের মন ভালো করার উদ্দেশ্যে মথুরানাথ তাঁকে নিয়ে জমিদারী মহলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই প্রাণের টানেই তিনি গোপনে হাজির হ'য়েছিলেন পানিহাটির মহোৎসবে, যখন শুনেছিলেন, সেখানকার গোঁড়া বৈষ্ণবকুল ঠাকুরের প্রতি অন্যায় আচরণ করতে পারেন। তাই, জাগতিক লাভ তাঁর যা-ই হ'য়ে থাক রামকৃষ্ণদেবের সাহচর্যে, সন্দেহ থাকে না, মথুরানাথের প্রাণপাত সেবার আসল উৎস ছিল, ঠাকুরের উপর তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা-ই।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মথুরানাথের স্ত্রী জগদম্বা দুরারোগ্য ব্যাধিমুক্ত হয়েছিলেন, একথা সবাই জানে। এতে ঠাকুরের যে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ, তা-ই সকলকে আচ্ছন্ন করে। কেউ কিন্তু ভুলেও একবার ভাবেন না কেন এমন হলো? রামকৃষ্ণদেব কি তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে ডাক্তারী করতে বসেছিলেন? যতদূর জানা যায়, তিনি এ জাতীয় সিদ্ধাইকে মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন, যথাসম্ভব

সচেতন থাকতেন, যাতে তাঁর আত্মিক শক্তির কোনো অলৌকিক প্রকাশ না হয়। মথুরানাথের বেলায় তার ব্যতিক্রম হ'লো কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে মথুরানাথেরই মনোভঙ্গীতে। নিজের কথা ভেবে যদি তিনি স্ত্রীর আরোগ্য কামনা করতেন তাহ'লে এ অঘটন ঘটত না নিশ্চয়ই। জগদম্বা মারা গেলে তাঁর নিজের যা হবার তা তো হবেই। সে জন্যে কাতর নন তিনি। কিন্তু স্ত্রী না থাকলে শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোনো আধিপত্য-ই থাকবে না এবং তার ফলে এতদিন যেমন মনের সাধে ঠাকুরের সেবা-পরিচর্যা করে আসছিলেন তা আর তাঁর দ্বারা করা সম্ভব হবে না। এই ভাবনাই বিচলিত করেছিল তাঁকে, আর সেই মনোবেদনাই তিনি নিবেদন করেছিলেন তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে। সেবকের এই দীন আকুতি-ই ঘটিয়েছিল ঐশ্বরিক শক্তির অবতরণ সেই ঠাকুরেরই মাধ্যমে, রোগসারানো সিদ্ধাই ছিল যাঁর দুচোখের বিষ।

শালগ্রামশিলা দিয়ে মশলা পেষা হয়তো যায় কিন্তু উচিৎ নয় এ বোধ যে মথুরানাথের বিলক্ষণ ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছোট্ট একটি ঘটনায়। মথুরানাথ ফোঁড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন। ক'দিন ঠাকুরের কাছে যেতে পারেন নি, তাই, খবর পাঠিয়েছেন ঠাকুরের কাছে, দর্শন দিতে। রামকৃষ্ণদেব এলেন মথুরানাথ তাঁর পদধূলি চাইলেন। ঠাকুর বললেন ; আমার পায়ের ধুলো দিয়ে কি হবে ? তাতে কি তোমার ফোঁড়া সারবে ? মথুরানাথ হেসে বললেন ; "বাবা আমি কি এমন-ই ? তোমার পায়ের ধুলো কি ফোঁড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি ? তাহার জন্য তো ডাক্তার আছে। আমি ভাবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।"

এই মথুরানাথ—ভক্তি পথের অর্জুন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ নিয়ে অনেক আলোচনা ; অনেক লেখা হ'য়েছে, হচ্ছে, হবে, হওয়া উচিৎও, কিন্তু সেই সাথে অন্ততঃ একবারও যেন আমরা স্মরণ করি সেই মানুষটিকে, যাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এক আঁচড়েই চিনে নিয়েছিল যুগাবতারকে, পিতার স্নেহে, দাসের সেবায় যিনি ঘিরে রেখেছিলেন তাঁর পরমারাধ্যকে, ভোগত্যাগের জোড়া ঘোড়া যিনি বলিষ্ঠ হাতে একসাথে ছুটিয়েছিলেন, নৈষ্ঠী শুদ্ধাচারী না হ'য়েও যিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠায় অকম্পহৃদয়, অব্যভিচারিণী ভক্তির জোরে অনায়াসে হয়েছিলেন সিদ্ধ, সাদা, খোলা চোখে পেয়েছিলেন নিজ ইষ্টের দর্শন,—রামকৃষ্ণকাব্যের উপেক্ষিত সেই মথুরানাথ বিশ্বাসকে।

তুর্ক মেনিয়া সাথে ভারতের সুপ্রাচীন সম্পর্ক

সুধীন্দ্র কুমার

মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে ভয়াবহ করকুম মরুভূমির অন্তর্গত তুর্কমেনিস্তানেরই উত্তরের বিস্তীর্ণ অংশ। পূর্বেকার ইসলামী ভূমি। ইসলাম-পূর্ব ইতিহাস বিশেষত প্রাক্ ইতিহাস অতি প্রাচীন। বর্তমানে সোভিয়েত ভূমি। 'তুর্কমেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রিপাব্লিক সুবিশাল সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্গত ও কেন্দ্রীয় শাসন নিয়ন্ত্রিত হলে স্বয়ংশাসিত সমাজবাদী সাম্যবাদী গণরাজ্য। ১৫টি অনুরূপ স্ব-রাজ্যেরই অন্যতম। যুগযুগান্তরবাহী জনকৃষ্টির ও সর্বপ্রধান ভাষার ভিত্তিতে প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় গণরাজ্য গঠিত। কাজাখ, উজবেক, তাজিক, কিরঘিজদের সোভিয়েত-পূর্ব ইসলাম ভূমির বহুকাল পরে স্ব স্ব এলাকায় তুর্কমেনদেরই মত স্বশাসিত রাজ্যগুলিও একই ভিত্তিতে। তারই প্রতিবেশী কাশ্পিয়ান্ সাগরের পূর্বতীরে, উত্তরে ও পূর্ব-দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্বে। পশ্চিমতীরে ককেশাশ জর্জীয়া, আর্যবজনের আসর্বাইজান ও তারই পাশে আরমেনিয়া অরমেনিয়া বা অরমীনিয়া। এই সবগুলি রাজ্যই ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্মরণাতীতকাল হতে। কিন্তু তা অন্য প্রশ্ন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় কৃষ্ণ-কাশ্পিয়ান্ সাগরের মধ্যস্থ ও আষত বা আর্যব সাগরের (বর্তমানে উপসাগরও নয় হ্রদে পরিণত) দক্ষিণে এইসব রাজ্যগুলি। আরল বা অরল সাগরের চারপাশে তুর্কমেনিয়া সহ (পশ্চিমে) চারটি উল্লিখিত সোভিয়েত রাজ্য। ভারত আফগানিস্তান গান্ধার বেলুচিস্তানেরই উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তরে। কাশপিয়ানের ককেশাশ পর্বতের পশ্চিমে তাউরস বা তাইরস পর্বতেরও উত্তর-পশ্চিমে জর্জিয়া, আযরবাইজান আরমেনিয়াই নয় বর্তমান তুর্কিও। সবকটি ভূমিই এশিয়ামাইনরের। খৃ.পূ. তিন সহস্রক হতে দুই সহস্রক ও তারও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক খাত্তি খেত ক্ষিতি ক্ষত্রভূমি। আজ প্রমাণিত সত্য খাত্তিদের সুপ্রাচীন ইতিহাস। প্রাচীন ভারতের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বহু 'জনে'রও কৃষ্টি এই সব ভূভাগের অনেক অঞ্চলেরই। কিন্তু সে সবও অন্য প্রশ্ন। তুর্কমেনিয়ার সহিত কৃষ্টির একই আদি ধারাবাহী বহুধারে। বিশেষত তুর্কমেনিয়া। তাই তার নামমাত্র উল্লেখ। একই যুক্ত ধারারই অন্য রাজ্যগুলিরও। প্রাচীন ক্ষাত্তিভূমি তুর্কির প্রাক্ ইতিহাস ভূগর্ভখোদিত প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষাত তাম্রপ্রস্তর কাল খৃ.পূ. ৪২০০ বছর অতিক্রম করে গেছে। শেষ প্রস্তরযুগ ও বিভিন্ন পাত্রের বহুবর্ণা কৃষ্টি ৬০০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০০ বছরেরও কাছাকাছি। ভারতের ও আফগানিস্তানের কাশ্মীর বদাক্ষণের বাণিজ কুঠার কৃষ্টি ও নিয়োলিথিক এবং 'লাপিস লাজুলি' জেল নীলমণির কৃষ্টি ৪২০০ বছর ছাড়িয়ে ৮০০০ খৃ.পূ. কালে পৌছেছে রেডিয়োকার্বন নিরূপিত তারিখগুলি অনুসারে। গান্ধারের 'ঘোর ও সয়ে' অঞ্চলের সপ্তগুহার কৃষ্টি খৃ. পূ. ৫০৮০ হতে ৬৭০০তে পৌছেছে। ঋগ্বেদের বহু সূত্রের রচয়িতা সর্পঋষি ঋষিকারাও। নাগ সর্প মাতা কদ্রু পুত্র কন্যার বংশধররা। বেলুচিস্তানের লসবেল বসতির কদ্রুরই নামাঙ্কিত কুদ নদীর তীরে প্রসিদ্ধ গন্ধর্বরাণীগুহা গন্ধর্বরাণীরই নামে। লসবেলার রেডিয়োকার্বন তারিখ খৃ. পূ. ৫৪৯৭ বছর। গন্ধর্বরাজ ত্বষ্টা ঋগ্বেদ কালেই কদেব প্রজাপতি দক্ষেরূপান্তরিত। অদিতি দাক্ষায়নীতে। ত্বষ্টারি ঘরণী। ইন্দ্রেরও জননী।

তুরকমেনিয়ার পশ্চিমে ইস্পাকু ইক্ষাকু অক্ষুভূমি ইরান আইর্যানা এবং ইউফ্রেতিস তাইগ্রিশ নদীধৌত সুপ্রাচীন সুমের ব্যাবিলন আসিরিয়া ভূমি। বর্তমানে ইরাক জর্দান সিরিয়া লেবানন ঈস্রাইল নামধারী স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির খণ্ড খণ্ড ভূভাগ। কাস্পিয়ান সাগর ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণে এশিয়া মাইনর তুর্কিস্থান তুরস্ক। কাশপিয়ান সাগরের চার পাশে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, হিন্দুকুশ সিন্ধু কারাকুরাম পামিরের দুই পারে সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির উদয় ও অস্তভূমি। উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিমভারত জুড়ে মহেঞ্জোদরো চহ্নুদারো লোদাল হরাপ্পা রূপারের সুপ্রাচীন সভ্যতারও তুঙ্গ অভ্যুদয় এবং আকস্মিক বিলয়। এখানে ওখানে তারি ধংসাবশেষ। আজো নানাস্থানে কতনা প্রাচীন ঐশ্বর্য মাটির তলে প্রোথিত হয়ে নবনব আবিষ্কারের অপেক্ষায় আছে। এই সব অঞ্চলেই প্রতি বছর খনিত কৃষ্টির বিচিত্র উপকরণ ভূগর্ভ হতে উত্থিত প্রাচীন জনপদ নগরী জগতের প্রাক ঐতিহাসিক রূপরেখা পরিবর্ত্তিত করে চলেছে। এই সব এলাকা দেখলে তারি কথা মনে রং ধরায়। তারি মাঝে বর্তমান মহাআনবিক যুগের বিকাশ দ্বন্দ্ব রক্তাক্ত সংগ্রাম ও নতুন সৃষ্টির প্রয়াস। তুর্কমেনিয়ার ভৌগোলিক ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক পরিস্থিতি তুর্কমেনিয়ার করকুম মরুভূমি প্রধান নদ নদী উপসাগর জনপদগুলির অবিস্মৃত নামাবলীর সাথেই নয় তুর্কমেনিয়ার নামেরই সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে সুপ্রাচীন প্রাক ইতিহাসের অনেক বিস্মৃত পদচিহ্ন। বিচিত্র পুরাণ কাহিনী। ভারতীয় কৃষ্টির সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কের নানা ইতিহাস। এই সব এলাকা দেখলে ও নামগুলির তাৎপর্যের সঙ্গে এই অঞ্চলের ও তার চার পাশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও প্রাক্ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা অনুধাবন করলে ইতিহাসের বিস্মৃত ও অর্দ্ধবিস্মৃত পথের কিছু সন্ধান মিলে। গুপ্ত বা সুপ্ত প্রাক্ ঐতিহাসিক খনিরও।

প্রথমে তুর্কমেনিয়া নামেরই অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা করা যাক। বহুকাল পরবর্ত্তী ইসলামী কৃষ্টি ও সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রিত তুর্কি, তুর্কিস্থান, সোভিয়েত তুর্কমেনিয়া। তারই কথা পড়তে ও শুনতেই আমরা অভ্যস্ত। অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ব বিদেরও এর অতীত কৃষ্টি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ধারণা নেই। থাকলেও অতিক্ষীণ। তাই অনেকেই হয়তো চমকে যাবেন যদি বলি তুরদেরই নামাঙ্কিত এই স্থানগুলির জনসমষ্টির আদি উৎস ভারতেরই এক প্রাচীন জনগোষ্ঠি। ঋগ্বেদে যার নাম তুর্বশ। পৌরাণিক নাম তুর্বস্থ। যদুজনের সঙ্গে তুর্বশ গোষ্ঠির জন যুদ্ধ ও শান্তির কালে বহু ঋক গানে যুক্ত হয়ে আছে অবিছিন্ন 'যদুতুর্বশ' নামে। প্রাচীনতর কালে। বিচ্ছেদ ঘটেছে পরে। যখন তুর্বশরা গেছে ভারতের বাহিরে। দ্রুহ্যরাও। যদুবংশ ক্রমে স্থায়ী হয়েছে ভারতে মহাভারতের মহাপ্রস্থান কাল পর্যন্ত।

ঋগ্বেদের বিভিন্ন প্রাচীন সূক্তে ও শতশত ঋকে সমসাময়িক কালের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দ্রষ্টা ও অংশগ্রাহী বহু প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর ঋকরচয়িতাদের সাক্ষ্যে এবং তাঁদেরই কাছ হ'তে শ্রুত সংহিতাকারদের শুধু শ্রুতই নয় তাঁদেরও নিজ নিজ কালে দৃষ্ট ঘটনাগুলির বর্ণনা হতে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্ট ও নিরূপিত হয়। এই তথ্য গুলি অতীব বাস্তব ও সুদূর প্রসারী অর্থপূর্ণ। আদি ভারতের বিভিন্ন কালের জন সমাজের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রাখে। তথ্যগুলির সম্যক পর্যালোচনার স্থান এ নয়। শুধু সোভিয়েত তুর্কিস্থান বা তুর্কমেনিয়া ও তুর্কিস্থানের সহিত প্রাচীন ভারতের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ বোঝাতে কয়েকটি তথ্যের স্পষ্টিকরণ দরকার। তুর্কিস্থান কি তুর্বশ

তুর্বশ-তুর্বান-তুরান তুরদেবি দেশ নামটির আদি উৎস ও তার রূপান্তরের একটু বিশ্লেষণ করলেই তার ক্রম পরিবর্তিত রূপের ধারাটি বেশ দেখা যায়। তুর্বশ হতে স্পষ্টই পালেস্তাইনের 'তুর্বষু'—তুর্বষু। পৌরাণিক তুর্বশু। ঋগ্বেদের 'তুর্বযানম' তুর্বীতি তুরা, তুর, তুরান। তুর্বীতি অবেস্তার 'ভৌর্বেতি'। ঋগ্বেদের সূক্তে সূক্তে বহু ঋকে ইন্দ্র পূর্বকালে তুর্বীতিকে সাহায্য করেছেন নানাভাবে। তুর্বীতির সঙ্গে মান্ধাতার পুত্র পুরু কুৎসকে, আর্জুনেয়কে এবং বিশেষত দভীতি ও ইধ্ম ভৃতিকে। একটি ঋকে অতিসুপ্রাচীন বৃহস্পতি পুত্র ভরদ্বাজ দভীতি ইধ্মভৃতিকে পক্থদের যুগ্ম অর্কবা সূর্য বলে গৌরব দিয়েছেন। পক্থরা পাঠানদেরই পূর্ব পুরুষ এক'জন' গোষ্ঠি। ঋ, বে, ৬/২০।১৩।

ষষ্ঠ মণ্ডলের একই বিংশতি সূক্তে ইন্দ্রের অনেক কীর্তি কাহিনীর বর্ণনা দেওয়ার সঙ্গে এরই আগের ১২ ঋকে ভরদ্বাজ ইন্দ্রকে 'ধুনিমতী ধুনি' বলে সম্বোধন করে তুর্বশ ও যদুদের সমুদ্র পার হতে আনয়ন করার কথা বলেছেন। মরুৎ ও যুগ্ম অশ্বিনীর ('অশ্বিনৌ') সহযোগে-যদুতুর্বশদের সুদূর হতে সমুদ্র ও নদনদী পার করে ভারতে আনয়নের কাহিনী গৌতম বামদেব ভৌম তাত্রি, ভার্গব শৌনক (পরে আঙ্গিরস শৌনহোত্র) প্রভৃতি ইন্দ্রের সমসাময়িক সুপ্রাচীন ঋষিরাও তারই সমর্থন করেছেন। মৈত্রাবরুণি অগস্ত্য এবং অপ্সু বিবস্বন পুত্র মনুও। ধুনিদেরও এইভাবে পার করিয়ে আনানো হয়েছে প্রাচীনতর কালে। দুইবীর যুবা তুগ্র ও ভুজ্যুকেও।

ধুনিদের সঙ্গে চুমুরিদের একত্রে ধুনিচুমুরি বলে উল্লেখ। চুমুরি চম্ব চাম চম্বা গন্ধর্ব কিন্নর গিন্নর গান্ধর্বী অপ্সরি কিন্নরীদেরই-বিভিন্ন গোষ্ঠি। ধুনিরাও। হিমালয় হিন্দুকুশ করকুরুমের দুই পারেই অতি প্রাচীন কাল হতে। প্রাচীনতম ও প্রাচীনতর জনগোষ্ঠিদের যক্ষ নাগ সর্পেরাও। চম্বসুত গন্ধর্ব ত্বষ্টা ইন্দ্রের জনক ও ইন্দ্র চুমুরিদের অদিতির কানীন পুত্র। জন্মমাত্রেই সোমপত্রে ভরা এক গিরিগুহায় বর্জিত। তথাকথিত আর্যও অনার্যের এক আদি জননী ও পিতৃপুরুষ অদিতি ও ত্বষ্টা এক আদিমাতা অহিগোপা অপ্সরা তাপ সেই গিরিগর্ভ হতে গুপ্ত বিল মধ্যে পতিত শিশু ইন্দ্রেরই পালিকা মাতা। তাঁরই কন্যা যমযমী আশ্বিনীদ্বয় যুগ্মযমজের জননী অপ্সরা অপ্যা সরন্যু বর্ণাশ্রমের বিধানদাতা মনুরও জননী। গন্ধর্ব অপ্সুই জনক। আর এক আদি জননী 'যুথমাতা' ইন্দ্র ও তার কন্যা অপ্সরা উর্বশী উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দুই প্রখ্যাত ঋগ্বেদী ঋষি বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের—যমজ জননী। এদের প্রত্যেকেরই সম্বন্ধে দেবতা ও মানুষরূপে স্বতন্ত্র রূপকথা, কাহিনী ও ইতিহাস আছে। প্রাচীন জগতের নানা স্থানের ভূগর্ভ হতে উত্থিত তথ্যগুলি এসবের উপর ইতিহাসের নতুন আলোকপাত করেছে। প্রত্যেকটি বিষয় স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে।

ঋগ্বেদের প্রাচীন সূত্রগুলির বর্ণনা দ্বারাই প্রমাণিত হয় তুর্বশ তুর্বযান তুরান তুরাতুর হতেই তুর্কি শব্দের উৎপত্তি ঘটেছে আদিম তুর্বশ শব্দটিরই ক্রম রূপান্তরে। সপ্তর্ষিদের অন্যতম ভূমি পুত্র অত্রি ইন্দ্রবন্ধু মরুতকে তুরদেরই জন বা গণ বলেছেন। বর্ম ও শিরস্ত্রাণধারী মরুৎগণ ইন্দ্রের বিভিন্ন যুদ্ধে প্রধান সহায় ছিলেন। ইন্দ্রের যেমন বজ্র মরুতদের তেমনি অনীক অর্থাৎ মিত্র বাহিনী। 'মরুতঃ' মরুৎগণ, 'মরুত্ত' পশ্চিম এশিয়ার সুমের বাবিলন আসিরিয়ার, আইর্যানা গুলিয়ানা আর্মেনিয়া আনাতোলিয়ার, ঋক-পূর্ব ও ঋকবেদী ভারতের এক সুপ্রাচীন দেবতা এবং তারই নামে নামী জনগণ ও তাদের এক সুবিশ্রুত নায়ক মরুত বা মরুত্ত। মরুৎগণ বলে প্রসিদ্ধ। আরব মরুভূমি হতে

তুর্কিস্থানের, তুর্কিমেনিয়ার ভয়াবহ কারাকোরাম বা করকুরুম মরুভূমিরই যেন দেবতা ও জনগণ।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের প্রথম দিকের প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগের এক সুমেরীয় লিপিতে মরুতের নাম 'মরুতু' বলে লিখিত। বাবলনীয় লিপিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের আক্কাদীয় ভাষায় রূপান্তরিত শব্দটি হলো 'অমুরু'। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগের 'টেল তামরণ' বা 'তামর্ণ' লিপিতে সিরিয়ার এক প্রাচীন জেলাকে, বর্তমান লেবানন ও তার কাছের কিছু অঞ্চলকে বলা হয়েছে 'অমুরি'। পশ্চিম এশিয়ার অমরদের সুপ্রসিদ্ধ বাবিলন সম্রাট অমর 'হাম্মরবি' বা 'সাম্মরবি'র কুলদেবতা রণদেব এই মরুতু। ঋগ্বেদের রণদেবতা ও গণনায়ক 'মরুতঃ'। তাই শুধু নয়। ঋগ্বেদেও এই অমরদেরই নাম হয়েছে 'অমুর' (অমুরা) 'অমুরু'। ইন্দ্রকেও 'অমুরু বীর' বলা হয়েছে এক প্রাচীন ঋকে। বৃহস্পতি পুত্র শংযু বলেছেন ইন্দ্রকে ষষ্ঠ মণ্ডলের ১১ ঋকে। এই সূক্তেরই প্রথম ঋকেই শংযু বলছেন: 'যিনি বহু দূর হতে তুবর্শ যদুদের ভালোভাবে এনেছেন সেই ইন্দ্রই আমাদের 'যুবা সখা'। ইন্দ্রকে পুরুদেরও 'পুরুতম' বলা হয়েছে এরি ২৯ ঋকে। এই (৪৫) সূক্তেরই শেষ তিনটি ঋকে পণীদের অধিপতি বৃবু ও তক্ষেরো সহস্র দানের স্তুতিবাদ করেছেন 'বৃবুং সহস্র দাতমমং সূরিং' বলে। পণীরা তখনো 'সূরি' সুরদেরি অন্তর্ভুক্ত। অথচ পরে পণীরা হয়েছেন অসুর। ইন্দ্রদূতী সরমার সঙ্গে 'পণয়োঽসুরাঃ' অসুর পণীরাও ঋগ্বেদেরি এক সূক্তের যুক্ত রচয়িতা। এই সূক্তটিও গভীর অর্থপূর্ণ এবং ঋগ্বেদ পূর্ব ও ঋগ্বেদ কালীন মহাযোদ্ধা ইন্দ্রেরই নেতৃত্বে আদিকালে অসুর পণীদের সঙ্গে যুদ্ধের সূচক। অসুর পণীদের ঐশ্বর্য ভরা পুরী ও তাদের বিপুল ধনরত্ন অশ্বগোধনপূর্ণ গুপ্ত পর্বত গুহা আক্রমণের প্রথম চক্রান্তের অতি বাস্তব ও জ্বলন্ত বর্ণনা। আর সেই বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী সরমা। ইন্দ্র বৃহস্পতি অঙ্গিরার গুপ্ত দূতী। বহু দূর হতে 'রসা' নদী অতিক্রম করে পণীদের পুরে এসে এবং সরল বিশ্বাসী পণীদের আতিথেয়তার আদর আপ্যায়নের সুযোগ নিয়ে তাদের ধনরত্ন গুপ্ত গুহাদ্বার প্রভৃতি দেখে ইন্দ্র বৃহস্পতি অঙ্গিরাকে সেই অমূল্য সংবাদ দান। পরে ইন্দ্র পরিচালিত এক সংযুক্ত সৈন্যদলকে ভারতের বাহির হতে আনয়ন গুপ্ত পথ দেখিয়ে—এবং অতর্কিত আক্রমণ ও গুপ্তদ্বার পথে গুহা লুণ্ঠন। পণীদেরি এক প্রসিদ্ধ নায়ক বলের গুহা ও ইন্দ্রের যুদ্ধ। তার বর্ণনা ঋগ্বেদের বহু সূক্তে।

ইন্দ্র শুধু ভ্রান্তি মিতাগ্নি 'আর্যানার্যের' দেবতাই নয় একজন রক্ত-মাংসের মানুষও ছিলেন। মহাশূর মহাবিজেতা মহাদানী নৃশংস ও ক্রূর কর্মা। এই ধুনি চুমুরি চাম গন্ধর্ব কিন্নরদের মধ্য হতেই জন্মেছিলেন। সিন্ধু হিমাচল বিন্ধ্যেরও দুই ধারে দেশে বিদেশে ঘুরেছিলেন। গন্ধর্ব কিন্নরদেরই সঙ্গে নয় তথাকথিত দেবদানব দৈত্য অসুর 'আর্য' অনার্যদের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়েছিলেন। ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তে সূক্তে অসংখ্য ঋকে অথর্বাদি বেদেও তাঁর মানবীয় কীর্তি অকীর্তির কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টারাই যেন বলছেন। তাঁদের কাছ হতেই অন্য ঋষিরা শুনে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন। কোন রূপকের আবরণে কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তার বাস্তব সত্যতা ঢাকবার নয়। প্রত্যক্ষ দ্রষ্টাদের মধ্যে আছেন বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা, অত্রি, ভৃগু, গৌতম, কামদেব, ভরদ্বাজ, মৈত্রাবরুণি বশিষ্ঠ অগস্ত্য, কশ্যপ, কাশ্যপ, গাথীন্ বিশ্বামিত্র, পজলন্তি জমদগ্নি। তাদের পুত্রপুত্রী। পৌত্র পৌত্রীদেরও কেউ কেউ। তবে লিখিত নয়। লিখতে তাঁরা তখনো জানতেন না। সবই শ্রুত ও স্মৃত। তাই তার নাম শ্রুতি ও স্মৃতি। তবু অত্যন্ত জীবন্ত। উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত।

রুচি বিকার

বাঙালীর গর্ব করবার আজ আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই, একথা সকলেই স্বীকার করেন আবার সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিতে ভুল হয় না, আর কিছু না থাক বাঙালীর সংস্কৃতি আছে। কথাটা কিন্তু নেহাতই কথার কথা বলে মনে হয় কারণ একজন জাপানী বা ফরাসীর মধ্যে তার সাংস্কৃতিক প্রভাব যেরকম পরিস্ফুট আমাদের মধ্যে কি তাই ? সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বিশদ আলোচনা বারান্তরে করার ইচ্ছা রইল, বর্তমানে সাধারণভাবে ধরা যাক।

সংস্কৃতির সাধারণ রূপায়ণ নানাবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানেই দেখা যায়। বাঙালীর সামাজিক সংস্কার অসংখ্য, তার মধ্যে প্রধান অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ আর শ্রাদ্ধ। এছাড়া ইদানীং কালের পশ্চিমী অনুসারী দু'টি উৎসবও বিচারের আওতায় আনা যায়—(১) জন্মদিন ও (২) বিবাহ বার্ষিকী। এই ক'টির প্রাচীন রূপ আর বর্তমান পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করলেই আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের গভীরতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যাবে। (নানাবিধ পূজার প্রসংগ ইচ্ছাকৃতভাবেই আপাততঃ মুলতুবী রাখছি কারণ প্রথমতঃ সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা দীর্ঘ হতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিচারে কতকগুলি মানদণ্ড সৃষ্টি করে নিলে বিচার সহজতর হবে।)

আমাদের প্রায় সর্ববিধ সংস্কারের দু'টি দিক—(১) শাস্ত্রীয়, (২) লৌকিক। আজকের দিনে শাস্ত্রীয় সংস্কার প্রায়শঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে সুতরাং এ নিয়ে আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কিছু লৌকিক ক্রিয়াকলাপের সাংস্কৃতিক মূল্য অনস্বীকার্য। অথচ আজকের দিনে তার ওপর ঝোঁক কমে আসছে তা নিশ্চয় আমাদের সংস্কৃতির গৌরব বাড়াচ্ছে না।

আগের দিনে একমাত্র শ্রাদ্ধ ছাড়া অন্য সব অনুষ্ঠানে সানাই বা নহবত বসাবার রেওয়াজ ছিল। নহবতের সুর সম্পূর্ণ দেশজ বস্তু এবং তা এদেশের সংস্কৃতির গৌরবই প্রচার করতো। শ্রাদ্ধে ব্যবস্থা থাকতো কীর্তনের, সেটিও দেশজ সংস্কৃতির এক মূল্যবান উপহার। কিন্তু আজকের দিনে প্রায়শঃই ও দু'টিকে বাদ দিয়ে সরাসরি মাইকের পাইক চালানো হচ্ছে। বিদেশী সুরের ভিত্তিতে অদ্ভুত শব্দ সম্ভার সম্বলিত সে গান শুনলে খুন না চাপাটা বিস্ময়কর। অথচ আমরা সে হেন অপসংস্কৃতিকেই আঁকড়ে ধরছি।

আগের দিনে আল্পনা আর ফুল দিয়ে গৃহসজ্জার রীতিটাও উঠে যাচ্ছে, তার জায়গা নিচ্ছে বৈদ্যুতিক আলোর চমক। তাতে আর যাই থাক সংস্কৃতির নাম-গন্ধ পর্যন্ত নেই।

তারপর প্রথাগত বরণ বা আহ্বানের মধ্যেও সংস্কৃতির আভাস ছিল। আজ তা সম্পূর্ণ অপসৃত না হলেও বিদেশীয়ানার প্রকোপ তাকে ক্রমেই কোণঠাসা করে দিচ্ছে।

জন্মদিন পালন আগেও যে হতো না তা নয় তবে সেটা মূলতঃ ছিল প্রিয়জনের প্রীতি বা শ্রদ্ধা

মেশানো ভালবাসার প্রকাশ। আজকের দিনে প্রায়শঃই হৃদয়ের উত্তাপটা শীততাপ নিয়ন্ত্রণের দৌলতে আমাদের কাছে এসে পৌছায় না। আর তাই তারই সঙ্গে বিদায় নিতে চলেছে আমাদের আর এক বৈশিষ্ট্য রন্ধন-কলা। ঘরোয়া রান্নার যে সুষম শিল্প সম্মত রূপ স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বকালেও পাওয়া যেত আজ তা কাহিনী মাত্র। আজকে তার জায়গা নিয়েছে এমন কিছু খাদ্যবস্তু যা শৈল্পিকগুণসম্পন্ন তো নয়ই এমনকি ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণ বেমানান তথা অস্বাস্থ্যকর।

এর পরে আসে বেশবাসের কথা। আমাদের দেশীয় বেশবাসের মধ্যে যেমন সুরুচি ছিল তেমনি ছিল সৌন্দর্য বোধ। তাছাড়া সেসব বেশ আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুসারী থাকায় আরামপ্রদও ছিল। কিন্তু বিদেশীয়ানার ধাক্কায় আজ যা অঙ্গে ধারণ করা হচ্ছে তাতে সুখও নেই আর রুচিও নেই।

বিবাহ বার্ষিকী বস্তুটিও খাঁটি বিদেশী। আমাদের দেশে যেহেতু বিবাহকে জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার বলে বর্ণনা করা তাই তার আয়ুঃষ্কাল নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজনই থাকতো না কারো। এখন বিদেশেও যতদিন অনুরূপ অবস্থা ছিল তখনও ঠিক একই ভাবে হিসাব নিকাশ অপ্রয়োজনীয় বোধ করা হতো। পঁচিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে অবশ্য প্রায়শঃই নাতি-নাতিনীরা খেলাচ্ছলে দ্বিতীয়বার বিয়ের ব্যবস্থা করতো এবং তখনো প্রথম বিয়ের অনুরূপই সমস্ত ব্যবস্থা হতো। কিন্তু এখন বিচ্ছেদ সহজসাধ্য হওয়ায় বার্ষিকীপালন প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ লোককে দেখানো, দেখ আমাদের এ বন্ধন কেমন মজবুত। এবং যেহেতু এ উৎসবের কোনো নজির বা ঐতিহ্য এদেশে গড়ে ওঠেনি তাই সম্পূর্ণ বিদেশীধরণ অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর কি ?

কোনো কিছু যদি ভালো হয় তো তাকে অনুসরণ করাতে খারাপ কিছু নেই কিন্তু পুরোপুরি অনুকরণে আর যাই হোক সুরুচির প্রকাশ সম্ভব নয়। এখন যেহেতু আমরা অধিকাংশ লোকেই বিদেশী ঐতিহ্যের অংশীদার নই কাজেই আমাদের অনুকরণ অন্ধের হস্তীদর্শন হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। অথচ তার বদলে যা হারাতে হচ্ছে তা আমাদের সংস্কৃতিক অমূল্য সম্পদ। এই রুচি বিকারের হাত থেকে রেহাই পাই কি করে ?

রবি মিত্র

পট

সমকালীন 'আষাঢ়' ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বিমলেন্দু চক্রবর্তীর 'পট' শীর্ষক মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনাটি পড়লাম। পট প্রসঙ্গে scroll বা দীর্ঘপট শ্রেণীর চিত্রকলার সম্পর্কে—কিছু বক্তব্য অনুক্ত থেকে গেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সময়ে ১৭০০ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে ইংলণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশে নানানসূত্রে ভারতবর্ষ থেকে পুথিপত্রের সঙ্গে নানাজাতীয় চিত্রপটের বিরাট একটি সংগ্রহ স্থানান্তরিত হয়। এই চিত্রকলার একটা প্রধান অঙ্গ হল scroll বা দীর্ঘপট। Oxford-এর All souls college এ Manchester এ John Rylands Library এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের Chestor Batty Libraryতে অন্যান্য অনেক মূল্যবান ভারতীয় পুঁথি পত্রের মধ্যে ৭৮টি মূল্যবান ও আকর্ষণীয় প্রাচীন দীর্ঘপট আছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে Chestor Betty Library তে রক্ষিত ভাগবত পুরাণের বিষয় অবলম্বনে আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫০০ শতকে রচিত এবং কাশ্মীর থেকে ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত একটি দীর্ঘপট। এই পটটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭০ ফিট এবং প্রস্থে মাত্র ২ ইঞ্চি। অতি সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্রের উপরে নানা বর্ণের দেশজ রং এর বিন্যাসে চিত্রিত এই পট। All Souls College-এর পটচিত্র দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ ফিট এবং প্রস্থে দেড় ইঞ্চি। এটিও আনুমানিক সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে প্রস্তুত। Manchester John Rylands Library র পুঁথি সংগ্রহের মধ্যেও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের একটি ভাগবত পুরানের দীর্ঘপট আছে। এর শিল্পমূল্য অসামান্য। এই পটগুলির বিষয়বস্তু লৌকিক নয়; রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত পুরাণ, মার্কেণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের বিষয় অবলম্বনে রচিত। এদের জমিও কেবলমাত্র মসলিন থেকেই প্রস্তুত নয়। অনেক সময়ে সূক্ষ্ম গাছের ছাল দিয়ে তৈরী বা পশুর চামড়ার উপরের সাদা সূক্ষ্ম ত্বক বিছিন্ন করে একত্র সংযুক্ত করে বিশেষভাবে প্রস্তুত। তাই জমিকে হলুদবর্ণের কোন রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে উজ্জ্বল ও মসৃণ করা হত। কাঁঠালের আঠাকেও কোন কোন ক্ষেত্রে উপকরণ রূপে ব্যবহার করা হত। জমিতে দেশীপটের মতন মেটে সিন্দুর, খড়িমাটি, হরিতাল, নীল এবং অন্যান্য নানা দেশজ শাকপত্রের নির্যাস ব্যবহার করা হত। প্রদীপের কালি থেকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রং তৈরী হত। কয়েকটি পটের মধ্যে দেশজ তৈল ও উদ্ভিদের ঘ্রাণ আমরা পেয়েছি। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী পটচিত্রের উদ্ভবের কোন সময় নির্দেশ করতে পারেননি। কিন্তু এই চিত্র সম্পদ যে মুসলমান আক্রমণের বহু পূর্ববর্তীতা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ জাতক কাহিনীগুলিতে লেপ্যচিত্র, লেখ্যচিত্র এবং ধুলিচিত্র এই তিনধরণের চিত্রকলার উল্লেখ আছে। লেপ্যচিত্র সাধারণতঃ পট্টবস্ত্রের উপরেই অঙ্কিত হত। পরবর্তীকালের সাধারণ পট এবং দীর্ঘপট এই লেপ্যচিত্রের ধারারই পরিণতি। বর্তমানে scroll painting বলতে যে ধরণের চিত্রকলা আমরা দেখতে পাই তাতে মুসলমান শিল্পকলার

প্রভাব কিছু পরিমাণে দেখা যায়। আয়ার্ল্যাণ্ডের Chester Betty Library তে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপরে লেখা ২ ইঞ্চি চামড়া এবং প্রায় ৬০ ফিট দীর্ঘ একটি হাতে লেখা কোরাণ আছে। মনে হয় সে হস্তলিখিত কোরাণের ঐ বিশিষ্ট রচনা পদ্ধতির অনুকরণে সমসাময়িক বা পরবর্তীকালে সূক্ষ্ম বৃক্ষত্বকের উপরে সোনালী দেবনাগরী ও কাশ্মীরী সারদা লিপিতে গীতা, চণ্ডী বা পুরানের এই সমস্ত দীর্ঘপটগুলি প্রস্তুত হয়। এই দীর্ঘপটগুলির চিত্রশ্রেণীতে কাংড়া কুলু প্রভৃতি শিল্পরীতির প্রভাব মাঝে মাঝে দেখা গেলেও এদের বিশেষ কোন শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার চিত্র শ্রেণীর নীচে ও পাশে দেবনাগরী বা কাশ্মীরী অক্ষরে ভাগবত পুরাণ বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কাহিনী লিখিত দেখা যায়। এক একটি পটে ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ ১০০টি চিত্র আছে। পটগুলিতে কুণ্ডলীকৃত করে মাত্র ১ ইঞ্চি ব্যাসের রূপার ছোট একটি আধারে রাখা যায়। এই সমস্ত পটে মুসলমানী চিত্রকলার ধাঁচে দুই পাশে নীল সোনালী বা সাদা রং এবং পুষ্পিত চিত্রাবলী অথবা দীর্ঘ সমান্তরাল রেখার ব্যবহার এ সমস্তই লক্ষ্য করা যায়। ভারতে মোঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্যের কোন কোন স্থান থেকে একদল ভাগ্যান্বেষী পুঁথি লেখক (calligraphist) ভারতে আসে। এদের মধ্যে অনেকেই চিত্রধর্মী অক্ষরবিন্যাসে এবং বিশিষ্ট মুসলমানী চিত্রাঙ্কনরীতিতে কোরাণ এবং অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ নকল করার কাজে বিশেষ দক্ষতা দেখায়। তাদের এই বিশিষ্ট রচনারীতি হিন্দু পটুয়াদের প্রভাবিত করে। রাজ পৃষ্ঠপোষকতাও হিন্দু পটুয়াদের এই রীতি গ্রহণের অন্যতম কারণরূপে নির্দেশ করা যায়। রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধজাতক, কাদম্বরী, হর্ষচরিত ও মুদ্রারাক্ষস এর কোনটিতেই লেপ্যপট্ট বা পটের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কুণ্ডলাকার অতিদীর্ঘ পটের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই শ্রেণীর চিত্রের আয়তন বৈদেশিক প্রভাবে অথবা সূক্ষ্ম বস্ত্রের সহজ পরিবহণ যোগ্যতার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল কিনা তা এখনও বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয়। অন্যদিকে এই দীর্ঘপটগুলি হিন্দু মুসলিম ভাবধারার মিলনের অথবা সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের নির্দেশক। মার্কণ্ডেয়পুরাণ বা বিষ্ণুপুরাণের দীর্ঘপটের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীগণ মুসলিম নবাব বাদশাহ এবং অন্তপুরিকারূপে সজ্জিত। ব্রহ্মাকে ফকিরের রূপে বিষ্ণুকে দরবেশ রূপে দেখা যায় এমনকি অনেক ক্ষেত্রে রাজপুত যোদ্ধাদের মুসলমান পোষাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত দেখা যায়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের চিত্রকলায় হিন্দু মুসলমান ভাবধারা ও জীবনাদর্শের কিভাবে সমন্বয় হচ্ছিল তার কিছু প্রমাণ এই দীর্ঘ পটগুলির মধ্যে মেলে। আকবর এবং দারাশুকোর প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে যে ভাববিনিময়ের সূচনা হয়েছিল তারফলে হিন্দু পটুয়াগণ দীর্ঘপট রচনায় এই বিশেষ আঙ্গিক গ্রহণ করেছিল এমন মনে করা বোধহয় বিশেষ অসঙ্গত হবে না।

দিলীপকুমার কাঞ্জিলাল

দেশ পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে নানারকমের আলোচনা হয়। কিন্তু এসব আলোচনার বেশীর ভাগটাই পরোক্ষ চিন্তার ফল। কাজেই এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যখন স্ব-আরোপিত সংজ্ঞা, কূটতর্কের রমরমা চলেছে চারদিকে তখন পশ্চিমবাংলার বাস্তবিক সাংস্কৃতিক উপাদান ও তার উদাহরণ বা নিদর্শনগুলিকে আমরা কেবলই উপেক্ষা করে চলেছি।

আজকে আমরা যদি জানতে চাই পশ্চিমবঙ্গে আমাদের কত রকমের উনানের গড়ন আছে বা কত রকমের আকার ও গড়নের বাসনপত্র আমরা ব্যবহার করি তাহলে এখানকার কোন কোন খুব সংস্কৃতিবান ও দেশপ্রেমী মানুষও হকচকিয়ে যাবেন। তারপর আবার যদি পশ্চিমবঙ্গের ঘরামি, ক্ষেতমজুররা বা কারুশিল্পী ও আদিবাসীদের দৈনন্দিন ব্যবহারের হাতিয়ার, কর্মপদ্ধতি ও যন্ত্রাদি নিয়ে প্রশ্নতোলা যায় তাহলে হয় নিদারুণ অবজ্ঞা বা নিরতিশয় ক্রোধের স্রোতে সবকিছু তলিয়ে দেওয়া হবে। এটাই এখানকার সংস্কৃতিবানদের বহু ব্যবহৃত পদ্ধতি।

সত্যি কথা এটাই যে, আমরা যেন নিজের দেশেই বিদেশী হয়ে আছি। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। লোকগণনা বিভাগের প্রতিবেদনের বিরাট গ্রন্থরাজির মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে থাকা ও নৃতত্ত্ববিদ্যার কয়েকটি গ্রন্থে ছাড়া আমাদের দেশ সম্পর্কে এই প্রকৃতির তথ্য এক জায়গায় দেওয়া নেই। এই রকম একটা অবস্থায় আমরা আমাদের দেশের প্রাথমিক দ্রব্যাদির সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে থাকছি। যন্ত্র শিল্পের অগ্রগতিতে, নতুন উপাদানের অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতায় ও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিভ্রান্ত করে দেওয়া আজকের সমাজে একেবারে খাঁটি দেশীয় প্রথা ও পদ্ধতি ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে আসছে।

এখানে বা এক্ষেত্রে একটা কাজ করার মত আছে। শ্রদ্ধেয় নির্মলকুমার বসু মহাশয়ের উদ্‌যোগে ও প্রচেষ্টায় ভারতীয় নৃতত্ত্ব-সমীক্ষা ও পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রাম-সংস্থান, কুটিরের গড়নরীতি, কৃষিযন্ত্রের প্রকৃতি, জামাকাপড় ও জুতার যে রকম সচিত্র ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ঠিক সেই রকমভাবে পশ্চিমবঙ্গের একটি সংহত ও চিত্রিত বিবরণের উপযোগীতা অপরিসীম। এতে এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের কুটিরও ঘরবাড়ী, গৃহ সংস্থান কৃষিযন্ত্র, খামার, গোলা, কাঠের, মাটির বা লোহার কাজের যন্ত্রাদি, যানবাহন ও নৌকা, মাছ ধরার জাল শিকারের দেশীয় সরঞ্জাম, হাঁড়ি কুঁড়ি বাসন-কোসন, গীতবাদ্যের যন্ত্র, সাজ পোষাক, পাখিরাখবার খাঁচা ও ফাঁদ, খেলনা-পুতুল এবং শিল্পকাজের পরিচয় দেওয়া দরকার। ছোট আকারের কিন্তু সুস্পষ্ট রেখাচিত্র দিলে সাধারণ কাগজেও বইটি ছাপা যাবে। এই রকম একটা পুস্তকে থাকা লিখিত বিবরণে যদি কেবল চিত্র নির্দেশনের ব্যবহারের এলাকা, পরিমাপ ও স্থানীয় নাম দেওয়া থাকে তাহলেই যথেষ্ট হবে। তবে সাধারণের বোঝবার জন্য যে সব জিনিষের ছবি দেওয়া হয়েছে তার ব্যবহার কিপ্রকার বা কারা ব্যবহার করেন—এ খবরটিও থাকলে ভাল হয়।

এই রকমের একটা একশত বা দুইশত পৃষ্ঠার পুস্তক প্রকাশিত হলে দেশের উপকার হবে। যেমন ভূগোল, সমাজবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তকে আমাদের ব্যবহারিক কৃষ্টির উপাদানকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করার কাজটি ভাল করে হবে। এছাড়া যদি গ্রন্থশেষে একটি বিভিন্ন স্থানীয় নক্সা ও অলঙ্করণের নমুনা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা ছাত্র, শিক্ষক

শিল্পী এরকম অনেকেরই কাজে লাগবে।

আমরা বড় বড় আকাশচুম্বী পরিকল্পনা করে করে ভীষণ পরিপক্ক হয়ে গেছি। কিন্তু এরকম একটা প্রচেষ্টায় অযথা কোন বড় পরিকল্পনাদির অন্ততঃ এখন কোন প্রয়োজন নেই। তথ্য ও চিত্র সংগ্রহের উদ্‌যোগ করে যদি কেউ পুস্তকাকারে প্রকাশকরার উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে এই কাজটি করে চলেন তাহলে এই প্রকারের একটি 'সামান্য' কিন্তু বহুমূল্য গ্রন্থ রচিত হতে পারে। হয়ত প্রথম প্রচেষ্টায় সব কিছুই বৈজ্ঞানিকভাবে 'নিখুঁত' হবে না। কিছু ত্রুটি হয়ত থাকবে। কিন্তু খুঁত, ত্রুটি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল প্রথম গ্রন্থটিতে থাকলেও পরে সেটা যোগ্যতর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণে সংশোধিত হতে পারবে। কারণ অনেক সময়েই দেখা যায় যে প্রকাশিত গ্রন্থই অনেক বিষয়ে সুষ্ঠু আলোচনার সূত্রপাত করেছে এবং বৃহত্তর ও সম্পূর্ণতর প্রয়াস বা প্রচেষ্টাকে উৎসাহ জুগিয়েছে।

লোকসংস্কৃতি, নৃতত্ত্ববিদ্যা ও শিল্পকলার কর্মীরা যদি এই প্রকারের একটা প্রচেষ্টা করেন তাহলে সমগ্র দেশের একটা উপকার হয়। আমাদের ব্যবহার্য জিনিষেই আমাদের রুচি, জীবনযাত্রা, সৌন্দর্যবোধ ও মানসিকতা ধরা রয়েছে। প্রথাগত ও ঐতিহ্যবাহী ব্যবহার্য সব জিনিষই তাই আমাদের কাছে একটা বারবার খুঁজে দেখার মত সময় পরীক্ষিত উত্তরাধিকার। এটি উপেক্ষা করা চলে না। এটিকে অস্বীকার করলে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন স্বকীয়তাহীন আবেগ দিয়ে খানিকটা চলে তারপর নিস্তেজ ও উদ্দেশ্যবিরহিত ব্যর্থতায় মগ্ন হয়ে যাবে।

যেসব গোষ্ঠী বা বিভাগ অথবা ব্যক্তিগত কর্মী এই কাজটির সম্পর্কে উৎসাহী তাঁদের কাছে এই আবেদনটি বিচারের জন্য উপস্থাপিত হল। বিদেশী মিশনারী ও ইউরোপীয় আগন্তুকেরা এইরকম কাজ স্বজ্ঞানে বা কেবল কৌতূহলের বশেও করে গেছেন গত শতাব্দীতে ও এই শতকের প্রথমদিকে। তাঁদের করা ভারতীয় জীবনের চিত্রিত বিবরণ আজ আমাদের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে কাজে লাগছে। কাজেই আমরা সহজভাবে ও কোন আড়ম্বর না করে এরকম ধারায় একটা কাজে নামলে সেটি সফল হবার সম্ভবনা নিশ্চয়ই আছে।

সন্তোষকুমার বসু

সমালোচনা

মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ : সুকুমার বসু ও সুহৃদ গোপাল দত্ত ॥ রূপা : কলকাতা—১২ ॥ মূল্য : বারোটাকা।

বেদ পুরাণ—উপনিষদের মন্ত্রপূত ভারতবর্ষে যত সাধু সন্ন্যাসী, যোগী ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তেমনটি পৃথিবীর আর কোথাও হয় নি। বিশেষত বাংলার গাঙ্গেয় পলিমাটিতেই সোনার ফসলের মত সোনার গৌরাঙ্গ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ যোগী-সমষ্টির হয়েছে আবির্ভাব। এদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে এক বিস্ময়। রুদ্রবাহী, স্বদেশসেবী সক্রিয় বিপ্লবী উত্তর জীবনে হয়েছেন নিষ্ক্রিয়, নিস্তব্ধ ধ্যানমগ্ন, আত্মসমাহিত যোগী। সাধারণ মানুষের কাছে শ্রীঅরবিন্দ এক অপার বিস্ময়। রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দকে গভীরভাবে উপলব্ধি করে তাঁর দ্বৈত-জীবনের পটভূমি সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—

'প্রথম তপোবনে শকুন্তলার উদ্বোধন হয়েছিল যৌবনের অভিঘাতে প্রাণের চাঞ্চল্যে। দ্বিতীয় তপোবনে তাঁর বিকাশ হয়েছিল আত্মার শান্তিতে। অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার আসনে দেখেছিলুম সেখানে তাকে জানিয়েছি—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"। আজ তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়, আজো তাঁকে মনে মনে বলে এলুম—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার"।'

রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণকে শ্রীঅরবিন্দের প্রাকৃত ও দিব্যজীবনের প্রবেশ পথের সঠিক চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। যাঁরা শ্রীঅরবিন্দ-জীবন দর্শনকে যাচাই করতে গেছেন, তাঁরাই অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব বিশ্লেষণের পথ ধরেই এগিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী শ্রীসুকুমার বসু ও আইনজ্ঞ লেখক শ্রীসুহৃদ দত্ত এই জাতীয় বিশ্লেষণী দৃষ্টির আলোকেই শ্রীঅরবিন্দকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রীঅরবিন্দ জয়ন্তীশতবার্ষিকীতে তাঁদের উভয়ের গভীর অনুধ্যান-অনুশীলনজাত লেখনীর সার্থক ফসল 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ'। মনোরাজ্যের মহারাজা-ধিরাজ শ্রীঅরবিন্দ। সেদিক থেকে গ্রন্থটির নামকরণের সার্থকতা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করে নেবেন।

'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির সূচীপত্র নিম্নরূপ—'আবির্ভাব' 'নৈষ্কর্ম্য এবং লোক-সংগ্রহ', যোগাশ্রমের একটি বছর', 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত,' 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ,' 'বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ,' 'জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের 'প্রারব্ধ' কর্মজীবন,' 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ'—এই কয়টি বিভাগে বিভাজন করে লেখকদ্বয় শ্রীঅরবিন্দ-অনুশীলনের পথ প্রশস্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'পরিশিষ্ট,' 'গ্রন্থপঞ্জী,' 'নামসূচী' দেখে ধারণা হয় লেখকদ্বয় বক্তব্য বিষয়সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নবান এবং গবেষণাকার্যে একনিষ্ঠ।

পড়াশুনায় 'বাঘা' ছাত্র ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ও সুকঠিন

পরীক্ষা 'ক্লাসিকাল ট্রিপস্' প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ল্যাটিন, গ্রীক, ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় তিনি ছিলেন বিশেষ ব্যুৎপন্ন। কঠিন প্রতিযোগিতামূলক আই-সি-এস্ পরীক্ষায় শ্রীঅরবিন্দ একাদশ স্থান অধিকার করেন। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার অশেষ গুণগ্রাহী-পিতা শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষের আদেশে আই-সি এস পরীক্ষা দিলেও শ্রীঅরবিন্দ ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকুরী করার একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। আই-সি-এস পরীক্ষার অশ্বারোহণ বিদ্যার যোগ্যতা পরীক্ষাকালে ইচ্ছাকৃত ভাবে বারবার অনুপস্থিত হয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ থেকে যান, ফলে বিলাতে ইংরেজ সরকার শ্রীঅরবিন্দকে সিভিল সার্ভিসে নিযুক্তি ব্যাপারে বিরত থাকেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে তিনি যে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিচালক হয়েছিলেন এই ঘটনায় তারই প্রথম আভাস লক্ষ্য করা যায়। শৈশবে ইউরোপীয় আবাওয়ায় মানুষ হলেও শ্রীঅরবিন্দের মনে গভীর স্বদেশ প্রীতি যে কিভাবে জাগ্রত হল তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অনেকের ধারণা শ্রীঅরবিন্দের পিতা দেশথেকে জনপ্রিয় দেশকর্মী সুরেন ব্যানার্জীর ইংরেজী সংবাদপত্র 'বেঙ্গলীতে' ইংরেজের অপশাসন, বিশেষত ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের যেসব ঘটনা ও মন্তব্য প্রকাশিত হত, তার 'কাটিং' ছেলের কাছে পাঠাতেন, সেগুলি পড়েই তাঁর মনে স্বদেশপ্রীতির সৃষ্টি হয়। তাছাড়াও শ্রীঅরবিন্দের মাতামহ ঋষি রাজনারায়ণ বসু ছিলেন জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ ও দার্শনিক। সুতরাং, পিতা ও মাতামহের প্রভাব যে তাঁর স্বদেশপ্রীতির অন্যতম কারণ, একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

১৮৯৩ সনে ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরার আগেই শ্রীঅরবিন্দ ভারতের স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিক মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ভারতে এসে প্রায় বারবছর তিনি বরোদায় অতিবাহিত করেন। বরোদায় রাজ দপ্তরে কিছুদিন কাজ করার পর শ্রীঅরবিন্দ বরোদা কলেজে ফরাসী ভাষায় অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। পরে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং সবশেষে সহকারী অধ্যক্ষের পদও গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকলেও তিনি দেশের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা কখনই ভুলে যান নি।

১৮৯৩-৯৪ সনে শ্রীঅরবিন্দ বোম্বে শহর থেকে প্রকাশিত 'ইন্দু প্রকাশ' নামে এক ইংরেজি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধে তাঁর গভীর স্বদেশ-প্রেম, তেজোদীপ্ত জ্ঞান ও প্রখর আন্তরাগ্নির বহ্নি-স্পর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। কিভাবে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করা যায়। কিভাবে দেশের অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করা সম্ভব—এই ছিল তখন শ্রীঅরবিন্দের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান। ১৯০৫ সনে বঙ্গদেশকে দু'ভাগ করে দুটি প্রদেশে পরিণত করার প্রস্তাবে বাংলাদেশে এক বিরাটকায় আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং বঙ্গভঙ্গ রোহিত করার এই আন্দোলন ক্রমে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণতি লাভ করে। ঠিক এই সময়েই বরোদার কাজ ছেড়ে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরের জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে এক সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'আবির্ভাব' অধ্যায়ে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি-পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা ও বরোদায় চাকরী এবং বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু বর্ণনা এত সংক্ষিপ্ত যে শ্রীঅরবিন্দ-জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বনিয়াদ সম্পর্কে পাঠকগণের সুস্পষ্ট পরিচয় সাধন সম্ভব হয় না। এই অধ্যায়টির বিস্তৃতির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা পাঠক সমাজে অবশ্যই অনুভূত হবে।

স্বদেশী, বয়কট প্রভৃতি প্রচার-কার্যে শ্রীঅরবিন্দ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়ে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে বিশিষ্ট বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল 'বন্দেমাতরম্' নামে একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সহকারীরূপে যোগ দেন। কয়েকমাস পরে বিপিনচন্দ্র এই পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করলে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই পত্রিকা-সম্পাদনার দায়িত্ব নেন। ১৯০৬ সনে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নতুন কার্যসূচী প্রকাশ করেন এবং জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে যেসব প্রবন্ধ লেখেন তা সারা ভারতবর্ষে ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি তখন পুরোপুরি সময় সাংবাদিকতা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ সরকারের সঙ্গে অসহযোগ নীতির স্বরূপ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী যে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয় তার মূলসূত্রগুলির প্রথম প্রবক্তা কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর অগ্নিস্রাবী লেখনীর প্রতিটি ছত্র দেশবাসীর নিস্তরঙ্গ জীবনে জলোচ্ছ্বাসের উন্মাদনা সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদের নতুন বীজ বপন করলেন তিনি দেশবাসীর মনে। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—'স্বদেশকে মা বলিয়া জান, ভক্তি কর, পূজা কর। মাকে উদ্ধার করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।' 'নৈষ্কম্য এবং লোকসংগ্রহ' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের লোকশিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসীর চেতনায় বিপ্লব সৃষ্টির যে প্রয়াস তা সুষ্ঠুভাবে বিবৃত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দের পরোক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী দলের শক্তি ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পায়। বিপ্লবী দলের প্রধান কেন্দ্র মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগান। এটাই ছিল তখনকার বোমা তৈরীর কারখানা। ১৯০৮ সনের ১লা ও ২রা মে ঐ বাগান পুলিস ঘেরাও করে এবং অনেক বিপ্লবী পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। শ্রীঅরবিন্দকেও তাঁর বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুরের জেলে তিনি এক বছর ছিলেন। আলিপুর জেলে অবস্থান ও আলিপুরের বোমার মামলাই শ্রীঅরবিন্দের দ্বৈত জীবনের সন্ধিস্থল বলা যায়। এই সময় থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনযাত্রার হয় সূত্রপাত। শ্রীঅরবিন্দ জেল অর্থাৎ কারাগারকে 'যোগাশ্রম' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথায়—'সেই আশ্রম ইংরেজ কারাগার। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের কোপদৃষ্টির একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম।' "যোগাশ্রমের একটি বছর" অধ্যায়টি 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। বৃহৎ এই কারণে যে, এই অধ্যায়ে যে সমস্ত ঘটনার ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দকে আলিপুর বোমা মামলার সঙ্গে জড়ানো হয়েছিল, সেগুলির সম্ভাব্য বিবরণ নেওয়া হয়েছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে আদালতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের যুগান্তকারী সওয়াল প্রভাবের ভিত্তিতে শ্রীঅরবিন্দের নির্দোষিতা প্রমাণের বিশদ তথ্যও পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটির মূল প্রসঙ্গ যখন নিছক আইন-সংক্রান্ত নয়। তখন এইসব বিতর্ক-জটিল আইন সম্মত তথ্যে গ্রন্থটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। লেখকদ্বয় দীর্ঘ ও বিস্তৃত তথ্যের যদি একটি সংক্ষিপ্ত সার-সংকলন করে দিতেন, তাহলেই গ্রন্থটির ভারসাম্য বজায় থাকতো। রচনাগত মাত্রাজ্ঞানের অভাবেই এই অধ্যায়টি অপেক্ষাকৃত একঘেয়ে ও অনাকর্ষণীয়।

১৯০৯ সনে আলিপুর জেল থেকে অব্যাহতি পাবার পর শ্রীঅরবিন্দ কিছুদিনের মধ্যেই ইংরেজি সাপ্তাহিক। 'কর্মযোগিন' এবং পরে বাংলা সাপ্তাহিক 'ধর্ম' নামক পত্রিকা প্রকাশে মনোনিবেশ করেন।

'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি' (An open letter to my Countrymen) নামক নিবন্ধে জাতীয় আন্দোলনের ভাবী পদক্ষেপ সম্পর্কে ও মিণ্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারে দেশের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণই বেশি ঘটবে, এই মন্তব্য করে দেশবাসীকে সচেতন করার এক জরুরী আহ্বান জানান শ্রীঅরবিন্দ। এই 'খোলা চিঠি'র জন্য সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। কিন্তু তার আগেই তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন। চন্দননগরে কিছুদিন থাকার পর শ্রীঅরবিন্দ গোপনে পণ্ডিচেরী রওনা হন ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল। 'প্রাক্-পণ্ডিচেরী বৃত্তান্ত' অধ্যায়টি শ্রীঅরবিন্দের 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি'র উল্লেখযোগ্য অংশগুলির উদ্ধৃতি সংকলন করে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারতো।

শ্রীঅরবিন্দের সাধনার তপোবন পণ্ডিচেরী। এখানেই তিনি ভাগবত্ ধর্মের প্রবক্তা ও পথিকৃৎ হিসাবে যথার্থভাবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৪ সনের ১৫ই আগষ্ট 'আর্য' মাসিক পত্রিকা শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমে বেদ-রহস্য, উপনিষদের ব্যাখ্যা, দিব্যজীবনের আদর্শ, যোগ-সমন্বয়ের প্রণালী, ভারত-সংস্কৃতির পরিচয়, মানবের মহামিলনের আদর্শ, মানব সমাজের বিবর্তনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ দিব্যজ্ঞানপ্রসূত আলোচনা প্রকাশ করেন। 'পণ্ডিচেরীতে উত্তরযোগী শ্রীঅরবিন্দ' অধ্যায়ে যোগীশ্বর শ্রীঅরবিন্দের তৎকালীন চিন্তাধারার সম্যক্ পরিচয় প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন লেখকদ্বয়। রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করার মত। লেখকদ্বয় এই স্বাতন্ত্র্যকে যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন :—মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে বিস্মৃত হয়ে রাজনীতিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। রাজনীতিকে আশ্রয় করে ব্যক্তিপূজা তাঁর মতে স্বধর্মের বিকৃতি। মানুষ একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণে বশ্যতা স্বীকার করবে—এই সত্যকে উপেক্ষা করে কোন নেতার মতবাদ বা কোন রাজনীতি ভারতের সনাতন ধর্মের পরিপন্থী। মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে উপেক্ষা করে যদি মানুষের উপর জোর করে কোন মতবাদ চাপানো হয় তাহলে মানুষের মধ্যে স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতার চেতনা বিকশিত হবার সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। সংকীর্ণ রাজনীতিতে, দিব্য-প্রকৃতির আধার মানুষকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির যন্ত্রে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা মানুষকে বন্দীজীবনের আস্বাদ দেয় —মুক্তির দিব্য আস্বাদে বঞ্চিত হয়ে মানুষ অধোগতির পথে মুক্ত জীবনের পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতার আবর্তে সমাজকে দূষিত করে তোলে।'

১৯২৬ সনের ২৪শে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দের দিব্য-জীবন সাধন পথের মহান্ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয়। শ্রীঅরবিন্দের সাধনার ঊর্ধ্বগতি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই উক্তি : 'যত উঁচুতে উঠি, মানুষের Spiritual evolution-এর (আধ্যাত্মিক বিকাশের) চরম সিদ্ধির অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে। বিজ্ঞানে উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় স্থির প্রতিষ্ঠা হয়, শুধু ত্রিকালাতীত পর ব্রহ্মে নয়—দেহে, জগতে, জীবনে। পূর্ণ সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বিকশিত হয়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই চেষ্টাই আমার যোগপন্থার central clue (মূলকথা)।' 'বিজ্ঞানময় পুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' অধ্যায়ে জীবদ্দশায় মানুষের পক্ষে ব্রহ্মবিজ্ঞানী হয়ে অমৃতত্ব লাভ করা যে সম্ভব শ্রীঅরবিন্দই তার প্রমাণ—তাঁর "বিজ্ঞান-সিদ্ধি"র সাফল্যের কথাই সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে।

'জীবন্মুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীঅরবিন্দের "প্রারব্ধ" কর্মজীবন' অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দের জগৎব্যাপী বৃহৎ কর্মযজ্ঞের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববাসীর কল্যাণ এবং মুক্তির ব্রতে ব্রতী পুরুষদের সংঘকেন্দ্র পণ্ডিচেরী থেকে আধ্যাত্মশক্তির অদৃশ্য রশ্মির আকর্ষণে দিব্যজীবনের জিজ্ঞাসা নিয়ে সর্বস্তরের মানুষ সমবেত হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দের পাদপীঠে। প্রজ্ঞাসুন্দর শ্রীঅরবিন্দের শ্রীহস্তপ্রসূত বেদান্তভাষ্য 'দিব্যজীবন' ভারতের আধ্যাত্মিক মহিমাকে সমুজ্জল করে সবার দৃষ্টি ভারতের দিকে আকৃষ্ট করেছে। অতিমানসের আলোকের কর্মাধারায় স্নাত মহাকাব্য 'সাবিত্রী' শ্রীঅরবিন্দের এক মহান্ কীর্তি। সাধারণ মানুষ দিব্যদৃষ্টির অভাবে যে অনন্ত জিজ্ঞাসা বুকে নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে এগিয়ে চলে, তার অভ্রান্ত উত্তর রয়েছে এই রচনায়। ১৯৫০ সনের ৫ই ডিসেম্বর নশ্বর দেহ ত্যাগের আগেই শ্রীঅরবিন্দ মানব মনের মহাকাব্য রচনা শেষ করেন। 'সাবিত্রী' মহাকাব্যের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছত্রের উদ্ধৃতি সহযোগে এই অধ্যায়টি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হয়েছে।

'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' নামক অধ্যায়টি গ্রন্থের শেষ অধ্যায়। এই শিরোনামেই গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের স্ব ইচ্ছায় তাঁর নশ্বর দেহের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এ সম্পর্কে তাঁর দিব্যবাণী শ্রীমা শুনেছিলেন—'I have left this body purposely. I will not take it back. I shall manifest again in the first supramental body built in the supramental way'. 'ব্রহ্মসূত্রে' মনস্পতি পুরুষের এই ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ যে যথার্থই মনস্পতি এবং দিব্যজীবনের দিশারী তার পরিচয়ে এই অধ্যায়টি সমুজ্জল।

কিছু ত্রুটি থাকলেও আটটি অধ্যায় সংবলিত 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' ১৯৭৩ সনের বাংলা গ্রন্থজগতের একটি মূল্যবান্ সম্পদ। দিব্য জ্যোতি স্নাত শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও তাঁর দর্শনের এরূপ মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য শ্রীসুকুমার বসু ও শ্রীসুহৃদগোপাল দত্ত শ্রীঅরবিন্দ-অনুরাগী পাঠক সমাজের কাছে যে কৃতজ্ঞভাজন হবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর এবং গ্রন্থমধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমায়ের কয়েকটি আলোকচিত্র থাকায় 'মনস্পতি শ্রীঅরবিন্দ' গ্রন্থটির আকর্ষণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

অধীর দে

অনন্ত সদাশিব আল্টেকর

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ভূতপূর্ব কোলাপুর দেশীয় রাজ্যের কাগাল নামক স্থানে অনন্ত সদাশিব আল্টেকরের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা 'দেশস্থ ব্রাহ্মণ' বংশজাত সদাশিব খাণ্ডোবা আল্টেকর কোলাপুরে আইন ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। সদাশিব লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলকের বিশেষ অনুগত শিষ্য ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে সদাশিব কোলাপুর ত্যাগ করিয়া ইংরেজ শাসিত কারহাদ শহরে আসিয়া আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। পুত্র অনন্ত সদাশিব এই স্থানেই বিদ্যাভ্যাস করিয়া কৃতিত্বের সহিত ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি পুনরায় ডেকান কলেজের ছাত্ররূপে অতিশয় কৃতিত্বের সহিত আই-এও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতেই অনন্ত সদাশিব সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ডেকান কলেজের সংস্কৃত ভাষার এম-এ শ্রেণীতে প্রবৃষ্ট হন ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আকাঙ্ক্ষিত চ্যান্সেলারের স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এম-এ পরীক্ষায় তাঁহার উত্তর পত্র দেখিয়া পরীক্ষকগণ বৈদিক ও লৌকিক সাহিত্য এবং প্রাচীন লিপি বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান লক্ষ্য করিয়া মন্তব্য করেন যে একজন ছাত্রের পক্ষে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত সুলভ এইরূপ জ্ঞান বিশেষ বিস্ময়ের বিষয়। বি-এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য অনন্ত সদাশিব লরেন্স জেঙ্কিন্স স্মারক একটি বৃত্তি পান। এই বৃত্তির সর্ত অনুযায়ী আইন অধ্যয়ন করিয়া তিনি এল-এল-বি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন।

এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনন্ত সদাশিব একটি সরকারী উচ্চপদের প্রার্থী হইয়া সিমলা

যান। সিমলা হইতে ফিরিয়া তিনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময়ে তিনি ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ছিলেন, বস্ত্র পরিবর্তনের সময় পান নাই। পুত্রকে ইংরাজী পোষাকে সজ্জিত দেখিয়া জাতীয়তাবাদী তিলক-শিষ্য সদাশিব অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করেন। পুত্র যখন কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলেন যে চাকুরীর চেষ্টা করিতে সিমলায় যাইতে হইয়াছিল—সেই জন্যই এই পোষাক, তখন পিতা উচ্চকণ্ঠে সরকারী চাকুরী রূপ 'গোলামী'ও বিজাতীয় আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। আদর্শবাদী পিতার প্রাণে আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কায় অনন্ত সদাশিব সরকারী চাকুরী প্রত্যাখান করেন এবং পিতার অভীষ্ট অধ্যয়ন অধ্যাপনা কার্যে আত্ম-নিয়োগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। অতঃপর ইংরাজী পোষাক ত্যাগ করিয়া তিনি পিতার ন্যায় খদ্দর বস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করেন। আজীবন তিনি এই অভ্যাস বজায় রাখিয়াছিলেন।

ছাত্র জীবনে প্রাচীন লিপিমালা অধ্যয়ন অনন্ত সদাশিবের বিশেষ প্রিয় ছিল। প্রাচীন লিপিমালা চর্চা করিতে গিয়া ভারতের প্রাচীন ইতিহাস বিষয়েও তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত হয়। চাকুরীর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া তিনি প্রাচীন কাল হইতে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড়ের প্রসিদ্ধ নগরগুলি সম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন ও এই বিষয়ে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। তরুণ অনন্ত সদাশিবের এই প্রথম গবেষণা-প্রবন্ধটি তৎকালে সুপ্রসিদ্ধ ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্বজ্জনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল (2. A, vols-53-54, 1924-25)। পরে এই নিবন্ধটি পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয় (১)। ইহার পর অনন্ত সদাশিব পশ্চিম ভারতের গ্রাম্য সমাজের ইতিবৃত্ত বিষয়ে গবেষণা করিয়া এই বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন (২)। এই নিবন্ধ-পুস্তকের জন্য তিনি 'হোমি কারসেটজি দাদী' নামক একটি পুরস্কার লাভ করেন।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তরুণ গবেষক অনন্ত সদাশিব বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপকের পদলাভ করেন। অনন্ত সদাশিবের বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের অল্প কিছু কাল পর সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫—১৯৩০) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী' অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস বিষয়ে রাখালদাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের গুরুদায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য তিনি তাঁহার এই পাণ্ডিত্যের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। উপযুক্ত আধার মনে করিয়া রাখালদাস অনন্ত সদাশিবকে লিপিমালা ও প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষ্যানুযায়ী রাষ্ট্রকূট বংশ বিষয়ে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। খ্রীষ্টিয় অষ্টমশতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাষ্ট্রকূটরাজগণ দাক্ষিণাত্যে প্রবল রাজশক্তিরূপে বিদ্যমান ছিলেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে দন্তিদুর্গ প্রথম কৃষ্ণ, ধ্রুব, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ, তৃতীয় গোবিন্দ প্রভৃতির নাম ভারতের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ রাজপুতানা ও মধ্যভারতের গুর্জর প্রতীহার রাজ বৎসরাজ ও গৌড়রাজ ধর্মপালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণই এলোরার সুপ্রসিদ্ধ কৈলাসনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্তমান অন্ধ্র প্রদেশের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে মানখেড় (মান্যখেট) নামকস্থানে রাষ্ট্রকূট বংশীয়দের রাজধানী ছিল। কল্যাণের চালুক্য বংশীয়দের দ্বারা দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাষ্ট্রকূট বংশীয়দের পতন সংঘটিত হয়। দুই বৎসর

কাল অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা অনন্ত সদাশিব রাষ্ট্রকূট বংশীয়দের সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত পূর্ব তথ্য সম্বন্ধীয় গবেষণা সম্পন্ন করেন। এই গবেষণার জন্য ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট্ (সাহিত্যাচার্য) উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে রাখালদাসের মৃত্যুর পর অনন্ত সদাশিব বিশ্ববিদ্যালয়ের মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপক পদলাভ করেন। রাষ্ট্রকূটবংশীয়দের সম্বন্ধে আল্টেকারের গবেষণা নিবন্ধটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় (৩)। রাষ্ট্রকূট রাজবংশ বিষয়ে এই গ্রন্থটি বর্তমানে অতিনির্ভরযোগ্য প্রমাণিত গ্রন্থরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই পুস্তকটির একটি মারাঠি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছিল (রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের ইতিহাস, বরোদা, ১৯৩৪)।

১৯২৩ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনন্ত সদাশিব বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা, হিন্দু সভ্যতায় নারীর স্থান, বারাণসীর প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় কয়েকটি গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন (৪—৮)। এই পুস্তকগুলির মধ্যে কোন কোনটির হিন্দী অথবা মারাঠি অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত এই সময়ের মধ্যে অনন্ত সদাশিব সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় ভারতীয় ইতিহাস পরিষদের উদ্যোগে বাকটক-গুপ্ত যুগ এর ইতিহাস রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। (৯)।

তরুণ বয়স হইতেই অনন্ত সদাশিব প্রাচীন লিপি পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন—এই সূত্রে প্রাচীন মুদ্রায় ক্ষোধিত লিপির পাঠোদ্ধার ও মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সমিতির (Numismatic Society of India) সদস্য পদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় মুদ্রা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্ত সদাশিব ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির মুখপত্রটির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৫৪—৫৭ খ্রীঃ এই তিন বৎসর ব্যতীত ১৯৪০ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই উচ্চাঙ্গ গবেষণামূলক পত্রটির সম্পাদন ভার বহন করেন। ১৯৩৬ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে নিউমিস্‌ম্যাটিক সোসাইটির ও অন্যান্য গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের পত্রিকায় অনন্ত সদাশিব সর্বশুদ্ধ ৯২টি প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব সমিতি মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে মূল্যবান স্মরণীয় গবেষণার জন্য তাঁহাকে 'নেলসন রিট' স্বর্ণপদক দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইহার পর ১৯৫১ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একাদিক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে ৫৭টি প্রবন্ধ রচনা ব্যতীত অনন্ত সদাশিব এই বিষয়ে দুইটি অতি উল্লেখযোগ্য পুস্তক রচনা করেন (১০—১১)। ইহার মধ্যে প্রথমটি বায়নায় প্রাপ্ত গুপ্তযুগের স্বর্ণ মুদ্রার বিস্তৃত বিবরণ ও তালিকা। গুপ্তযুগের মুদ্রা বিবরণ দ্বিতীয় পুস্তকটির বিষয়বস্তু। এই শেষোক্ত পুস্তকটির হিন্দী সংস্করণ 'গুপ্তকালীন মুদ্রায়েঁ' ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে পাটনাস্থিত বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রাজপুতানার অন্তর্ভুক্ত ভূতপূর্ব দেশীয় শাসিত রাজ্য ভরতপুরের বায়না নামক স্থানে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মাচ কতকগুলি গ্রাম্য

বালক দৈবক্রমে মৃত্তিকাখনন কালে ভূগর্ভে প্রোথিত ১৮২১টি প্রাচীন যুগের স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করে। গভর্ণমেণ্ট এই ধনভাণ্ডার পাঠোদ্ধারাদির জন্য ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সমিতিকে অর্পণ করেন। অতঃপর অনন্ত সদাশিব এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি গুপ্ত শাসনকালের বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত ছিল। অনুমান করা হয় যে এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল, তিনি এই মূল্যবান সম্পদ তদানীন্তন রীতি অনুযায়ী গৃহ সংলগ্ন স্থানে প্রোথিত করেন। গুপ্ত-শাসনকালে খ্রীষ্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে হুন জাতীয়দের আক্রমণের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকজনের সহিত প্রাণভয়ে পলায়ন সময়ে ধনী ব্যক্তিটি প্রোথিত স্বর্ণমুদ্রাগুলি সঙ্গে লইবার সময় পান নাই, অথবা তিনি আত্মরক্ষা বা পলায়ন কালেই অত্যাচারী হুনগণ কর্তৃক নিহত হন। হুন আক্রমণকারীগণ অথবা শত শত বর্ষ ধরিয়া অন্য কেহ এই গুপ্ত ধনের সন্ধান না পাওয়াতেই এই ধনভাণ্ডার নিরাপদে মৃত্তিকাগর্ভে রক্ষিত হইয়াছিল। বায়নায় প্রাপ্ত এই ১৮২১টি সুবর্ণমুদ্রার মূল্য তখনকার দিনে ১২ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছিল। ভারতের ইতিহাসে একসঙ্গে এত অধিক সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই। ইংরাজী ভাষায় অনন্ত সদাশিব রচিত বায়নায় প্রাপ্ত মুদ্রা বিষয়ক গ্রন্থটি ভারতে গুপ্ত-যুগের ইতিহাস চর্চার পক্ষে বর্তমানে অপরিহার্য বিবেচিত হইয়া থাকে।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রবর্তিত হইলে অনন্ত সদাশিব এই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বারাণসী হইতে পাটনায় আসেন। অনন্ত সদাশিবের পাটনা আগমনের কিছুকাল পর বিহার সরকারের উদ্যোগে স্বর্গত ঐতিহাসিক কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের (১৮৮১-১৯৩৭) স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁহার নামে একটি রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট বা গবেষণা ভবন স্থাপিত হয়। অনন্ত সদাশিব আংশিক সময়ের জন্য এই গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ হইতে অবসরপ্রাপ্ত হইয়া তিনি একান্তভাবে জয়সোয়াল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউটের পরিচালকরূপে আত্মনিয়োগ করেন।

পাটনায় অবস্থিতিকালে অনন্ত সদাশিব হিন্দুধর্মের উৎস বিষয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন (১২)। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব বিষয়ে অনন্ত সদাশিব ৯৭টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকায় তিনি ইতিহাস, প্রাচীন-লিপি, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রায় ষাটটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়েরী, মডার্ণ রিভিউ, জার্নাল অফ্ দি বিহার য়্যাণ্ড ওড়িশা রিসার্চ সোসাইটি, জার্নাল অফ্ দি বোম্বে হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান হিষ্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি, ইণ্ডিয়ান কালচার, জার্নাল অফ দি বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, য়্যানেলস্ অফ দি ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টেল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, জার্নাল অফ দি গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিয়া, জার্নাল অফ দি নিউমিস্‌ম্যাটিক সোসাইটি অফ্ ইণ্ডিয়া, ভারতীয় বিদ্যা, প্রসিডিংস অফ দি অলইণ্ডিয়া হিষ্ট্রি কংগ্রেস, প্রসিডিংস অফ্ দি অলইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব পরিদর্শক অধ্যাপকরূপে আমেরিকান্ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি ভাষণ দান করেন। এই বৎসরই ভারত সরকার তাঁহাকে ব্রিটিশ

ওয়েষ্টইণ্ডিজে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দানের জন্য প্রেরণ করেন। সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপারে ভারত সরকার কয়েকবার অনন্ত সদাশিবের পরামর্শ গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জার্মানী ভ্রমণ করেন। জয়সোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের পরিচালকরূপে অনন্ত সদাশিব প্রাচীন বৈশালী (মজঃফরপুর সহরের নিকট বসার গ্রাম) ও প্রাচীন পাটলিপুত্র (পাটনা সহরের কুমরাহার) নগরীর স্মৃতি সমৃদ্ধ স্থান দুইটি উৎখনন করিয়া বহু অমূল্য প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন। কুমরাহার উৎখননের বিষয়ে তাঁহার একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় (১৩)। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বেও আল্টেকর গয়া জেলার বেলা পুলিশ থানার নিকটবর্তী সেনাপুর নামক প্রত্নবস্তু সমৃদ্ধ স্থানটির উৎখনন কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। জয়সোয়াল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের রক্ষিত তিব্বতীয় প্রাচীন পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনায় আল্টেকর বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় পুঁথি সংগ্রহের মধ্য হইতে তিনি ত্রয়োদশ শতকে ভারতে আগত এক তিব্বতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতের একটি আত্মজীবনী উদ্ধার করেন। এই পুস্তক হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। আল্টেকর এই পুস্তকটির সম্পাদনা করিয়া গিয়াছিলেন কিন্তু ইহা তাঁহার জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নাই। (Biography of Dharmaswamin —Trs. by G. Roerich Ed. with historicol & critical introduction by A. S. Alterkar, Patna, 1959)

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রাচীন ভারতীয় শাখার সভাপতিরূপে আল্টেকর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বকালীন ইতিহাস উদ্ধারের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান করেন ("can we reconstruct Pre-Bharata war History ?"—দ্রঃ P.I.H.C., 1939) ১৯৪৬ ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব ইণ্ডিয়ান নিউমিসম্যাটিক সোসাইটির অধিবেশনে সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন। এই অধিবেশন দুইটি যথাক্রমে পাটনা ও বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্সের ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে অনন্ত সদাশিব ভারতীয় ইতিহাসে অভ্যুত্থান ও পতনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। (দ্রঃ transactions and proceedings A. O.-R. I, 1949)

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অনন্ত সদাশিব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টেল কনফারেন্সের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে আসামের গৌহাটি শহরে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি কংগ্রেসের দ্বাবিংশতম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনন্ত সদাশিব আল্টেকর এই অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতির ভাষণটির রচনা সম্পন্ন করার পরই আল্টেকর অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে পাটনা জেনারেল হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাঁসপাতালে প্রবেশ করার কয়েক ঘণ্টা পর ২৫শে নভেম্বর প্রত্যুষেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী চারিটি পুত্র ও তিন কন্যা রাখিয়া যান। সারল্য, উদারতা ও অমায়িক স্বভাবের জন্য আল্টেকর পরিচিতদের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র পাটনা শহরে গভীর শোকের ছায়া পতিত হয়।

ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের জন্য আপ্টেকর রচিত সভাপতির ভাষণটি কংগ্রেসের অধিবেশনে ২৭শে ডিসেম্বর মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক দত্ত বামন পোতদার কর্তৃক শোকগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পঠিত হইয়াছিল। আর্যদের ভারতে আগমনের কালটি বিতর্কমূলক। অনন্ত সদাশিব আপ্টেকর তাঁহার অন্তিম রচনায় এ বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধটির সারমর্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

ম্যাক্সমুলারের মত খ্রী: পূ: ১২০০ অব্দের পূর্বেই ঋগ্বেদ রচিত হয়। কীথ বলেন কোনমতেই ইহা ১৩০০ খ্রী: পূর্বে রচিত হয় নাই। উইন্ট্যারনিৎজ বলেন খ্রী: পূ: ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ঋগ্বেদ রচিত হয়। তিলক ওয়াকোবির মতে আনুমানিক খ্রী: পূ: ৪৫০০ অব্দে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছিল। মিতান্নি ভাষায় লিখিত মেসোপোতামিয়ায় আবিষ্কৃত অনুশাসনে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-বরুণ-মিত্র ও নাসত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। এশিয়া মাইনরে কাসাইট ও হিত্তী ভাষায়ও বৈদিক উপাদান পাওয়া গিয়াছে। এই সব কারণে বর্তমানে মনে করা হয় যে আনুমানিক ১৫০০ খ্রী: পূর্বাব্দে আর্যেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া হরাপ্পা সভ্যতার অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করতঃ নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতে আসার পর ঋগ্বেদ রচনার সূত্রপাত হয়। অতএব এ বিষয়ে কীথ্-ম্যাক্সমূলার প্রভৃতির মতই গ্রাহ্য।

এই বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসিতে হইলে (১) পশ্চিম এশীয় ও (২) ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) (৩) বৈদিক সাহিত্য ও (৪) পুরাণোল্লিখিত বংশাবলীর যুগপৎ পর্যালোচনা ও সামঞ্জস্য সাধন প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় প্রায়শই বৈদিক কাল বিচারে একসঙ্গে এই চারিটি বিষয়েরই প্রতি একসঙ্গে দৃষ্টিক্ষেপ করা হয় না।

পার্জিটার পৌরাণিক সাক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই গ্রাহ্য করেন না। পুরুষোত্তম লাল ভার্গব পৌরাণিক ও বৈদিক সাক্ষ্য মানেন কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য তিনি গ্রাহ্যই করেন না। অপরদিকে বর্তমান কালের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে হুইলার ও পিডাটের নিকট বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের সাক্ষ্য ও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

একদেশদর্শিতা ত্যাগ করিয়া প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক সাক্ষ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন দ্বারা ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে ২০০০খ্রী: পূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যগণ ভারতে আগমন করেন এবং পরবর্তী পাঁচ ছয়শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা হরপ্পা সভ্যতার অধিকারীগণের সহিত সহাবস্থান করেন। ১৫০০ খ্রী: পূর্বাব্দের নিকটবর্তী সময়ে হরাপ্পা সভ্যতা বিনষ্ট হয় এইজন্য হুইলার, উলি (Wooley) প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মনে করেন যে এই সময়টিই আর্যগণের ভারতে আগমনকাল। এই সময়েই আর্যেরা হরাপ্পাবাসীদের পরাভূত করিয়াছিলেন ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পূর্বেও তাঁহাদের ভারত প্রবেশ অসম্ভব ব্যাপার নহে। আর্যেরা হরাপ্পা সভ্যতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিলেন ইহার স্বপক্ষে বিশেষ কোন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রায় চব্বিশটি মৃতদেহ গৃহাভ্যন্তরে অথবা পথিপার্শ্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে—এই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটি সমগ্র সভ্যতা ধ্বংসের অপরাধ আর্যদের উপর আরোপ করা যুক্তি সঙ্গত নহে। হরাপ্পা সভ্যতা আততায়ী আর্যদের দ্বারা আকস্মিকরূপে বিনষ্ট হইলে হরাপ্পা ও

মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অসংখ্য মৃতদেহ পাওয়া উচিত হইত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং হরাপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্বকালে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে আর্যদের ভারত প্রবেশের পক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যটি যুক্তিসহ নহে।

হিত্তী ভাষা আনুমানিক ১৫০০-১৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের এই সাক্ষ্যের বশে এই সময়ের পূর্বে আর্যদের ভারতে আগমন সম্ভব নহে ইহা বলা চলে না। হিত্তী (বর্তমান ইরাক-মেসোপটোমিয়া) অঞ্চলে প্রবল প্রতাপশালী স্থানীয় অধিবাসীদের পরাজিত করিয়া আধিপত্য স্থাপন করিতে নিশ্চয়ই হিত্তীয় আর্যদের বহু শতাব্দী সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল, সম্ভবতঃ হিত্তীয় আর্যগণ ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের পূর্বেই এই অঞ্চলে আসিয়াছিল। হিত্তীয় আর্যগণের বংশধরেরাই ভারতে আসেন ইহা প্রমাণিত হইলে আর্যগণের ভারত প্রবেশ কালটি পিছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু হিত্তীয় আর্যরা ঐ অঞ্চলে বসবাস স্থাপনের পর তাহাদেরই সমসাময়িক এক শাখা বা তাহাদেরই বংশধরগণই যে ভারতে আসেন ইহার প্রমাণ নাই। হিত্তীয় আর্যগণের মেসোপটোমিয়া প্রবেশের পূর্বেই অর্থাৎ ২০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের পূর্বেই ভারত ও ইরানীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষেরা হিত্তীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া যান ও বর্তমান ইরানের উত্তরাঞ্চলে অক্সাস নদীর উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন—ইহাই সম্ভব মনে হয়। পরে এই গোষ্ঠীরই একশাখা জীবিকার সন্ধানে উত্তর আফগানিস্তানের পথে ভারত প্রবেশ করেন। হিত্তীয় আর্যগণই ভারতীয় আর্যগণের পূর্বপুরুষ এই যুক্তিতে আর্যদের ভারতে আগমনের কালটি পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইলেও ইহার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি আছে। ভারতীয় আর্যগণেরই একটি শাখা যে মেসোপটোমিয়া অঞ্চলে গিয়া মিত্তানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন নাই—ইহার বিরুদ্ধে কি যুক্তি আছে? হিত্তী ভাষায় বৈদিক দেবতার উল্লেখ এই কারণেও সম্ভব হইতে পারে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত প্রাচীন পাঁচটি আর্য গোষ্ঠীর মধ্যে দ্রুহ্যদের নাম আছে, গান্ধার অঞ্চলে ইহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পৌরাণিক বংশ তালিকায় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল পর্যন্ত যে রাজবংশগুলির নাম পাওয়া যায় তাহার মধ্যে দ্রুহ্যদের নাম পাওয়া যায় না, আনুমানিক ১৭০০ খ্রঃ পূর্বাব্দ সময় হইতে পুরাণ তালিকায় ইহারা নিরুদ্দিষ্ট। এই সময়েই ইহারা পেশোয়ার কাবুল পথে মেসোপটোমিয়ায় গিয়া রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন এমনও হইতে পারে। পুরাণে দ্রুহ্য বংশীয় সর্বশেষ উল্লিখিত নরপতি প্রচেতস্। ইহাকে ম্লেচ্ছ দেশাধিপতি বলা হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে হিত্তী বা মিত্তান্নি ভাষার সাক্ষ্যের উপর ভারতীয় আর্যদের ভারত আগমনকাল তথা ঋগ্বেদ রচনার কালটি অর্বাচীন প্রমাণ করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। বায়ু ও ভাগবত পুরাণের বংশতালিকা অনুযায়ী আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেই ভারতে আর্যগণের আগমন হইয়াছিল।

আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আর্যগণ ভারত প্রবেশ করিয়া প্রথমে অবিভক্ত ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে প্রবেশ করেন। পাঞ্জাবের অম্বালা জেলায় রূপার ও উত্তর প্রদেশের মীরাট জেলার আলমগীরপুর প্রভৃতি স্থান ছিল হরাপ্পা-সভ্যতা অঞ্চলের সীমান্ত ঘাঁটি। এই সীমান্ত ঘাঁটিগুলি কোনক্রমে অধিকার করিয়া গঙ্গা উপত্যকায় আর্যেরা প্রথমে বসতি স্থাপন করেন ইহাই সম্ভব হইতে পারে। হরাপ্পা-সভ্যতার ব্যাপ্তি ছিল ৫২,২৫,০০ বর্গমাইল। একটি বিস্তৃত অঞ্চলে যাহারা একটি অতি উন্নত সভ্যতার প্রবর্তন করিয়াছিল—তাহাদের যে পর্যাপ্ত সামরিক শক্তি ছিল না ইহা অসম্ভব।

হরাপ্পাবাসীদের অনেকগুলি দৃঢ় দুর্গ ছিল—কতকগুলি যাযাবর আর্যের আক্রমণে তাদের প্রাসাদের মত অল্পকালের মধ্যেই হরাপ্পা-সভ্যতা সমগ্র অধিবাসীগণ সহ বিনষ্ট হইয়াছিল ইহা এক প্রকার অসম্ভব। আকস্মিক আক্রমণে রুপার-আলমগীর প্রভৃতি ছোট ছোট ঘাঁটি আর্যেরা প্রথম দিকে জয় করিয়াছিল ইহা সম্ভব হইতে পারে। হরাপ্পা-সভ্যতার অধিবাসীদের জয় করিয়া এই অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করিতে আর্যদের পক্ষে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতে আগমনের প্রথম দিকে আর্যগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এক একটি রাজ্য স্থাপন করেন—ইহাদের নিজেদের মধ্যেই সদাসর্বদা ঝগড়া বিবাদ লাগিয়া থাকিত। পরস্পরের সহিত যুদ্ধে ইহারা অনার্য নৃপতিগণেরও সাহায্য প্রার্থনা করিত ইহাং সুবিদিত। সুতরাং অনুমান করা অসম্ভব নহে যে আর্যগণ দীর্ঘকাল যাবৎ অনার্যগণের সহিত সহাবস্থান বা সহযোগিতায় অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

ঋগ্বেদে ধনবান ব্যবসায়ী ও কুসিদজীবী যে পনি শ্রেণীর উল্লেখ আছে তাহাদের বর্ণনার সহিত হরাপ্পাবাসীদের প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে ঋগ্বেদে 'পনি' আখ্যাটি হরাপ্পাবাসী অথবা তাহাদের মধ্যে একাংশকে বিশেষভাবে বণিকশ্রেণীকে দেওয়া হইয়াছিল। ঋগ্বেদে (৬ ৬১।১—৩) হইতে জানা যায় যে আর্যবংশীয় রাজা দিবোদাস, সরস্বতী নদীতীরে পনিদের সহিত যুদ্ধ করেন। প্রাচীন সরস্বতী নদীর শুষ্ক খাত বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যে ঘাঘর নামে পরিচিত—এই অঞ্চলে হরাপ্পা-সভ্যতার অন্যতম প্রান্তসীমা ছিল। আর্যগণ হরাপ্পাবাসীদের কতকগুলি ঘাঁটি অধিকার করিয়া লইলেও সরস্বতী নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ তাদেরই অধিকারে ছিল, মনে হয় সিন্ধু নদীর নিম্নাঞ্চলেও দীর্ঘকাল তাহাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পনিগণের রাজ্য জয় করিয়া লওয়া অপেক্ষা তাহাদের অর্জিত ধনসম্পদে ভাগ বসানো হয়ত আর্যেরা বেশী পছন্দ করিতেন। পনিদের গাভী ও ধনসম্পদ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার বিবরণও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়— (১।৮৩।৪, ৫।২৪।৭, ৬।১৩।৩, ৪।৩৮।২)। পনিদের সহিত খণ্ডযুদ্ধে আর্যেরা অনেক সময় জয়ী হইতেন আবার অনেক সময় পরাজিতও হইতেন। দশ রাজন্য যুদ্ধে সুদাসের বিরুদ্ধে পাঁচজন আর্য ও পাঁচজন অনার্য রাজার মিলিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই অনার্য নরপতিদের মধ্যে পনি অথবা হরাপ্পার রাজন্যেরাও নিশ্চয়ই গণ্য ছিল। পনিগণ আর্যদের আক্রমণ করিয়া ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে এমন বিবরণও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের সাক্ষ্য হইতে অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে আর্যগণের ভারত আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই হরাপ্পা সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই।

খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকার মধ্যাঞ্চল হইতে মুলতান পর্যন্ত ভূভাগ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত ছিল, পাঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দু আধিপত্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব উনবিংশ শতাব্দীতেও হরাপ্পাবাসী ও আর্যগণ দুইটি পৃথক ধর্ম ও সভ্যতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও প্রায় অনুরূপভাবেই বর্তমান ছিলেন ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

আর্য ও হরাপ্পাবাসীগণের এই সহাবস্থানের ফলে বহু পনি যে বৈদিক ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল ঋগ্বেদে তাহার উল্লেখ আছে। বৃবু নামে এক ধনী পনি আর্য পুরোহিতগণকে প্রচুর ধন দান করিতেন (৬।৪৫,৩১)। পনিদের মধ্যেও ইন্দ্রের জনপ্রিয়তার উল্লেখ দেখা যায় (৬। ৩.৩)। পনিগণ অর্থাৎ হরাপ্পাবাসীগণ কর্তৃক বৈদিক আর্যদেবতাদের আত্মীকরণের দৃষ্টান্ত যেমন পাওয়া যায়, ঠিক

তেমনই ভাবে পাওয়া যায় আর্যগণ কর্তৃক হরাপ্পা-সভ্যতার দেবদেবীগণকে গ্রহণের দৃষ্টান্ত।

বৈদিক রুদ্রদেবতার সহিত মহেঞ্জোদড়োয় প্রাপ্ত পশুপতির সাদৃশ্য আছে। বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক অশ্বত্থ বৃক্ষ ও মাতৃ-দেবতার উপাসনা নিঃসন্দেহে হরাপ্পা সভ্যতা কর্তৃক প্রভাবিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দ অব্দ হইতে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষের ঘটনা সত্বেও হরাপ্পা-সভ্যতার অধিবাসিগণ একই সঙ্গে বসবাস করিয়াছিলেন ও একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এই যুগের ইতিহাসের সূত্র প্রধানতঃ বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণ। বৈদিক-সাহিত্যে সৌভাগ্যক্রমে সুসংরক্ষিত আছে। বৈদিক সাহিত্যে যত্রতত্র রাজকুলের নাম উল্লেখ থাকিলেও ইহা হইতে বংশ পরম্পরা জানার উপায় নাই। পৌরাণিক সাহিত্যে অবশ্য এই বংশ পরম্পরার উল্লেখ আছে। পুরাণগুলিতে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজবংশ বিবরণ সম্বলিত আছে। অথর্ববেদ রচনাকালে একশ্রেণীর ব্যক্তি যে রাজবংশাবলীও প্রাচীন কালের বীরপুরুষদের জীবনের ঘটনাবলী স্মৃতি বদ্ধ রাখিতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ ও ধর্মসূত্র রচনাকালে অর্থাৎ ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী সময়ে এই শ্রেণীর প'ণ্ডিতদের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মসূত্র রচনার অব্যবহিতকাল পরেই পুরাণগুলি বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয়, সুতরাং পুরাণোল্লিত বংশতালিকাগুলি অবিশ্বাস করার কোন কারণ নাই। বিপুল বৈদিক সাহিত্য যে ভাবে যুগের পর যুগ স্মৃতিবদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট লভ্য হইয়াছে, কয়েকশত শ্লোকে বদ্ধ পৌরাণিক বংশতালিকা গুলিও সেইভাবে খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের দিকে পুরাণকারদের নিকট পৌঁছিয়াছিল এবং তাঁহারা এইগুলি পুরাণের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

পুরাণগুলি হইতে প্রাচীন আর্যজাতির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। পুরাণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় হইতে ৯২ জন ইক্ষাকুবংশীয় রাজার নাম ধারাবাহিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এইরূপ যদুবংশীয় ৬৩ জন রাজার নাম পাওয়া যায়। কৌরব বংশীয়দের তালিকায় ৫৩ জন নৃপতির নাম আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় যদি ৯৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ ধরা যায় তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে এই সময়ের পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন অন্ততঃ এমন ৭০।৭৫ জন রাজার নাম পুরাণ হইতে পাওয়া যাইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে যে এক পুরুষের জন্য কত সময় দেওয়া যায়? ঐতিহাসিককালে পূর্ব চালুক্য বংশীয়গণ ৪৬১ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন। ৩২ জন নৃপতি ৪৬১ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিলে গড় প্রত্যেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রতিটি রাজা গড়ে ১৫ বৎসর রাজত্ব করিলে মহাভারত যুদ্ধের কাল হইতে প্রায় ১১০০ বৎসর পূর্বে প্রথম ইক্ষাকুনৃপতির রাজ্য শাসন কাল ছিল। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২১০০।২০০০ অব্দে ইক্ষাকুবংশীয়দের রাজত্বের সূত্রপাত হয়। পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দেই যে আর্যদের ভারতে আগমন ঘটিয়াছিল তাহা দেখানো হইয়াছে। পৌরাণিক সাক্ষ্য হইতেও এই সময়টি পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংস কাল ১৫০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দকে আর্যদের ভারত আগমনের কালরূপে নিধারণ করা সঙ্গত হইবে না। এখন প্রশ্ন থাকিয়া যায় বেদ কখন রচিত হয়? বায়ুপুরাণে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বেদব্যাস বেদগুলি সংগ্রহ করিয়া উহা সঙ্কলন করেন। বেদব্যাস ভীমার্জুনাদির পিতামহ ভীষ্মের বিমাতা সত্যবতীর গর্ভজাত। অতএব বেদব্যাস কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নায়কদের পিতামহের বয়সী ছিলেন সুতরাং আনুমানিক ১১০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ

তৎকর্তৃক বেদ সঙ্কলনের কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়ে যে কোন পণ্ডিতই বেদকে ইহার পরবর্তী বলিতে সাহস করেন নাই। তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে বর্তমানে যে ভাবে বেদ আমাদের নিকট পৌছিয়াছে, তাহাই তাহার প্রাচীন রূপ নহে। প্রত্যিটি বেদের বহুবিধ 'পাঠ' অতীতে প্রচলিত ছিল বর্তমানে ঋগ্বেদের একটি, যজুর্বেদের পাঁচটি, সামবেদের তিনটি ও অথর্ববেদের দুইটি পাঠ প্রচলিত আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার সঙ্কলন কর্তা বেদব্যাস কর্তৃক ইহার প্রদত্ত রূপটিই আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। এই রূপ-লাভ ও মন্ত্ররচনার কালের মধ্যে কয়েক শতাব্দী ব্যবধান রহিয়াছে—সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে খ্রীষ্ট পূ: ২০০০ অব্দ হইতেই ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলির রচনা সুরু হয়। ঋগ্বেদ সংহিতার ভাষা এত প্রাচীন না মনে হইবার কারণ ইহাই যে ইহাতে সঙ্কলনকর্তা বেদব্যাসের সময়ের ভাষার প্রভাব রহিয়াছে। আদিম ভাষাটি আমাদের নিকট পৌছায় নাই। (দ্র: Procedings of the Indian History Congress—1959, P 13—34, Bombay, 1960)

(১) A history of important towns and citizens, in Gujart and Kathiward from earliest times to C. 1300. A. D. (Reprınted from Indian Antiquary), Bombay, 1926.

(২) A histry of Village Communities in Western India, Bombay, 1927.

(৩) The Rastrakutas and their times—Poona, 1934, 2nd edn. 1967.

(৪) Education in Ancient India, Varanasi, 1934, 5th Edn. 1957.

(৫) History of Benares from earliest times to 1937. Vanarasi. 1937.

(৬) Benares : Past & Present, Varanasi, 1943. 2nd Edn. 1947.

(৭) The Position of Women in Hindu Civilizatihn, 2nd edn. 1956 Varanasi ; 1938.

(৮) State and Government in Ancient India—1942 (3rd edn—Delhi, 1958)

(৯) A New History of the Indian People, Vol VI, The Vakataka-Gupta Age, Lahore, 1946.

(১০) Catalogue of Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard, Bombay, 1954.

(১১) The Coinage of the Gupta Emipire, Varanasi, 1957.

(১২) Sources of Hindu Dharma—Sholapur, 1952. (Sain Das fowndation Lectuers)

(১৩) Report on Kumrahar Excavations, 1951—55 (Jointly with V. Misra)

সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পটভূমি ত্রিপুরা

সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

পার্বত্য অঞ্চলসহ ত্রিপুরা জেলার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যময়। এই ইতিহাস প্রাচীন সমতটের ইতিহাসের অন্তর্ভূত। সমতটের প্রাচীনতম উল্লেখ বোধ হয় মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে, আর এই সমতটেরই অংশ ত্রিপুরার প্রাচীনতম উল্লেখ বোধকরি মহারাজা বৈন্যগুপ্তের গুণাইগড় তাম্রলিপিতে (৫০৬-০৭ অব্দ)। ত্রিপুরার অন্তর্গত কুমিল্লা থেকে গুণাইগড় এর দূরত্ব আঠারো মাইল মাত্র। এই গুণাইগড়ের বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্যে পরম শৈব 'মহাদেবপাদানুধ্যাত' বৈন্যগুপ্ত ভূমিদান করেছিলেন। অবশ্য শুধু বৌদ্ধ বিহার নয়, গুণাইগড় লিপিতে ত্রিপুরা জেলায় ব্রাহ্মণ্য দেবতা মহাদেব প্রদ্যুম্নেশ্বর এর মন্দিরেরও উল্লেখ আছে।

চীনা পরিব্রাজক য়ুয়ান-চোয়াং সপ্তম শতকের মাঝামাঝি মগধ থেকে বাংলাদেশে আসেন। তাঁর সময়ে সমতট এক ব্রাহ্মণ বংশীয় রাজার অধীন ছিল। চোয়াং-এর বর্ণনার ভিত্তিতে বর্তমান ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা যে সমতটের অন্তর্ভূত ছিল—এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। স্মিথের মতে বর্তমান বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকার দক্ষিণ-পূর্বাংশ এবং ত্রিপুরার দক্ষিণভাগ নিয়ে সমতট রাজ্য গড়ে উঠেছিল।

চোয়াং সমতটের রাজধানীতে ত্রিশটির বেশি বিহার ও দু'হাজারেরও বেশি ভিক্ষুর অবস্থানের উল্লেখ করেছেন। সপ্তম শতকের শেষদিকে আসেন আরও দু'জন চীনা পরিব্রাজক—ই-ৎসিং ও সেংচি। সেংচির সময়ে সমতটে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিরও আরও প্রসার। তিনি রাজধানীতে চার হাজারের বেশি ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর উল্লেখ করেছেন। সমতটের রাজা তখন রাজভট। তিনি দিনে লক্ষ বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ ও লক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন প্রজ্ঞাপারমিতা থেকে। অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি সামনে নিয়ে শোভাযাত্রা পরিচালনা করতেন।

সেংচি উল্লিখিত রাজভট এবং মহাযানী বৌদ্ধ খড়্গবংশের চতুর্থ রাজা রাজরাজ-কে সংগত কারণেই অভিন্ন বলে মনে করা হয়। রাজরাজ-এর রাজধানী 'জয়কর্মান্ত' ত্রিপুরা জেলার বড়কামতা-র নামান্তর মাত্র। কুমিল্লা থেকে বড়কামতা-র দূরত্ব অনধিক ১২ মাইল। বড়কামতা-র এক মাইলের মধ্যে পাওয়া গেছে অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি, পাঁচ মাইল উত্তরে শুভপুরে পাওয়া গেছে বোধিসত্ত্বের মূর্তি আর বিহার মণ্ডলের (নামটি তাৎপর্যপূর্ণ) নিকটবর্তী বাঘেরপুর-এ পাওয়া গেছে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি।

অল্প কিছুকালের ব্যবধানে কুমিল্লা অঞ্চলে 'রাত' বংশীয় রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই এই বংশের জীবধারণ ও শ্রীধারণ রাত সমতটেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীধারণ রাত-এর কিলান লিপি থেকে অনুমিত হয়, ক্ষীরোদা নদী পরিবেষ্টিত তাঁর রাজধানী দেবপর্বত কুমিল্লার পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতী পাহাড় অঞ্চল। রাত রাজারা বৈষ্ণব হলেও রাজার অনুমোদন ব্যতিরেকে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের পক্ষে বৌদ্ধ বিহারের জন্য ভূমিদান সম্ভব হত না।

ময়নামতী অঞ্চলে খননের ফলে খর্গদের পরে এক দেববংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া গেছে। এই দেবরাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। দেবরাজাদের পতনকালে অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল রাজাদের অভ্যুদয়। তাঁরা ছিলেন পরম সৌগত। পাল রাজাদের প্রায় চারশো বছরের রাজত্বকালে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অনির্বাণ দীপশিখা আবার প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে গড়ে ওঠে নটি বৌদ্ধ বিহার। এগুলির মধ্যে লালমাই-ময়নামতী অঞ্চল সন্নিহিত পট্টিকেরা বিহার ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পট্টিকেরাই আধুনিক পাটিকারা পরগণা।

পাল রাজাদের পরধর্মসহিষ্ণুতা ঐতিহাসিক। তাঁদের দীর্ঘ রাজত্বকালে একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছে অন্যদিকে তেমনই ব্রাহ্মণ্যধর্মও যথেষ্ট আনুকূল্য পেয়েছে। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণগণকেই পাল রাজারা মন্ত্রীপদে নিয়োগ করেছেন এবং ব্রাহ্মণস্ত দেবদেবীর পূজা ও মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান করেছেন। বস্তুত পালযুগে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ক্রমশ একটা সমন্বয়ের প্রয়াস দেখা যায়। বৌদ্ধরা যেমন ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীকে স্বীকার করে নেন, ব্রাহ্মণরাও তেমনই বহু সহযানী দেবদেবীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই সমন্বয়ের প্রয়াসেই শিব-বুদ্ধ এবং বুদ্ধ-বিষ্ণুর একীকরণের কথা শোনা যায়। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সমন্বয় চিন্তার ফল সমাজের নানা স্তরে ছড়িয়ে পড়ার ফলে শুধু বৌদ্ধধর্মেরই রূপান্তর ঘটেনি, সেইসঙ্গে তার প্রভাব অন্যান্য ধর্মের উপর গিয়ে পড়ে এবং বাংলার ভাব ও সংস্কৃতির জগতে এক বিপ্লব ঘটায়।

সমগ্র ত্রিপুরা জেলা না হলেও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ যে পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ জোলাইবাড়ীস্থিত পিলাক অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন স্তূপ, ব্রোঞ্জের পদ্মপাণি বুদ্ধ, পাথরের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি ও ময়নামতীতে আবিষ্কৃত টেরাকোট্টার অনুরূপ টেরাকোট্টার আবিষ্কার থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় পাল যুগের বা চন্দ্রযুগের কোন এক সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের পিলাক অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিল। বিভিন্ন বৌদ্ধ মূর্তির সঙ্গে এই অঞ্চলে যে সব বৃহদাকার গণেশ ও মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গেছে তা থেকেও অনুমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ের যুগেই এই বৌদ্ধ কেন্দ্রটি বিকাশ লাভ করেছিল।

পালবংশের পতনকালে ময়নামতী অঞ্চলে এক বৌদ্ধ চন্দ্রবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। চন্দ্ররাজারা প্রথমে ময়নামতী ও পরে বিক্রমপুরে রাজধানী গড়ে তোলেন। এই বংশের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে বলে ধরা হয়। একাদশ শতকের একটি সচিত্র পুথিতে চন্দ্রদ্বীপের দ্বিভুজা তারা, ত্রিপুরার চম্পীতলা, পট্টিকেরার চুন্দা, সমতটের জয়তুঙ্গ লোকনাথ, হরিকেল-এর শীল লোকনাথ ও ভগবতী তারা প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর ছবি দেখা গেছে। পুথিটি আছে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পালরাজাদের পরে ব্রাহ্মণ ধর্ম রাজাদের রাজত্বকালেও বৌদ্ধদের ধর্মাচরণে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটেছিল বলে মনে হয় না। একাদশ শতকের শেষদিকে হরিবর্ম-এর রাজত্বকালে তিনটি বৌদ্ধগ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। হরিবর্মের ভাই সামলবর্ম প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরের জন্য ভূমিদান করেন।

ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে সমতট অঞ্চলে দেববংশীয় রাজাদের রাজত্বকালের যেমন উল্লেখ পাওয়া গেছে তেমনই পাটিকারা অঞ্চলে স্বাধীন রাজা রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেব এর নামও পাওয়া গেছে।

হরিকালদেব ১২০৪ অব্দ পাটিকারার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন এবং প্রায় সতের বছর রাজত্ব করেন। হরিকালদেব ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হলেও তাঁর আনুকূল্যে রাজমন্ত্রী ধড়িএব (ব্রহ্মদেশ সুলভ উপাধি) পাটিকারা নগরে বৌদ্ধবিহারের জন্য ভূমিদান করেন। দেববংশের পরাক্রান্ত রাজা দামোদরদেব (১২২১—১২৪৩ খ্রীঃ) 'অরিরামচামুরমাধব সকল ভূপতি চক্রবর্তী' উপাধি ধারণ করেন এবং বর্তমান ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মোটামুটি হিসাবে চারশো বছরেরও বেশি কাল বাংলাদেশে বৌদ্ধধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে এতদিনের মধ্যে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠা কতদিন ছিল তা ঠিক বলা শক্ত, কারণ মহাযান বৌদ্ধ মতবাদে তান্ত্রিকতার ছোঁয়া পাল রাজত্বকালেই লাগে। মহীপালের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ প্রজ্ঞাভদ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধ হয়ে তিলোপা বা তিল্লিপা নাম গ্রহণ করেন। অষ্টম-নবম শতকে ততটা সুস্পষ্ট না হলেও দশম শতকেই বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক বিবর্তন ধরা পড়ে। পাল-চন্দ্র রাজত্বকালে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি বৌদ্ধতান্ত্রিক সাধন-পদ্ধতির ইঙ্গিত পাওয়া যায় হেবজ্র, হেরুক, মিতাতপত্রা, বজ্রভৈরব, হয়গ্রীব, জম্ভাল, তারা, চুন্দা প্রভৃতি তান্ত্রিক বৌদ্ধ মূর্তির আবিষ্কারের ফলে। ত্রিপুরাও যে এই প্রভাবমুক্ত ছিল না তা বোঝা যায় ত্রিপুরা থেকে আবিষ্কৃত হেবজ্র, হেরুক, মিতাতপত্রা প্রভৃতি মূর্তি থেকে। এছাড়া উনকোটি পাহাড়ের গায়ে খোদাই-করা একাধিক মূর্তির বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবদেবীর সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সেন-রাজত্বকালের সূচনা থেকেই বাংলাদেশে বৌদ্ধ বিতাড়ন সুরু হয়ে যায় বলে একটা কথা শোনা যায়। কিন্তু তা যদি সত্যি হত তাহলে বৌদ্ধ আচার্য শরণ লক্ষ্মণসেনের সভায় স্থান পেতেন না। শুধু লক্ষ্মণসেন কেন, মধুসেনের রাজত্বকালেও মহাযানগ্রন্থ 'পঞ্চরক্ষা'র অনুবাদ হয়েছে। তবু একথা স্বীকার্য যে, সেন-যুগে বৌদ্ধধর্মের 'অস্তাঙ্গমিত মহিমা'। কিন্তু তার কারণ শুধু সেন রাজত্বকালে হিন্দুদের বৌদ্ধ-বিরূপতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবজাগরণই নয়, সেই সঙ্গে মহাযানী বৌদ্ধদের আত্মকলহ তথা অবক্ষয়ও বটে। সেন-রাজত্বের অবসানকালে শুধু বৌদ্ধবিহার নয়, হিন্দুদের মন্দির ও দেবদেবীর অঙ্গহানি কম হয়নি।

সুতরাং একথা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত যে, অন্তর্বিরোধ ও বহিশত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়েই একাদশ শতকের বৌদ্ধরা সহজিয়া বা শৈবতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করতে থাকেন। ত্রিপুরার ময়নামতী অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র শৈবনাথ ধর্মে দীক্ষিত হন বলে জনশ্রুতি। ত্রিপুরার উনকোটি পাহাড়কে কেউ কেউ পরবর্তীকালে শৈবনাথপন্থীদের গুপ্ত সাধন-পীঠ বলে চিহ্নিত করতে চান। এ সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওয়ার মত তথ্যাদি না থাকলেও উনকোটির অসংখ্য মূর্তির মধ্যে কয়েকটিতে শৈবনাথপন্থার লক্ষণবৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া শক্ত নয়।

সহজিয়া মতবাদ ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত নানাভাবে টিঁকে ছিল—শেষ পর্যন্ত হয়ত বৌদ্ধপ্রভাব শূন্য হয়েও। ১৪৩৬ অব্দে বেণুগ্রামে বোধিচর্যাবতার-এর পুথির নকল তৎকালীন তান্ত্রিক-প্রবণতাই প্রমাণ করে। কিন্তু এত কথার পরেও স্বীকার করতে হবে যে, বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন কোনদিনই হয়নি বরং আরাকানী প্রভাবে এবং সংস্কারসাধনের ফলে 'থেরবাদ' রূপে আজও

বেঁচে আছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, কুমিল্লায় এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অঞ্চল বিশেষে কয়েকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে।

এখন ত্রিপুরার রাজাদের সময়কালে আসা যাক্। বড়ো আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এই রাজ-বংশের ঐতিহাসিক উল্লেখ পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়। ১৪৫৮ অব্দে রাজা ধর্মমাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন। এই রাজবংশের গাথাকাব্য রাজমালায় এই কথাই আছে কিন্তু কোথাও বৌদ্ধ-প্রসঙ্গের ছিটাফোঁটা নেই। অথচ পিলাক অঞ্চলে প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ধর্মমাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের আগের জীবনের সংক্ষিপ্ত উল্লেখও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। রাজমালার ভাষায় ;

'বড় পুত্র তীর্থে গেল সন্ন্যাসী হইয়া।
উদাসীন সঙ্গে চলে রাজপুত্র হইয়া'॥

এই 'উদাসীন' সম্প্রদায়ের যে স্বল্প বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে ঠিক বুঝা যায় না এই উদাসীরা শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত সংসার-বিমুখ ভিন্নতর কোন যোগীসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে রাজপুত্রের 'ধর্মমাণিক্য' নাম গ্রহণের মধ্যেও কি কিছু রহস্য লুকিয়ে নেই। এই পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময় থেরবাদী ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মাথায় বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বাঙালী বড়ুয়া বৌদ্ধদের বিশ্বাস। ত্রিপুরার লালসাই পাহাড়ের যে বৌদ্ধ আশ্রম স্থাপিত হয় সেখানে ত্রিপুরার রাজবংশের একজনকে নাকি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করা হয়। দীক্ষান্তে তিনি ঐ স্থানে একটি বিহার ও মন্দির নির্মাণ করেন এবং ঐ মন্দিরে পরিনির্বাণ বুদ্ধের বিরাট মূর্তি স্থাপন করেন। ত্রিপুরার রাজবাড়ীতে এখনও একটি বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। মূর্তি কোন্ সময়ে এবং কোথা থেকে রাজবাড়ীতে স্থানান্তরিত হয় তা অবশ্য সঠিক জানা যায় না। মহারাজা দেবমাণিক্যের রাজত্বকালের সূচনা ১৫২০ অব্দে। তিনি তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হন এবং শবসাধনাকালে নিহত হন। এই তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ ও শাক্ততন্ত্রের মিলনসঞ্জাত কৌল সাধনা হওয়া বিচিত্র নয়।

রত্নমাণিক্য থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজাদের মুদ্রায় হিন্দু দেবদেবীর নাম বা দেবদেবীর মূর্তি দেখা গেলেও তাঁরা যে কোনদিন তাঁদের কৌলিক চতুর্দশ মুণ্ড দেবতার পূজায় বিরত হয়েছেন এমন উল্লেখ নেই। মহারাজা কল্যাণমাণিক্য কালিকা পূজা ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণের সঙ্গে 'ধর্মে'র উদ্দেশে মঠও উৎসর্গ করেছিলেন। কল্যাণমানিক্যের ধর্মপূজার তাৎপর্য কম নয়। ধর্মঠাকুরের পূজায় বৌদ্ধ-হিন্দু-তান্ত্রিক-কৌম ধর্মবিশ্বাসের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছিল বলেই অনুমিত হয়।

ত্রিপুরার রাজাদের চতুর্দশ কুলদেবতার পরবর্তীকালে যে হিন্দু নামকরণ হয় তা সাহিত্যেই সীমিত। প্রকৃতপক্ষে বার্ষিক খাটি ও কের পূজায় যে চতুর্দশ দেবতার পূজা হয় তাদের কৌলিক নাম ও পূজার প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান এখনও অপরিবর্তিতই আছে। শুধু হিন্দু প্রভাবের ফলে চণ্ডীপাঠ এই অনুষ্ঠানে অঙ্গীভূত হয়েছে বলা যায়। আষাঢ় মাসের শুক্লাষ্টমীতে খাটিপূজা ও একপক্ষকাল পরে শনি বা মঙ্গলবারে কের পূজা অনুষ্ঠান। দেবদেবীর নাম মা-দেব, লাম্প্রা, সাংরংমা, লংত্রাই, বনিরক, যুমনাইরক, গাং, বিনাইকর, বুড়া দেবতা, লম্প্রাবুচা, তবাকাত্রিসৎ, বুকাসিং, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি।

পাঁঠা, হাঁস, পায়রা ও ডিম পূজার প্রধান উপকরণ। আগে কেরপূজার অঙ্গ ছিল নরবলি। চোদ্দ দেবতার দৈনিক পূজায় লাগে একটি পাঁঠা ও তিনটি করে ডিম। শুক্লাষ্টমীতে বাড়তি খাসী ও আঠারোটি ডিম।

পূজা-পদ্ধতির এই মিশ্র রূপ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ত্রিপুরার রাজারা পঞ্চদশ শতকেই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও দেবার্চনা ও সামাজিক ব্যাপারে নিজেদের আচার অনুষ্ঠানও কৃত্যপদ্ধতি আদৌ বর্জন করেননি। এইভাবে দুই ধর্ম ও সংস্কৃতির সহাবস্থানের ফলে বরং স্বাভাবিকভাবেই একটা সামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে তাঁদের জীবনচর্যায়।

বাংলাদেশে তৎকালীন প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনের আর একটা উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হল মন্দিরনির্মাণ শিল্প। ত্রিপুরার প্রাচীনতম মন্দিরগুলির অধিকাংশই উদয়পুর অঞ্চলে। গঠনের দিক দিয়ে মন্দিরগুলি নিঃসন্দেহে ইসলামীপ্রভাবযুক্ত বাংলার চার-চালা মন্দির সদৃশ। কিন্তু ত্রিপুরার মন্দিরের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এগুলির বৌদ্ধস্তূপ সদৃশ শীর্ষভাগ। এই সঙ্গে ইসলামী মিনারের চতুষ্কোণের ঢেমনাও উল্লেখযোগ্য।

মহারাজা ধন্যমাণিক্য কর্তৃক ১৫০১—০২ অব্দে (মতান্তরে ১৫২০—২১) নির্মিত (রূপান্তরিত ?) ত্রিপুরাসুন্দরীর 'মঠ' বা মন্দিরই রাজ্যের প্রাচীনতম মন্দির বলা যায়। মন্দিরটি রাজমালার মতে বিষ্ণুর জন্য নির্মিত হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত মন্দিরে স্থাপিত হয় কালীমূর্তির। পঞ্চদশ শতকের যে ত্রিপুরা ও সন্নিহিত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম লোপ পায়নি সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির সম্বন্ধে আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এটির বর্মী প্যাগোডা বা ধর্মীয় স্তূপ ভারতেরই অবদান। প্রাচীন তিন শ্রেণীর বর্মী স্তূপই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধস্তূপের অনুরূপ। ত্রিপুরার স্তূপশীর্ষ মন্দিরগুলির সঙ্গে প্রাচীন বর্মী প্যাগোডার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। যা কিছু বৈচিত্র্য আছে তাও হয় চতুর্দশ দেবতার মন্দির বা গুণবতী গুচ্ছ মন্দিরে দেখা যায়।

আবার কেউ কেউ বলেন, ঊর্ধ্বভাগে গোলার্ধকার অণ্ডের নিচে চক্রাকৃতি পাল ও সেন যুগের স্তূপোপরি ছত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—অবশ্য আকার ও নকশার পার্থক্য এক্ষেত্রে স্বীকার্য। এখন প্রশ্ন হল। চতুর্দিকে মুসলিম শক্তি পরিবেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে এই আরাকানী বৌদ্ধরীতি অনুসৃত হল কি ভাবে ? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, স্তূপ হয়েছে স্থলপথে হয় চট্টগ্রাম না হয় আসামের মধ্যে দিয়ে। আবার কেউ কেউ অন্য কথা বলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'অষ্টসহস্রিক প্রজ্ঞাপারমিতা'র সচিত্র পুথির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ঐ পুথিতে (১০১৫—১৬ অব্দের নেপালী প্রতিলিপি) স্তূপ-শীর্ষ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য (বৌদ্ধও প্রভাবিত) দেবদেবীর মন্দিরের চিত্র আছে। যেমন, ওড্ডীয়ানের বজ্রপাণি-মঙ্কোষ্ঠ-এর মন্দির, রাঢ়ের ধর্মরাজীক চৈত্য ও জাত লোকনাথের মন্দির। কাজেই যেখানে আঞ্চলিক নজীর রয়েছে সেখানে আরাকানী প্রভাবের সম্ভাবনা স্বভাবতই হ্রাস পায়। তবে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মন্দিরে স্তূপ সদৃশ শীর্ষ যোজনা শুধুই বাঙালী স্থপতিদের প্রাচীন শৈলী রক্ষার প্রয়াস বলে মনে করা শক্ত। বরং এই মন্দিরগুলির নির্মাণকাল আরও প্রাচীন কিনা সেই প্রশ্নই নতুন করে জাগবে। এই মন্দিরটি কি সংস্কার পূর্বকালের কোন বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মন্দির ছিল না ? বিশেষ করে যখন পঞ্চদশ শতকেই ভিক্ষু চন্দ্রজ্যোতি লালমাই পাহাড়ে বৌদ্ধ আশ্রম তৈরি

করেন আর সীতাকুণ্ড পাহাড়ে তৈরী করেন বৌদ্ধ মন্দির—যা পরবর্তীকালে চন্দ্রনাথ মন্দিরে রূপান্তরিত হয় ?

ত্রিপুরার ধর্ম ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের উল্লেখসূত্রে এই আলোচনা সুরু করা হয়েছিল। আলোচন ফলে দেখা গেছে, সমতটের অংশ হিসাবেই ত্রিপুরার শৈব, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এবং পরিশেষে আদিবাসী ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক সহাবস্থান ও সামঞ্জস্য ঘটেছে যুগে যুগে। কাজেই ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে যেমন অবিমিশ্র হিন্দু ও আদিবাসী সংস্কৃতির মিশ্ররূপ বলা যায় না তেমনই বৌদ্ধ ও আদিবাসী সংস্কৃতির মিশ্ররূপও বলা যায় না। এই তিনটি প্রধান সংস্কৃতির মধ্যে সংঘাতের বাহ্যিক প্রকাশ যে কোথাও ঘটেনি তা নয় তবে এই তিন সংস্কৃতির সামঞ্জস্যও পরিশেষে সমন্বয় ঘটেছে তার বাহ্যিক প্রকাশ সর্বত্র সুলভ না হলেও অন্তত ত্রিপুরাতে যে দেখা গেছে তা বোধ হয় নিঃসন্দিগ্ধভাবেই বলা যায় পিলাক ও ঊনকোটির কথা মনে রেখে। পিলাকে যেমন বৌদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে তেমনই পাওয়া গেছে ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর মূর্তি। আর একদা কিরাত অধ্যুষিত অঞ্চল ঊনকোটিতে তো আজও ছড়িয়ে রয়েছে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-কৌল ভাবপুষ্ট সাধনার অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি। জনমানসে প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যেই এই সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল এবং সে প্রয়োজন জাতীয় সংহতির পরিপ্রেক্ষিতে বোধ করি আজও ফুরোয়নি।

কয়লাখাদের বিবরণ

পরিমল চক্রবর্তী

কয়লা সম্বন্ধে আমরা অনেকেই শুনেছি এবং দেখেছি। কিন্তু এই কয়লা কোথায় কি ভাবে পাওয়া যায় এবং আধুনিক জীবনযাত্রায় এর ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা অনেকেই ভালোভাবে জানি না। সাধারণভাবে আমরা যে কয়লা দেখি বা ব্যবহার করি তা হোলো পোড়া কয়লা বা কোক্ (coke)। কিন্তু খাদ বা মাইন (mine) থেকে যে কয়লা তোলা হয় তার নাম পাথুরে কয়লা বা কোল্ (coal)। এই পাথুরে কয়লাকে একটা বিশেষ প্রক্রিয়ায় পুড়িয়ে পোড়া কয়লা পাওয়া যায়।

এই প্রবন্ধে আমরা খুব সংক্ষেপে এই পাথুরে কয়লার উৎপত্তি, শ্রেণীবিভাগ, অবস্থান এবং খনি থেকে কয়লা তোলার ব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখব। এর পর থেকে লিখবার সুবিধার জন্য পাথুরে কয়লার বদলে কেবলমাত্র কয়লা শব্দটি ব্যবহার করব।

কয়লার উৎপত্তি এবং তাহার শ্রেণী-বিভাগ

পৃথিবীতে মানুষ আস্বার বহু আগেই কয়লার উৎপত্তি হয়ে আছে। আজ থেকে প্রায় ২০-৩০ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বহু অংশই ছিল জলাভূমি। মাটি তখনও খুব একটা শক্ত হয়নি। ঐ সময় পৃথিবীর জলবায়ু এবং আবহাওয়া ছিল গভীর অরণ্য এবং বিশাল গাছপালা জন্মাবার পক্ষে অনুকূল। বহু সহস্র বছর ধরে চলেছিল এই বনরাশির সৃষ্টির আর ধ্বংসের বিবর্তনের ইতিহাস। বিশাল বনরাশি নষ্ট হয়ে সেই নরম জলাভূমিতে বসে গেল এবং তার ওপর আবার নতুন অরণ্যের জন্ম হোলো। হয়তো জলের স্রোত নিয়ে গিয়েছিল এই বিশাল বনরাশির ধ্বংসাবশেষ কোনো বিশাল হ্রদে। হাজার হাজার বছর ধরে উদ্ভিদের এই ধ্বংসাবশেষের পাহাড় জমতে লাগলো এই হ্রদে। আর নিজের চাপে নিজে তলিয়ে যেতে লাগল পৃথিবীর মধ্যে। তারপর এর উপরে জমতে আরম্ভ করলো জলে বয়ে আনা পলি মাটির স্তর। হাজার হাজার বছর ধরে চলল এই বৃত্তাকার আবর্তনশীল প্রক্রিয়া, উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ এবং তার উপর পলিমাটির স্তর। বনরাশির ধ্বংসাবশেষ উপরের চাপে চলে যেতে লাগলো মাটির বহু নীচে।

উপরের স্তরের চাপের জন্য উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ যতই নীচে যেতে লাগলো তার উপর চাপ ততই বাড়তে লাগলো। এর উপর আছে পৃথিবীর গভীরের উত্তাপ, উপরের পলিমাটির চাপ। এবং পৃথিবীর ভিতরের উত্তাপ এই বনরাশির পচনমণ্ডের মধ্যে আনল—আমূল রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে ধ্বংসাবশেষ থেকে জলের পরিমাণ কমতে আরম্ভ করলো। চাপের ফলে স্তরের ঘনত্ব বাড়তে থাকলো এবং একই সঙ্গে স্তরের বেধ কমতে লাগলো। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তনের পদ্ধতি এতই জটিল যে সাধারণভাবে এখনও পর্যন্ত তাকে ব্যাখ্যা করা কঠিন। কিন্তু একটা কথা বেশ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা যায় যে এই পচনমণ্ডের আনবিক গঠন সময়ের সংগে চাপ এবং উত্তাপের সাহায্যে জটিল থেকে

জটিলতর হয়েছে। তার ফলে এই বস্তু থেকে জলীয় এবং উদ্বায়ী অংশ কমেছে ও স্থিরীকৃত স্থায়ী অঙ্গার বেড়েছে।

খুব সাধারণভাবে কাঠের অবস্থা থেকে প্রতি ধাপের অবস্থাকে একটা মাত্র অনুপাত দিয়ে বেশ ভালোভাবে বোঝাতে পারা যায়। এই অনুপাতটা হচ্ছে স্থিরীকৃত অঙ্গার/উদ্বায়ী অংশ যত সুষ্ঠ এবং সুন্দর ভাবে কয়লায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া হবে এবং অনুকূল ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ পাবে ততই ভালো কয়লা পাওয়া যাবে এবং উপরে যে অনুপাতের কথা বলা হয়েছে তার মান ততই বেড়ে যাবে।

পৃথিবীর বেশীর ভাগ কয়লাই সাধারণ ভাবে 'বিটুমিনাস্ কোল্' এর ধাপ পর্যন্ত আসতে পারে। কিন্তু বিটুমিনাস্ থেকে অ্যানথ্রেসাইটের ধাপ পর্যন্ত যেতে হলে বিশেষ ভূতাত্ত্বিক পরিবেশ এবং প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সব জায়গায় ঐ পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া হয় না বলেই কয়লা বলতে সাধারণভাবে বোঝা যায় বিটুমিনাস্ কোল. 'অ্যানথ্রেসাইট' কয়লার ঘনত্ব বেশী এবং স্থিরীকৃত অঙ্গার প্রায় পুরোটাই, এই কয়লা জ্বালান কঠিন কিন্তু একবার জ্বালালে অনেকক্ষণ জ্বলবে এবং সাধারণ কয়লার চেয়ে তাপ অনেক বেশী দেবে।

সাধারণভাবে ভূবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রথায় এবং মাঝে মাঝে যন্ত্রের সাহায্যে কয়লাস্তরের অবস্থান পরিমাপ ইত্যাদি ব্যাপারে খবরাখবর দেবার পর আসল মাইনিং-এর কাজ আরম্ভ হয়। কয়লাস্তরের পরিমাপ-আয়তন-বেধ এবং ওপর থেকে স্তরের দূরত্ব সম্বন্ধে জানা হলে তখন বেশ ভালোভাবে নকশা করে খাদ সংক্রান্ত ব্যাপারে সব খুঁটিনাটি বিষয় ঠিক করা হয়। এর নাম সর্বাঙ্গীন খাদ-পরিকল্পনা। তারপর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়।

কয়লাস্তরের অবস্থান, মাপ ইত্যাদি জানবার পর প্রথম কাজ হোলো চানক খোঁড়া (shaft sinking)। এই চানক খোঁড়ার কাজটা হোলো মাইনিং-এর প্রথম ধাপের কাজ। এর মানে হচ্ছে মাটির উপর থেকে মাটির নীচের কয়লাস্তরে যাবার জন্য খাড়া কুয়োর মত রাস্তা, সাধারণতঃ এই চানক প্রত্যেক খাদের জন্য দুটো বা তার বেশী থাকবার নিয়ম। চানকের গঠন গোলাকার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আয়তাকার হয়। চানকের গঠনের মাপ নির্ভর করে চানকের গভীরতা কয়লা তোলার পরিমাপ চানকের অন্য কাজে ব্যবহার ইত্যাদির উপর। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে চানকের ব্যাস ৩ মিটার থেকে ৭-৮ মিটার পর্যন্ত হয়। বড় ব্যাসের চানক বড় খাদের জন্যই হয়, চানক কত গভীর হবে তা নির্ভর করছে মাটির উপর থেকে কয়লাস্তরের দূরত্বের উপর। আমাদের দেশে এখন প্রায় ৬০০।৭০০ মীটার নীচে পর্যন্ত কয়লা তোলার কাজ চলছে। ভবিষ্যতে আরও নীচের স্তরের কাজ করবার পরিকল্পনা আছে। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এই চানক কাটার কাজটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। জমি থেকে ৮।১০ মিটার নীচে মাটি কেটে গেলেই পাথর পাওয়া যায়। চানক খোঁড়ার কাজে মাইনিং সংক্রান্ত একাধিক সমস্যা আসতে পারে। যেমন জলের সমস্যা, হাওয়ার সমস্যা, চারপাশে দেয়াল ধরে রাখার সমস্যা, কাটা মাল তোলার সমস্যা, লোকের ওঠা-নামার সমস্যা, পাথর কাটার সমস্যা, নিরাপত্তার সমস্যা ইত্যাদি। খনি বিশেষজ্ঞকে এই সমস্ত সমস্যা একটার পর একটা সমাধান করতে হয়। যেমন ঝুলন্ত পাম্পের সাহায্যে চানকের নীচের অংশের সব জল তুলে ফেলার ব্যবস্থা করা, উপর থেকে পাখার সাহায্যে বিশুদ্ধ হাওয়ার নলের মধ্য

দিয়ে পাঠানো, লোহার, কংক্রিটের অথবা ইটের ভালো গাঁথনি করে চানকের চারপাশে মুড়ে যাতে কোনো কিছু ভেঙ্গে না পড়ে, লোকজনের ওঠা-নামার জন্য ছোট ডুলি (cage)-এর বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি……। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এই চানক দুটিই হচ্ছে উপরের পৃথিবীর সঙ্গে মাটির নীচের কাজের লোকদের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা এবং এই চানককে খাদের জন্মের প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত সুস্থ সবল রাখতে হবে। এই রাস্তায় গোলযোগ হলেই সমস্ত খাদের বিপদ এবং তার সংগে ভিতরের কাজের লোকদেরও বিপদে পড়তে হবে। এক একটা খাদের জীবন নির্ভর করে কয়লার পরিমাণ, অবস্থান, জমির পরিমাপ, এবং মাইনিং-এর পদ্ধতির উপর। বড় বড় কয়লার খাদে একশ বছরের ও বেশী কাজ চলে। ছোট খাদের জীবন সাধারণতঃ ১০ থেকে ২০ বৎসর পর্যন্ত হয়।

চানক খোঁড়ার পর চানকের মাথার উপর ১০-১৫ মিঃ উঁচু একটা লোহার ফ্রেম 'হেড্‌গিয়ার' বানানো হয়। এই হেড্‌গিয়ারের উপর বসানো থাকে দুটি অথবা চারটি বিশাল পুলি, চানকের মুখ থেকে সামান্য দূরে একটা ঘরের মধ্যে থাকে ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন।

খাদের ভিতরে লোকজন ওঠা-নামার জন্য ও নীচে থেকে কয়লা উপরে তুলে আনবার জন্য দুটি ডুলি বা 'কেজ' এই চানকের মধ্যে উপরে নীচে যাতায়াত করে। ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন সাধারণভাবে একটা বিরাট বড় 'ড্রাম'-কে ঘোরায়। সেই ড্রামে লোহার দড়ি জড়ানো থাকে। দড়ির এক দিকটা থাকে ড্রামের সংগে বাঁধা আর অন্য দিকটা হেডগীয়ারের উপর পুলি দিয়ে ডুলির মাথার সংগে বাঁধা থাকে। এইরকম দুটো দড়ি ওয়াইন্ডার ড্রামের দুই অংশে বাঁধা থাকে এবং ড্রামে পরস্পর পরস্পরের উল্টোদিকে জড়ানো থাকে। ইঞ্জিনটা যখন চলতে আরম্ভ করে তখন একটা ডুলি যতখানি নীচের দিকে যায় অপর আর একটা ডুলি ততটা নীচে থেকে উপরে চলে আসতে থাকে। এর মানে হচ্ছে ওয়াইন্ডার ড্রামের একদিকে দড়ি জড়াতে আরম্ভ করলে অন্যদিকে দড়ি খুলে ডুলিসহ নীচে চলে যায়। যেহেতু এই ডুলি করেই লোকজন কাজের জন্য উপর-নীচে যাতায়াত করে সেইজন্য ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিনের প্রত্যেকটা অংশ খুব সাবধানে তৈরী করা হয়। এর উপরই লোকের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত। এই ইঞ্জিন বিকল হলেই খাদের নীচের মানুষদের অসহায় হয়ে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না। চালু অবস্থায় ইঞ্জিন খারাপ হলে তো ভিতরের লোকদের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগে পাকানোর এই যন্ত্রে বা ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিনে অনেক রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়েছে, যার ফলে এই ইঞ্জিনের চালক ভুল করলেও যন্ত্রটি নিজে নিজেই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এই যন্ত্রের আধুনিকীকরণও অনেক রকম হয়েছে।

গভীর খাদের জন্য ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিনের ড্রামের ব্যাস প্রায় ৪-৫ মিটার হয় এবং সেই ড্রামগুলিতে প্রায় ৯০০-১০০০ মিটার লম্বা লোহার দড়ি থাকে, এই দড়ির ব্যাস প্রায় ৫০-৬০ মিলিমিটার হয়, বড় ওয়াইন্ডিং ইঞ্জিন চালাতে প্রায় ১৫০০-৩০০০ কিলোওয়াট শক্তির মোটরের প্রয়োজন হয়।

খাদের নীচে কয়লাস্তর পর্যন্ত চানক যাবার পর আরম্ভ হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এই কাজকে বলা যেতে পারে খাদের গঠনমূলক কাজ। এখন নক্শা মত কয়লার মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়। এই সুড়ঙ্গের মাপ সাধারণভাবে নির্ভর করে উপর থেকে কয়লা স্তরের গভীরতা এবং কয়লার

স্তম্ভের মাপের উপর। সুড়ঙ্গের মাপ প্রস্থে ৩ মিটার থেকে ৪'৬ মিটার এবং উচ্চতায় ১'৫ মিটার থেকে ২ মিটার পর্যন্ত হয়, অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে এই মাপের পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়।

চানকের নীচের কয়লা খোঁড়ার নক্‌শা খুব সাবধানতার সাথে তৈরী করতে হয়, কারণ এই নক্‌শার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতে এই খাদের কয়লা উৎপাদন ক্ষমতা। চানকের নীচের নক্‌শার নাম ইংরাজীতে বলে 'পিট্‌-বটম লে-আউট'। কোন রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটবে, কোন রাস্তা দিয়ে আবার বোঝাই গাড়ী যাবে, কিভাবে খালি গাড়ী নীচে নামানো হবে, বিশুদ্ধ হাওয়া কোন রাস্তা দিয়ে কাজের জায়গায় যাবে তার সমস্ত ব্যবস্থাই এই সময় ঠিক করতে হবে। পরিকল্পনার ভুলের জন্য অনেক বড় বড় খাদে উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও বাড়ানো যায় না কেবলমাত্র চানকের নীচের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার জন্য। খাদের 'বট্‌ল্‌ নেক' বা বোতল মুখ বলা যেতে পারে চানকের নীচের এই জায়গাটাকে, খাদের নানা জায়গার থেকে নানান লাইনে কয়লা এসে জমা হয় চানকের নীচে। এই কয়লাকে ঠিকমত উপরে পাঠানোর কাজের উপর নির্ভর করছে চানকের নীচের পরিকল্পনার কার্যকারিতা।

কয়লা কাটার নকসা—স্তরের মধ্য থেকে কয়লা ইচ্ছে মত কাটলে কয়লা পুরোটা কখনই পাওয়া যাবে না বরং বিপদের সম্ভাবনা আছে। কি ভাবে কয়লা কাটতে হয় এবং কোথা থেকে কাটতে হয় তার বিশেষ বিশেষ নমুনা আছে।

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে চানক খোঁড়া এবং চানকের নীচের গঠনমূলক কাজ করবার পর নীচের নকসামত সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়। এই প্রথম পর্যায়ের কয়লা কেটে স্তরের অবস্থান সম্বন্ধে জেনে নেওয়াকে ডেভেলপমেণ্ট কাজ বলা হয়। কয়লার মধ্যে সুড়ঙ্গ কাটা হয় এবং দুটি পাশাপাশি সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা করে কয়লার স্তম্ভ রাখা হয়। এই কয়লার স্তম্ভের মাপ নির্ভর করে কয়লা স্তরের গভীরতা, সুরঙ্গের পরিমাপ, কয়লার উপরের পাথরের অবস্থা ইত্যাদির উপর। সাধারণভাবে এর মাপ ৩০ মিটার থেকে ৫০ মিটার হয়। এইভাবে সমস্ত কয়লাস্তরের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ আর স্তম্ভ বানানো হয় এই পদ্ধতির নাম 'বোর্ড এণ্ড পিলার সিষ্টেম', এবং এর প্রথম ধাপের কাজকে বলা হয় 'ডেভেলপমেণ্ট ওয়ার্ক' বা সম্প্রসারণ সম্পর্কিত পদ্ধতি। দ্বিতীয় ধাপের কাজের নাম স্তম্ভ কাটার কাজ। এই কাজটা একটু বিপদজনক। প্রথম ধাপের কয়লার উপরের স্তরগুলির চাপ কয়লার স্তম্ভ বেশ ভালোভাবেই বহন করতে পারে। কিন্তু যেই স্তম্ভ কাটার কাজ আরম্ভ হোলো তখন থেকেই উপরের স্তরের চাপের তারতম্য শুরু। তার ফলে উপর থেকে পাথর ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশী। স্তম্ভ কাটার সময় কাজের জায়গা এবং তার আশেপাশে কাঠের এবং লোহার ঠেস দেওয়া হয়। এই ঠেসের দুটো কাজ। প্রথম কাজ উপরের পাথর যাতে হঠাৎ ভেঙ্গে না পড়ে। আর দ্বিতীয় এই ঠেস গুলি দেখে অথবা ধরে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলে দিতে পারে আর কয়লা কাটার কাজ চালানো যাবে কিনা। স্তম্ভ কাটার কাজেরও অনেক নিয়ম-কানুন আছেন। বর্তমান কয়লা কাটার পর শূন্য জায়গাটা জল আর বালি দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হয়। এই কাজের নাম বালিপূরণ বা 'স্যাণ্ড ষ্টোইয়িং' এর ফলে খাদের কাজ কিছুটা নিরাপদ হয়েছে। তবে শূন্যস্থান বালি দিয়ে পূরণের নানান ঝকমারি আছে। এই গেল এরকম কাজের কথা এ ছাড়া পৃথিবীর নানান দেশে আরও নানান পদ্ধতিতে কয়লাকাটার

কাজ হয়। তবে প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে একটা নিয়ম সকলেই মেনে চলে যে কয়লাকে এমন পদ্ধতিতে কাটতে হবে যাতে প্রায় সব কয়লাটাই কেটে নিয়ে আসা যায় এবং উপরের পাথরের স্তরগুলির ভারসাম্য হঠাৎ বেসামাল হয়ে না পড়ে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে কয়লার উপরের স্তরের ভারসাম্যের গোলমাল হলে কোনো রকমে কাঠ অথবা লোহার রক্ষণী বা স্তম্ভ দিয়ে খাদকে ধরে রাখা যায় না।

খাদের নীচে কিভাবে কয়লা কাটা হয়

আগে আমাদের দেশে কয়লা কাটা হত গাঁইতি দিয়ে। যে সমস্ত লোক গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতো তাদের বলা হোতো 'মাল কাটার'। যে কেউ গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতে পারবে না। কারণ সুড়ঙ্গের মধ্যে ছোট জায়গায় গাঁইতি চালাবার একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। এ কাজটা বেশ কষ্টসাধ্য। কয়লা যে সুড়ঙ্গের মধ্যে কাটা হয় তাকে বলা হয় কয়লাস্তর-মুখীন কাজের জায়গা। খাদ যখন নতুন থাকে কাজের জায়গাগুলি চানকের কাছাকাছি থাকে। খাদ বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই কয়লা কাটার জায়গাগুলি অনেক দূরে দূরে চলে যায়। বড খাদে অনেক সময় এই কয়লা কাটার জায়গাটা চানক থেকে ২।৩ মাইল দূরে থাকে, কয়লা কাটার জায়গা পর্যন্ত ছোট ছোট রেললাইন পাতা থাকে, এই লাইনের উপর ছোট গাড়ী চলাচল করে। এই গাড়িগুলি সাধারণতঃ ১ টন কয়লা নিতে পারে। কয়লা কাটা হলে দ্বিতীয় দলের লোকেরা এসে কাটা কয়লাকে গাড়ীতে বোঝাই করে ঝুড়ি বেলচার সাহায্যে এদেরকে 'বোঝাই কুলী' অথবা লোডার বলা হয়। এইরকম ভাবে কয়লা কাটার জায়গায় বেশ কিছু টাব বোঝাই হলে 'হলেজ ইনজিনের' আকর্ষণ যন্ত্রের বা দড়ি টানা যন্ত্রের সাহায্যে এই বোঝাই গাড়ীগুলিকে কয়লাস্তর থেকে চানকের নীচে নিয়ে আসা হয়। তারপর কয়লা বোঝাই গাড়ীগুলিকে ডুলির মধ্যে করে খাদের উপরে নিয়ে আসা হয়। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত অনেক খাদেই এই পদ্ধতিতে কয়লা কেটে খাদের উপরে নিয়ে আসা হয়।

কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে আধুনিক যুগে কয়লার চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে কয়লা কাটার ব্যবহার পরিবর্তন হচ্ছে। কয়লা কাটার এবং বোঝাই করার জন্য নানারকমের যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। এই যন্ত্রের কাজ করার পদ্ধতি এতই জটিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা বেশ দুরূহ কাজ। আমাদের দেশে এখন কয়লা কাটার যন্ত্র দিয়ে কয়লার মধ্যে একটা 'কাট' দেওয়া হয়। একটি মটরের সাহায্যে একটা লোহার চেনকে একটা লোহার বার বা বেলনের উপর ঘোরান হয়। সেই চেনটার মধ্যে অনেকগুলি লোহার দাঁত বা ছোট গাঁইতি লাগান থাকে। এখন আস্তে আস্তে সেই ঘূর্ণায়মান চেনটাকে কয়লার গায়ে নিয়ে যাওয়া হয়, চেনের মধ্যে যে দাঁত লাগানো আছে তা দিয়ে স্তরে একটা 'কাটনী' বা 'কাট' দেওয়া হয়। এর পরের কাজ হচ্ছে ড্রিল যন্ত্র নিয়ে এসে কয়লার স্তরে ৯/১০টি ফুটো করা হয়। এই ফুটোগুলির ব্যাস ২৫-৩০ মিলিমিটার এবং লম্বায় প্রায় ১.৫মিঃ/২মিঃ। এইবার এই ফুটোর মধ্যে যতটা বারুদ বিস্ফোরণে বিপদের সম্ভাবনা নেই ততটা ভরে দূর থেকে ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই কাজের নাম ব্লাসটিং অপারেশন বা বিস্ফোরণের কাজ। এক এক করে 'ব্লাসটিং' করার পর 'কোল ফেসে' প্রায় ১২/১৬ টন কয়লা পাওয়া যায়। তারপর এই কয়লা বোঝাই কুলী দিয়ে অথবা বোঝাই যন্ত্র দিয়ে

'কনভেয়ারের' সাহায্যে চানকের নীচে পাঠান হয়। বিদেশে এখন কয়লা কাটা এবং তোলার জন্য এমন সব যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যার সাহায্যে কয়লা কাটা এবং এবং একই সঙ্গে কয়লা বোঝাই করার কাজ চলতে থাকে। সেখানে খাদের কাজ হতে থাকা কয়লার স্তরে মানুষের সংখ্যা খুব কম থাকে। কারণ নূতন যন্ত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনেক মানুষের কাজ করে দেয়।

খাদের ভিতরের হাওয়ার বন্দোবস্ত

আগেই বলেছি যে মাটির নীচে কয়লা স্তরের মধ্যে যে সুড়ঙ্গ কাটা হয় তার সঙ্গে উপরের যোগাযোগ হচ্ছে কেবল মাত্র দুই বা ততোধিক কূয়োর মত চানকের সাহায্যে। এ কথা সকলেই জানে যে মাটির নীচে লোক যেখানে কাজ করে সেখানে বিশুদ্ধ হাওয়ার দরকার। খাদের ভিতরে বিশুদ্ধ হাওয়া দেবার জন্য সাধারণতঃ কোন একটি চানকের মুখে একটি বা দুটি বিশাল পাখা চালানো হয়। এই পাখা খাদের ভিতরকার যত দূষিত হাওয়া টেনে বার করে নিয়ে আসে। সুতরাং অন্য চানকের মুখ দিয়ে পৃথিবীর উপরের বিশুদ্ধ হাওয়া খাদের ভিতরে প্রবেশ করে। এই নির্মল হাওয়া ভিতরে গেলে তাকে সুন্দরভাবে খাদের সমস্ত জায়গায় এবং বিশেষভাবে কাজের জায়গায় নিয়ে যেতে হয়। খাদের উপরের বিশুদ্ধ হাওয়া চানকের মধ্য দিয়ে নীচে গেলেই তার-মধ্যে রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক পরিবর্তন আরম্ভ হয়। একদিকে হাওয়ার মধ্যে 'অক্সিজেন' এর অংশ কমতে থাকে এবং 'কারবন্ ডাই অক্সাইড' সামান্য বেড়ে যেতে থাকে। এই পরিবর্তনের প্রধান কারণ হ'ল লোকজনের নিশ্বাস প্রশ্বাস, কয়লার মৃদু দহন ক্রিয়া অক্সিজেনের সঙ্গেই অথবা 'কারবন ডাই অক্সাইডের' কয়লা স্তর থেকে বার হয়ে আসা। কয়লাস্তরে সব সময় 'মিথেন' গ্যাসের সংমিশ্রণ থাকে বাতাসের সঙ্গে কোন কোন খাদের মধ্যে মৃদু পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড এবং 'নাইট্রাস গ্যাস'ও পাওয়া যায়। উপরের সব গ্যাসই মানুষের পক্ষে বিপদজনক। সেইজন্য প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ হাওয়া খাদের মধ্যে না পাঠালে যে কোন গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে মানুষের জীবন বিপন্ন করতে পারে। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ড যেমন মানুষের শরীরের সব জায়গায় বিশুদ্ধ রক্ত পাঠিয়ে দূষিত রক্তকে লাংসে পাঠিয়ে দেয় তেমনি খাদের বড় পাখা খাদের ভিতরকার দূষিত বায়ু খাদ থেকে বার করে সেই সব জায়গায় পরিষ্কার হাওয়া পাঠায়।

অবস্থা বিশেষে এই বিশাল পাখা খাদের উপরে অথবা নীচে বসান যেতে পারে। তবে কয়লাখাদে এই পাখা খাদের বাইরে মাটির উপরেই বসাবার নিয়ম। খাদের এই পাখার ব্যাস ১.৫মি থেকে ৪.৫ মিঃ হতে পারে। এই পাখা এক সেকেণ্ডে ৫০ থেকে প্রায় ২৫০ ঘনমিটার হাওয়া খাদের ভিতর থেকে বার করে দেয়। সুতরাং সমপরিমাণ বিশুদ্ধ হাওয়া অন্য চানক দিয়ে খাদের ভিতরে ঢোকে। এত বড় পাখা চালাতে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। বড় খাদের পাখা চালাতে ২০০—৩০০ থেকে ২০০০ কিলোওয়াট শক্তির মোটরের প্রয়োজন। এই মোটর পাখা চালাবার জন্য রাতদিন চলে। কারণ পাখা বন্ধ হলেই নীচের লোকের বিপদ। সেইজন্য উপরের এই পাখাবন্ধ হলেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লোকজনকে চানকের কাছে নিয়ে আসার নিয়ম আছে তবে একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে খাদে পাখা বন্ধ হলেই যে নীচের লোকের জীবন সংশয় তার কোন মানে নেই, উপরের পাখাবন্ধ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ খাদে বিশুদ্ধ হাওয়া থাকে।

খাদের ভিতরে বিপদের আশঙ্কা

মাটির নীচের কয়লা কাটার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীর নানা দেশের বহুবৎসরের খাদের লোকের বিপন্ন জীবনের করুণ কাহিনী। খাদের ভিতরের দুর্ঘটনার কথা হয়ত সুপরিচিত কিন্তু কি করে এইসব দুর্ঘটনা ঘটে এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কি ভাবে এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করার বন্দোবস্ত করা হয় তা হয়ত ততটা পরিচিত নয়।

প্রথমেই বলেছি যে কাঠ থেকে কয়লা পরিবর্তনের ধাপের মধ্যে নানান রকমের রাসায়নিক জটিল প্রক্রিয়া ঘটেছে, এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে কয়লাস্তরের মধ্যে নানান 'হাইড্রোকারবণ' গ্যাস হয়। এই গ্যাসের মধ্যে 'মিথেন' গ্যাস প্রায় সব কয়লার মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং কয়লাকাটার সঙ্গে সঙ্গেই মিথেন গ্যাস কয়লা থেকে বার হয়ে খাদের মধ্যকার হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়। মিথেন গ্যাসের কোন গন্ধ নেই, কোন স্বাদ নেই, বাতাসের চেয়ে হালকা হওয়ার দরুণ এই গ্যাস সুড়ঙ্গের রাস্তার উপরের দিকে জমা হবে এবং উপর দিকে যেতে চেষ্টা করবে। আবার এই গ্যাস হাওয়ার সঙ্গে মিশে প্রচণ্ড বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরী করে। এখন যদি এই বিস্ফোরক মিশ্রণ কোন স্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে অথবা আগুনের কাছে আসে তবে বিশেষ পদ্ধতিতে এই গ্যাস জ্বলে যেতে পারে অথবা বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। বিস্ফোরণ এত জোরে হতে পারে যে এক মুহূর্তে খাদের নীচের সমস্ত লোক নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। বহু বহু বৎসর ধরে খাদের লোকেরা এই গ্যাস সম্বন্ধে জানত না এবং তার ফলেই খাদের বহু লোক কাজ করতে গিয়ে অসহায় ভাবে প্রাণ দিয়েছে। স্যার হামফ্রে ডেভি (১৭৭৮—১৮২১) প্রথম একজাতীয় নিরাপত্তা বাতি আবিষ্কার করলেন। যার সাহায্যে এই মিথেন গ্যাসের অবস্থান এবং পরিমাণও জানা যেতে লাগল। এই মহৎ আবিষ্কার খাদ জীবনে আনল নূতন যুগের সূচনা। একবার যদি এই গ্যাসের অবস্থান সম্বন্ধে জানা যায় তবে নানান প্রক্রিয়ায় সেই গ্যাস তাড়াবার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। আধুনিক যুগে অনেক রকমের যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে যার সাহায্যে এই গ্যাস জমলে তার সংকেত পাওয়া যায়। এবং দরকার মত তার পরিমাপ জানা যায়। এছাড়া এখন খাদে বাতাস প্রেরণের ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে যার ফলে মিথেন গ্যাস খাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জমবার অবকাশ পায় না। এমন অনেক দেশে খাদের মধ্যে বিশেষ স্থানে মিথেন গ্যাস ১.২৫ শতাংশ জমলেই তার সংকেত পাওয়া যায় এবং নিয়ম অনুযায়ী খাদের মধ্য থেকে ইলেট্রিক পাওয়ার সপ্লাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবং এই গ্যাস কমাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও নেওয়া হয়। একটি কথা মনে রাখা দরকার যে খাদের মধ্যে মিথেন গ্যাস থাকলেই বিস্ফোরণ হয় না। এই গ্যাস থেকে বিস্ফোরণ হবার জন্য দরকার বাতাসে মিথেন গ্যাসের অংশ শতকারা ৪৫ থেকে ১৪৮ ভাগ হওয়া এবং আগুন অথবা স্ফুলিঙ্গের অবস্থান এবং তার সংস্পর্শন। খাদের মধ্যে ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতিগুলি বিশেষভাবে তৈরী, এই সব ইলেকট্রিক যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ অগ্নি বা স্ফুলিঙ্গ নিরোধক করে তৈরী হয়। এর অর্থ যন্ত্রের মধ্যে স্ফুলিঙ্গ থাকলেও তা চার পাশের হাওয়ার মধ্যে মিথেন গ্যাস জ্বলে ওঠার শক্তি রাখে না।

পৃথিবীতে খাদের মধ্যে যত বড় বড় বিস্ফোরণ হয়েছে তার বেশির ভাগ বিস্ফোরণ হয়েছে বাতাসে ভেসে থাকা 'কয়লাগুড়ো' থেকে, কয়লাগুড়ো বিস্ফোরণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হয় মিথেন গ্যাস

বিস্ফোরণের পর। খাদের মধ্যে কয়লার গুড়ো বাতাসে থাকবেই, এবং সাধারণত যে পরিমাণ কয়লাগুড়ো বাতাসে থাকে সেটা একটা বিরাট বিস্ফোরণ ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে কয়লাগুড়োর বিস্ফোরণ চট্ করে নিজে নিজে হতে চায় না। এই প্রকারের বিস্ফোরণ শুরু করার জন্য চাই আবার একটি ছোট বা সূচনাকারী বিস্ফোরণ বা 'ডিটোনেটর বা ইনিসিয়েটর' বিস্ফোরণ। মিথেন গ্যাস বিস্ফোরণ সাধারণতঃ কয়লাগুড়ো বিস্ফোরণ ঘটাতে খুব সাহায্য করে। কয়লা খনির মধ্যে বড় বিপদ দেখা দেয় যখন কোন কারণে খনির ভিতরে আগুন লেগে যায়। প্রত্যেক কয়লারই একটা স্বভাবসিদ্ধ দহন ক্রিয়ার প্রবণতা থাকে তার মানে হচ্ছে কয়লা বাতাস থেকে মৃদু অক্সিজেন নিয়ে নিজেই গরম হতে হতে হঠাৎ জ্বলে উঠে। এবং সহর সদৃশ মাটির নীচের সুড়ঙ্গের নানা অলি-গলির মধ্যে কোথায় যে কি ভাবে আগুন লাগতে পারে তা ধারণা করা খুবই মুশকিল. সেইজন্য প্রবীণ ও বিচক্ষণ লোকেরা প্রায় প্রতিদিনই তাদের নানান অলি-গলির মধ্যে অনুসন্ধান চালিয়ে আসেন। অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ খনিবিদেরা ঘ্রাণ গ্রহণ করেই বলে দিতে পারেন এই জাতীয় বিপদের আশঙ্কার কথা। এ ছাড়াও আরও নানান কারণে খাদের ভিতরে কয়লার আগুন লাগতে পারে। যেমন ইলেকট্রিক তার থেকে, কাজের জন্য যে তেল নেওয়া হয় তাতে আগুন লেগে ইত্যাদি কারণে। যে কোন কারণেই হোক খাদের মধ্যে একবার আগুন লাগলে সেই আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করা বেশ দুরূহ কাজ। প্রথম কারণ এই আগুন থেকে যে কোন মুহূর্তে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি খাদের কোথাও অল্প আগুন লাগে তবে কয়লার সঙ্গে অক্সিজেনের আংশিক দহন ক্রিয়া (Incomplete combustion) হয় এর ফলে উৎপন্ন হয় সবচেয়ে ভয়াবহ এবং মারাত্মক গ্যাস 'কার্বন মনোক্সাইড্' এই গ্যাস যদি অতি সামান্য পরিমাণে ও খাদের হাওয়ার মধ্যে থাকে তবে লোকের অজান্তেই লোককে পঙ্গু করে ফেলে অথবা মৃত্যু ঘটায়। এই গ্যাসের গন্ধ নেই স্বাদ নেই। বাতাসে যদি ১০০০ ভাগের মধ্যে মাত্র ৫ ভাগ এই গ্যাস থাকে তবে ২০-৩০ মিনিটের মধ্যে একটি সুস্থ সবল লোকের মৃত্যু ঘটতে পারে। এবং যদি এই গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে এক শতাংশ থাকে তবে ১/২ বার নিশ্বাস নিলেই একটি মানুষের মৃত্যু হতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে এই গ্যাসে আক্রান্ত লোক বুঝতেই পারবে না যে সে এই গ্যাসের কবলে পড়েছে। সাধারণতঃ এই গ্যাস খাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কারণে খাদে আগুন লাগলে অথবা কোন বিস্ফোরণের পর এই গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তখন খাদের মধ্যে যেতে হলে গ্যাস মুখোশ পরে কাজকর্ম করতে হয়।

কোন জায়গায় এই গ্যাস অল্প পরিমাণে আছে কি না তা জানতে হলে আগেকার দিনে এমন কি এখনও পর্যন্ত খাঁচায় করে একটি ছোট ময়না পাখি নীচে নিয়ে যেতে হয়। পাখি খুব অল্প পরিমাণে এই গ্যাস থাকলেই সাড়া দেবে। এবং পাখির কাছ থেকে সাড়া পাবার পর কোন ক্রমে বিনা মুখোশে খাদের ভিতরে যাওয়া উচিত নয়। পাখি যে পরিমাণ গ্যাসে সাড়া দেবে সাধারণভাবে সেই পরিমাণ গ্যাস মানুষের পক্ষে মারাত্মক হয় না। তবে কার্বন মনোক্সাইড যদি বেশী পরিমাণে থাকে তবে পাখি ও মানুষ প্রায় এক সঙ্গেই আক্রান্ত হবে। এখন অবশ্য নানান রকমের কার্বন মনোক্সাইড্ অনুসন্ধানের যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিদেশে স্বয়ংক্রিয় ডিটেকটর দিয়ে এই গ্যাসের পরিমাণের অংশও জেনে নেওয়া হয়।

খাদের মধ্যে আরও নানান গ্যাস আছে যথা—কার্বন-ডাই-অক্সাইড্, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ইত্যাদি। যে কোন একটি গ্যাসের পরিমাণ খাদের মধ্যে বেড়ে গেলেই খাদের কর্মীদের বিপদের সম্ভাবনা আছে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে এইসব গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে যদি খাদে হাওয়া পাঠাবার এবং তা পরিবেশন করার ব্যবস্থাটা ঠিক না থাকে।

খাদের মধ্যে আরও নানান বিপদের সম্ভাবনা আছে যথা জল ঢুকে যাওয়া, চাল ধ্বসে পড়া অথবা হঠাৎ দেয়াল ধ্বসে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে কোন বিপদই বিপদ নয় যদি মানুষের বুদ্ধি ঠিক মত কাজ করে।

খাদের কাজের ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাটির নীচের খাদের লোকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এবং নূতন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার এবং ব্যবহার এমনভাবে করা হচ্ছে যার ফলে খাদের লোকদের কর্মকষ্ট এবং বিপদের আশঙ্কা হ্রাস পায়।

আলো-আঁধারের কবি নেরুদা-পাউণ্ড

সুরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রায় সমসাময়িক না হলেও পাউণ্ড আর নেরুদার আবির্ভাব ঘটেছে একই শতকের কাব্যাকাশে। তাঁরা একই যুগের দুই কীর্তিমান পুরুষ, দুজনেই যুগ যন্ত্রণায় জর্জরিত। তবুও নির্মম হলেও এ কথা বলতেই হবে যে এজরা পাউণ্ড বা পাবলো নেরুদা কেউই যথাসময়ে উপযুক্ত কাব্য মর্যাদা পান নি। যদিও বা পাবলো নেরুদা লেনিন পুরস্কার লাভ করার পর থেকে খ্যাতি বিস্তার এবং উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু এজরা পাউণ্ডের জীবন কেটেছে কেবলই হাহাকারে, তীক্ষ্ণ, তীব্র লাঞ্ছনা আর চরম যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে।

একদা প্রচণ্ড ইহুদী বিদ্বেষী পাউণ্ড অনেক ক্ষতিকর মন্তব্য করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার জন্যে কোনদিনই পাউণ্ডকে ক্ষমা করেন নি দীর্ঘ বারো বৎসর মানসিক হাঁসপাতালে বন্দী থাকার পর অনেক কবি সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় যদিও বা তিনি মুক্তি পেয়েছেন, তবুও ভেনিসেই তাকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনদিনই তাঁকে স্বদেশে স্থান দেয় নি। অথচ ঐ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রসঙ্গেই পাউণ্ড একবার সরস মন্তব্য করেছিলেন 'দি বিগেষ্ট ল্যুনাটিক আসাইলাম ইন্ দি ওয়ার্লড'; কেবলমাত্র তাই-নয় অধিকাংশ মার্কিন অ্যানথোলজী বা কাব্য সংগ্রহেও পাউণ্ডের কবিতা বাদ পড়েছে, এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্তেও 'আমেরিকান একাডেমি এণ্ড দি ন্যাশানাল ইন্‌স্টিটিউট অব্ আর্টস এ্যাণ্ড লেটারস' সংস্থা প্রতি বৎসর যে সুযোগ্য ও যথোপযুক্ত ব্যক্তিকে 'ইমার্সন মরো' পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন, শেষ বৎসরে বিচারক মণ্ডলী এজরা পাউণ্ডকেই এই পুরস্কারের উপযুক্ত বলে মনোনীত করেন, কিন্তু পরিচালক মণ্ডলী পাউণ্ডের সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টিকে অস্বীকার করে, জীবনের অন্যান্য দিক পর্যালোচনা করে পাউণ্ডকে পুরস্কারের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে সেই মনোনয়ন নাকচ করে দেন। ভেনিসে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বৃদ্ধ পাউণ্ড তাই বড় দুঃখে আত্ম সমালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন—নিজেকে আমার বড় অশিক্ষিত নির্বোধ বলে মনে হয়, আমার সারা জীবনটাই কেবল ভুলে ভরা।............অথচ এই পাউণ্ড কি? কবি, সমালোচক অথবা অনুবাদক তাই নিয়েই সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিতর্কের ঝড় বয়েছে দীর্ঘকাল। জ্যেষ্ঠ কবি ইয়েটসকে তিনি সমালোচনা করেছেন তীব্র ভাবে, উপদেশ দিয়েছেন, আবার তরুণ কবি টি. এস এলিয়টের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশনার জন্য সকলের কাছে চাঁদা তুলেছেন পরম উৎসাহে, কাটাকুটি করে এলিয়টের বেঠিক কবিতাগুলোকে সঠিক রূপদান করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথকেও সমালোচনা করেছেন অতুল উৎসাহে, গীতাঞ্জলি পাঠ করে বিশ্বস্ত জ্ঞানে অবিস্মরণীয় বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি। (যদিও পরবর্তীকালে টি. এস এলিয়টের ন্যায় পাউণ্ডও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন) অ্যাংলো স্যাকসন, চীন, জাপান, ফরাসী ও অন্যান্য বহু অপ্রচলিত ভাষা থেকে অনুবাদও প্রচুর করেছেন। অত্যন্ত তরুণ বয়সেই পাণ্ডিত্যের জাঁকজমকে আর কবিতার নূতন পদ্ধতিতে সবাইকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে থাকাকালীন পাউণ্ড

'পার্সনি' নামক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করলেন, আর এই গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকেই কবিতার গতির বদল ঘটল, জন্ম নিল ইমেজিষ্ট মুভমেণ্ট। আর ঐ একটি কাব্যেই পাউণ্ড সিনক্লেয়ার, ষ্ট্রাং ওয়েজ, ইয়েটস্, রথেনষ্টাইনদের মত শিল্পী সাহিত্যিকদের হৃদয় জয় করে নিলেন। ঐ বৎসরেই যৌথ সহযোগিতায় প্রকাশ করলেন ব্লাষ্ট পত্রিকা। তরুণ কবিদের জন্ম হতে লাগল আর ইমেজিষ্ট মুভমেণ্ট ছড়িয়ে পড়তে লাগল সারা পৃথিবীতে।

এ হেন অশান্ত হৃদয়ের চিত্তাকর্ষক কবি পাউণ্ডের সমস্ত সাহিত্য স্বীকৃতি জীবনের একটি ত্রুটির জন্যেই চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেল। পাউণ্ড তার চোখ ঝলসান কবিতাগুলো পড়িয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে যত না উৎসাহ পেয়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী পেয়েছেন জোচ্চর আর ভণ্ড উপাধিটি। পাউণ্ডের অনবদ্য অনুবাদগুলো পড়েও বিশেষজ্ঞরা ভুল আর বিকৃত বলে ভুয়ো প্রতিপন্ন করে পাউণ্ডের প্রতিভাকে অস্বীকার আর নষ্ট করে দিতেও পেছপা হন নি। পাউণ্ডের সর্বাধিক পরিচিত কাব্য সম্ভারটি হল পিসান ক্যানটোস। এই কাব্য সম্ভারে তাই পাউণ্ডের যন্ত্রণার আর দুঃখের প্রতিফলনই অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। ইহুদী বিদ্বেষী ক্লান্ত কবি এজরা পাউণ্ডের জীবনের তাই অধিকাংশ সময়েই অতিবাহিত হয়েছে তীব্র যন্ত্রণা আর লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়ে।

প্রায় সমকালেই চিলির কাব্যাকাশে অরুণোদয় ঘটেছে, সূর্যের কিরণ পড়তে শুরু করেছে আর সেই সূর্য স্বয়ং নেরুদা। চিলির কাব্যের সীমানা ভেঙ্গে ক্রমেই তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উপস্থিত হচ্ছেন, নিজের সম্পর্কে যিনি মন্তব্য করেছিলেন নিঃশ্বাসের মত কবিতা ছাড়াও আমি বাঁচতে পারি না। সেই নেরুদা, যিনি দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতাকে চোখে দেখেছেন, হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন এবং কাব্য সাহিত্যে তার ফসল ফলিয়েছেন। রোমান্টিকতা, সুররিয়েলিজম সমস্ত স্তরকে অতিক্রম করে ধূলি-মাটি থেকে কাব্য উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ হেন পাবলো নেরুদাও কিন্তু তাঁর কাব্য রচনা শুরু করেছিলেন রোমান্টিক কবিতার বাতাবরণেই। কিন্তু স্পেনের গৃহযুদ্ধ নেরুদাকে গৃহহারা করেছে। এরপর ফুল ফেলে নেরুদা হাতে তুলে নিয়েছেন আগুন জ্বালিয়েছেন হাতের মশালকে আর এগিয়ে এসেছেন বিশ্ব সাহিত্যকে আলোকিত করতে। গতানুগতিক কবিতার ধারাকে বদল করে অভিজ্ঞতার কষ্টি পাথরে কবিতাকে উপস্থাপিত করেছেন মেহনতী মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন—

'ভাইসব আমাদের লড়াই চলবে
ফ্যাক্টরিতে মাঠে'—

একজন কবির এরচেয়ে সংগ্রামী ডাক আর কি বা হতে পারে। নেরুদা হলেন ল্যাতিন আমেরিকার সবচেয়ে বড় শিল্পীত প্রতিবাদ। রাজনৈতিক নেতাদেরকে মঞ্চ থেকে তুলে সরাসরি কাব্যের বিষয়বস্তু করে নিয়েছেন। মাও সে তুং, সিগুয়েল, কাস্ত্রো, স্তালিনকে নিয়ে কাব্যবিপ্লবের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন। 'হৃদয়ে স্পেন' নামে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থে তিনি স্বদেশের যন্ত্রণাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে। মানুষের ডাককেই নেরুদা সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি জানিয়েছেন। শোষিত মানবের মুক্তিই তাঁর একমাত্র কামনা, তাই কবিতা সৃষ্টি হয়েছে কামার, মুটে, মজুরের মধ্য থেকে। সহানুভূতির মন নিয়ে অবাক পৃথিবীকে দেখেই এসেছেন। সেই অমল

ভালবাসার ফসল ক্যান্টো জেনারেল। ব্যক্তিগত জীবনে নেরুদা ভারতেও এসেছেন কনসুলেটের কর্মচারী হিসাবে। সাম্রাজ্যবাদের চাপে দলিত, পিষ্ট এক নিরস্ত্র বৃহৎ জনসম্প্রদায়কে দেখে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। অনুভব করেছেন যে মৃত্যু এ জাতিকে ছুঁয়ে যেতে চাইছে বারবার। কম্যুনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় গোপনে দেশত্যাগীও তাঁকে হতে হয়েছিল। এত যন্ত্রণায় দগ্ধিত হওয়া সত্ত্বেও প্রেমের কবিতা রচনা কিন্তু তিনি কোন সময়েই ছাড়েন নি। তৃতীয়বার বিবাহের সময় ভিন্ননামে প্রকাশিত একগুচ্ছ সোনালী প্রেমের কবিতা তারই ফসল। তাই যারা নিরালা নির্জনের কবি নেরুদাকে তারাও অকুন্ঠিত চিত্তে অভিনন্দিত করেছে। প্রেম-প্রতিবাদ সব মিলে গিয়ে অদ্ভুত কবিতার সৃষ্টি হয়েছে—

পিতৃভূমি ; হে আমার পিতৃভূমি তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তধারা
তোমার জন্যে কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা শিশুর মতো
মাতার জন্যে অপ্রমেয়।
গ্রহণ করো এই অন্ধ গীটার
এবং এই ভ্রষ্ট কপাল।

(স্তোত্র ও প্রত্যাবর্তন) বিষ্ণু দে

পাউণ্ড আর নেরুদা দুজনেই যুগ যন্ত্রণায় জর্জরিত। আর দু দুটো যুদ্ধ যে পরিমাণ অপরিমেয় বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষতিসাধন করল তা আর কিছুতেই পূর্ণ হবে না। জীবনের স্বর্ণ যুগ পাউণ্ড মানসিক হাসপাতালে অর্ধ-জন্তুর মত দিন কাটিয়েছেন। অনুবাদ, সমালোচনা আর ইমেজিষ্ট মুভমেণ্টের সে সুসম পরিণতি সহজেই ঘটতে পারত, তা চাপা পড়ে গেল। সারা জীবনের আত্মগ্লানিতে অন্ধকারেই মুখ লুকিয়ে চিরকালের মত সরে গেছেন এজরা পাউণ্ড। পাউণ্ড রাজনীতিবিদ ছিলেন না অথচ নির্ভুলভাবে রাজনীতির শিকার হয়েছেন। তবুও কবি হিসাবে পাউণ্ড মহাবিপ্লবী আর মহান নেতা সেই কারণেই পাউণ্ড আলোর কবি ; যদিও অন্ধকারের বাসিন্দা। আর চিলির এক গণ-অভ্যুত্থানে যখন বিশ্ববাসী স্তম্ভিত। নূতন গ্লানিকে যখন কাব্যের আগুনে ঝলসান রূপটা দেখবে বলে পাঠক সমাজ উদগ্রীব, তখনই স্বয়ং নেরুদা নিভে গেলেন। যে মশাল একদা তিনি বিশ্বের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেই মশাল নির্বাপিত হল। একই শতকের দুই কবি নেরুদা আর পাউণ্ড, আমেরিকার আর ল্যাতিন আমেরিকার। দু'জনেই যুগ-যন্ত্রণার ফসল। একজন আলো দিতে গিয়ে অন্ধকারে সরে গেছেন। অপর জন অন্ধকারে আলো পৌঁছে দিয়েছেন। অথচ দুজনেই সম পথের পথিক। আশ্চর্য ও অদ্ভুত।

একাংকের উৎস ও বাংলা একাংক নাটক

পরিমল ঘোষ

নাটক বলতে আমরা এক বিশেষ সাহিত্য কর্মকেই বুঝি। আবার একাংক নাটকও নাটক। তবে একাংক বলার সংগে সংগে তার একটা বিশিষ্ট রূপের কথা আমাদের মনে আসে। একাংক বললেই স্বল্পায়তনের নাটক বুঝায়। কিন্তু পূর্ণাংগ নাটকের সংগে একাংকের সেটাই শুধু পার্থক্য নয়, আরো কতকগুলো দিক আছে। একাংক নাটকের কতকগুলো স্বরূপ ও লক্ষণ আছে—যা তার পক্ষে একান্ত দরকার। এই শ্রেণীর নাটকে দুটো দিক পরিষ্কার—একটা হল আয়তনের দিক অর্থাৎ তার বিষয়বস্তু এক অংকে নির্দিষ্ট হয়; অপর দিক তার নাটকের দিক, অর্থাৎ বক্তব্যকে বিশেষ কৌশলের মাধ্যমে শিল্প-তাৎপর্যে মণ্ডিত করা দরকার।

নাটকে পঞ্চসন্ধির কথা সর্বজনবিদিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশীয় নাটকে তা স্বীকার করা হয়েছে। প্রাচ্য সংস্কৃত নাট্য-শাস্ত্রে যেমন পঞ্চসন্ধি (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, নির্বহণ)-এর কথা আছে, পাশ্চাত্যে এরিষ্টটলও তেমনি 'পোয়েটিক্‌স্‌'-এ পঞ্চসন্ধির উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক নাট্য-কাহিনীকে এই পঞ্চসন্ধি (Introduction, Rising action, Climax, Falling action, Catastrophe)-এর মাধ্যমে সংঘটিত হতে হয়। নাটকের অন্তঃবাহিত এই পঞ্চসন্ধির প্রভাবেই পরবর্তীকালে নাটকে পাঁচটি অংক প্রচলিত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের নাট্যতত্ত্বে এই পঞ্চসন্ধির কথা স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু সকল নাটকের ক্ষেত্রে পঞ্চসন্ধিকে পাঁচটি ভাগ বা অংক রূপে দেখানো হয়নি। এই পঞ্চসন্ধি নাটকে বিভিন্ন অংকের (এক, তিন, পাঁচ, আট, দশ প্রভৃতি) মাধ্যমে সংস্থাপিত করা হয়েছে। এই অংক বিভাগ প্রাচ্য দেশে সংস্কৃত নাটকে ও পাশ্চাত্য দেশে রোমীয় নাটকে প্রথমে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক নাটকে পর্ব বা ছেদ থাকলেও প্রকৃত অংকগত বিভাগ ছিল না।

সংস্কৃত নাটকে শ্রেণী অনুসারে বিবিধ অংক বিভাগ দেখতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত নাটক ও প্রকরণগুলির অংক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত রয়েছে। 'ডিম' ও 'ইহামৃগ' শ্রেণীর রচনায় অংক সংখ্যা চার, এবং 'সমবকার' শ্রেণীর রচনায় অংক সংখ্যা তিন দেখা যায়। 'ভাণ', 'বিয়োগ', 'অংক', 'প্রহসন' ও 'বীথী' শ্রেণীর রচনাগুলিতে একটি অংক অবলম্বন করা হয়েছে বলে, এগুলোকে একাংক জাতীয় রচনা বলা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের আবির্ভাবকাল যদিও বিতর্কমূলক, তবু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক বলে তা অনুমিত হয়। তাঁর প্রসিদ্ধ এক অংকের রচনাগুলোর ('মধ্যমব্যায়োগঃ', 'কর্ণভারম্‌', 'দূতঘটোৎকচঃ', 'দূতবাক্যম্‌', 'উরুভঙ্গঃ' প্রভৃতি) মাধ্যমেই পৃথিবীর প্রাচীনতম একাংক নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে মনে করা যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন নাট্যকার রচিত 'লীলামধুকরঃ', 'সৌগন্ধিহরণম্‌', 'শর্মিষ্ঠা-যযাতিঃ', 'হাস্যার্ণবঃ' প্রভৃতি রচনাগুলোকে একাংক শ্রেণীর অন্তর্গত ধরা যায়। এগুলোতে স্বল্পায়তনে একটি চমৎকার ভাব স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছে এবং রসসৃষ্টিতে তা সার্থকতা লাভ করেছে।

পাশ্চাত্যেও প্রাচীনকালে বিভিন্ন অংকের নাটক দেখা গেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকে অংক-বিভাগ তেমন স্পষ্ট ছিল না, তবে বিভিন্ন পর্ব, ভাগ বা বিরতি অবশ্যই ছিল। পঞ্চসন্ধিকে অবলম্বন করে রোমীয় নাটকে (সেনেকার নাটকে) পঞ্চাংকের প্রাথমিক রূপ দেখা দেখা যায়। রোমীয় নাটকের পথও অংকের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে। সেক্‌স্‌পীয়রের পরবর্তীকালে এই পঞ্চাংকের বিধিই প্রচলিত হয়ে এসেছে। নাট্যকার ইবসেনের সময় থেকে নাটকের পঞ্চাংকের এই ধরাবাঁধা নিয়ম শিথিল হয়ে পড়ল। তারপর বাধ্য-বাধকতা বা স্থিরতা আর তেমন অনুভূত হল না। তখন থেকে চার, তিন বা দুই অংকের নাটক লেখা হতে থাকে। এই প্রসংগে আরো কটি কথা বলা দরকার। প্রাচীন গ্রীসে দু-একটা একাংক (স্বল্পায়তন বিশিষ্ট) জাতীয় নাটক ছিল বলে। মধ্যযুগের ইংরেজী সাহিত্যে 'মিস্ট্রী', 'মিরাকল', 'মর‍্যালিটি' ও 'ইন্টারল্যুড' জাতীয় রচনার কথা জানা যায়। এগুলোর অধিকাংশই একাংক শ্রেণীর রচনা। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে নাট্যাভিনয় বন্ধ হয়ে গেলে, সেখানে ভ্রাম্যমান অভিনেতারা দেশের বিভিন্ন স্থান 'ড্রলস্' (Drolls) নামে এক অংকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় করতেন। সমসাময়িক ঘটনা, সামাজিক সমস্যা বা বিশেষ অভিব্যক্তি—এসব নাটিকাগুলোতে প্রকাশ করা হত। উনিশ শতকেও বিভিন্ন সখের দল দ্বারা অনেকগুলো একাংক নাটক অভিনয়ের কথা জানা যায়। এ সব নাটকে একটা অংক থাকলেও, তাতে প্রধানতঃ হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা উগ্র-প্রচার-ধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। বর্তমানকালের নাটকের মত বিশিষ্ট শিল্পরূপ তাতে অপরিজ্ঞাত ছিল, অধিকাংশ নাট্যকারদের সে মানসিকতাও ছিল না।

বলা বাহুল্য, এসব একাংকের উল্লেখ ঐতিহাসিক উৎস ও ক্রমসূত্রটি স্মরণ করার জন্য। একাংক নাটক পূর্ণ ও পরিণত শিল্পরূপ লাভ করেছে বিশ শতকে এবং মূল্যবান সাহিত্যরূপে তা বিবেচিত হয়েছে।

যথার্থ একাংক নাটক বিশ শতকের সৃষ্টি। যুগ পরিবর্তনের পথে ও অভিজ্ঞতার মূল্যে একাংক নাটক এখন সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রসংসাক্রমে ছোট গল্পের কথাও উল্লেখ করা যায়। উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত রূপ হলেই তা ছোট গল্প হয় না, ছোট গল্পের কতকগুলো বিশিষ্ট লক্ষণ নির্নীত হয়েছে। এ সব গুণে মণ্ডিত হলেই তাকে ছোট গল্পের আখ্যা দেওয়া যায়। একাংক নাটক সম্বন্ধেও সে কথা সমান ভাবে প্রযোজ্য। পঞ্চাংক বা বড় নাটকের সংক্ষিপ্ত বা এক অংকে রূপায়ণকেই কেবলমাত্র একাংক নাটক বলা যায় না। এই শ্রেণীর নাটকের কতকগুলো স্বরূপ বা লক্ষণ আছে, সেগুলো অনুপস্থিত থাকলে তাকে প্রকৃত একাংক নাটক বলা যায় না। এ সম্পর্কে সংক্ষেপে ক'টি কথা বলা যেতে পারে।

একাংক নাটকে প্রথমতঃ থাকবে একটা অংক। কিন্তু একটি অংক থাকলেই তাকে একাংক শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' ও 'রক্তকরবী' নাটক দুটিতে একটি করে অংক রয়েছে। কিন্তু এখানে ঘটনার জটিলতা ও ব্যাপ্তি এবং চরিত্রের আধিক্য থাকায় তা পূর্ণ নাটকের গুরুত্ব লাভ করেছে। এগুলোকে একাংক নাটকের শ্রেণীভুক্ত করা সংগত নয়।

অন্যদিকে, একের অধিক দৃশ্য-বিশিষ্ট নাটকও কখনো কখনো একাংক নাটকের মর্যাদা লাভ করতে পারে। অবশ্য সে দৃশ্যগুলো একটি অংকেরই অন্তর্নিহিত ভাগরূপে পরিস্ফুট হওয়া দরকার।

এখানে দৃশ্য ভাগটি শুধুমাত্র সময়ের বিরতি বা অতিক্রান্তি বুঝতে ব্যবহৃত হয়। নাটকীয় ঘটনার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো দর্শকমনে সময়ের ব্যবধান সম্বন্ধে বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হয়। সেখানে অভিনয়ের বিরতি ঘটিয়ে কিছুক্ষণ পর্দা ফেলে রাখার প্রয়োজন ঘটে। দৃশ্যমান অভিনয়ের সংগে সংযুক্ত নেপথ্য ঘটনার ব্যাপ্তি যদি বেশী হয়, তবে পর্দা ফেলার প্রয়োজন হয়। উদাহরণ হিসেবে 'The Monkey's Paw', 'Firmed Oak' প্রভৃতি নাটকের কথা উল্লেখ করা যায়। এখানে একাধিক দৃশ্য থাকলেও দৃশ্য পরিবেশের বৈচিত্র্য নেই, অর্থাৎ নাট্য-কাহিনী মূলতঃ একটা অংকেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। প্রসংঙ্গক্রমে বলা যায়, পর্দা না ফেলেও মঞ্চে কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীর গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজকর্ম, আবৃত্তি, গান, বাদ্যযন্ত্র (পিয়ানো-গীটার-বাঁশি প্রভৃতি) বাজানো, আসবাবপত্র ঝাড়ামোছা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়েও সময়ের ব্যাপ্তি বা অতিক্রান্তি বুঝানো যায়। নেপথ্য ঘটনার সময় ব্যাপ্তি ও অভিনয়ের সময় অতিক্রান্তি একরূপ হওয়া নিখুঁত নাটকের পক্ষে প্রয়োজন। বর্তমানে কৌশলী ও বর্ণালী আলোক-সম্পাতের মাধ্যমে সময়ের ব্যাপ্তি বুঝানো সম্ভব হয়েছে। এ সব ব্যাপারে কৃত্রিমতা বা অস্বাভাবিকতাকে দর্শকরা নাটকের প্রয়োজনে মেনে নেয়।

বিষয়বস্তুও একাংক নাটকের উপযোগী হওয়া দরকার। একই কাহিনী একাংক ও পঞ্চমাংক নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে-না। পঞ্চমাংকে একটি কাহিনী পল্লবিতভাবে আবর্তিত ও বিবর্তিত হয়ে নানা রসমগুনের মাধ্যমে উপসংহারে পৌছায়। কিন্তু একাংকে সে সুযোগ নেই। একাংকে সেই কাহিনীর একটি বিশেষ সমস্যা, একটা দ্বন্দ্বমুখর ঘটনা পর্যায় বা কোনো জীবনের এক গভীর অভিব্যক্তি মাত্র নাট্যরূপ পায়। একাংকে কাহিনীর বৃত্তটি ঘনপিবদ্ধ ও রসমণ্ডিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমাংকের মত মৃদুমন্দ গতিতে চলা একাংক নাটকের স্বভাব-বিরুদ্ধ। দ্রুতগতিতে চলাই এর রীতি। এ নাটকের সংলাপে থাকে গভীর অর্থদ্যোতনা। অপ্রয়োজনীয় সংলাপে নষ্ট করার মত সময় এখানে বড় কম। পঞ্চমাংক নাটকের মত বিভিন্ন রসের ভিয়ান এখানে সংঘটিত করা সম্ভব হয় না, তাতে একাংকের উদ্দেশ্য ও পরিণাম ব্যর্থ হতে পারে। নাটকের ঘটনাগত অবিচ্ছিন্নতা ও ভাবগত ঐক্য বজায় রেখে নাট্যরসকে এখানে বিশেষ পরিণামমুখী করে প্রবাহিত করা হয়।

পঞ্চমাংক নাটকের তুলনায় একাংকের চরিত্রসংখ্যাও হয় অল্প। অধিক চরিত্রের প্রয়োগে কোনো চরিত্রই এখানে পূর্ণতা পায় না। সীমিত পরিসরে পরিমিত বক্তব্যকে সুনির্বাচিত চরিত্রের মাধ্যমে এখানে প্রকাশ করা হয়। তবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রগুলি যথানির্দিষ্ট পথে এগিয়ে চলে। অন্তর্দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে বিপর্যস্ত বা উৎক্রান্তির চিত্র এখানে সুন্দর ভাবে বিন্যস্ত করা হয়।

তাহলে বলা যায়, একাংক নাটকে কোনো ঘনপিবদ্ধ কাহিনীবৃত্ত একটি অংকে আবর্তিত হয়ে স্বাভাবিক সম্পূর্ণতা লাভ করবে এবং অল্পসংখ্যক চরিত্রের কথোপকথনে ও নাটকীয় কৌশলে বিষয়টি শিল্পকর্মে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

আধুনিককালের ইংরেজী সাহিত্যে অনেক শিল্পসম্মত একাংক নাটক রচিত হয়েছে। সাহিত্যের বিচারে এগুলি মূল্যবান ও প্রসিদ্ধ রচনারূপে বিবেচিত। প্রসংগক্রমে 'The Rising of the

Moon', 'The Bishop's Candle-Sticks', 'Miss India', 'A Night at an Inn', 'Hewers of Coal' প্রভৃতি একাংক নাটকগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এবার বাংলা একাংক নাটকের কথা। বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখার ন্যায় নাটকেও পাশ্চাত্য প্রভাব স্মরণীয়। বর্তমান বাংলার একাংক নাটকের শিল্পসম্মত ও পরিণত রূপের পিছনে পাশ্চাত্য একাংকের প্রেরণা রয়েছে অনেকখানি। তবে পাশ্চাত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও খাঁটি একাংক নাটক রচিত হবার আগে তার যে একটা প্রচ্ছন্ন প্রয়াস ছিল, তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা ছিল অনেকখানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াসের ফল। সে রচনাগুলোর পিছনে নাট্যকারের বিশেষ শিল্প-সচেতনতা বা অভিজ্ঞতা ছিল না। সেজন্য হয়ত সেগুলো তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। তবে একাংক নাটকের আলোচনার সূচনাপর্বে এদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এদিক থেকে গিরিশচন্দ্রের 'বৃষকেতু' (১৮৮৪/এক অংক) পৌরাণিক নাটক এবং 'ভোটমঙ্গল' (১৮৮২/এক দৃশ্য), 'বেল্লিকবাজার' (১৮৮৭/ এক অংক), 'অকাল-বোধন' (১৮৮৮/দুই দৃশ্য প্রভৃতি প্রহসন-নক্সা জাতীয় রচনাগুলির কথা উল্লেখ করা যায়। এই প্রসংগে অমৃতলাল বসুর 'চাটুজ্যে-বাড়ুজ্যে' (১৮৮৬/এক দৃশ্য) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পুনর্জন্ম' (১৯১১/এক দৃশ্য) প্রহসন দুটিও স্মরণীয়। উনিশ শতকের শেষাংশ হতে বিশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত এ জাতীয় আরো কিছু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। নাটক হিসেবে এগুলোর মধ্যে নানা দোষ-ত্রুটি রয়েছে, তা সত্ত্বেও একাংক শ্রেণীর রচনার প্রাথমিক প্রয়াস হিসেবে এগুলোর নামোল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার ন্যায় নাটক নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক নাটক রচনাকালে তাঁর লেখনী মাধ্যমে এমন কতকগুলো নাট্য-অর্ঘ্য আমরা পেয়েছি. যেগুলোকে একাংক নাটকের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাঁর 'কাহিনী' (১৯০০) গ্রন্থের কতকগুলো কাব্যনাট্য (,গান্ধারীর আবেদন', 'সতী', 'নরকবাস', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' প্রভৃতি) 'হাস্য-কৌতুক' (১৯০৭) ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' (১৯০৮)-এর কতকগুলো নাটিকা এবং 'বিদায় অভিশাপ' (১৯৩২) উপভোগ্য একাংক নাটকরূপে বিবেচিত হতে পারে। 'হাস্যকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' —এ হাল্‌কা বিষয়বস্তু কৌতুক ও রস-রসিকতার সংগে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু অন্যান্যগুলোতে গভীর ভাবনা উপযুক্ত নাট্যকৌশলে প্রকাশ করা হয়েছে। এ নাটকগুলো একাংক শ্রেণীর রচনারূপে সমাদৃত হতে পারে। কিন্তু কবিগুরুর নাট্যভাবনাই ছিল স্বতন্ত্র ধরণের। বিদেশী একাংক নাটকের সংগে পরিচিত হয়েও তিনি সচেতনভাবে একাংক নাটক রচনায় কতটা প্রয়াস করেছিলেন, তা জানা যায়নি। রবীন্দ্রনাটকে মনীষী কবির বিশিষ্ট ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে অভিনব নাটক-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তাই বাহ্যিক রূপগত মিল দেখে এগুলোকে একাংক শ্রেণীর রচনা বলে মনে হলেও, রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট নাট্য রচনা হিসেবে এগুলোকে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

বিশ শতকেই বাংলা একাংক নাটক রচনার যথেষ্ট প্রেরণা ও সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। এ বিষয়ে সচেতনভাবে প্রথম প্রয়াস চালিয়ে যিনি বাংলা একাংক নাটকের ইতিহাসে কৃতিত্ব অর্জন করেন, তিনি হলেন বর্তমান বাংলার বিশ্রুত নাট্যকার মন্মথ রায়। তাঁর 'মুক্তির ডাক' নাটকটি বাংলা একাংক নাটকের ইতিহাসে প্রথম সার্থক সৃষ্টিরূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। একাংক নাটকের শিল্পসম্মত

বিশেষ রূপটি এ নাটকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। সমালোচক প্রমথ চৌধুরীও এ নাটকটিকে 'সবুজপত্র'-এ স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর 'স্টার থিয়েটার'-এ নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে সে এক বিশিষ্ট গৌরবের দিন। নাটকটি পরিচালনা করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণভামিনী।

নাট্যকার মন্মথ রায় অনেকগুলো একাংক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে উন্নত করেছেন। একাংক নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে আরো যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, জ্যোছন দস্তিদার, কিরণ মৈত্র, উৎপল দত্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বর্তমানে বহু খ্যাত, স্বল্প খ্যাত ও অর্বাচীন নাট্যকার বিশেষ প্রযত্ন ও প্রয়াস চালিয়ে বাংলা একাংক নাটকের যাত্রাপথকে প্রসারিত করে তুলেছেন। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একাংক নাটক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বহু বিশিষ্ট নাটকের সংগে ক্রম-পরিচয় লাভ ঘটে চলেছে। একাংক নাটকের এই প্রচার ও প্রয়াস এক পৃথক আলোচনার বিষয়বস্তু। বাংলা একাংক নাটক পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে এখন পরিণতির পথে ক্রম-বিবর্তিত হচ্ছে—এ আমাদের আশা ও আনন্দের কথা।

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

আন্তর্জাতিক আইন : কি ও কেন

সম্ভবতঃ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মি বেনথামই আন্তর্জাতিক আইন শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন। ফ্রান্স ও জার্মান ভূখণ্ডের জাতি সমূহের আইন ড্রইট ড্য জেমস ও ভোলকারেকট্ এর প্রতিশব্দ রূপে এর ব্যবহার বেনথামের এক নিঃসন্দেহ এবং স্মরণীয় কৃতিত্ব।

বস্তুতঃ আন্তর্জাতিক আইন বলতে কি বোঝায় জানতে হলে বিভিন্ন সময়ে বিশ্বনন্দিত লেখক, আইনবিদ, জননেতা এবং রাজনীতিজ্ঞরা যেসব অসংখ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এবং/অথবা প্রাথমিক মামলার নিষ্পত্তি করেছেন সে সবের দিকেই আমাদের নম্রমনোহর ও সহিষ্ণু দৃষ্টি দিতে হবে।

প্রখ্যাত ইংরেজ আইনজ্ঞ লরেন্স বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো এমন কতকগুলি বিধি যা' সভ্যজাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।' পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসমূহের ব্যবহারের রীতিনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এই আন্তর্জাতিক আইন—শান্ত এবং অশান্ত, অস্থির উভয় রাষ্ট্রেরই। অধ্যাপক ওপেনহীমেনের মতে, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতকগুলি আচরণগত ও চিরাচরিত বিধি যা' সভ্য রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আইনানুগ-ভাবে বর্তায়।' অধ্যাপক ব্রায়ারলি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো কতকগুলি বিধি ও কর্মকাণ্ডের সর্ত সংকলন যা' সভ্যজাতিসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।' দেখা যাচ্ছে এইসব মহাজনদের সকলের মতামত থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটি একান্ত জরুরী কথা—সভ্যজাতি, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আবশ্যকীয় আচরণীয় বিধি এবং তার আইনানুগত বাধ্যবাধকতা।

অবশেষে অধ্যাপক হলের কথায় আসা যায়। অধ্যাপক হল আন্তর্জাতিক আইনকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে এই আইন হলো এমন কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যা' আধুনিক সভ্যরাষ্ট্রগুলি একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেনে চলে। এর মধ্যে নিহিত রয়েছে এমনই এক শক্তি যাকে প্রকৃতিগতভাবে এবং মাত্রার দিক দিয়ে সচেতন ব্যক্তি দেশীয় আইনের মতই মানে এবং যাকে যে কোন বিধিবিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী বলে মনে করে।

বলা অনাবশ্যক যে হলের বক্তব্যে আন্তর্জাতিক আইনের সংজ্ঞাটি অনেক ব্যাপকতা পেয়েছে। অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। আর বনাম ক্যেন (দ্য ফ্যাৰনোনিয়া), [(১৮৭৬) ২ এর ডি ৬৩]-এর মামলায় মাননীয় বিচারক লর্ড কোলরিজ লক্ষ্য করেছেন যে জাতিসমূহের আইন হলো কতকগুলি প্রথারই সমষ্টি যাকে সভ্যরাষ্ট্রগুলি একের সঙ্গে অন্যের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মেনে নিতে স্বীকার পেয়েছে। এই প্রথাগুলি কি, কোন একটি বিশেষ প্রথা স্বীকৃতি পেয়েছে কি পায় নি, তা' অবশ্যই সাক্ষ্যপ্রদানের উপর নিশ্চিন্ত নির্ভরশীল। অন্যত্র সুবিখ্যাত ওয়েষ্ট র‍্যাণ্ড সেন্ট্রাল গোল্ড মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড বনাম দি কিং [১৯০৫] ২ কে. বি ৩৯১]-এর মামলায় মাননীয় বিচারক লর্ড

এ্যালভার ষ্টোন ১৮৯৬ সালে কীলআওয়েনের লর্ড রাসেল সারা টোয়াগাতে প্রদত্ত অভিভাষণে যা বলেছিলেন তার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন যে আন্তর্জাতিক আইনের এর চেয়ে ভালো সংজ্ঞা তিনি আর খুঁজে পান নি, তা হলো এই আইন হলো কতকগুলি প্রথা বা রীতিরই সমষ্টি যাকে সভ্যরাষ্ট্রগুলি পারস্পরিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছে। অবশেষে এস. এস. লোটাসের মামলায় [(১৯২৭) পি. সি. আই. জে সিরিজ এ. নং ১০] স্থায়ী আন্তর্জাতিক বিচারালয় বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন হলো এমন কতকগুলি অর্থময় আদর্শ যা' স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কার্যকরী।'

স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতে এই কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিশিষ্টতা। যেমন—একটি হলো এর সর্বজনীনতা আরেকটি হলো এর একমুখীনতা। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, 'স্বাধীন জাতিসমূহের উপরে।' অধিকন্তু স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের মতে অর্থময় আদর্শাবলী সকল জাতির ক্ষেত্রে নয়, কেবলমাত্র স্বাধীন জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

সসীম প্রয়োগক্ষেত্র যে আইনের, যে আইন আবদ্ধ থাকতে চায় কেবলমাত্র স্বাধীন জাতিগুলিরই সমস্যা নিয়ে; চায় না বিস্তৃত হতে, ব্যাপক অধিক্ষেত্রের বাসনায় বিশাল হতে তথাপি তাকে আন্তর্জাতিক আইন বলে মানবো কি করে ?

এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল অতীতেই অনেকের মনে। অনেকেই ছিলেন তাই এই আইনের আলোচনায় দ্বিধান্বিত, নীরব। সংশয় দেখা দিয়েছিল প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জন অষ্টিনেরও মনে। তবু তিনি মূক থাকতে পারেন নি। স্পষ্টতই বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক আইন যথার্থ আইন নয়; এ হলো কতকগুলি ব্যাবহারিক ও আচরণীয় বিধি যার মধ্যে আছে কেবল নৈতিক সমর্থন।' অথচ তিনি আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, আইন হলো প্রথম কতকগুলি ব্যবহারিক বিধি যাকে চাপায় এবং কার্যকরী করে তোলে সার্বভৌম শক্তি। অষ্টিনের পূর্বসূরী হবস্ এবং প্রুফেনড্রফও আন্তর্জাতিক আইনের আলোচনায় কোন স্বস্তিবাচক বক্তব্য তুলে ধরেন নি। তাঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল এর কার্যকরী শক্তির অনুপস্থিতি ও পরিচালকের অনস্তিত্ব দেখে। তবু ভ্যাটেল, হল্যাণ্ড, বেনথাম প্রমুখ চিন্তানায়কেরা মুখর সমালোচনার অন্তেও আন্তর্জাতিক আইনের কিছু অবশেষ খুঁজে পেয়েছিলেন। কিছু ভগ্নাংশ। অন্তরের বাণী শুনিয়েছিলেন ভ্যাটেলই সর্বপ্রথম। বলেছিলেন, জাতিসমূহের আইন তার উদ্ভবের লগ্নে জাতিসমূহের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত প্রাকৃতিক আইন বই কিছু নয়। হল্যাণ্ড দেখিয়েছেন জাতীয় আইনের সঙ্গে আন্তর্জাতিক আইনের ব্যবধানের সীমারেখা এবং অবশেষে বলেছেন ব্যক্তিগত আইনেরই 'বৃহৎ-লিখন' হলো আন্তর্জাতিক আইন। কিন্তু সবচেয়ে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এই আইনকে দেখেছেন হল এবং ফেরেন্স প্রমুখ লেখকগণ।

অষ্টিন খারিজ করেছেন এই আইনের অস্তিত্বকে এইজন্যে যে এর পেছনে কোন সার্বভৌম শক্তির সমর্থন নেই। এতো নয় সক্রিয়, প্রকৃতিবাদী আইন। নীতির সমর্থনে আইনকে তাঁর তেমন কার্যকরী এবং/অথবা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি। দ্বান্দ্বিক জাতি সমূহের বিরোধ ঘটাতে, শাসন করতে, আয়ত্বাধীন রাখতে তাদের, তিনি দেখতে পান নি কোন খর্ব শক্তিমান, চরাচরব্যাপী সার্বভৌমের বিচারের দণ্ডপানি হাতে কদাচিৎ আবির্ভাব। এই আন্তর্জাতিক আইনকে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতই বলেছেন এ হলো, "স্পষ্ট আন্তর্জাতিক নীতি" গড়ে উঠেছে সাধারণতঃ জাতি

সমূহের "প্রচলিত মতামত ও ভাবাবেগের" বশে। প্রায়ই একই রকম উচ্চারণ শেষ করে হলাণ্ড বললেন আন্তর্জাতিক আইন হলো কেবলমাত্র "সৌজন্যের আইন"।

সৌজন্যের আইন? ব্যক্তিগত আইনের বৃহৎ লিখন? সার্বভৌম শক্তির সমর্থন শূন্য থরো থরো আবেগ কম্পমান নীতিগুচ্ছ খালি?

হয়তো আছে আরও অনেক নিন্দাবাচন আন্তর্জাতিক আইনের ভাগ্যে। অনেক গলদ, অনেক ত্রুটির কথা। তা বরং অন্য সময়, আরেকদিন আলোচনা করা যাবে।

বলেছি আইন বলতে আন্তর্জাতিক আইন কি, কোন্ ধরণের আইন।

এবারে বলা যেতে পারে প্রত্যেক জাতি ও রাষ্ট্রের আপন আপন আইন থাকতেও এই আইনের প্রয়োজনীয়তা কি? কেন এই আইন?

বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, একই আকাশের তলে, উদার নীলিমায় বাঁচতে চায় না কেউ, কোন জাতিই। ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের নিঃসঙ্গ কুয়াসালীন দ্বীপ, কিংবা কাউপারের নির্বাসিত আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক কল্পনার কুহকে থেকেও কি আসতে চায় নি রৌদ্রের প্রান্তরে, উজানের দিকে উদ্ভাসিত হতে? অর্থাৎ পরস্পরের সম্পর্ককে, প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বকে সকলেই চায়। আকাঙ্ক্ষা করে। আকাঙ্ক্ষা করে না পেলে, হারালে অস্বস্তি বোধ করে। অসুস্থও হয় কভুবা। সব ছাপিয়ে মানুষ চায় বিজয়ী এবং বিজিত, শাস্তিগ্রস্ত এবং শাস্তিদাতার মধ্যে একটি আশ্চর্যমধুর সামীপ্য, পরস্পর স্পৃষ্ট হবার মতো নম্র একটি একাত্মবর্তিতা। সহানুভূতিতে আর্দ্র, ঘনীভূত এক মমতাময় পৃথিবী।

চায়। আর চায় বলেই অন্বেষণ করে ফেরে কিছু আচরণীয় বিধি, পালনীয় শর্ত। যা পারস্পরিক সম্পর্ককে, আদান প্রদানকে দৃঢ় করে, দীপ্ত করে। আন্তর্জাতিক আইন এই দীপ্তিময় পৃথিবীর দ্রাঘিমা প্রসার করবে বলেই তার অস্তিত্ব। সৌজন্যের আইন হলেও যদি তার উদ্দেশ্য হয় সুন্দরের উদ্বোধন, সৃষ্টির দাক্ষিণ্যে, প্রেম প্রীতির বন্যায় ভাসিয়ে দেয় তা পৃথিবী তাহলে ক্ষতি কি?

শক্তির দম্ভে, আস্ফালনে অনুগত করা যায়, পুলিসী শক্তির পরাকাষ্ঠায় মানানোও যায় অনেক কিছু কিন্তু আইনের যে উদ্দেশ্য, ন্যায় নীতি তা' তখন অস্তাচলকে রক্তিম করে গোধুলির লালিমায় ক্ষণকালের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। থাকে না তার রেশ। কোনই সুদূরাভাস। রুজভেল্ট তাই কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের বাণীতে যথার্থই বলেছিলেন," একথা মনে করা অসঙ্গত হবে যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে শক্তি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রাজনীতিবিদেরা যাথার্থবোধ, আইন ও ন্যায়নীতির ধারণার দ্বারা পরিচালিত নয়।" অধ্যাপক ব্রায়ারলিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন, আন্তর্জাতিক আইনের এই ন্যায়নীতির দিকটিতেই।

স্যার হেনরী মেইন নির্মম সমালোচনা করছেন অষ্টিনের মতামতকে যদিও তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে শাস্তির ভয়ে মানুষ অনেক সময় অনেক বিধিনিয়মকে মেনে নেয়। তবুও মানবসংসারে সকল মানুষের তুলনায় এমন মানুষের সংখ্যানগণ্য, এরা হলো দুষ্কৃতকারীর দল ছাড়া কিছুই নয়। আইনের মতে অধিকাংশ আচরণ-বিধিই মানুষ মননের অভ্যাসে না জেনেও মেনে থাকে। কিলআওয়েনের লর্ড রাসেলও অবনত মস্তকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এই মত।

পৃথিবী জুড়ে অন্ত্যহীন সমস্যা উদ্ধত মাথা তুলে উঠছে প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে। অশুভবুদ্ধির

প্রেরণায়, স্বার্থের সীমাহীন প্ররোচনায় মানুষ কুটিল বৃত্তিতে নিমগ্ন হচ্ছে। একে অন্যের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে; কখনো প্রত্যক্ষ, পরোক্ষে কভুবা। লিপ্ত হচ্ছে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে, সংঘর্ষে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও প্রায় সময়।

দেখে মনে হয় পারস্পরিক দ্বন্দ্বে, কোলাহলে, সংঘর্ষে, সংগ্রামে শেষ হয়ে যাবে কি মানবজাতি? অশুভবুদ্ধির প্রেরণায় আত্মঘাতী হবে কি? মগ্ন হবে আত্মদানের হত্যায়? প্রতিবেশীর রক্তে রাঙা করে নেবে হাত? আকাশ কি মলিন হবে মেঘভারে? চরাচর ব্যাপ্ত হবে ধূম্রচ্ছায়ে?

না। এতবড় ক্ষতি মানুষের ভাগ্যে কোনদিনও লিখতে পারবে না সময়। পারবে না ইতিহাস। মানুষের শুভবুদ্ধির প্রেরণা বারুদগন্ধী আকাশেও ডেকে আনবে ফিনিক্সকে। অগ্নি-বিহঙ্গকে। তার পাখায় থাকবে অজ্ঞাত দিনের শুভ বার্তা বহনের চঞ্চলতা।

মানুষের সঙ্গে মানুষের, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের ভাবের আদান প্রদানের সেতুটি অচিরেই গড়া হবে। সেই সেতুস্তম্ভ দৃঢ় হবে এক আদর্শ, এক নীতির নির্ভরতায়। তার নাম বিদেশ নীতি। আর তাকে নির্ভর করবে যা', দৃঢ় করবে যা', তাকে দেবে সুদূর, সতেজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ স্বাচ্ছন্দ্যতার নামই আন্তর্জাতিক আইন।

শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার—সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ। **ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী**—জন্ম-শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন—১০৩ এ-সি বালিগঞ্জ প্লেস। কলিকাতা-১৯

পুস্তিকা দুইটিই স্মারকগ্রন্থ—সুভেনিয়র নয়। ইদানীংকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠানকালে কর্মকর্তাগণ আমাদের যা উপহার দেন, মূল্যের বিনিময়ে অবশ্য, সে-সব পুস্তিকা বিজ্ঞাপন, শুভেচ্ছাবাণী আর কর্মকর্তাদের প্রলম্বিত জিরাফের গলার মতো নামতালিকায় আদ্যোপান্ত ছাপানো থাকে—নানা রং বেরঙে ছাপানোও বলা চলে। তার ভিতর না থাকে চোখ-জুড়োবার মতো সুদৃশ্যচিত্র না থাকে মন-হারাবার মতো কোনো বিষয়মাধুর্য। কিন্তু ডিমাইসাইজের রুচিশীল এই পুস্তিকা দুটি প্রচ্ছদে ও মুদ্রণসৌকর্যে শুধু যে সুদৃশ্য তাই নয় বিষয়নৈপুণ্যেও অতুলনীয়। ৬৪ এবং ৩৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকা দুটি বিনামূল্যে সংবেদনশীল এবং বিদগ্ধ উপস্থিতিদের ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। সমস্ত দিক বিবেচনা করলে এটি শুধু অভিনব নয়, উৎসাহব্যঞ্জক।

অনাদি দস্তিদার যে একজন রবীন্দ্র-স্নেহধন্য এবং সত্যিকারের রবীন্দ্র-সংগীতের তন্নিষ্ঠসাধক এবং মৌলিক অর্থে রবীন্দ্র-সংগীতের যথার্থ প্রচারকও ছিলেন—এ তথ্য আজ আমাদের কাছে বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়। ইন্দিরা সংগীত শিক্ষায়তন যে সংগীত-জগতের পূর্বসূরীদের প্রতি আজও শ্রদ্ধাশীল তার নিদর্শন তাঁদের ক্রমশ প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ ও পুস্তিকাতেই প্রমাণিত।

৩ জুন ১৯৭৩ সম্পাদকের নিবেদনে…'সদা-আনন্দোচ্ছল অনাদিদা দীর্ঘকাল রোগশয্যাগত ও লোকসমাজের অন্তরালে জীবনমৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করছেন'—বলা হলেও অনাদিদা আজ আর নেই—দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত মৃত্যু শেষ পর্যন্ত তাঁর সকল রোগভোগের অবসান ঘটিয়ে দিলে। যদিও এই মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি আমাদের black ingratitude-এর ধূলিঝড়ে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। কাজেই প্রথমে ইন্দিরার উৎসব ও পরে তাঁর এই মৃত্যু সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় এবং জনমানসের স্মৃতিচারণে তাঁকে সাময়িকভাবে হলেও পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে।

অশ্রদ্ধা করা বা অনধীত থাকাটা আপাত যুবধর্ম বলে প্রচারিত হলেও এটা যে বিজ্ঞানসম্মত নয় এটা যে গোটা সমাজের চেহারা হতে পারে না কাজেই এটা যে যুগধর্মও নয় তারই প্রমাণ ইন্দিরার এই সফল প্রয়াস।

অনাদিদা যে গোটাজীবন রবীন্দ্র নির্দেশ শ্রদ্ধায় এবং মৌলিক অর্থেই পালন করে এলেন তার অনুপ্রেরণা হিসেবে দেখতে পাই…'আমার বক্তব্য এই যে, অন্যান্য সকল বিষয়ের চেয়ে সংগীত-শিক্ষাই তোমার প্রধান বিষয়।… তুমি যদি এই বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কর তাহলে আমি আনন্দ লাভ করব এবং বিশ্বভারতীর পক্ষে সে একটা গৌরবের বিষয় হবে।'

'ইন্দিরা'—প্রকাশিত এই পুস্তিকায় আমরা সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিজ্ঞান-

ভিত্তিক চিন্তা এবং জাতির পক্ষে গৌরবজনক বিষয় জানতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চিঠিপত্রে অনাদিদাকে বলছেন—...'আজকালকার দিনে কোনো য়ুরোপীয় ভাষা ও সাহিত্য না শিখতে পারলে বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে আমাদের যোগসাধন হয় না এবং বিদ্বানের সমাজে আমাদের আসন সঙ্কীর্ণ এই জন্যই তোমাকে ইংরেজী ভাল মতো শিখতেই হবে...আর একটি কাজ কোরো—দিনুর কাছ থেকে ইংরেজী-সঙ্গীতের Staff Notationও শিখে নিয়ো। ঐ নোটেশনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গীতকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করবার জন্যে ঐ নোটেশনের দরকার হবে। ...স্বরলিপি যদি তোমার আয়ত্ত হয় তা হলে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ থেকে লৌকিকসঙ্গীত তুমি সংগ্রহ করে আনতে পারবে—সেই একটি মস্ত বড়ো কাজ আমাদের সামনে রয়েছে।

যথেষ্ট বিলম্ব ঘটলেও আজও প্রশ্ন করা চলে বিশ্বভারতীর সংগীতভবন রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাকে কতটুকু বাস্তবায়িত করেছেন? আমাদের মতো দাসসুলভ জাতির অলস ও কর্মবিমুখবিলাসিতার পক্ষে সংগীতভবনও কী ক্লেদাক্ত নন? রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত সংগীত-ভবন ভারতবর্ষের সংগীতসমাজের অন্যতম প্রধান কর্ণধার হবার কথা ছিল না কি? ভারতবর্ষের সংগীতচর্চা নিয়ে মৌলিক গবেষণাও কথা তো দূর অস্ত্—রবীন্দ্রসংগীতেই বা কজন রিসর্চস্কলার বিশ্বভারতী-সংগীত-ভবন আজ পর্যন্ত দেশকে উপহার দিয়েছেন যাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের তথা সমগ্র জনমানসের হৃদয়-স্পন্দনকে তুলে ধরতে পেরেছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র আদর্শ বিনষ্ট হচ্ছে বলে একদল ভাবুক যতখানি সোচ্চার হচ্ছেন সেই বিচ্যুত আদর্শকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁরা কী সামান্যতম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন?

'আমার অনুপস্থিতিকালে আশ্রমে শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে কিছু কিছু ত্রুটি ঘটবার আশঙ্কা আছে সেজন্য তোমাদের মনে যেন কোন ক্ষোভ না জন্মায়। শুভদিনের জন্য ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করো।'—অনাদিদাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের চিঠি/আগষ্ট ৫,১৯২০

অতঃপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করাই শ্রেয় নিশ্চয়!

এই পুস্তিকায় বহু তথ্য যেমন আছে তেমনি আছে কতকগুলি মূল্যবান ছবি ও পরিচয়জ্ঞাপক স্মৃতিচারণ জাতীয় টুকিটাকি চিত্তাকর্ষক ঘটনাও। রচয়িতাদের অনেকেই বিশেষ বিশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুরাগী বলেই লেখাগুলো যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি রসগ্রাহী ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

সে না হলে সকাল বেলায়
চামেলি কি ফুটবে!
সে নৈলে কি সন্ধে বেলায়
সন্ধে তারা উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ পদ্যের হেঁয়ালিতে ইন্দিরাদেবীকে কথাগুলি বললেও এগুলো যে গভীরতর সত্য এ তথ্য রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীদের নিকট অপরিচিত নয়। ছিন্নপত্র বা ছিন্নপত্রাবলী পড়েন নি রবীন্দ্রসাহিত্যের এমন পাঠক বিরল নন কি?

ইন্দিরাসংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক প্রকাশিত এই পুস্তকটি ইন্দিরাদেবীর শতবার্ষিকী উৎসব

উপলক্ষে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি হলেও এটি তাঁদের exhaustive publication নয়। 'ইন্দিরাদেবী এবং সাহিত্যসংগীতের বিভিন্ন শাখায় তাঁর কৃতির পরিচয় সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ একটি স্মারকগ্রন্থ' ও তাঁরা প্রকাশ করবার সংকল্প জানিয়েছেন। তাই তাঁরা এই স্বল্প পরিসরে ইন্দিরাদেবীকে লিখিত শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই গদ্য-পদ্যর কতকাংশ এখানে সংকলিত করেন। হয়তো আমাদের অনেকেরই এর সঙ্গে পূর্ব পরিচয় আছে তবু একত্রে সংকলনের আকারে এর মূল্য স্বতন্ত্র। আশা করি প্রকাশিতব্য স্মারকগ্রন্থে সাহিত্য ও সংগীতে ইন্দিরাদেবীর গোটা জীবনের কৃচ্ছ্রতার নিদর্শন মিলবে। শোভন সংস্করণযোগ্য পুস্তিকা হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণত্রুটিতে আকর্ষণীয় ছবিগুলো ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন,…'কবিতার তর্জমাগুলি বিশ্বভারতীর জার্নালের জন্যে সুরেনকে কপি করে পাঠাবার জন্যে অমিয়কে বলে দিলাম।…এইমাত্র তোর তর্জমাগুলি অপূর্বকে দেখালুম—সে বললে আমার কবিতার এত ভালো তর্জমা সে আগে আর দেখে নি।'

ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণীর মার্জিতমানসিকতা যে সাহিত্যের সকল শাখাতেই সপ্রতিভ ছিল তারই নিদর্শনস্বরূপ এই ক-ছত্র উদ্ধৃত করে দিলাম

যদিও ইন্দিরাসংগীত শিক্ষায়তন কর্তৃক এই পুস্তিকা দুটি দুই প্রথিত যশ ব্যক্তির নামে প্রকাশিত তবুও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে এ দুটি সংকলন সামগ্রিকভাবে সংগীত-সাহিত্যের মূল্যবান তথ্যবহ।

বিকাশ বসু

কালিদাসের হু'টি বিলাপ

মনোমোহন দত্ত

জগতে যাঁরা মহাকবিরূপে পরিচিত, সকল রসের সৃষ্টিতে তাঁদেরও প্রতিভার সমান স্ফূর্তি ঘটে না; রসবিশেষের ক্ষেত্রেই সমধিক নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। যেমন ভবভূতির 'করুণ'-এ, কালিদাসের আদিরসে। বিচিত্র রসলোকে যাঁরা যথার্থ কবি-সার্বভৌম, কেবল তাঁদেরই সর্বত্র স্বচ্ছন্দ-বিহার। তাঁরাই কবিপ্রজাপতি; ইতিহাসে তাঁরা শুধু দুর্লভ নন, দুর্লভতম।

লোকোত্তর প্রতিভা সত্বেও রসবৈচিত্র্যে কালিদাসের সমান দক্ষতার নিদর্শন মেলে না। বরং তাঁর আদিরসপ্রবণতা ভিন্নতর রসসৃষ্টিকে কোথাও কোথাও বিঘ্নিত করেছে।

'কুমারসম্ভব'-এর চতুর্থ সর্গে মূলতঃ রতিবিলাপ বর্ণিত। এই শোকসঞ্জাত 'করুণ' ও কোথাও কোথাও আদিরসগর্ভ। 'মোহপরায়না সতী'র সম্মুখে কবি উপস্থাপিত করেছেন মদনের 'পুরুষাকৃতি' ভস্মরাশি।—'দদৃশে পুরুষাকৃতিক্ষিতৌ হরকোপানল ভস্মকেবলম্।' (৩ চতুর্থ সর্গ) এ-দৃশ্য অবশ্যই শোকের উদ্দীপক। স্বভাবতঃ পতিবিয়োগ-বিধুরা রতির অশ্রু উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তাঁর বিলাপে বনস্থলী 'সমদুঃখে' প্রতিধ্বনিত। কিন্তু সেই 'বিহ্বলা-বিকীর্ণমূর্দ্ধজা'র শোকদৃশ্য বর্ণনায় কবির আদিরসাত্মক দৃষ্টিই পরিস্ফুট। বসুধালিঙ্গনে রতি ধূনরস্তনী।* এই সর্বনাশের মধ্যেও কবির দৃষ্টি কোথায় নিবদ্ধ তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কামসখা বসন্তকে দেখে রতির শোকাশ্রু দ্বিগুণ উদ্বেল হয়ে উঠল। শোকাবেগে তিনি বক্ষে করাঘাত করতে লাগলেন। কবি বর্ণনা দিচ্ছেন—তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং স্তনসংবাধমুরো জঘান চ।

* দ্রষ্টব্য: কালিদাসের চিত্রাংকনী প্রতিভা—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২৬—চতুর্থ সর্গ) কবির আকুলতা যেন করাঘাতজনিত ঐ স্তনসংবাধ উরসের ব্যথায়, তাঁর হৃদয়বেদনায় নয়।

রতির বিলাপোক্তিতে যে সব স্মৃতিচিত্র বর্ণিত হয়েছে, তার অধিকাংশই রতিরসরভসের দৃশ্য। —কেলিমন্দিরে মদনের মুখে অন্যমনে ভিন্ন নায়িকার নাম উচ্চারিত হওয়ার অভিমানে কেমন করে তাঁকে মেখলাবন্ধনে বেঁধেছিলেন, অবতংসোৎপলে তাড়না করায় কেমন করে তাঁর চোখদুটি 'চ্যুতকেশরে পীড়িত হয়েছিল (২)—ইত্যাদি। একদা কেমন করে মদন 'শিরসা প্রণিপত্য' সুরতমানসে তাঁর বেপথু আলিংগন প্রার্থনা করেছেন—সেই কথা স্মরণ করে আজ তাঁর মনে আর শান্তি নেই।'

কোথাও কোথাও রতিবিলাপে করুণরস কেবল অগভীর নয়, চাপল্যে হাস্যকর। কন্দর্প রতির যে অংগরাগ বিলেপন সুরু করেছিলেন, এখনো তা অসমাপ্ত। এই তো সবে দক্ষিণপদে আলতা পরানো হয়েছিল, এখনো যে বামপদ বাকি। সুতরাং রতির সখেদ প্রার্থনা—

তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণংনির্মতরাগমেহি মে ॥১৯, ৪র্থ সর্গ এ বর্ণনায় চিরন্তন নারীপ্রকৃতির স্বভাবচাপল্যই যেন আভাসিত।

এতৎসত্ত্বেও রতিবিলাপের বিশ্বভূমীণ তাৎপর্য অনস্বীকার্য।—নিশাকর আজ 'নিষ্কলোদয়। শুক্লপক্ষেও বুঝি তার তনুতা ঘুচবে না; আনন্দপূর্ণিমা আর বুঝি বিলসিত হবে না আকাশে। হরিতারুণ চুতমঞ্জরী শররূপে আর কার ধনুতে সংযোজিত হবে! ঐ ভ্রমরপুঞ্জ, যারা একদা ধনুর্গুণ হয়েছে, আজ তারা করুণস্বরে অনুরোদন করছে। (শ্লোকসংখ্যা ১৩, ১৪, ১৫—চতুর্থ সর্গ),

বিশ্বপ্রকৃতির সব সৌন্দর্য অবসিত হয়েছে মদনের মৃত্যুতে। শুধু বিশ্বলোকে নয়, মানুষের চিত্তলোকেও এই মদনেরই প্রবর্তনা। প্রেমপ্রেতিই ভয়াল নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে জনশূন্য রাজপথে একাকিনী অভিসারিকাকে সংকেতকুঞ্জে পরিচালিত করে। রতিবিলাপে মানবহৃদয়ের এই নিত্যসত্যকে কবি আশ্চর্য কাব্যরূপ দিয়েছেন।

রাত্রির তিমিরাবৃত রাজপথে চকিতবিদ্যুতালোকে অশনি ত্রস্তা অভিসারিকা কে আর প্রিয়সংগমে পরিচালিত করবে।

রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবা।

বসতিং প্রিয়! কামিনীং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥ ১১, ৪র্থ সর্গ

কামের অভাবে প্রকৃতি আজ মদিরতাশূন্য। নারীর রূপ-যৌবন, বিভ্রম-বিলাস—সব অর্থহীন, অনুত্তেজক। নিখিল সৃষ্টির, সৌন্দর্যের, সম্ভোগের উৎসমূলে যে কামশক্তি, তার অপসৃতিতে অন্তরে বাহিরে রসের ধারা আজ শুদ্ধ। এই বেদনাকেই প্রকাশ করেছেন কবি অপূর্ব ভংগীতে 'প্রমদার পানমদির অরুণ নয়ন, স্খলিত বচন আজ সব বিড়ম্বনামাত্র।'—

নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন পদেপদে।

অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ১২, ৪র্থ সর্গ

রতির অসহ্য বিরহব্যাকুলতায় তাঁর প্রেমের প্রগাঢ়তাই পরিস্ফুট। বসন্তের প্রতি রতির উক্তি —আমার চিতায় সত্বর অগ্নিপ্রদান করো; দক্ষিণসমীরবীজনে তাকে জ্বালিয়ে দিও অবিলম্বে।—

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং ত্বরয়ের্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ।৩৬

কারণ তুমি তো জানো, আমার ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদও কন্দর্পের অসহ।—

বিদিতঃ খলু তে যথা স্মরঃ ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬

রতির এই প্রার্থনায় আত্মভাবনার চেয়ে প্রিয় ভাবনাই বড় হয়ে উঠেছে। আপনার বিরহযন্ত্রণাকে অতিক্রম করে পতির বিরহ যন্ত্রণার উদ্‌বেগেই তাঁর কাতরতা। সুতীব্র বিরহদহনের মধ্যেও এই প্রিয়ৈকভাবনা রতির প্রেমসর্বস্বতারই পরিচায়ক।

প্রেমাস্পদের মঙ্গলচিন্তায় ও মঙ্গলকর্মে প্রেমের যে চরিতার্থতা, রতিবিলাপে তা পরিস্ফুট। রতি বসন্তকে বলছেন—আমাদের উদ্দেশে সলিলাঞ্জলি দান করো তুমি। আমাকে নিয়ে তোমার সখা পরলোকে সেই জল পান করে তৃপ্ত হবে।

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ।

অবিভজ্য পরত্র তং ময়া সহিতঃ পাস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥৩৭

আর পারত্রিক কর্মে তোমার বন্ধুর অতি প্রিয় বিলোল পল্লব চুতমঞ্জরী দান করো। (শ্লোক সংখ্যা ৩৮)

রতির শোকচ্ছলেই কবি কাম, সৌন্দর্য ও সৃষ্টিরহস্যের এক সুগভীর ব্যঞ্জনা সঞ্চারিত করেছেন রতির বক্ষঃস্থল মদনভস্মে প্রলেপিত করে। মদন ও রতি কাম ও কামনা, প্রেম ও আসংগলিপ্সা। অবিনাভাবী। রতি আজ কামবিরহিতা। সেই নারীরূপা রতির স্তনযুগল 'প্রিয়গাত্রভস্মে' অনুলিপ্ত করে তার অনুরূপে কাম, সৌন্দর্য ও সৃষ্টির আদিরহস্য কথা কবি অভিব্যঞ্জিত করেছেন। (শ্লোক সংখ্যা ৩৪)

রতির চিতানলে আত্মাহুতির প্রাক্ মুহূর্তে আকাশে দৈববাণী হল—

কুসুমায়ুধপত্নি! দুর্লভস্তব ভর্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি। ৪০

তাপসী পার্বতী যেদিন মহেশ্বরকে তপস্যায় জয় করে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবেন, সেই মিলনের আনন্দে মহেশ্বরেরই কল্যাণে মদন হবে পুনরুজ্জীবিত।

পরিণেষ্যতি পার্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।

উপলব্ধসুখস্তদা স্মরং বপুষা স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২

জিতেন্দ্রিয় ও জলদ—দুই একাধারে অশনি ও অমৃতের উৎস। (৪৩)

এই দিব্যবাণীতে মরণোৎসুক রতির স্তিমিত প্রাণ যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠল নবধারাবর্ষণে। 'হ্রদশোষবিক্লবা' শফরীর মতো। তাঁর 'মরণব্যবসায় বুদ্ধি' মন্দীভূত হল। (৩৯।৪৫) দিব্যবাণীর ধারাশান্তিতে কেবল আশা, আশ্বাস ও উজ্জীবনই নয়, রতির অপূর্ব মিলনোৎকণ্ঠা ও প্রেমজীবিতত্ব পরিস্ফুট হয়েছে এই আশ্চর্য উপমায়।

এর পরে রতির যে চিত্র এঁকেছেন কবি উপমাশ্রিত রূপকল্পে, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই নিদারুণ উপপ্লবান্তে 'ব্যসনকৃশা' রতি যেন 'রবিপীতজলা' নদী, যেন 'দিবাতনে কিরণপরিক্ষয় ধূসরা শশিলেখা'—

রবিপীতজলা তপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী। ৪৪

শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা কিরণপরিক্ষয়ধূসরা প্রদোষম্ ॥ ৪৬

নিদাঘতপ্ত নদী এবং কিরণপরিক্ষীণ শশিলেখার উপমানে কবি কেবল বিরহের কারুণ্যই পরিস্ফুট করেন নি, বিরহ প্রতীক্ষার শেষে তার স্ব-রূপতায়, স্বভাবস্থতায় আনন্দময় চিত্রও আভাসিত করেছেন —গ্রীষ্মাপগমে নদীর পূর্ণোচ্ছলতায়. দিনাবসানে শশিলেখায় পরিপূর্ণ আলোকে। অচিরবিরহের শেষে কন্দর্প ও রতির শাশ্বত মিলনের অবশ্যম্ভাবিতাকে স্ফুটতর করেছেন কবি সৃষ্টির এই চিরন্তন রূপালেখ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয়—আলোচ্য সর্গের পূর্বোদ্ধৃত ৪২ নম্বর শ্লোকটি। কন্দর্পের পুনরুজ্জীবনের লগ্ন নির্দেশ করেছেন কবি উমা মহেশ্বরের মিলনে। ঐ শুধু কাব্যকথাসংগ্রন্থনে পুরান আখ্যায়িকার বিবৃতি মাত্র নয়। বরং এই পুরাণকথায় এক নবতর তাৎপর্য সঞ্চারিত করে একে অভাবিত কাব্য-গৌরব দান করেছেন।

বস্তুতঃ কবির নিগূঢ় রসাভিপ্রায়, অখণ্ড কাব্যতাৎপর্য এতে সংকেতিত হয়েছে। যে পার্বতী কামসম্মোহে যোগীশ্বরকে জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন নিদারুণ পরাভবে, সেই পার্বতীর তপস্যায় যোগীশ্বর 'তৎপ্রবণীকৃতো' এবং মিলনের সেই 'উপলব্ধসুখে' ভস্মীভূত মদন হবে সঞ্জীবিত। তপঃশুদ্ধ অকৈতব প্রেমেই বিজিতা হবে বিজয়িনী। মহাভয়ংকর অসুরশক্তির বিনাশকল্পে যে মহাবীর্যশালী কুমারের সম্ভব হবে শিবশক্তির সম্মিলনে—মহাসৃষ্টির সেই চিৎস্পন্দে সঞ্জীবিত হবে কন্দর্প। ভস্ম অপমান শয্যা ছেড়ে অতনু বীরের তনুতে অনুলাভ করবে। বিশ্বলোক হবে নবসৃষ্টির সৌন্দর্যের রসলীলায় বিলসিত। শুষ্ক বল্কলধারী বৈরাগী যে সুন্দরের হাতে একান্ত পরাভব চেয়েছেন—সে-সুন্দর পার্বতীর তপঃজ্যোতিতেই সমুজ্জ্বল। নবতর সৃষ্টির, সৌন্দর্যের লীলারভসেই 'বারে বারে পঞ্চশরে অগ্নিতেজে দগ্ধ করে' দ্বিগুণ উজ্জ্বল করে অবশেষে তাকে বাঁচিয়ে তোলেন। তারই তূণ অভিনব সম্মোহনে ভরে দিতে যে 'সংগীতের ইন্দ্রজাল' রচনা করেছেন কবি কালিদাস, কুমারসম্ভব তারই আশ্চর্য গীতিময় মায়ালোক। তপোভঙ্গের যথার্থ তাৎপর্য এইখানে। কুমারসম্ভবের গূঢ় ব্যঞ্জনা একালের আর এক মহাকবির অনন্তপ্রকাশকলায় পরিস্ফুরিত হয়েছে 'তপোভঙ্গ'-এ (পূরবী)।—এ কবিতা নিঃসন্দেহে কুমারসম্ভবেরই নবতর রসভাষ্য।

পরবর্তী সর্গে হরপার্বতীর মিলনে ভস্মীভূত মদনের স্মিতহাস পুনরাবির্ভাবের অপরূপ ছবিটি এঁকেছেন কবি সকৌতুকে।—

তস্যাঃ করং শৈলগুরূপনীতং জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্তিঃ।
উমাপতপৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্বমিব প্ররোহম্॥ (৭৬, ৭ম সর্গ)

এই শ্লোকের সংগে চতুর্থ সর্গের আলোচ্য শ্লোকটি মিলিয়ে পড়লেই কেবল কাব্যের কাহিনীগত অখণ্ডতা নয়, উদ্দিষ্ট কবিবাচ্য, কাব্যের ভাবৈকরসতাও পরিস্ফুট হবে। কাহিনী, ঘটনা ও ভাবের দিক থেকে কুমারসম্ভবকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। পূর্বার্ধ ও পরার্ধ। তৃতীয় সর্গে মদনভস্ম ও পার্বতীর পরাভবে পূর্বার্ধের সমাপ্তি, আর পঞ্চম সর্গে পার্বতীর তপস্যায় পরার্ধের সুরু, মিলনে যার পরিণাম।

চতুর্থ সর্গটি এই দুই অংশের সংযোগসেতু। কেবল কথাবস্তুর দিক থেকেই নয়, ভাবের থেকেও। আপাতদৃষ্টিতে এই দীর্ঘ রতিবিলাপ কোথাও অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু অখণ্ড কাব্যদৃষ্টিতে তা নিতান্তই অর্থপূর্ণ। 'মদন ভস্মের পূর্বে'—রূপে, বর্ণে, গন্ধে, বসন্তহিল্লোলে—প্রেমের প্রসাধনে অনঙ্গদেবতা একদা নবভুবনে 'অঙ্গ ধরি' ফিরেছেন ; আজ 'মদনভস্মের পরে'—ভরিয়া উঠে

নিখিল ভব রতিবিলাপসংগীতে। সকল দিক কাঁপিয়া উঠে আপনি।

বস্তুতঃ রতিবিলাপের যে বিশ্বজনীন ব্যঞ্জনা তা স্ফুটতর হয়েছে রবীন্দ্রনাথের রসব্যঞ্জনায়। কালিদাসের 'কপোতকর্বুর' ভস্মরাশি বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে একালের এই সমানধর্মা কবি কন্দর্পের বিশ্বব্যাপী অজেয়তাই বিঘোষিত করেছেন ;—রতিবিলাপের শোকোচ্ছ্বাস ব্যাকুলতর বেদনায় নিশ্বসিত হয়েছে নিখিলচিত্তে।

চতুর্থ সর্গে মদনভস্মের পরের যে চিত্র. সেই কারুণ্যকে অতিক্রম করে উমার তপস্যার পরিশেষে মিলনরসের যে লীলা বিলসিত হবে পঞ্চম সর্গে তারই প্রারম্ভ। বস্তুতঃ কুমারসম্ভবে প্রধান চরিত্র তিনটি—পার্বতী, মহেশ্বর ও মদন। এবং এই অলক্ষ্যচারী মদনের অতনুরূপে বিচিত্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে কাব্যের কাহিনী ও ঘটনার এক অচ্ছেদ্য সংযোগসূত্র রচিত হয়েছে। নাটকীয়তায় ও রসপরিণামে এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে এই চরিত্রটি।

ঐ কাব্যের অদৃশ্য প্রবর্তনাশক্তি—মদন। 'অরূপহার্য্য' পিনাকপাণির কাছে মদন তখনই 'অবার্য্যবীর্য্য', কাম যখন তপঃশুদ্ধ হয়ে অরূপ প্রেমে রূপান্তরিত। ভাবৈকরসে যখন পার্বতীর মন স্থির হয়েছে ; চন্দ্রমৌলি তখনই স্বয়ং ধরা দিয়ে বলেছেন—'তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিরিতি…'। চতুর্থ সর্গের রতিবিলাপ এই.ভাবৈকরসনিষ্পত্তিতে অপরিহার্য।

কুমারসম্ভবের রতিবিলাপের সংগে রঘুবংশের অজবিলাপ প্রসঙ্গত তুলনীয়। এ দুটিই প্রিয়জন-বিয়োগের বিলাপকথা।—কবির উদ্দিষ্ট শোকসঞ্জাত করুণ রসসৃষ্টি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রতি-বিলাপ বুঝি অজবিলাপের নারীসংস্করণ, একই মুদ্রার দৃষ্টান্তরমাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে দুটি বস্তু ভিন্ন ধাতুতে রচিত। তাদের পার্থক্য কেবল রূপে নয়, স্বরূপেতে ; যদিও বিচ্ছিন্নভাবে করুণরস উভয়ের অন্বিষ্ট। এই স্বরূপের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধ হয়, যখন কেবল সর্গহিসাবেই নয়, সমগ্র কাব্যের সংগে অব্যবহিতভাবে একে মিলিয়ে দেখা যায়। আদ্যন্ত কাব্যে কবির যে নির্মাণকল্প, যে অখণ্ডদৃষ্টি, তার সম্পূরকতায় এই সর্গের সার্থকতা বিচার্য।

আলোচ্য সর্গদুইটির প্রেক্ষাপট ও পরিণাম ভিন্ন। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিচ্ছিন্নভাবে অজবিলাপ রতিবিলাপের চেয়ে প্রগাঢ়, গভীর ও সমুচ্চ। এর কিছুটা কারণ অবশ্যই কবির বয়োধর্ম। রঘুবংশ কুমারসম্ভবের পরবর্তী—কবির পরিণত বয়সের রচনা। সুতরাং মনন, অভিজ্ঞতা ও গাম্ভীর্যে প্রৌঢ় পরিণতি স্বাভাবিক। তথাপি অজবিলাপে কারুণ্যের যে রসনিবিড়তা তার মূলে ভিন্ন প্রেক্ষাপট, ভিন্ন পরিণাম, ভিন্নতর কবিবাচ্য।

রতিবিলাপের কারণ মদনের মৃত্যু ; মৃত্যুর কারণ রুদ্ররোষ। এবং এই মৃত্যু যতই শোকাবহ হোক, ন্যায়ানুগত কার্যকারণ-শৃংখলে বাঁধা।—যে অক্ষম স্পর্দ্ধায় মদন যোগীশ্বরকে সম্মোহিত করতে গিয়েছিলেন, রুদ্রকালাগ্নিতে তার দাহনমৃত্যু সমুচিত পরিণাম বলেই মনে হয়। ঘৃণ্য অপকৌশলে মহৎ মঙ্গলকর্ম সাধিত হয় না—ললাট-বহ্নির দীপ্তশিখায় কবি এই সত্যকেই সমুজ্জ্বল করেছেন। মদনের অপঘাত অলংঘ্য নিয়তির অমোঘ বিধান। এই দুষ্কৃত 'দেবকার্যে' রতি নিরপরাধা সন্দেহ নেই, তথাপি প্রিয়তমের স্বকৃত দুর্ভাগ্যের অংশভাগিনীরূপে তো তাকে মেনে নিতে হয় অনিবার্য বিশ্ববিধানে। ফলতঃ রতি-বিলাপে শোকের তীব্রতা সত্ত্বেও শোকসংবেদনে কিছুটা যেন সহৃদয়চিত্তে 'সমভার' ভাব দেখা দেয়।

পক্ষান্তরে, রঘুবংশে ইন্দুমতীর মৃত্যু আকস্মিক ও অভাবিত। প্রিয় দম্পতির বিহারভূমিতে একী দারুণ দুর্দৈব মিলনের মহেন্দ্রক্ষণে !—এ দুর্ভাগ্য তো আজ অথবা ইন্দুমতী কারও স্বকর্মোদ্ভূত নয়। যদিও কবি তপস্বী তৃণবিন্দু ও সুরাংগনা হরিণীর পুরাণকথাশ্রয়ে পূর্বজন্মের কর্মসূত্রে এই দুর্ঘটনার কার্য-কারণ সংগ্রথিত করেছেন (রঘুবংশ—অষ্টম সর্গ, শ্লোকসংখ্যা ৭৯-৮২), তথাপি সেই প্রাক্তনে মন সায় দেয় না, সান্ত্বনাও পায় না কিছুমাত্র। এই ঘটনাবৃত্তে অজের তো কোনো দায়িত্ব ছিল না। ইন্দুমতীর উরুস্তনচূড়ায় নারদের বীণাযন্ত্র স্খলিত দিব্যমাল্যের পতনমাত্র বিহ্বলা নরোত্তমপ্রিয়া—'নিমিমীল···হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী।' (৩৭ অষ্টম সর্গ) কোমল পারিজাতমাল্য ইন্দুমতীর কোমলতর স্তনযুগের ভূষণ না হয়ে আশ্চর্য মৃত্যুর কারণ হয়েছে। এই দুর্ঘটনে অলক্ষ্য মানবনিয়তির রহস্য বিস্ময় করুণ রসের সংগে সংমিলিত হয়ে যেন গ্রীক-ট্র্যাজিডির গৌরবসঞ্চার করেছে। অশ্রুনিবিড় এই বিস্ময় আভাসিত হয়েছে অজের বিলাপোক্তিতে। দৈববিধানে অমৃত কোথাও বিষ, বিষ কোথাও অমৃতে পরিণত হয়।—

বিষমপ্যমৃতং কচিৎ ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া ॥ ৪৬, অষ্টম সর্গ

ঘটনাপরিণামেও সর্গ দুটি পৃথক। ফলতঃ এ দুটির রসোৎকর্ষেরও পার্থক্য ঘটেছে। কুমারসম্ভবে দৈববাণীর আশ্বাসে রতির শোকোচ্ছ্বাস প্রশমিত হয়েছে। 'দুর্লভস্তব ভর্তান চিরাত্তবিষ্যতি'। (৪০) সুতরাং 'ভবিতব্যপ্রিয়সঙ্গমে' রতির আত্মাহুতির সংকল্প মন্দীভূত হয়েছে। 'মন্দীচকার মরণব্যবসায়-বুদ্ধিম।' (৪৫) যে বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী মিলনে আশ্বাসিত, সেই বিচ্ছেদজনিত শোকসংবেগ যতই উচ্ছ্বসিত হোক, তার করুণরস কখনই চরম উৎকর্ষ লাভ করে না। স্বভাবতঃ কবি অচিরবিরহের বেদনাকেই মূর্ত করে তুলেছেন। 'ব্যসনকৃশা' রতির আলেখ্য—'রবিপীতজলা' নদীর 'দিবাতনে কিরণ পরিক্ষয়-ধূসরা' শশিলেখার উপমানে। (৪৪।৪৬) এই আশ্চর্য বর্ণনায় বিরহ, প্রতীক্ষা, পুনর্মিলন ও পূর্ণতায় এক বিমিশ্র রূপচিত্র।

অপরপক্ষে, 'বিহ্বলা' ইন্দুমতীর চৈতন্য-সঞ্চারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ। আয়ু যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই প্রতিকারবিধান সম্ভব ; গতায়ুর সহস্র চিকিৎসাও নিষ্ফল।—

প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ (৪০)

এই প্রিয়াবিয়োগে অজের বেদনা যেন বিশ্বলোকে বিলপিত হয়েছে—কলহংসীর অনুরোদনে, অশোকের কুসুমাশ্রুবর্ষণে উদ্যানতরুর সমীরবিকম্পিত শাখারসস্রুতিতে। (৩৯,৬৩।৭০)

তাঁর বিরহের কারুণ্য প্রতিরূপিত হয়েছে জ্যোৎস্না রজনীর অবসিত সৌন্দর্যে। অজ যেন আজ উষার মৃগলাঞ্ছন চন্দ্রমার মতো প্রভাহীন। 'মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমা। (৪২) শোকসন্তাপের তীব্রতা কবি ব্যক্ত করেছেন অপূর্ব উপমায়—রক্তমাংসের মানুষের কথা কি, লৌহও অগ্নিদাহে বিগলিত হয়।—

অভিতপ্তময়োঽপি মার্দবং ভজতে কৈব কথা শরীরিষু। (৪৩)

ছিন্নতার বল্লরীর মতো গতপ্রাণা ইন্দুমতীকে অতি সাবধানে আপনার অংকে স্থাপন করে যে বিলাপ করেছেন 'নিতান্তবৎসল' অজ সে কারুণ্যে প্রেমের নিকষিত কান্তি সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শোকার্ত অজের দৃষ্টিতে সর্বত্র আজ ইন্দুমতীর স্মরণিকা—ঐ তো সহকার, প্রিয়ংগুলতা। তুমি যে

ওদের মিলনের সংকল্প করেছিলে। ঐ তো অশোক তোমারই শিঞ্জিতচরণাঘাতে দোহদশ্রী। অচিরে প্রসূনপুঞ্জে শোভিত হবে। সেই পুষ্পস্তবকে আর কার অলকাভরণ রচনা করব (৬১-৬৩) তোমার নিঃশ্বাসগন্ধা বকুলে দু'জনে যে বিলাসমেখলা গেঁথেছি, তা যে অসমাপ্ত রয়ে গেল।

তব নিঃশ্বসিতানুকারিভির্বকুলৈরর্দ্ধচিতাং সমং ময়া।
অসমাপ্য বিলাসমেখলাং কিমিদং কিন্নরকণ্ঠিঃ সুপ্যতে ॥ ৬৪

প্রসঙ্গতঃ রতিবিলাপের সেই খেদোক্তি স্মরণীয়, যেখানে রতি বাঁ পায়ের আলতা পরা অসমাপ্ত দেখে বলছেন—ফিরে এসো তুমি, প্রিয়তম, আমার বাঁ পায়ের আলতা পরিয়ে দাও।

তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্মিতরাগমেহি মে ॥

নিঃসন্দেহে অজবিলাপের আলোচ্য শ্লোকের তুলনায় এই উক্তি বহুলাংশে স্থূল। অসমাপ্ত বিলাসমেখলার বকুলগন্ধ ইন্দুমতীর নিঃশ্বাসপরিমলের মতো সূক্ষ্ম সৌকুমার্যে অতলস্পর্শ বিরহের অশ্রু-নিবিড়তা লাভ করেছে। আর রতির দক্ষিণেতর চরণখানি যতই কোমল ও আকাংক্ষিত হোক না কেন, এই খেদোক্তি অগভীর প্রেমের চাপল্যই সূচিত করে। বস্তুত, রতির প্রেমের ঐকান্তিকতা সত্ত্বেও সে মদনের নর্মসহচরী যেখানে নিত্য সুখ, নিত্য বসন্ত, সম্ভোগ। সুতরাং তার বিরহ-রোদনেও বিলাসবাসনা পরিস্ফুট হওয়া অসম্ভব নয়। এই স্বভাবচিত্রই কালিদাসের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিতে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর অজের ইন্দুমতী কেবল রহঃসখী নন—একাধারে, গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলা বিধৌ। (৬৭)

প্রেমে, পাতিব্রত্যে, মন্ত্রণে, ললিতগীতিনৃত্যে—রূপে, রসে, সৌন্দর্যে ইন্দুমতী পরিপূর্ণ মানবী। জায়া ও অপ্সরীকে, লক্ষ্মী ও উর্বশীকে কবি একাধারে মিলিয়েছেন তাঁর আদর্শ দাম্পত্যপ্রেমে। ইন্দুমতী কালিদাসের প্রেম ও সৌন্দর্যের কল্পপ্রতিমা।

অজের বিলাপসম্ভাষণে ইন্দুমতীর উদ্দেশে কবি যে কয়টি বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোথাও 'শুচিস্মিতে' কোথাও 'সুগাত্রি' কোথাও কিন্নরকণ্ঠি,' কোথাও বা 'মদিরাক্ষি'। —নয়নসুভগতায় শ্রুতিরম্যতায়,স্পর্শনহলাদিতায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিতর্পণে এ এক অপূর্ব সৌন্দর্যমূর্তি। ইন্দুমতী কেবল ইন্দ্রিয় রমণীয়া নন, মনোরমাও। 'শুচিস্মিতা'—এই একটি শব্দেই দেহরূপের স্থূলতাকে অতিক্রম করে দিব্য লাবণ্যধারা নিস্পন্দিত হয়েছে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়। এই প্রিয়তমা, এই প্রাণতমাকে হারাবার বেদনা যে কী দারুণ, কবি তা ব্যক্ত করেছেন নিতান্ত নিরাভরণ বাক্যে।— অকরুণ মৃত্যু তোমাকে হরণ করে আমায় কী না হরণ করল!

'করুণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্ ॥ ৬৭

এ উক্তি উপমাপ্রিয় কালিদাসের অনুপম প্রকাশকলার প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। জগতের শ্রেষ্ঠকাব্য বোধ করি নিরলংকার। এই রসোক্তিই তার প্রমাণ। জীবনসর্বস্ব রূপিণী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজের অর্থহীন জীবনের অতল শূন্যতার হাহাকার সমীরিত হয়েছে আশ্চর্য নিরলংকার বাক্যে। পূর্ববর্তী শ্লোকটি তারই সংগে মিলিয়ে পড়লেই বুঝা যাবে।

আজ আমার ধৈর্য নেই, জীবনের আনন্দ নেই, আভরণে প্রয়োজন নেই; শয্যা শূন্য ঋতু

উৎসবহীন। জীবনের সব গান আজ থেমে গেল।

ধৃতিরস্তমিতা রতিশ্চ্যুতা বিরতং গেয়মৃতুর্নিরুৎসবঃ।
গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে ॥ ৬৬

একথা সর্বদা সত্য যে, কালিদাসের সৃষ্টিতে তাঁর আদিরসপ্রবণতা কোথাও কোথাও করুণকে বিঘ্নিত করেছে। শৃংগারের অযথা স্মৃতিচিত্রগুলি কবির সচেতন অথবা অবচেতন মানসে করুণরসলোকে অনধিকার প্রবেশ করে কোথাও কোথাও বিপর্যয় ঘটিয়েছে। কুমারসম্ভবের রতিবিলাপে শৃংগার-চিত্রগুলি কিছুটা যে রসাভাস ঘটিয়েছে, তা আকস্মিক বা কবির তারুণ্যজনিত নয়; এ তাঁর স্বভাবগত প্রৌঢ় প্রতিভার সৃষ্টি অজ বিলাপেও তার অসদ্ভাব নেই। ছিন্নতার বল্লকীর মতো অতি সাবধানে যে গতায়ু ইন্দুমতীকে আপনার অংকে স্থাপন করে অজ বিলাপ করছেন, তাঁর 'সুরত-শ্রমসংভৃত মুখে' এখনও স্বেদবিন্দু বিদ্যমান। এবং দেহের অসারতায় যতই ধিক্কার দিন না কেন, এ নির্বেদ শৃংগারের অতিশায়িতায় নিরর্থক মনে হয়।—

সুরতশ্রমসংভৃতো মুখে ধ্রিয়তে স্বেদলবোদগমোঽপি তে।
অথ চাস্তমিতা ত্বমাত্মনা ধিগিমাং দেহভৃতামসারতাম্ ॥ ৫১

এই বিলাপেও করুণরসনিষ্পত্তিতে যে অন্তরায়, তার অন্যতম কারণ বোধ করি কালগত অদূরতা। মিলন ও বিচ্ছেদের মধ্যে যে কালিক ব্যবধান মানস দূরত্বের (Psychical distanee) সৃষ্টি করে, সেই সুদূর স্মৃতিবাহিত বিরহেই করুণরস নিবিড় হয়ে ওঠে। বিচ্ছেদমাত্রই বিরহ নয়। ইন্দুমতীর সদ্যবিয়োগে তাদের এই শোকোচ্ছ্বাসে সেই কালিক দূরত্ব ছিল না। ফলতঃ এই অষ্টম সর্গের পরিশেষে স্বল্পতম ভাষণেও বিরহের যে কারুণ্য আভাসিত হয়ে ওঠে, কালিক দূরত্বে তা অনেক বেশী প্রগাঢ় ও গভীর। সামগ্রিকভাবে অজবিলাপে যে বিরহের রোদন সঞ্চারিত করেছেন কবি, তার সর্বলোকচারী প্রতিধ্বনিতে বুঝি অমরার আনন্দমগ্ন দেবতারাও সচকিত বিস্ময়ে ও বেদনায় ক্ষণকালের জন্যও এই মর্তভূমির দিকে চেয়েছিলেন সাশ্রুনয়নে। বস্তুতঃ কালিদাস মানুষের প্রেম ও সৌন্দর্যকে এমন নিবিড় অশ্রুজলে আর কোথাও সমুজ্জল করে তোলেননি।

ইন্দুমতীর যে মেখলা অবিরাম শিঞ্জিত হয়েছে মধুর গতিবিভ্রমে, আজ তা নীরব, সে প্রথমা রহঃ সখী যেন আজ শোকে অনুমৃতা। (৫৮) মিলনে বিরহে এই শিঞ্জনেই নন্দিত হয়েছে অজের আকাশ, আলোক, দিনরাত্রি।

যে আননের মধুপানে একদা প্রিয়া তৃপ্ত হয়েছে, অশ্রুজলে আজ এ কোন পরিতর্পণ! (৬৮) বিরহখিন্ন অজের পুরীপ্রবেশের দৃশ্যটিও কী করুণ! আজ তিনি উষাশশীর মতো নিঃসংগ পাণ্ডুর; পুরবধূগণের মুখাশ্রুতে তাঁরই বেদনার ছায়া। (৭)

এই দারুণদুর্মর বেদনার ছবি এঁকেছেন কবি অপূর্ব সংকেতে। এই দুর্দিনে রাজগুরু বশিষ্ঠ শিষ্যমুখে যে সান্ত্বনা উপদেশ দান করেছিলেন, তা 'উদারমতি' অজ নীরবে শুনলেন, কিন্তু তাঁর 'শোক-ঘন' হৃদয়ে তা প্রবেশ করল না, দুঃখের সুকঠিন প্রতিঘাতে সেই উপদেশবাক্য উপদেষ্টার কাছে ফিরে গেল। (৯১)

মানবহৃদয়ের সত্যকে গুরু উপদেশও শাস্ত্রবাক্যের ঊর্ধ্বে স্থাপন করে প্রেমের অমর মহিমাকেই কবি

উজ্জ্বল করেছেন। মরণকে প্রকৃতি জেনেও জীবনবিকৃতির সত্য বড়ো হয়ে উঠেছে প্রেমের গৌরব।১

অজের অবশিষ্ট দিনগুলি কেটেছে ইন্দুমতীর স্মৃতিচারণায়। তাঁর শোকক্লিষ্ট জীবনের করুণতম চিত্র এঁকেছেন কবি অপূর্ব উপমায়।—

তস্য প্রসহ্য হৃদয়ং কিল শোকশঙ্কুঃ প্লক্ষপ্ররোহ ইব সৌধতলং বিভেদ।

প্রাণান্তহেতুমপি তং ভিষজামসাধ্যং লাভং প্রিয়ানুগমনে ত্বরয়া স মেনে॥ ৯৩

বটমূল যেমন সৌধকে ভিন্ন করে, তেমনি শোকশল্য তার হৃদয়কে শতধা দীর্ণ করেছে। এবং ভিষগাসাধ্য এই শোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হেতু জেনে অচির প্রিয়ামিলনের আশায় অজ একেই পরমলাভরূপে গণ্য করেছেন।

কেবল অভিরোধ্য বেদনার দুঃসহতাই নয়, সেই সংগে সুবিপুল সৌধের ভগ্নগৌরবও পরিস্ফুট হয়েছে এই রূপকল্পে। একদা যে রাজচরিত্র সমুন্নত ছিল অভ্রংলিহ মহিমায়, আজ তা দীর্ণ, জীর্ণ ভগ্নপ্রায়। 'প্লক্ষপ্ররোহ' প্রভৃতি অপূর্ব অর্থানুকূল শব্দধ্বনিতে শোকশংকুর অন্তঃপ্রবিষ্টতাও সংকেতিত হয়েছে। সর্বোপরি আনন্দময় মৃত্যুর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় অজের অমর প্রেমের মহিমাই ব্যঞ্জিত।

রঘুবংশের অন্যান্য নৃপতির মতো অজও প্রায়োপবশনে প্রাণত্যাগ করেছেন, কিন্তু এ প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য যেন ভিন্ন। এ মুমুক্ষার অর্থ বুঝি ব্রহ্মপদ নয়, প্রিয়ামিলন। 'শান্তিমার্গোৎসুক' রাজচরিত্র থেকে এ চিত্র ভিন্নতর। —কবি বর্ণনা দিয়েছেন, রোগে শোকে সন্তাপে জীর্ণ দেহভার বহনের আর কোনো ইচ্ছাই অজের রইল না। —রোগোপসৃষ্ট তনুদুর্বসতিং মুমুক্ষুঃ। তাই শেষে প্রায়োপবেশনমতির্নৃপতির্বভূব। ৯০ কালিদাস সূর্যবংশীয় রাজবৃত্তের যে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছেন রঘুবংশে, অজবিলাপ তারই অংশমাত্র। তথাপি এ যেন একটি স্বতন্ত্র কাব্যবিশেষ। অংশটি এই বৃহৎ মহাকাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে পুরাণ-ইতিহাসের দিক থেকে কবি পরিকল্পিত সূর্যবংশীয় রাজবৃত্তের অবশ্যই কিছুটা হানি হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে অখণ্ড কাব্য তাৎপর্যের হানি হয় না। করুণ-রসাত্মক রঘুবংশের রসসম্পাদনে সমষ্টিগতভাবে অজবিলাপের রসসমবায়িতা অবশ্যই স্বীকার্য, তবে তা অখণ্ড কাব্যতাৎপর্যে অপরিহার্য নয়। এই অংশটি বিচ্ছিন্ন করে নিলে কবিরচিত বাণীর রত্নকিরীটের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন শূন্য হয়—এইমাত্র।

অপরপক্ষে, কুমারসম্ভবে রতিবিলাপ অখণ্ড কাব্যতাৎপর্যের দিক থেকে অপরিহার্য। সুতরাং এর উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ আংশিক এককত্বে নয়, সর্বের সমগ্রতায়।

'মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতম্'—উমার তপস্যার সিদ্ধি এই বাণীতে। কুমারসম্ভবের মর্মবাণীও তাই। কামসম্মোহে নয়, এই ভাবৈকরসেই উমা-মহেশ্বরের যথার্থ মিলন। সেই মিলনানন্দেই মদন পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এবং সেই পুনরুজ্জীবনে বিশ্বলোক পরিপ্লুত হয়েছে প্রেম সৌন্দর্য ও সৃষ্টির আনন্দধারায়। চতুর্থ সর্গ তারই সকরুণ প্রস্তাবনা।

১ মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ। ৮

২

রতিবিলাপের দশ্রুকুহেলির অবসানে দূর হিমাদ্রিলোকে তপস্বিনী উমার যে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সেই আলোকেই চতুর্থ সর্গের সার্থকতা বিচার্য। বিচ্ছিন্ন কাব্যগৌরবে অজবিলাপ নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। কিন্তু রতিবিলাপের উৎকর্ষ অনুধাবনীয় কাব্যের সমগ্রতাবোধের দিক থেকে।

অথণ্ড কাব্যের ভাবৈকরসেই তার সৌন্দর্য উপলভ্য। উমার তপস্যার মতো কুমারসম্ভবে কালিদাসের শিল্প সাধনার সিদ্ধিও ভাবৈকরসে। প্রসাধনকলা তার প্রকরণমাত্র। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিকৃতিই বোধ করি উমার তপস্যা—রূপের প্রসাধনকলা অতিক্রম করে ভাবৈকরসেই যার পরিণাম।

নারায়ণ পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ

গৌরচাঁদ মিত্র

১৩৮০ সালের কার্তিক সংখ্যা 'সমকালীন' পত্রিকায় আমার লেখা 'নারায়ণ' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রবন্ধটিতে কয়েকটি ভুল-ত্রুটি থাকায়, প্রথম সুযোগেই পাঠকবর্গের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। প্রথম ত্রুটি, আমি লিখেছিলাম—'নারায়ণের আয়ুষ্কাল চার বছর'। চার বছর নয়, দীর্ঘ দশ বছর নারায়ণ বাংলা সাহিত্য-প্রাঙ্গণে সতেজভাবে জীবিত ছিল। দ্বিতীয় ত্রুটি, 'নারায়ণ' পত্রিকার বঙ্কিমস্মৃতি সংখ্যায় প্রকাশিত বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ-গীতার কথা' প্রবন্ধটির আলোচনায় আক্ষেপ করেছিলাম—'আমাদের দুর্ভাগ্য, গীতা ভাষ্য রচনা করার প্রয়োজনীয় সময় তিনি পাননি'। এ অভিমত আংশিক সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯তম শ্লোক পর্যন্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করেছিলেন। নিয়ে আমার অপর একটি ত্রুটি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বছরের প্রত্যেকটি সংখ্যাই বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের বিভিন্ন মনোরম রচনায় সজ্জিত থাকত। দ্বিতীয় বছরে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রচনা প্রকাশের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়েন। পরিবর্তে নিয়মিত লেখক-লেখিকার তালিকায় যুক্ত হন—কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী ও মহিলা কবি গিরিন্দ্রমোহিনী দেবী। বিপিনচন্দ্রের তর্কাতীত প্রাধান্য কিন্তু এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি দ্বিতীয় বছরেও। 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ধারাবাহিক প্রবন্ধটি ছাড়া ২য় বছরের নারায়ণে বিপিনচন্দ্রের লেখা অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হল—ধর্ম ও আর্ট, হিন্দু-শ্রাদ্ধের অর্থ ও অধিকার, বৈষ্ণব কবিতার কথা, ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন, তত্ত্বচিন্ত গৌরচন্দ্র, মহারাজ পদাবলী ও রসকীর্তন, সকলই আছে কিছুই নাই, অবতার কথা, মাতৃপূজা এবং জাতীয় বর্ণভেদের কথা। এর মধ্যে কয়েকটি দুই বা ততোধিক সংখ্যা জুড়ে লেখা অতি দীর্ঘ রচনা। সংস্কৃতিবান বিপিনচন্দ্রের মনস্বীতার পরিচয় নারায়ণের পাতায় পাতায় ছড়ানো। প্রসঙ্গতঃ এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, বিপিনচন্দ্রের সাহিত্য-কর্ম কতখানি সৃষ্টিধর্মী, বা কালোত্তীর্ণ কিনা। সম্প্রতি বিশিষ্ট সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃত'র ১৩৮০ সালের ২৬শে পৌষ সংখ্যায় ডঃ শিবদাস চক্রবর্তীর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'বিপিনচন্দ্র পাল : জীবন, সাহিত্য ও সাধনা'-র সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয় প্রশ্ন রেখেছেন—'বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে এবং গল্প কবিতা উপন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণভাবে তিনি কতকটা উৎসাহী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁকে উচ্চস্তরের সাহিত্যস্রষ্টা বলতে তাঁর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর এখন আর কেউ রাজী হবেন কি?' এ প্রশ্ন বহু আধুনিক সমালোচকের। এ বিষয়ে সবিনয়ে কয়েকটি কথা বলি। পাঠক সাধারণের প্রতি অনুরোধ, তাঁরা যেন আমার বক্তব্যকে হরপ্রসাদবাবুর উক্তির বিরোধিতা বলে মনে না করেন—অতি কিঞ্চিৎ পড়াশুনো নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনার চেষ্টা মাত্র। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তির পিঠে উচ্চস্তরের সাহিত্যস্রষ্টা—এই লেবেল সাটতে কেউই রাজী হবেন না। কিন্তু বিপিনচন্দ্রকে সাহিত্যবিষয়ে শুধুমাত্র 'কতকটা উৎসাহী' বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় তাঁর প্রতিভার অবমূল্যায়ণ

ঘটানো হয়। তাঁর প্রাবন্ধিক ভূমিকা কি এতই নগণ্য? আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক সংস্কারকরূপে সাধারণে তাঁর স্বীকৃতি, লেখক বিপিনচন্দ্রের সামনে এক মস্ত বড় আড়াল। তিনি অবশ্যই প্রথমে দেশপ্রেমী জননেতা, পরে প্রবন্ধকার—শুধুমাত্র সাহিত্য-সৃষ্টিই তাঁর জীবনের বড় তাগিদ ছিল না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর সৃষ্টি কিছুটা অবহেলিত। দ্বিতীয়তঃ, আজ পর্যন্ত নারায়ণ কিংবা অন্যান্য পত্রিকার পাতা থেকে সংগ্রহ করে তাঁর সামগ্রিক রচনাবলী প্রকাশিত না হওয়ায় বহু সুধীজন তার রসাস্বাদে বঞ্চিত রয়েছেন। তৃতীয় এবং প্রধান কারণ, বিপিনচন্দ্রের সমকালে বাংলা সাহিত্যের 'মঁতেন' প্রমথ চৌধুরীর আবির্ভাব—'I am myself the subject of my book' একথার অনুরণণ যাঁর প্রতিটি রচনায়। বিস্ময়াভিভূত দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়ে রইলেন প্রমথ চৌধুরীর টগবগে তেজী ষ্টাইলের দিকে। রাজর্ষি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রায় সকলেই ম্লান হয়ে গেলেন—প্রত্যেকের রচনাই বাসি ঠেকতে লাগল। প্রবন্ধ জগৎকে সহজেই নিজের করতলগত করে ফেললেন প্রমথ চৌধুরী। যদিও প্রবন্ধ সাহিত্যের বন্ধনমুক্তি ঘটেছিল তাঁর পূর্বেই। তাঁর আবির্ভাবে প্রথমতঃ বাংলা প্রবন্ধে আধুনিক মননের ছোঁয়া লাগল, দ্বিতীয়তঃ তিনি স্বয়ং একটি পৃথক প্রবন্ধ ধারার প্রবর্তন করলেন। এ দু'টি কিন্তু সমার্থক নয়। প্রথমটি সার্বজনীন, দ্বিতীয়টি ব্যক্তিগত। তাই তাঁর সমকালীন বা পরবর্তীকালের ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন বা বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গুরু প্রবন্ধ রচয়িতাগণ বীরবলী ষ্টাইলে অসাচ্ছন্দ্যবোধ করলেন—পাঠকরাও এ সকল ক্ষেত্রে বক্তব্য-বস্তুর প্রতিদানে বীরবলী ঢঙ গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হলেন। ফলে এই রীতি বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে সাধারণভাবে অনভ্যাসে পরিণত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভঙ্গীকে সার্বজনীন প্রাঙ্গণে টেনে আনতে কেউ রাজী হননি। ঐ বিশেষ ধারার প্রবন্ধ রচনায় কিন্তু ছেদ পড়েনি। প্রমথ চৌধুরীর পরে এসেছেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশংকর রায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, এককলমী, ইন্দ্রজিৎ এবং আরও কয়েকজন। প্রমথ চৌধুরী স্বয়ং বলেছেন—'আমি অবশ্য সকলকে লেখায় মৌখিক ভাষা অনুসরণ করতে বলি, কিন্তু কাউকেও বীরবলী ঢঙ অনুসরণ করতে অনুরোধ করিনে'। ক্ষেত্রবিশেষে এই ঢং যে পরিত্যাজ্য তিনি নিজেই তা স্বীকার করেছেন—'সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই বক্তাকে বীরবলী ঢং ত্যাগ করতে হয়, কেন না কোন সভার কোনও সভাপতি মজা ঠাট্টার ওজুহাতে নিজ কথার দায়িত্ব এড়াতে পারে না' (সবুজপত্র, ১৩২২ আষাঢ়, ভাষার কথা, পৃঃ ১৭৫)। একারণে শুধুমাত্র তাঁর সর্বজনীন দানই বিনম্রচিত্তে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী বেশ কয়েকজন আধুনিক সমালোচক কিন্তু অতি সহজেই নস্যাৎ করে দিলেন প্রমথ চৌধুরীর সমকালীন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ-রচয়িতাদের। বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধে তথ্যনিষ্ঠা, চিন্তার গভীরতা, যুক্তির পরাকাষ্ঠা, সাহিত্যচেতনা—সমস্ত গুণই বিদ্যমান। তথাপি তাঁর জীবনে সাহিত্যসেবা পার্টটাইম কাজের মতন ছিল বলেই কিনা কে জানে। উচ্চস্তরের প্রবন্ধকর্তাদের সারিতে তিনি অপাংক্তেয় রয়ে গেলেন। এসকল বিভিন্ন কারণেই আজ তাঁর স্বীকৃতি পেতে অসুবিধা হচ্ছে মনে হয়। অবশ্য আমার বিশ্লেষণ ভুলও হতে পারে।

নারায়ণ পত্রিকার কথাতেই ফিরে আসি। বাংলা সাহিত্য প্রাপ্তমনস্ক হতেই আর্ট, আর্টের উদ্দেশ্য, আর্টের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে পত্র পত্রিকায় আলোচনা শুরু হয়। বিপিনচন্দ্রের 'ধর্ম ও

আর্ট প্রবন্ধটি নারায়ণ পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনায় সূত্রপাত ঘটিয়েছিল (অগ্রহায়ণ, ১৩২২)। অন্য যে কোন মুক্তমন পুরুষের মত বিপিনচন্দ্রও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লৌকিক ধর্ম ও নীতির হাতে সাহিত্য শাসনের দণ্ড কখন অর্পণ করা সঙ্গত নয়। এই ধর্ম ও নীতির শাসনে আর্টের স্ফুরণ হয় না। সজীব সাহিত্য মাত্রেই সহজ মানব-প্রবৃত্তির উপরে আপনাকে গড়ে তোলে। ক্ষেত্রবিশেষে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে আর্টের বিরোধ থাকলেও, সনাতন ধর্ম বা সত্য ধর্মের সঙ্গে কখনই বিরোধ সম্ভব নয়। কারণ তাঁর ভাষায়—'যে মানব প্রকৃতিকে এই ধর্ম সার্থক ও পূর্ণ করে, সেই মানব প্রকৃতির অন্তঃ-প্রয়োজনেই সাহিত্যের এবং আর্টের সৃষ্টি হয়। যেখানে সাহিত্য এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, যেখানেই ইহা বর্তমান অনুভূতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল পুরাতন শ্রুতিস্মৃতিকে আশ্রয় করিতে চাহে, সেইখানেই ইহা কৃত্রিম, অলীক, অসার, বস্তুতন্ত্রহীন ও শূন্যগর্ভশব্দাড়ম্বর পূর্ণ হইয়া উঠে। এই আলোচনা পড়ে কি মনে হয় বিপিনচন্দ্র উদারপন্থীভুক্ত নন? বছর খানেক আগে কিন্তু তিনি, মৃণালের স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। 'যে দেশে মাজিষ্টারের কাছে রেজিষ্টারী করে বিয়ে হয়, সে দেশে আবার মাজিষ্টারের কাছে গিয়ে রেজিষ্টারী থেকে নিজেদের নাম খারিজ করতেও বা পারে। হিন্দু তা পারে না। সাতপাক ঘুরে যে বে হয়, চৌদ্দপাকেও তা খোলে না'—এই ছিল বিপিনচন্দ্রের ধারণা। হয়তো পরবর্তীকালে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছিল! বিপিনচন্দ্রের লেখা অপর বিশিষ্ট প্রবন্ধটি হল—ব্রাহ্ম-সমাজ ও রাজা রামমোহন! 'নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষ' প্রবন্ধে পরম পূজনীয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র-জীবনী' গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নারায়ণ-ব্রাহ্ম সমাজ দ্বৈত সমর প্রসঙ্গে লিখেছিলাম—'ব্রাহ্মসমাজের' প্রকাশ্য বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণে চোখে পড়ে না। এই লাইনটির শুদ্ধরূপ হবে—'ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশ্য বিরোধিতামূলক প্রবন্ধ নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষে চোখে পড়ে না। দ্রুততাজনিত এই ত্রুটির জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত। শুধুমাত্র প্রথম বছরের পরিচয় পেশ করে সামগ্রিক মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হওয়া মূঢ়তার পরিচায়ক, তাই এ ভুল যে অনিচ্ছাকৃত তা' নিশ্চয় বলে বোঝবার প্রয়োজন নেই।' 'ব্রাহ্মসমাজ ও রামমোহন' ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক নারায়ণে প্রকাশিত প্রথম আলোচনা। কেন ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ শিক্ষিত জনমানসে পূর্বের মতন সাড়া জাগাতে অক্ষম হচ্ছে, কেন তার প্রভাব দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে বিপিনচন্দ্র তা' বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রাহ্মনেতারা এই প্রতিপত্তি হ্রাসের জন্য গোঁড়া হিন্দুত্ববোধকে আক্রমণ করেছেন বারবার। শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায়ও তাঁর উষ্মা চেপে রাখতে পারেননি। বিপিনচন্দ্র কিন্তু ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিবেন। রামমোহনের ধর্মীয় মানসের অভূতপূর্ব সুচারু বিশ্লেষণের পর তিনি প্রশ্ন রেখেছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ কি রাজা প্রদর্শিত পথের অনুগামী? রামমোহন সম্বন্ধে পূর্বে যা কিছু আলোচনা হয়েছিল তা' হয় শুধুমাত্র ব্রাহ্মসমাজীয় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে নতুবা বিশেষ একটি খ্রীষ্টীয় মতবাদের সমর্থকরূপে তাঁকে প্রচার করার অত্যুৎসাহে। তাই হিন্দুত্ববোধের কষ্টিপাথরে 'হিন্দু রামমোহনের' মানস মূল্যায়ণে ব্যাপৃত বিপিনচন্দ্রের প্রবন্ধ দু'টির মূল্য অশেষ। রামমোহনকে স্বমূর্তিতে পাঠকবর্গের সামনে হাজির করে দিয়েই বিপিনচন্দ্র প্রস্থান করলেন। সরাসরি উত্তর দিলেন না। উত্তর পেলাম গিরিজাশঙ্কর চৌধুরীর তীক্ষ্ণ কলম থেকে পরবর্তীকালে। অবশ্যই

গিরিজাশঙ্কর সকলক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দৃষ্টি বজায় রাখতে পারেননি, কিছু অন্যায় অভিযোগও তিনি করেছিলেন ; কিন্তু কয়েকটি অপ্রিয় সত্যকথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। গিরিজাশঙ্কর বা অন্যান্য সুধীজন প্রদর্শিত ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ব্রাহ্মসমাজ শোধরাবার চেষ্টা না করার দরুণই আজ যে সে শুধুমাত্র একটি জড়বস্তুতে পরিণত হয়েছে, একথা সর্বজনবিদিত। অবশ্য অন্যান্য কারণও ছিল।

সম্পাদক চিত্তরঞ্জনের লেখনী দ্বিতীয় বছরেও বহু কবিতা-গান প্রসব করেছে। ২য় বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় তিনি একটি গল্পও লিখেছিলেন—গল্পটির নাম 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা'। প্রথম বছরের নারায়ণে প্রকাশিত 'ডালিম' ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা'—ব্যস্ততাময় জীবনে কবি চিত্তরঞ্জন মাত্র এ দু'টি গল্প লেখার 'দুঃসাহস' দেখাতে পেরেছেন। ডালিম গল্পটি প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন কথা প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জনকে বলেছিলেন—'আপনি যে ছোট গল্পও লেখেন তা তো জানা ছিল না'। চিত্তরঞ্জন হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন—'দেখছেন তো আমার দুঃসাহসের অন্ত নেই।' শরৎচন্দ্র তখন বলেছিলেন—'আপনার এই দুঃসাহসের জন্য আমার অন্তরের অভিনন্দন জানাচ্ছি'। (মানুষ চিত্তরঞ্জন—অপর্ণা দেবী, পৃঃ ১২৮) অবশ্যই অনভ্যাসের চিহ্নস্বরূপ গল্প দু'টিতে কিছু ভুল-চুক রয়েছে, তথাপি অদূর ভবিষ্যতেই আমরা যে একজন সার্থক গল্পকারকে পেতাম সে প্রতিশ্রুতি উভয় গল্পেই মেলে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার কথা' বিবৃত করতে গিয়ে (১ম বর্ষ) সহজ সরল সুন্দরের প্রতি চিত্তরঞ্জনের যে প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, গল্পগুলিতে সেই মানসিকতার অভাব। উভয় গল্পেই এক অদ্ভুত চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়—চরিত্রগুলিও জটিল। গদ্যে ভাবপ্রকাশের আংশিক অক্ষমতা বোধহয় এর জন্য কিছুটা দায়ী। 'প্রাণ প্রতিষ্ঠা' গল্পটি প্রথম পুরুষে আত্মকাহিনীর ভঙ্গীতে লেখা। নায়ক এক তরুণ চিত্রশিল্পী। ছোটবেলা থেকেই শিল্পসৃষ্টির সহজাত প্রেরণা পেয়েছেন অন্তর থেকে। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'-কে তুলির আঁচড়ে মূর্ত করে তোলাই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। নায়কের পাড়াতে থাকত আশালতা নামে এক বাল্যবিধবা। শৈশবে সে ছিল পাড়ার 'দস্যি মেয়ে'। ছেলেরাও হার মানত তার দুরন্তপনার কাছে। আশালতা বা লতার পরিবারে নায়কের অবাধ যাতায়াত ছিল। এই যাতায়াতের পথ ধরে লতা শিল্পীর নিভৃত অন্তরে আসন পাতে, শিল্পীর চেতন-মনের অলক্ষ্যে। হঠাৎ একদিন অবচেতন মনের পরিচয় পেয়ে শিল্পী দেখলেন অসীম প্রযত্নে তিনি এতদিন শুধুমাত্র লতার ছবি আঁকতেই ব্যস্ত ছিলেন। বুঝতে পারলেন লতা তাঁর প্রেরণাদাত্রী মানসসুন্দরীতে রূপান্তরিত। ইতিমধ্যে লতার বাবা মারা গেলেন। লতার পরিবারের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হল নায়কের ! লতাও ততদিনে 'শান্ত তরঙ্গহীন সরোবরে' পরিণত। অবসর সময়ে 'তুলিদাদার' কাছে সে নতুন করে পড়াশুনো শুরু করল। কোন এক গোধুলি বেলায় নায়ক ও লতা মুখোমুখি বসে। তখনও সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালান হয় নাই। সন্ধ্যার পূর্বাভাস কোমল ছায়ার মত ভাসিতেছিল। কেমন করিয়া জানিনা আমাদের হাতে হাত ঠেকিল। মৃদুমন্দ মধুর বাতাসে লতার চুলগুলি উড়িয়া উড়িয়া আমার মুখে চোখে পড়িতে লাগিল। আমার শরীরের রক্তস্রোত যেন পাগলের মত নাচিয়া উঠিল। লতার মাথা আমার বুকে ঢলিয়া পড়িল—আমি তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলাম। পরক্ষণেই চৈতন্য হইল। চীৎকার করিয়া বলিলাম—'একি করিলে প্রাণসুন্দর—বাসনা কি এমন অন্তঃসলিলা হইয়া লুকাইয়া থাকে ? আমার যে পূজার মন্দির ভাঙিয়া

পড়িল!' লতার চক্ষু দেখিলাম একেবারে স্থির হইয়া গিয়াছে। আমি আপনাকে ছিঁড়িয়া লইয়া একদৌড়ে বাহির হইয়া পড়িলাম'। নায়কের হঠাৎ চীৎকার বিসদৃশ লাগা স্বাভাবিক! যাহোক! আত্মগ্লানিতে নায়ক সন্ন্যেসী হয়ে দেশান্তরী হলেন। ছবি আঁকাও বন্ধ করলেন। কিন্তু লতার চিন্তা তাঁকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখল। পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হল। লতা ততদিনে তাঁর হৃদয়ে পুনরায় দেবীর আসনে অধিষ্ঠিত। নায়ক ফিরে এলেন কলকাতায়। লতা এখন রঙ্গালয়ের নামী অভিনেত্রী। তুলিদাদার সাক্ষাতে লতার চোখে আনন্দাশ্রু। কিন্তু সে যে এখন কুলটা-কলঙ্কিনী। লতার মনে দ্বন্দ্ব। কিন্তু নায়কের শিল্পী মনে লতা তো কুৎসিত নয়—সেখানে নিষ্পাপ দেবীরূপে তাঁর প্রতিষ্ঠা। আবার তুলি-রঙের আশ্রয় নিলেন শিল্পী। সমাজের চোখে হেয় অভিনেত্রীর ছবিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন হল। ধীরে ধীরে ক্যানভাসে ফুটে উঠল 'লতা দেবী' নয় দেবী লতা। ডালিমের তুলনায় এ গল্পটি অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিসম্পন্ন। অতিকথনের ঝোঁক গল্পকার এড়াতে পারেন নি। তবুও স্থানে স্থানে বক্তব্য অস্পষ্ট রয়ে গেলে। শিল্পীর অন্তর্লোক সম্পর্কে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণার অভাবজনিত ত্রুটী গল্পের শেষাংশে বড় বেশী স্পষ্ট। তথাপি গল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ মেলে।

নারায়ণ পত্রিকার প্রথম বর্ষে নলিনীকান্ত ভট্টশালী নাট্যকার রামনারায়ণ সম্বন্ধে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, সেই সূত্র ধরে ২য় বর্ষ ১ম খণ্ডে রামনারায়ণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন অশ্বিনী কুমার সেন ও অমরেন্দ্রনাথ রায় অশ্বিনী কুমারের প্রবন্ধটি রামনারায়ণ সম্পর্কে কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। প্রথম ঘটনাটিই ইণ্টারেস্টিং। লেখকের বক্তব্য—'রঙ্গপুর কুণ্ডীর সাহিত্যানুরাগী জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত পুরস্কার ও উৎসাহই যে রামনারায়ণকে 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' লিখিতে উদ্বোধিত করিয়াছিল তাহা ঠিক; কিন্তু এ বিষয়ে তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন বহু পূর্বে।' সেন মহাশয় বিবৃত ঘটনাটি হল—তর্করত্ন মহাশয় কৈশোরে এক পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন। পণ্ডিত কন্যা কামিনী দেবীর বিবাহ হয় এক বহুবল্লভ কুলীনের সঙ্গে। বিবাহ-ব্যবসায়ী স্বামীর নির্মম ব্যবহারে কামিনী দেবী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। পড়ুয়া রামনারায়ণের মনে এ ঘটনা গভীর রেখাপাত করে এবং কালীচন্দ্র চৌধুরী এ বিষয়ে নাটক লেখার প্রতিযোগীতা আহ্বান করলে রামনারায়ণ তৎক্ষণাৎ সাড়া দেন। অমরেন্দ্রনাথের রচনাটি ভিন্নধর্মী (ফাল্গুন ১৩২২)। বাংলা নাট্য সাহিত্যের শুরু থেকে রামনারায়ণ-প্রতিভার শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ নিখুঁত বিশ্লেষণ করেছেন অমরেন্দ্রনাথ। তাঁর প্রবন্ধটির সারাংশ পরের মাসে মালঞ্চ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'সৌরভ' পত্রিকাতেও লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পত্রিকা প্রকাশে চিত্তরঞ্জনের অন্যতম সহযোগী নলিনীকান্ত ভট্টশালী মাঘ সংখ্যায় (১৩২২) 'মধুসূদনের নাট্য প্রতিভা' নির্ণয়ে প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে ভট্টশালী মহাশয়ের কড়া সমালোচক মূর্তি। মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও 'পদ্মাবতী' নাটক দু'টিকে তিনি নির্মম ভাবে কালপরীক্ষকের বিচারে ফেল করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মতে—'যে রত্নাবলী অভিনয়ে ব্যয় ও আড়ম্বর বাহুল্যে ক্ষুব্ধ হইয়া মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা' রচনায় প্রবৃত্ত হন, সে রত্নাবলীর প্রভাবের গোলকধাঁধায় শর্মিষ্ঠা অন্ধের মত পথ হাতড়াইয়া বেড়াইয়াছে। আর পাদ্মাবতীতে শকুন্তলার অনুকরণ এত স্পষ্ট যে টুলো পণ্ডিতরূপী বৃদ্ধদের অবাক করা যাঁহার সঙ্কল্প ছিল, তিনি কিরূপে যে

এরূপ বালকোচিত আক্ষরিক অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়'। তাঁর মতে এই অনুকরণ প্রবণতা ও ভাষার কৃত্রিমতা ও মার্জনা করা যেত, যদি নাটকগুলিতে প্রকৃত সাহিত্যরসের বিকাশ ঘটত। তিনি অবশ্য মন্দের ভালো বলেছেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটিকে। 'একেই কি বলে সভ্যতা'কে তিনি মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেছেন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম, পৌরাণিকী কথা ও সেকালের কথা—বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনা চারটি নারায়ণের প্রথম বছরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। শেষোক্ত রচনা দু'টির ইতি ঘটেছিল প্রথম বছরেই। দ্বিতীয় বছরের ধারাবাহিক রচনা—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মায়াবতী পথে' ভ্রমণ কাহিনীটি। একমাত্র 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' ছাড়া অন্য কোন রচনার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি। ফলে রসহানি ঘটেছে প্রচুর। এই সম্পাদকীয় ত্রুটী লক্ষণীয়। বিপিনচন্দ্রের অতিদীর্ঘ প্রবন্ধের ২য় বা ৩য় অংশের শিরোনামে দেখতে পাই '……পৃষ্ঠার অনুবৃত্তি'—এ হেন সম্পাদকীয় টীকা। যা অন্য কোন প্রবন্ধকারের ভাগ্যে জোটেনি। বিপিনচন্দ্রের প্রতি সম্পাদকীয় পক্ষপাত বুদ্ধিমান পাঠকের চোখ এড়ায় না।

২য় বর্ষের ফাল্গুন সংখ্যায় স্বনামখ্যাত সুখরঞ্জন রায় 'ছোটগল্প' শীর্ষক একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। সাহিত্য বিষয়ে এই প্রবন্ধটি নারায়ণ পত্রিকার প্রথম দু'বছরের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য—সর্বশ্রেষ্ঠ উপাধি লাভের জন্য অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রবন্ধে তাঁর আলোচনার ধারা নিম্নরূপ—সাহিত্য ও নীতি বিষয়ে প্রথমে কয়েক কথা—তারপর পাশ্চাত্য সাহিত্যে নভেল সৃষ্টির ইতিহাস—ছোটগল্পের সৃষ্টি—ছোটগল্প নভেলের ছোট সংস্করণ নয়—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও গীতি-কাব্যের মধ্যে প্রভেদ—খণ্ডকাব্য ও গীতিকাব্যের সম্বন্ধ। নভেল ও ছোটগল্পের সম্বন্ধ প্রায় এক—ছোটগল্পে পার্থিব স্থূলতার ঊর্ধে অনির্বচনীয় রসের স্পর্শ—ছোটগল্পের ভাষা ও ভাব—সূক্ষ্ম সুকুমার প্রত্যক্ষের অগোচর কতকগুলো মনোবৃত্তি নিয়ে ছোট গল্পকারের কারবার—আয়তনে সঙ্কুচিত হলেও অন্তরের দিকে ছোটগল্পের অসীম বিস্তৃতি। নারায়ণের ২য় বছরের ১ম খণ্ডে প্রকাশিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রাধামাধবোদয়, ননীগোপাল মজুমদারের শাব্দিক শাকটায়ন, অতুল মুখোপাধ্যায়ের ডঃ স্পুনারের নতুন আবিষ্কার (পাটলিপুত্র খনন বিষয়ক), ফুলিয়া গ্রামে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন উপলক্ষে সভাপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ এবং সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের 'জাতীয় জীবনে ধ্বংসের লক্ষণ'। জনৈক সুশীল কুমার দে ১ম খণ্ডের নারায়ণে তিনটি কবিতা লেখেন—মরীচিকা, কাণ্ডারী ও নিঃশ্রেয়স। কবি কোন সুশীল কুমার—প্রখ্যাত গবেষক ডঃ সুশীল কুমার দে, না বিপিনচন্দ্র পালের দৌহিত্র আই. সি. এস. সুশীল দে? সাল তারিখের বিচারে প্রথমোক্ত জনেরই নারায়ণ পত্রিকায় কবিতা লেখার সম্ভাবনা বেশী বোধহয়। প্রজ্ঞাদীপ্ত রাশভারী এই মানুষটি প্রথম জীবনে কবি হতে চেয়েছিলেন কিনা কে জানে! বিপিনচন্দ্রের মত জ্ঞানতপস্বী মনীষীও যে কবি হতে চেয়েছিলেন—এ ঘটনা ক'জন জানেন?

বিপিনচন্দ্র কাব্যসমালোচক ও কাব্যরসপিপাসু ছিলেন চিরদিনই—কিন্তু তাঁর কবিতা রচনার কথা আমাদের প্রায় অজ্ঞাত। নারায়ণ পত্রিকার ২য় বর্ষ ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় বিপিনচন্দ্রের প্রথম

কবিতাটি প্রকাশিত হয়—নাম 'পীরিতি'। এটিই কিন্তু তাঁর প্রথম ও শেষ প্রয়াস নয়। ২য় খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় তিনি আরও দু'টি কবিতা লিখেছিলেন। দ্বিতীয় কবিতা—রূপ, তৃতীয় কবিতা—পূর্বরাগ। শেষোক্তটি দীর্ঘ ও উভয় সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি বৈষ্ণব কবিদের দুর্লঙ্ঘনীয় প্রভাব চোখে পড়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে কবি নিজের অজান্তে বৈষ্ণব কবিতার পঙক্তিরও আশ্রয় নিয়েছেন। কবির স্বকীয়তার কোন চিহ্ন কবিতাগুলিতে নেই। ১ম খণ্ডে 'বৈষ্ণব কবিতার কথা' প্রবন্ধটি লেখার জন্য বিপিনচন্দ্রকে বৈষ্ণব কাব্যসকল পাঠ করতে হয়েছিল নিশ্চয়, হয়তো সেই সময় তার অন্তরে কবিতা রচনার বাসনা জাগে। পাঠকমনের ঔৎসুক্য নিবারণে এখানে বিপিনচন্দ্রের দ্বিতীয় কবিতাটি তুলে দিলাম।

রূপ

পুছিও না মোরে　　সে কেমন জন　　বলিতে নারিব আমি
নয়ন দেখেছে　　নয়ন না জানে　　কেমন সে রূপখানি
সে রূপ পরশে　　আঁধোয়া এ আঁখি　　কে কারে দেখিবে বল ?
কিবা সে বরণ　　কিবা সে গঠন　　কেবল মরম ছুঁইয়া গেল !
মরম ছুঁইয়া　　পরাণে পশিয়া　　সৃজিল আপন কায়
পরাণ চিরিয়া　　বাহির করিলে　　দেখিতে পাইব তায় ॥
মিছা কহিলাম　　চিরিলি পরাণ　　দেখা নাহি পাবে তার
পিঞ্জর ভাঙ্গিবে　　পাখী পলাইবে　　ভাষা শুধু হবে সার ॥

হয়তো, বাংলা কবিতায় প্রাণের স্পর্শ মেলে না—সম্পাদক কবি চিত্তরঞ্জনের এই আক্ষেপ মোছাতে তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা যে মোটেই উচ্চাঙ্গের হয়নি বলা বাহুল্য।

২য় বর্ষ ১ম খণ্ডের ১ম সংখ্যায় ধর্ম ৺ আর্টের সীমারেখা প্রশ্নে বিপিনচন্দ্র যে আলোচনা করেছিলেন সেই আলোচনাকে আরও একটু বিস্তারিতরূপে পাঠক সমক্ষে হাজির করলেন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, পরবর্তীকালের ঋষি অরবিন্দ—তাঁর 'আর্টের আধ্যাত্মিকতা' প্রবন্ধের মাধ্যমে। ২য় খণ্ডের ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটি সুধীজনের আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল। ১৩২৩ সালের আষাঢ় সংখ্যার 'ভারতী' পত্রিকায় নিয়মিত বিভাগ 'মাসকাবারী'তে প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। এবং প্রবন্ধের মূল বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্তাকারে মুদ্রিত হয়। বিপিনচন্দ্র নির্দেশ করেছিলেন ধর্ম ও আর্টের সম্বন্ধ—শ্রীঅরবিন্দ ঐ প্রসঙ্গে নির্ণয় করলেন সাধু ও শিল্পীর পার্থক্য। সাধুর অন্তিম লক্ষ্য জগতে আদর্শ স্থাপন। শিল্পীর লক্ষ্য আদর্শ স্থাপন বা সমর্থন নয় রসসৃষ্টি। আদর্শের নিগড় শিকল পায়ে পরতে সে নারাজ। সাধুর আনন্দ ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে—অশুচি থেকে সে শতহস্ত দূরে। জীবনের আলোকিত দিকই শুধু তাঁর নয়নগোচর হয়, মুখ ফিরিয়ে থাকে অন্ধকার থেকে। শিল্পীর দ্রষ্টব্য কিন্তু আলো-অন্ধকার উভয়েই। অশুচির মধ্যেও শিল্পী আনন্দ অন্বেষণে ব্যস্ত। 'সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমন রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের যেন একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকারণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রয়কে বোধ করিতে।' অধ্যাত্মের সঙ্গে আর্টের কোন বিরোধ নেই। অধ্যাত্ম অর্থে

আত্মসম্বন্ধীয়; যোগীর আত্মা যোগে, ভোগীর আত্মা ভোগে। 'যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসেবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী'। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিন্তু সাধু-শিল্পীর এই পার্থক্য মেনে নিতে পারেন নি। নারায়ণের ভাদ্রসংখ্যায় 'সাহিত্য ও সুনীতি' প্রতিবাদ প্রবন্ধে তিনি লিখলেন—'বুদ্ধদেব কাশীর বারনারীকে, যীশুখৃষ্ট woman of Samoriaকে, চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, অশুচির মধ্যে, ইন্দ্রিয়তৎপরতার মধ্যে তাঁহারা ভগবানের সত্তার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পাপের প্রতি অন্ধদৃষ্টি ছিলেন না। পাপের প্রতি উদাসীন অথবা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি বর্তমান যুগে সাধুতার বৈপরীত্যই প্রমাণ করে।...শ্রেষ্ঠ সাধু ও শ্রেষ্ঠ শিল্পী শুধু সুন্দর মহত্তের ভিতর নহে, অসুন্দর হীন নিকৃষ্টের মধ্যেও ভগবানের রসমূর্তিটি ফুটাইয়া তুলেন'। প্রবন্ধটির সঙ্গে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয় টীকায় জানা যায় আর্টের আধ্যাত্মিকতা প্রবন্ধটি শ্রীঅরবিন্দের লেখা নয়, লেখক ছিলেন নলিনীকান্ত গুপ্ত। রাধাকমল বাবু অবশ্য অরবিন্দকেই প্রবন্ধকাররূপে সম্বোধন করেছিলেন। আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত 'সাধু ও শিল্পী' প্রবন্ধে নলিনীকান্ত গুপ্ত পুনরায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন। রাধাকমল বাবুকে লক্ষ্য করে তিনি পাল্টা প্রশ্ন রাখলেন—সাধু পাপের মধ্যে দেখেন যেন ভগবান, কি ভাবে? পাপের মধ্যে সাধু দেখেন পুণ্যাত্মক ভগবান, পাপাত্মা ভগবানকেও তিনি দেখেন কি? 'পাপীকে সাধু আলিঙ্গন করিতে পারেন, কিন্তু পাপকে কখন তিনি আলিঙ্গন করিবেন না। পাপীর পাপের অন্তরালে একটা পুণ্যবান শুদ্ধিমান কিছুর সহিতই তাঁহার একাত্মতা, পাপের সহিত নহে'। পরিবর্তে শিল্পী পাপের মধ্যে ভগবত সৌন্দর্য দেখেন তার পাপের জন্যই সাধু ও শিল্পীর মধ্যে পার্থক্য পাঠকবৃন্দের কাছে আরও স্পষ্ট করার জন্য টলষ্টয়ের উদাহরণ দিয়ে নলিনীকান্ত লিখছেন—'আনা কারেনিনার টলষ্টয় হইতেছেন শিল্পী তিনি যে সত্য প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন তাহা চিরজনের জিনিষ; কিন্তু ফাইভ্ কম্যাণ্ডমেণ্টস্ এর টলষ্টয় সেক্সপীয়রে কোন নীতিশিক্ষা না পাইয়া বলিয়াছেন, সেক্সপীয়রের কিছু মূল্য নাই, সে টলষ্টয় সাধুমাত্র'। নলিনীকান্তের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (প্রতিবাদের প্রতিবাদ, কার্ত্তিক সংখ্যা 'নারায়ণ')। এই প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা অনাবশ্যক। ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড নারায়ণ পত্রিকা সরগরম করে রেখেছিল আর্ট বিষয়ক এই বিতর্ক।

মগধের মৌখরি রাজবংশ, চল্লিশ বৎসর পূর্বে ও রঙ্গলালের 'বিরহ বিলাপ—নারায়ণের ২য় বর্ষ ২য় খণ্ডে এই তিনটি আলোচনা লিখে ননীগোপাল মজুমদার সাধারণ পাঠকের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আদায় করতে পেরেছিলেন। ১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'মগধের মৌখরী রাজবংশ' প্রবন্ধে ননীগোপাল দ্বিতীয় গুপ্ত রাজবংশের সমকালে যে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়েছিল, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মগধের মুখরবংশীয় ধর্মরাজ বংশের কালানুক্রমিক পরিচয় পেশ করেছেন নিপুণ ঐতিহাসিকদের মত। 'চল্লিশ বৎসর পূর্বে'—স্মৃতিকথামূলক রচনা। লেখকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পর্কে যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন, এই স্মৃতিকথায় তা বিবৃত হয়েছে। নারায়ণের ২য় বর্ষ অন্তিম সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৩) কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত খণ্ডকাব্য 'বিরহ-বিলাপ' আলোচনাসহযোগে প্রকাশ করা

ননীগোপালের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। তাঁর তৎপরতায় এই অমূল্য সম্পদটি কালের সর্বগ্রাসী গর্ভ থেকে রক্ষা পায়। 'বিরহ-বিলাপ' খণ্ডকাব্যটি কবি রাম শর্মার ইংরেজী কাব্য Willow Drops এর অনুবাদ। এই অনুবাদ বিষয়ে 'মুখার্জীস ম্যাগাজিন' পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রঙ্গলালের যে পত্রালাপ হয়, ননীগোপালের আলোচনায় সেই পত্রগুলি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। ননীগোপালের প্রচেষ্টায় আশ্বিন সংখ্যাতেও কবি রঙ্গলালের একটি ছোট অপ্রকাশিত অনুবাদ কবিতা মুদ্রিত হয়। কবিতাটি রামশর্মার লেখা Hymn to Durgaর অনুবাদ। এখানে উল্লেখ্য ননীগোপালের ব্যক্তি প্রতিভা সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা সমকালীন পত্রিকার গত শ্রাবণ, ১৩৮০ সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত মহাশয়ের লেখা ননীগোপালের জীবনী পাঠ করতে পারেন।

নারায়ণের ২য় বর্ষ ২য় খণ্ডে প্রাবন্ধিকদের তুলনায় কবিদের অপেক্ষাকৃত প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। ভুজঙ্গধর ও গিরিন্দ্রমোহিনী দেবীর সাথী হয়েছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র সেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মশায় দ্বিতীয় বছরেও বেশ কয়েকটি কথা-নাট্য, গল্প ইত্যাদি লিখেছিলেন। বিস্ময়ের কথা, বক্তব্য স্পষ্ট করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না—শিক্ষানবিশীর স্তর তিনি পেরোতে পারেন নি, তথাপি প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাতেই তিনি নিজের জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি এই সম্পাদকীয় দাক্ষিণ্যের কারণ 'নিহিতং গুহায়াম্'। 'গোবর গণেশের গবেষণা'খ্যাত হরিদাস হালদার ২য় খণ্ডের দু'টি সংখ্যা জুড়ে 'বিশ্বসেবায় বিদ্যুৎ' শীর্ষক একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছিলেন (৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা)। বিদ্যুতের কৃপায় বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ কত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে অর্জন করেছে তার পরিচয় মেলে প্রবন্ধটিতে। কলমের ডগায় নির্মল হাস্যরসসৃষ্টিতে তাঁর পটুত্ব ছিল লেখাটি পড়ে বোঝা যায়। মুচকি হাসিকে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ-তে রূপান্তরিত করতে ৬ষ্ঠ সংখ্যার জন্য 'গোবর গণেশ' ছদ্মনামে তিনি আবার কাগজ-কলম-মন তিনজনকে একত্রিত করলেন—প্রকাশিত হল 'প্রেম ও পরিণয়'। 'কর্তা গিন্নী এণ্ড কোম্পানী' কারবারের ক্যাপিটালিস্ট পার্টনার স্ত্রী ও ওয়ার্কিং পার্টনার স্বামীর মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ, কখন পুঁজিপতি অংশীদারকে আলিঙ্গন করলে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি হয়, ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে আদর্শ অংশীদার হবার জন্য সৎ পরামর্শ দান করেছেন তিনি—বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে তাঁর দক্ষতা কোন কোন পাঠকের ঈর্ষাই বোধ হয়।

অমরেন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণের নাটক বিচার করে যিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি নারায়ণের ২য় বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যায় কালের বিচারে নিধু গুপ্তের মূল্য নিরূপণে সচেষ্ট হন। নারায়ণে চারটি সংখ্যায় তাঁর এই কাব্যপরিক্রমা সমাপ্ত হয়। অবশ্য রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। লেখকের পূর্ব প্রবন্ধের মত এটির মূল্যও অপরিসীম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য বা সিদ্ধান্তকে সহজেই 'অবিবেচনাপ্রসূত' আখ্যা দেওয়া যায়। নিধুবাবুর সৃষ্টিকে মহত্তর করার বাসনায় তিনি বেমালুম লিখেছেন—'মুখে নিধুকে উড়াইতে চেষ্টা করিলেও, মন হইতে আমরা তাঁহাকে এড়াইতে পারি নাই। এমন কি এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীত রচয়িতা গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ তাঁহারও অন্যান্য কবিওয়ালার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই'। অমরেন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত দিতেও ভোলেননি। যেমন, নিধুবাবুর—'তোমারি মনের দুঃখ চিরদিন মনে রহিল/ফুকারি কাঁদিতে নারি বিচ্ছেদে প্রাণ দহিল' ও রবীন্দ্রনাথের—হলো না, হলো না সই/মরমে মরম লুকান রহিল বলা হল না; /বলি বলি বলি

তারে কত মনে করিনু/হলো না সই'—এর সাদৃশ্য। 'আমি মাত্র এই চাই, মরি তাতে ক্ষতি নাই/ তুমি আমার সুখে থেকো, এদেহে সকলি সবে'—নিধুবাবুর এই ভাবই রবীন্দ্রনাথ একটু ঘুরিয়ে বলেছেন —'তুমি যাহে সুখী হও তাই কর সখা/আমি সুখী হব বলে যেন না /আপন বিরহ লয়ে আছি আমি ভাল। (গিরিশচন্দ্র প্রসঙ্গ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই)। খণ্ডিত চিত্র সামনে রেখে বিচারে প্রবৃত্ত হলে এরকম অবিচার অবশ্যম্ভাবী। অমরেন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত কোন রসগ্রাহী সাহিত্যবোদ্ধাই যে মেনে নিতে পারবেন না, বলা বাহুল্য। এই উদ্ভট আবিষ্কার সম্বন্ধে 'ভারতী' পত্রিকা তাদের 'মাসকাবারী' বিভাগে লিখছেন—'এ অত্যন্ত ভুয়ো কথা—যতই জোর গলায় বল, ইহা টিঁকিবে না। রবীন্দ্রনাথ নিধুগুপ্তের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই—একথা মানিতে হইলে রবীন্দ্রের রবীন্দ্রতত্ত্বকেই অস্বীকার করিতে হয়।···বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডভাবে দেখিলে তো চলিবে না, তাঁহাকে সমগ্রভাবে দেখা চাই। তিনি যদি কেবলমাত্র গোটাকয়েক বিরহ বা মিলনের টপ্পা লিখিয়া ক্ষান্ত হইতেন তাহা হইলে চাই কি এমন কথা তোলা চলিত। কিন্তু তাঁহার শক্তি যে বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা তো কোনো গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই—তাহা নব নব বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অসীমতার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কাজেই অপরের কথা দূরে থাক, তিনি নিজেকেই নিজে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। লেখক যে লাইনগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তো রবীন্দ্রনাথের সর্বস্ব নহে এবং সেগুলিও যে তাঁর শ্রেষ্ঠ দান তাহাও নয়। কাজেই সেগুলি লইয়া রবীন্দ্রনাথকে বিচার করা চলে না। আর তা ছাড়া, সকল মানুষের মধ্যে কতকগুলা সাধারণ ভাব আছে—সেগুলোর মূল-কথা লইয়া সাহিত্যের বিচার হয় না। ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়া কোন্ আকারে তাহা ফুটিয়াছে তাহাই দেখিতে হয়। নইলে মূলভাব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় সাহিত্যের আরম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত গোটা-কয়েক সূত্র ছাড়া বেশি কিছু সৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটা মাত্র সূক্ষ্মরেখা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত প্রতিভাকে বাঁধিয়া ফেলা যায়' (আষাঢ়, ১৩২৩, পৃঃ- ৩৮০-৮২)।

'স্ত্রীর পত্রের' আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করে বিপিনচন্দ্রের লেখা 'মৃণালের কথা' প্রকাশ করে নারায়ণ পত্রিকা রবীন্দ্র-বিরোধিতার ধ্বজা উড্ডীন করে। প্রথম বছরের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে সহজেই সে রবীন্দ্র-বিরোধীদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল, আমার পূর্ব প্রবন্ধে বিষয়টি আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষ ১ম খণ্ডের কোন সংখ্যাতেই, কেউ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জোব্বায় কালি ছিটোতে এগিয়ে আসেন নি। দ্বিতীয় খণ্ডে এই দুর্নাম মোচালেন অমরেন্দ্রনাথ রায়। ১ম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ কঠোরভাবে সমালোচিত হলেন। 'কঠোর সমালোচনা' শীর্ষক এই ছিদ্রান্বেষণ ও নিধুগুপ্তের সাহিত্যালোচনার প্রথম পর্ব একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)। ভারতী পত্রিকার বৈশাখ, ১৩২৩ সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের একটি নিবন্ধকে কেন্দ্র করে অমরেন্দ্রনাথ আক্রমণ শানিয়েছিলেন। সে বছর ভারতী পত্রিকার ৪০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে, এই খেয়া নৌকাটির প্রথম ভাসানের দিনে যাঁরা দাঁড়ি-মাঝি ছিলেন তাঁদের তলব পড়ে সেদিনের অভিযান কাহিনী শোনানোর জন্য। রবীন্দ্রনাথ 'তখন ও এখন' শিরোনামে সংক্ষেপে বাংলা সাহিত্যের তখন ও এখনকার (১৩২৩) অবস্থা বর্ণনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে বাংলা সাহিত্যের বর্তমানে

শৈশবাবস্থা। এই শিশুকে সুস্থ সবল পূর্ণ বয়স্কে রূপান্তরিত করতে হলে সমালোচকদের অহেতুক নিত্য নতুন তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ সংবরণ করতে হবে। আমরা দেখি বর্তমান সমালোচকরা শাসনের কঠোর দণ্ড হাতে নিয়ে সর্বসময়ে এই ছোট্ট শিশুটিকে গালমন্দ দিচ্ছে। প্রশংসা বা উৎসাহ মেলে না কোথাও। কিন্তু সমস্ত অপরিণতি সত্বেও, তাকে বড় করে তুলতে হলে স্নেহস্পর্শ একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধ শেষে তিনি সাহিত্য সমালোচকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—'সত্যংব্রুয়াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং/প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং'॥ 'বাংলা সাহিত্যকে কি আমরা পাকা বয়সের সাহিত্য বলিতে পারি? না পারি না। এখন ইহাকে ঘের দিয়া বাঁচাইয়া তুলিতে হইবে—ইহার কচি ডালপালাগুলো গোরু ছাগল দিয়া মুড়াইয়া খাইতে দিলে যে ইহার উপকার হইবে এমন কথা আমি মনে করি না। এই জন্য আমার মতে বাংলা সাহিত্যে কঠোর সমালোচনার দিনে আসে নাই। যে লেখা ভাল বলিতে পারিব না তার সম্বন্ধে চুপ করিয়া যাইতে হইবে। অথচ দেখিতে পাই বালক বাংলা সাহিত্য যেন অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর হাতে চারিদিক হইতে কেবলি বাণ খাইতেছে। না, সপ্তরথী বলাও ভুল—কেন না বীরের হাতের মারও নয়। ছোট ছোট সমালোচকের ছোট ছোট খোঁচা তাহাকে হয়রাণ করিয়া মারিতেছে।'—রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে এই উদ্ধৃতি দিয়ে অমরেন্দ্র বলেছিলেন—(১) প্রায় পাঁচশো বছর আগে যে দেশে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশের সাহিত্যের বয়স পাকা না বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। (২) রবীন্দ্রনাথই 'সাধনা'র পাতায় ২২।২৩ বৎসর আগে লিখেছিলেন—'নিজের বাগানের প্রতি যে মালীর যথার্থ অনুরাগ আছে, ছোট খাট কাঁটাগুল্ম-জঙ্গলকে সে তীব্র কোদালি দিয়া সবলে সমূলে উচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্ম জঙ্গল অনাদরে জন্মে, তাহাদিগকে সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। কারণ তাহারা দেখিতে দেখিতে সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুণে না হৌক সংখ্যায় প্রধান হইয়া দাঁড়ায়, ভালয় মন্দয় এমন একাকার হইয়া যায় যে নির্বাচন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তখন ভাল জিনিস আপন জন্মভূমি হইতে প্রাণধারণযোগ্য যথেষ্ট রস পায় না, ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসে।' —এখন কেন রবীন্দ্রনাথ বিপরীত মত সমর্থন করছেন? 'পাঠক বেচারী—যাহারা ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়ে, তাহাদের সহিত প্রতারণা করাই কি তবে সমালোচকের ধর্ম? সমালোচনা ও বিজ্ঞাপন কি তবে একাকার হইয়া যাইবে? কঠোর সমালোচনার আঘাত রবীন্দ্রনাথ খুব অল্পই সহ্য করিয়াছেন সত্য। কিন্তু সেই স্বল্প আঘাতের ফলে যে তাঁহার একটু উপকার হইয়াছিল, সে কথা তিনি আজ কেন বিস্মৃত হইতেছেন? কেন ভুলিয়া যাইতেছেন যে য়াঃর কবলে না পড়িলে তাঁহার 'কড়ি ও কোমলের' দ্বিতীয় সংস্করণ অতটা আবর্জনাবর্জিত হইত না? রবীন্দ্রমতের শুধুমাত্র পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি পাঠে অনেকের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধটি যাঁরা পড়েছেন অমরেন্দ্রনাথের বক্তব্যে তাঁদের মনে কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। এবং রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে যে যথেষ্ট যুক্তি ছিল তা' মেনে নিতে দ্বিধা হবে না। রবীন্দ্রমতের প্রয়োজনীয় কয়েকটি অংশ অমরেন্দ্রনাথ সযত্নে পরিহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'বাংলা সাহিত্যের জন্য সৌজন্যের চেয়ে আরো বেশী কিছু চাই, তাহা স্নেহ। স্নেহের লক্ষণ এই তাহা বর্তমানের অসম্পূর্ণতাকেই বড় করে না। তাহা ভবিষ্যতের আশার প্রতিই

বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করে। যে জিনিষ কাঁচা যার বাড় ফুরায় নাই, এই স্নেহ, এই ভবিষ্যতের আশ্বাস তার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ যার শক্তির পরিচয় বর্তমানেই, প্রধানতঃ ভবিষ্যতে নহে, স্নেহ তার পক্ষে অনাবশ্যক ও অনিষ্টকর। ভালো বলিতে পারিবার আনন্দ যদি আমাদের মনে না থাকে, যদি মন্দ বলবার উৎসাহই যখন তখন ছোবল মারিতে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করে তবে এমন নির্মমতার পথে বঙ্গসাহিত্যের কোনো কল্যাণ দেখি না। ছোটছেলের কান মলিতে পারি বলিয়াই তার কানমলা যে মস্ত একটা বাহাদুরি এই বর্বরতা যেন আমাদের মনে না থাকে। ছোট ছেলেকেও যে শ্রদ্ধা করিতে পারে সেই হল মহৎ'। সাময়িক উত্তেজনায় অমরেন্দ্রনাথ যে ভুল করেছিলেন এই উদ্ধৃতি পড়ে সহজেই বোঝা যায়। উভয়ের বক্তব্যের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে —রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যকে 'বালক' আখ্যা দিয়েছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ধরে নিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্য প্রাপ্ত বয়স্ক ও মনস্ক। অমরেন্দ্রনাথের অপবাদ প্রচেষ্টা 'ভারতী' সহজে মেনে নিতে পারেন নি। আষাঢ় সংখ্যায় 'ভালো-মন্দ' প্রবন্ধে অমরেন্দ্র উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন করে রবীন্দ্র মত পুনরায় বিশদভাবে ব্যক্ত করা হয়। সাহিত্যের বয়স বিষয়ে ভারতীর জবাব—'কিন্তু দিন গণিয়া কি সাহিত্যের পরিণতি সাব্যস্ত করা যায়। মানুষেরই যায় না তা সাহিত্যে তো দূরের কথা। চলতি কথায় শোনা যায়, কোনো কোনো বংশের লোক আশি বছরে সাবালক হয়। সেটা একেবারে মিছা কথা নয়। অনেক মানুষের বয়স আশি হইয়াছে দেখা যায়,—তার চুল পাকিয়াছে, হাড় পাকিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি পাকে নাই; আট বছরে যেমন ছিল আশি বছরেও তেমন আছে। তেমন লোককে বলিতে হয় বয়স হয় নাই। সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে—শুধু বছর গণিয়া তার পরিণতি নির্ণয় করা চলে না। পরিণতির যে রূপ আছে তাহা সে লাভ করিয়াছে কি না বিচার করিতে হয়"। বাংলা সাহিত্যের সমস্ত অঙ্গ পরিপুষ্ট হয়ে, এটি কি মহামহীরুহে পরিণত হয়েছে? সাহিত্যে কি কোন 'standard' তৈরী হয়েছে? 'দুই-একজন মহাপুরুষের শক্তিতে ইহার এক এক জায়গায় বাড় যেন যাদুমন্ত্রে হঠাৎ অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেছে, তাহাতে দেশবিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, কিন্তু অনেক অংশ যে এখনও কচি।'—ভারতীর বক্তব্য যুক্তিসম্মত, বলা বাহুল্য। দ্রুততার সঙ্গে রচিত হওয়ার মধ্যেই বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের 'তখন ও এখন' প্রবন্ধ-বক্তব্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ রয়ে গেছে। প্রবন্ধটি থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে অতি সহজেই বক্তব্য বিষয়ের বিপরীত মত সমর্থন করা যায়। যেমন—উপসংহার পর্যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'সাহিত্য সমালোচনায় ক্ষেত্রে এই উপদেশটি অমূল্য—সত্যংব্রূয়াৎ…ইত্যাদি'। যে দেশের সাহিত্য বয়সে ও মননে পরিণত, সে দেশের সাহিত্য সমালোচকদের কি এই শ্লোকটি স্মরণে রাখার প্রয়োজন আছে? বালক সাহিত্যের সমালোচকদের ক্ষেত্রেই শুধু একথা প্রযোজ্য। এবং রবীন্দ্রনাথের উপদেশ 'বালক' সাহিত্য সম্পর্কেই। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটির উপসংহার পর্যায়ে আর একটু সতর্ক হলে হয়তো অথবা সমালোচনার হাত থেকে তিনি রক্ষা পেতেন। অবশ্য চালুনি সর্বসময় সুঁচের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত থাকে। রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে প্রমথ চৌধুরীও এগিয়ে এসেছিলেন। আশ্বিন সংখ্যা ভারতীতে 'সত্যং ব্রূয়াৎ' নিবন্ধে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে লিখলেন 'সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ…' শ্লোকটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোন গর্হিত কাজ করেন নি। কারণ হালফ্যাসানী সমালোচকদের অনুসৃত নীতির

কোনটিই এই শ্লোকের সাহায্যে খর্ব করা সম্ভব নয়। প্রথমতঃ, আচার্য বলেছেন—সত্য কথা বোলো, প্রিয় কথা বোলো। কিন্তু 'প্রিয়সত্য বলিয়ো' এ আদেশ তো তিনি করেন নি। সুতরাং 'যে সমস্ত সত্যসত্যই প্রশংসার যোগ্য তার প্রশংসা করতে আমরা বাধ্য নই—অর্থাৎ বঙ্গসাহিত্যে প্রতিভার প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্তব্যের মধ্যে নয়'। দ্বিতীয়তঃ, অপ্রিয় সত্য বলা বারণ, অপ্রিয় মিথ্যা বলা তো বারণ নয়। সুতরাং সমালোচকদের আতংকিত হবার প্রয়োজন নেই। তৃতীয়তঃ রবীন্দ্রনাথ উপদেশ দিয়েছেন—'বড়র পক্ষে ছোটর উপর হাত চালানো অকর্তব্য'—একথা বলার অর্থ এই নয় যে ছোটরাও বড়র উপর হাত চালাবে না। 'সুতরাং সমালোচকদের পক্ষে কৃতি লেখকদের প্রতি ধৃষ্ট তাড়না করবার অধিকার রবীন্দ্রনাথ কেড়ে নিতে চাননি'। প্রমথ চৌধুরীর সরস রচনাটির শেষ পৃষ্ঠায় ভারতী কর্তৃপক্ষ একটি শ্লেষাত্মক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। জনৈক নবকুমার কবিরত্ন রচিত 'রামছুঁচায়ণ' শীর্ষক কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন হল—

ছুঁচামিতে বড় যারা তারা রামছুঁচা
দুটা কান কাটা তাই মান ভারি উঁচা।
কিচ কিচ স্বরে ছুঁচা কয় একদিন।
'আমি প্রায় ক্ষুদ্রকায় কস্তুরী হরিণ'।
থাঁদা নাক ফোলাইয়া ব্যাঙ কহে তাই॥
এ খোঁজ রাখে না কেউ কারো নাক নাই॥…

নবকুমার কবিরত্ন আর কেউ নন, প্রখ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। নবকুমারের 'রামছুঁচায়ণ' রচনায় কোন উদ্দেশ্য ছিল কি না জানিনা, তবে সাহিত্য বিষয়ে ভারতী সবুজপত্র গোষ্ঠীর আধুনিকতার সমর্থনে তিনি ভারতীর পাতায় কয়েকটি আলোচনা লিখেছিলেন। তাই মনে হয়, 'রামছুঁচায়ণ, উদ্দেশ্যহীন নয়। অমরেন্দ্রনাথ রায় কিন্তু মোটেই দমলেন না। অপরিসীম উৎসাহে তিনি সঞ্চয় করতে লাগলেন স্বরদৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি সকলের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা বা inconsistency। এই সংগ্রহ 'রবিয়ানা' নামে একটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বক্তব্যবস্তুর অদ্ভুত মৌলিকতার জন্যই কি না কে জানে বর্তমান যুগের অধিকাংশ পাঠক ও সমালোচক বইটির অস্তিত্বও জানেন না। ভারতী পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩২৩) 'মাসকাবারী' বিভাগটি ছিল শুধুমাত্র কয়েকটি শ্লেষাত্মক চুটকী জাতীয় রচনার সমন্বয়। তা' থেকে একটি চুটকী উদ্ধৃত করে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করলাম—প্রাণীতত্ত্ববিদগণ বলেন, রবির আলো পেঁচা বাদুড় ও চামচিকেদের চর্ম-চক্ষে সহে না। এখন এ আলো শীতল করিবার উপদেশ কি ? কবি বলিতেছেন—

রবির গায়ে থুতু দিতে
　　উড়ছে বাদুড় মেলা
চামচিকে! নাম কিনবি যদি
　　সঙ্গ নে এই বেলা॥

গণপতি-বিনায়ক

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঠিক কবে গণেশঠাকুরের পুজোর প্রচলন হয়েছিল এ নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। তবে, অন্যান্য হিন্দু দেবদেবীদের তুলনায় তিনি যে কিছুটা আসরে নবাগত এ ব্যাপারে অনেকেরই সন্দেহ নেই। রামায়ণ তাঁর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নীরব—যদিও সেখানে শিব, বিষ্ণু, উমা, সূর্য, স্কন্দ ইত্যাদি দেবতার উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে যে গণেশের সন্ধান পাওয়া যায় প্রথমে তাঁকে নিয়েই আলোচনা করা যাক। কারণ আমাদের ধারণা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে এখানেই প্রথম গণপতির আবির্ভাব। আদিপর্বের বেশ কিছুটা অংশ মহাভারতে পরে সংযোজিত হয়েছিল তা মনে করবার সংযত কারণ আছে। এই পর্বের প্রথম অধ্যায়েই (৭৩-৮৩) গণেশের কথা (ক্রিটিকাল এডিসনে শ্লোকগুলিকে অবশ্য Appendix-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে) আছে। গণেশের আবির্ভাব প্রসঙ্গে যে গল্পের অবতারণা করা হয়েছে সেটা প্রায় সবারই জানা, তাই পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন; গণেশ এখানে কেরানীর ভূমিকা নিয়েছেন। বলা হয়েছে গোটা মহাভারতটাই নাকি ব্যাসদেব তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন। গণেশকে লেখক বা কেরাণীর ভূমিকা কেন দেওয়া হল তা পরে আলোচনা করছি। আপাততঃ মহাভারতের এই অংশে গণেশ সম্বন্ধে আর কি কি বলা হয়েছে সেটা দেখা যাক। সব শুদ্ধু চারটে নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। সেগুলি হল গণেশ, হেরম্ব, বিঘ্নেশ, ও গণনায়ক। এই প্রত্যেকটি নামের এক বিশেষ তাৎপর্য আছে। গণেশ, গণনায়ক এবং পরের যুগের গণপতি নামে তিনটির অর্থ একই। ঋগ্বেদে (২, ২, ২৩) গণপতি নাম পাই। কিন্তু সেখানে ঐ গণপতি পরের যুগের স্থূলোদর, সিদ্ধিদাতা গণেশ যে কিছুতেই হতে পারেন না সে বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। বাজসনেয়ি সংহিতায় (২৩. ১৯) যে গণপতির কথা আছে, তিনিও পরের যুগের গণেশ নন। আরও দুটি বৈদিক গ্রন্থে অবশ্য পরের যুগের গণেশের কথা আছে। সেগুলি হল মৈত্রায়ণী সংহিতা (২. ৯. ১) ও তৈত্তরীয় আরণ্যক (১০. ১. ৫,)। কিন্তু ঐ গ্রন্থদুটির যে অংশে গণেশ রয়েছেন তা খুব বেশী পুরোনো কিনা তাতে অনেকেরই সন্দেহ আছে।

আমরা একটু আগেই বলেছি যে গণেশ এবং গণনায়ক কথার অর্থের কোনো পার্থক্য নেই। ঋগ্বেদে রুদ্রের সঙ্গে নানা ধরণের গণের উল্লেখ আছে। এরা তাঁর পার্ষদ বলে পরিচিত। ঋগ্বেদের এই রুদ্র অন্যান্য দেবতার মতো অতটা polished নন এবং তাঁর পার্ষদেরা খুব আর্যজনোচিত কাজে লিপ্ত থাকতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মহাভারতের যিনি গণনায়ক বা গণেশ তাঁর সঙ্গে বৈদিক গণদের কোনো মিল দেখি না। আমরা প্রথমেই দেখেছি যে গণেশ মহাভারত লেখক বা ইংরেজীতে যাকে বলে amanuensis-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গে তাঁর জ্ঞান ও বিদ্যার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে। তাঁর 'সর্বজ্ঞ' বিশেষণটি (১. ১. ৮৩) সবারই চোখে পড়বে। এ ছাড়া ব্যাসদেবের মতো কট্টর পণ্ডিত লোকের শ্লোক বুঝে শুনে তাঁকে লিখতে

হয়েছিল (১. ১. ৮২-৮৩)। সুতরাং কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে মহাভারতের এই গণেশ পরের যুগের ব্যবসাদারদের মামুলী দেবতা নন। মহাভারতে গণেশের আরো দুটি নাম 'বিঘ্নেশ' ও 'হেরম্ব' পরের যুগের সাহিত্য ও শিলালিপিতে বহুবার পাওয়া যায়।

গণেশ-প্রসঙ্গে মহাভারতের আলোচনায় একটা ব্যাপার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এ গণেশ এখনও 'গজানন' হয়ে উঠতে পারেন নি। গণেশ নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গজমুণ্ড গণেশ ভারতীয় ভাস্কর্যে খৃষ্টজন্মের কিছু পর থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন। সিংহলে মিহিনতালের কাছে হস্তিমুণ্ড যে মূর্তিটি পাওয়া যায় তাকে অনেকেই গণেশেরই prototype হিসেবে ধরেছেন। এ মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের পরের নয় (গেটি—গণেশ, পৃঃ, ২৫)। অমরাবতীতে প্রাপ্ত দ্বিতীয় শতকের গজমুণ্ড যক্ষমূর্তিটিকে কুমারস্বামী গণেশেরই আদিমূর্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে ঐ মূর্তিটিতে এক সর্পাকৃতি মালা রয়েছে যা বিষ্ণুধর্মোত্তর (৩. ৭১. ১৬) 'বা' কথাসরিৎসাগরের (৫৫. ১৬২ ; ৭৩. ৩২৫) গণেশমূর্তির বর্ণনাকেই সমর্থন করে। এ ছাড়া গত কয়েক বছরে প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের গজমুণ্ড দু একটি ছোটো মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। মথুরা ও ভিতরগাঁও এ প্রাপ্ত গণেশমূর্তি দুটি ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরের বলে মনে হয় না। স্বর্গীয় অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গজমুণ্ড গণেশের প্রাচীনতম মূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে গুপ্ত যুগের পরে তৈরী করা হয়েছিল। এই ধরণের আলোচনা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে মহাভারতের যে অংশে গণেশের কথা আছে তা অন্ততঃ খ্রীষ্টজন্মের কিছু আগে লেখা হয়েছিল। মহাভারতের গণেশ সম্বন্ধে বিটারনিৎসের (Winternitz) মত আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ যে গণেশ 'সর্বজ্ঞ' রূপে কল্পিত হতে পারেন এবং যিনি পরের যুগের সাহিত্য ও (হর্ষচরিত, তৃতীয় উচ্ছ্বাস, নারদ ও ব্রহ্মবিবর্ত পুরাণ) জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন তাঁর লেখক বা copyist হওয়ার বাধা কোথায় ? সোমদেবের কথা সরিৎসাগরের তো সর্বত্রই গণপতি বা বিনায়ক জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতা হিসেবে চিত্রিত হয়েছেন। পণ্ডিতপ্রবর Muirও গণেশের লেখক বা কেরাণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কারণ সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত যে যুক্তি সমর্থনযোগ্য তা বর্তমান লেখক বিশ্বাস করেন। মৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে যে গণপতির কথা বলা হয়েছে তিনি অবশ্যই 'গজানন' ও সেই সঙ্গে 'দন্তিন'। এই অংশগুলি তাই খ্রীষ্টজন্মের পরের বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু গজানন-গণেশ ভারতীয় ভাস্কর্যে এমন কিছু অর্বাচীন নন, সেহেতু ঐ গ্রন্থগুলির অংশদুটিকে যাঁরা বহু পরের রচনা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারব না।

হাতীর মাথা গণেশের ঘাড়ে কেন চাপল তা আলোচনার আগে মহাভারতের পরের যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে গণেশের কথা আর কি আছে তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্। মানবগৃহ্যসূত্রে (২'১৪) যে চার ধরণের বিনায়কের কথা আছে সে সম্বন্ধে স্তর আর জি ভাণ্ডারকার ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছেন। মহাভারতের অনুশাসনপর্বেই (১৫০ তম অধ্যায়) বিনায়কদের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মানবগৃহ্যসূত্রে বা অনুশাসনপর্বের বিনায়কদের সঙ্গে আমাদের হেরম্ব-গণেশের সম্বন্ধের কোনো ইঙ্গিত আমরা পাই না। অবশ্য অনুশাসন পর্বের একটি শ্লোকে (১৫০.২৫) 'গণেশ্বরবিনায়কাঃ'

কথাটি আছে। কিন্তু এই বহুবচনের প্রয়োগ থেকে কিছুই স্পষ্ট হয় না। আমাদের নিশ্চিত ধারণা 'বিনায়কাঃ' বলতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা একধরণের প্রাচীন লৌকিক গ্রহ-রাক্ষস ছাড়া আর কিছু নয়। মানবগৃহ্যসূত্র থেকে জানা যায় যে বিনায়কেরা নানাভাবে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করতে ওস্তাদ। তাদের দৌরাত্ম্য থেকে বাঁচার জন্য অনেক ধরণের পুজো পার্বণের কথা বলা হয়েছে।

বিনায়কদের সঙ্গে গণেশের মিলনের প্রথম সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (১'২৭১-২৯৪)। মানবগৃহ্যসূত্রের মতো এখানেও বিনায়কের উৎপাত থেকে রেহাই পাবার উপায় বলা হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ বিনায়ক শিবপত্নী অম্বিকার পুত্র হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। পরের যুগের পার্বতীপুত্র গণেশের উৎপত্তি যে এই অম্বিকাপুত্র গণপতি বিনায়ক থেকেই হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের মতোই যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের বিবাদ আছে। তবে দীনারের উল্লেখ না থাকায় এই গ্রন্থের রচনা অন্ততঃ প্রথম শতকের পরের নয় বলেই মনে হয়। অনেকেই মনে করেন কায়স্থের (১'৩৩৬) উল্লেখের জন্য গ্রন্থটিকে গুপ্তযুগের রচনা বলে মনে করা উচিত। কিন্তু সম্প্রতি-প্রাপ্ত কুষাণযুগের এক মথুরার শিলালিপিতে 'কায়স্থ' কথাটা পাওয়া যায়। সুতরাং অন্য কোনো ভালো প্রমাণ না পওয়া পর্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিকে প্রথম শতকের রচনা বলে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

গুপ্তযুগে রচিত অমরকোষে (অবশ্য গুপ্তযুগের কিছু আগের গ্রন্থও এটা হতে পারে। দীনারের উল্লেখ থাকায় এ গ্রন্থকে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের পূর্বে ফেলা যায় না।) গণপতির ৮টি নাম পাই। নামগুলি হোলো—বিনায়ক, বিঘ্নরাজ, দ্বৈমাতুর, গণাধিপ, একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর এবং গজানন। আমরা একটু আগেই দেখেছি যে মহাভারতে তাঁকে চার নামে ডাকা হয়েছে। মহাভারতে 'গণেশ' বা 'গণনায়ক' এ মানে হয়েছে 'গণাধিপ' এবং 'বিঘ্নেশ' 'বিঘ্নরাজ ' দাঁড়িয়েছে। 'হেরম্ব' যথাযথভাবে এখানেও রয়েছে। আর যে পাঁচটি নাম যোগ হয়েছে তা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। 'দ্বৈমাতুর' কার্তিকেয়ের 'ষাণ্মাতুর' নামের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং শিবপত্নীদ্বয় উমা ও গঙ্গার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কথাই প্রমাণ করে। গণেশের 'গজানন'রূপে আত্মপ্রকাশটাই এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আর যিনি 'গজানন' তাঁর নাম 'লম্বোদর' হওয়াটাই স্বাভাবিক। মহাভারতের আদিপর্ব ও অমরকোষের রচনার মধ্যে যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছিল তার মধ্যেই ধীরে ধীরে গজাননের আত্মপ্রকাশ। যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে মহাভারতের ঐ অংশটা খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের লেখা এবং অমরকোষ খ্রীষ্টিয় চতুর্থ শতকের গ্রন্থ তাহলে গণপতির পুরোপুরি গজানন হতে দুশ বছর লেগেছিল।

এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে। অমরকোষের স্বর্গবর্গে প্রায় সমস্ত জনপ্রিয় প্রাচীন ভারতীয় দেবদেবীর নাম আছে। শিব, বিষ্ণুর মতো বড় দেবতার সুদীর্ঘ নামের তালিকা এখানে রয়েছে। তালিকার দৈর্ঘ্য দেখে ঐ গ্রন্থ রচনার সময়কার কোনো বিশেষ দেবতার জনপ্রিয়তা ও প্রাচীনত্ব কিছুটা আন্দাজ করা যায়। অর্থাৎ যে দেবতাকে দশ নামে ডাকা হয়েছে, তিনি নিশ্চয়ই পাঁচ-নামের দেবতার চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে স্বর্গবর্গে পার্বতীকে ১৭টি নামে অথচ লক্ষ্মীকে মোটে ৬টি নামে ডাকা হয়েছে। তাতে প্রমাণ হয় পার্বতী

গুপ্তযুগে লক্ষ্মীর চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। সেইসঙ্গে আরো একটা ব্যাপার ভাবতে হবে। পার্বতীর ঐ ১৭টি নাম হতে যে সময় লেগেছিল তা নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর ঐ ৬টি নামের চেয়ে বেশী। তবে সব ক্ষেত্রে এ যুক্তি নাও টিকতে পারে। বুদ্ধের এখানে ৭টি নাম, অথচ বরুণের মাত্র ৫টি। কিন্তু বরুণ বৈদিক যুগেরও পূর্বের দেবতা আর বুদ্ধের সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক। এতে বোঝা যায় যে গুপ্তযুগে বরুণের জনপ্রিয়তা অনেক কমে গিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তালিকার চেহারা দেখে এক গ্রহণযোগ্য সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো সম্ভব।

আমাদের মতে যেহেতু অমরকোষে গণপতির ৮টি এবং কার্তিকের ১৬টি নাম রয়েছে সেহেতু ঐ সময় কার্তিক গণেশের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ছিলেন। শুধু তাই নয় কার্তিকের ঐ ১৬টি নাম পরোক্ষভাবে প্রমাণ করে যে তিনি দেবতা হিসেবে গণেশের চেয়ে প্রাচীন। অন্যান্য সূত্রেও আমাদের এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রে (২. ৫. ৯. ৭) আমরা গণেশের কয়েকটি নাম পাই। নামগুলি এরকম—বিঘ্ন, বিনায়ক, বীর, স্থূল, বরদ, হস্তিমুখ, বক্রতুণ্ড, একদন্ত ও লম্বোদর। এই নামগুলির সঙ্গে গণপতির দ্বারপাল ও দ্বারপালিকাদের কথাও বলা হয়েছে। Biihler এবং Macdonell উভয়েই এই গ্রন্থকে চতুর্থ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের পূর্বের লেখা বলেছেন। ঠিক এই কারণেই মহামহোপাধ্যায় কানে গণেশের নামের এই তালিকাকে প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন। যদি এই তালিকা প্রক্ষিপ্ত না হয় তাহলে অবশ্যই গণেশ সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণাকে পাল্টাতে হবে। সেই সঙ্গে মৈত্রায়ণী সংহিতা ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে গণেশ সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী থাকতে হবে। আমরা আগেই দেখেছি যে এই দুই গ্রন্থে গণেশের হাতীর সঙ্গে যোগের কথা বলা হয়েছে। বৌধায়ন ধর্মশাস্ত্রের হস্তিমুখ, বক্রতুণ্ড ও একদন্ত নাম ঐ একই যোগ প্রমাণ করে।

গণপতির সঙ্গে রুদ্রের সম্বন্ধের কথা আমরা আগেই বলেছি। বেশ কিছু পণ্ডিত শিব-রুদ্রের পুজো মহেঞ্জোদারোর যুগে ছিল এ কথা বিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে শিব আর্যপূর্ব ভারতের লৌকিক দেবতা। আমরা এও দেখেছি যে বিনায়কনামে যাদের কল্পনা করা হয়েছে তাদের কার্যধারার মধ্যে এই লৌকিক ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। গণেশের হস্তিমুখ দেখে মনে হয় তিনি আর্যদের মধ্যে জনপ্রিয় হবার আগে কোনো একরূপে পুলিন্দ, শবর, ভীল ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় অনার্য জাতিদের দ্বারা পূজিত হতেন। অমরকোষের প্রখ্যাত টীকাকার ক্ষীরস্বামীর মতে গণেশের 'হেরম্ব' নামটি এক দেশ্য শব্দ। এই 'হেরম্ব' নামটি মহাভারতেও আছে তা আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি। সুতরাং কোনো সন্দেহ নেই যে গণেশের এটি একটি অতি প্রাচীন নাম। ক্ষীরস্বামীর মত গ্রহণ করলে এটা স্বীকার করতে হবে যে গণেশ মূলতঃ শিব বা দুর্গার মতো লৌকিক দেবতা ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় কানেও গণেশ সম্বন্ধে এ কথা বিশ্বাস করেন।

গাথা সপ্তশতীতে (৪. ৭২ ; ৫. ৩) গণেশের মূর্তি ও তার হাতীর সঙ্গে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে। শাতবাহন যুগের রচনা হিসেবে এ গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ। কিন্তু অনেকেই তা বিশ্বাস করেন না। তবে গুপ্তযুগের বেশী পরে এটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। রাধিকার উল্লেখ থাকায় কেউ কেউ এই গ্রন্থকে মধ্যযুগের রচনা বলে মনে করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে রাধার নাম বায়ুপুরাণেও

আছে, যদিও অনেকে এও প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে গুপ্তযুগের শুরু হবার আগে থেকেই গণেশের মূর্তি পূজার প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং গাথা সপ্তশতীর মধ্যে রাধামূর্তির উল্লেখ দেখে আঁতকে ওঠার কিছু কারণ নেই। কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত এবং বেশ কিছু তাঁদের ভারতীয় শিষ্য প্রাচীন ভারতের যে কোনো গ্রন্থ বা পুরাণকে বহু পরের যুগের রচনা বলতে পারলে যেন বেঁচে যান। তাঁদের সমস্ত ধারণার মূলে অবশ্য রয়েছে ভট্ট মোক্ষ মূলরের ঋগ্বেদের রচনকালের থিওরী। ঋগ্বেদকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে ফেললে তাঁদের মনগড়া ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারতে আর্যদের আক্রমণের কল্পনা যে নস্যাৎ হয়ে যাবে তা তাঁরা ভাল করেই জানেন; এবং সেই সঙ্গে ধ্বংস হবে হুইলার (Wheeler) সাহেবের আর্যদের দ্বারা হরপ্পা ধ্বংসের থিওরী। যে কোনো দিক দিয়ে বিচার করলেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধে এ থিওরীকে অদ্ভুত ও অবাস্তব বলে মনে হবে। প্রথমেই ধরা যাক্ ভারতে ব্যাকরণশাস্ত্রের ইতিহাস। Basham ও আরো দু-একজন পণ্ডিতকে বাদ দিলে কেউই পাণিনিকে ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরের বলে মনে করেন না। এই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে অন্ততঃ এক ডজন প্রাচীন বৈয়াকরণদের নামের উল্লেখ করেছেন। এবং যদি পাণিনি থেকে অন্ততঃ ৫০০ বছরের মধ্যেকার লোক হন তাহলে ভারতে ব্যাকরণশাস্ত্র যে কমপক্ষে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে শুরু হয়েছিল তা মানতেই হবে। তবে কি একথা স্বীকার করব যে Aryan barbarianরা ভারত আক্রমণের কিছু পরেই ব্যাকরণশাস্ত্রের মতো এক জটিল বিষয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিল? আর একটা দিক দিয়ে ব্যাপারটাকে পরীক্ষা করা যাক্। বুদ্ধের কিছু পরের সময়কার পালি গ্রন্থে রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, তক্ষশিলা ইত্যাদি শহর অত্যন্ত জনাকীর্ণ, উন্নত এবং sophisticated শহর হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। তবে কি একথা কল্পনা করা অন্যায় হবে যে রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী ইত্যাদি শহর বুদ্ধের অন্ততঃ কয়েক'শ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। যদি শ্রাবস্তী বা রাজগৃহের তৈরী হবার সময় ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ হয় তাহলে এদের চেয়েও অনেক প্রাচীন বলে বর্ণিত কাশী, অযোধ্যা, ইন্দ্রপ্রস্থ, শাকল, মাহিষ্মতী ইত্যাদি শহর কবে গড়ে উঠেছিল? পালি গ্রন্থ পড়লেই বোঝা যায় যে বুদ্ধের সময় ইন্দ্রপ্রস্থ, শাবল ইত্যাদি নগর মানুষের স্মৃতির মধ্যেই জাগরূক ছিল। কাশীর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কারণ প্রকৃতপক্ষে তার ধ্বংস কোনোদিনই হয় নি। যাঁরা ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ঋগ্বেদের রচনকাল ধরেন তাঁদের উত্তর দিতে হবে ঠিক কবে এই শহরগুলি গড়ে উঠেছিল। অন্য আর একটি দিক দিয়ে প্রশ্নটি বিচার করা যাক্। মহাভারত-রামায়ণ-পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র বংশের অনেক রাজার নাম ও কীর্তিকলাপের কাহিনী জানা যায়। এঁদের মধ্যে অনেক রাজার নামের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যেও আছে। এ ছাড়া পালি পিটকে এবং দ্বিতীয় শতকের বাশিষ্ঠীপুত্র পুলুমায়ির এক শিলালিপিতে বেশ কিছু চন্দ্র ও সূর্য বংশের খ্যাতনামা রাজার নাম আছে। এঁরা সবাই বুদ্ধের বহু আগের মানুষ হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। ঋগ্বেদকে ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের গ্রন্থ হিসেবে ধরলে এঁদের সবাইকেই কাল্পনিক চরিত্র হিসেবে উপেক্ষা করতে হবে। ভারতের বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা যাঁর আছে তিনি তা পারবেন না।

গণেশ-প্রসঙ্গে এ ধরনের আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয় জেনেও এত কথা বলতে বাধ্য হলাম। সমস্ত প্রশ্নটি অবশ্য এত জটিল ও ব্যাপক এবং এত ধরনের সমস্যার সঙ্গে জড়িত যে কয়েক লাইনে বা কয়েক পৃষ্ঠায় তার আলোচনা সম্ভব নয়। হরপ্পার লিপির সঠিক পাঠোদ্ধার হয়তো এ প্রশ্নটির ওপর নতুন

আলোকপাত করবে। কিন্তু তার আগে কোনো বদ্ধমূল ধারণা মাথায় রেখে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়ার বিপদ অনেক।

আবার গণেশ-প্রসঙ্গে আসা যাক, কালিদাস ও গুপ্তযুগের শিলালিপিতে গণেশের উল্লেখ না থাকায় অনেকে এঁকে বহু পরের যুগের দেবতা হিসেবে কল্পনা করেন। কিন্তু এই ধরনের চিন্তা ঐতিহাসিকদের পক্ষে নিতান্তই বিপজ্জনক। আমাদের সাহিত্য ও শিলালিপিগুলির চরিত্রের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে অপ্রাসঙ্গিক কিছু এগুলির মধ্যে সহজে থাকে না।

যাই হোক, ওপরের আলোচনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগের পূর্বেকার সময়েও গণপতি বা বিনায়কের কথা জানা ছিল। অবশ্য তাঁর জনপ্রিয়তা শিব, বিষ্ণু, স্কন্দ, সূর্য বা দুর্গার তুলনায় যৎসামান্যই ছিল। এ প্রসঙ্গে ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দের চীনদেশে প্রাপ্ত এক হস্তিমুণ্ড গণেশের কথা উল্লেখ করতে হয়। যদি ঐ সময় সুদূর চীনদেশে গণেশপূজা প্রচলন ছিল তবে কি তাঁকে অর্বাচীন দেবতা ভাবা সমীচীন হবে? চতুর্থ শতকের সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ শিলালিপিতে আর্যাবর্তের এক রাজা গণপতিনাগের উল্লেখ হয়েছে। উত্তর ভারতের একাধিক স্থানে এই রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রাও পাওয়া যায়। এই রাজার নাম থেকে ও প্রমাণিত হয় যে হাতীর গণপতির সঙ্গে সম্পর্ক চতুর্থ শতকের পরের নয়। বরং এর কয়েকশ বছর আগের হওয়াই স্বাভাবিক। একমাত্র অত্যন্ত পরিচিত দেবতা না হলে কোনো রাজা তাঁর ছেলের নাম সেই দেবতার নামানুসারে রাখবেন তা আশা করা যায় না। এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই কারুর সন্দেহ থাকতে পারে না যে গণপতিনাগের নাম গজমুণ্ড গণপতির নামানুসারেই হয়েছিল। গণপতিনাগের নামের পেছনে যে এক ধর্মীয় ব্যাপার আছে তা রায়চৌধুরী ও গেটী উভয়েই স্বীকার করেন। যদি এলাহাবাদ শিলালিপির আনুমানিক সময় ৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ হয় তাহলে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত গণপতিনাগের জন্ম আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল সে কথা বিশ্বাস করায় কোনো অসুবিধে নেই। সুতরাং এ ৩০০ খৃষ্টাব্দে ছেলের নামকরণের সময় গজমুণ্ড গণপতির কথা অবশ্যই গণপতিনাগের পিতার জানা ছিল। আমরা একটু আগেই বলেছি যে অত্যন্ত পরিচিত না হলে কোনো রাজা বা কেউই তাঁর ছেলের নাম সেই দেবতার নামানুসারে রাখবেন না। অতএব একথা ভাবা অন্যায় হবে না যে গজমুণ্ড দেবতা গণেশের যাকে বলে conception রাজা গণপতিনাগের জন্মের অন্ততঃ দুশ বছর আগে ছিল। সুতরাং খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে গজমুণ্ড গণেশের আবির্ভাব ভাবতে কোনো কল্পনা করতে হবে না।

গুপ্তযুগের পর থেকেই গণপতির পুজোর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আফগানিস্থান থেকে জাপান সর্বত্রই তাঁর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আমরা একটু আগেই বলেছি যে চীনের সর্বপ্রাচীন গণেশমূর্তিটি ৫৩১ খ্রীষ্টাব্দের। জাপানে নবম শতক থেকে গণেশের পুজোর প্রচলন সুরু হয়। ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, বার্মা, সিংহল সর্বত্রই অসংখ্য গণেশের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। গেটির মতে গণেশ হলেন 'the most universally adored of all the Hindu Gods'। তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল যা তাঁকে সবার কাছেই সমান জনপ্রিয় করেছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন সবাই গণেশকে নিজের দেবতা বলে দাবী করেছেন। রাজস্থানের যোধপুর জেলায় প্রাপ্ত নবম শতকের এক শিলালিপিতে বণিকদের সঙ্গে গণপতির নিগূঢ় যোগের কথা প্রথম জানতে

পারা যায়। এরপর থেকেই তিনি প্রধানতঃ বণিকদের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছেন। কিন্তু সোমদেবের কথাসরিৎসাগর পড়লে সন্দেহ থাকে না যে বিদ্যার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে Dowinigoes paes এর ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে পতিতারাও তাঁর পূজা করত। মনে হয় সিদ্ধিদাতা হিসেবেই তিনি তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। প্রাচীন বা অর্বাচীন কোনো পুরাণেই অবশ্য গণপতির সঙ্গে গণিকাদের যোগের কথা বলা হয় নি।

সোমদেব তাঁর গ্রন্থে দুটো নতুন খবর দিয়েছেন। একটি হোলো গণেশঠাকুরের সম্মানে মালবদেশে যাত্রোৎসবের কথা (৭৩·৩২৭) আর অন্যটি কাশ্মীরে গণেশপুজোর কথা (৭৩·১১৬) যার সমর্থন মেলে কলহণের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থে (গ্রন্থে) ৩·৩৫২) এ ছাড়া সাপের সঙ্গে গণেশের যোগের কথা যা সোমদেব বলেছেন (৫৫·১৬২ ; ৭৩·৩২৫) তার সাম্য গণেশের বহু প্রাচীন মূর্তিতে আছে। বর্তমান লেখকের ধারণা শিবের সঙ্গে গণেশের যোগ ছিল বলেই কবিদের পক্ষে তাঁর সর্পালাংকৃত মূর্তি কল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল। কিংবা এমনও হতে পারে যেহেতু হাতীর আর এক নাম 'নাগ' এবং এই নাগের অন্য অর্থ সাপ, সেহেতু নাগমুণ্ড গণপতির সঙ্গে সাপের যোগ ভাবা সহজ হয়েছিল। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত সপ্তম শতকের সুবিখ্যাত গণেশমূর্তিটিতে একটি সম্পূর্ণ সাপ যজ্ঞোপবীত হিসেবে দেখানো হয়েছে। আমরা গণপতির সঙ্গে বিদ্যার যোগের ব্যাপারটা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি। বৈদিক দেবতা বৃহস্পতি বা ব্রহ্মশক্তিকে অনেক সময় 'গণপতি' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এই বৃহস্পতি বেদে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দেবতা হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। আমাদের ধারণা মহাভারতে বা বাণভট্টের হর্ষচরিতে যে গণপতিকে জ্ঞানের দেবতা বলা হয়েছে তার মূলে রয়েছে বৃহস্পতির চরিত্রের প্রভাব। বৌদ্ধায়ন ধর্মগ্রন্থে গণপতির অনেক নামের মধ্যে একটা নাম হোলো 'বীর'। মৎস্যপুরাণে বিনায়কের মূর্তির বর্ণনার পরেই 'বীরেশ্বর' নামে যে দেবতার মূর্তির কথা বলা হয়েছে আমাদের ধারণা তিনি গণেশেরই অন্য এক পার্ষদ দেবতা। মৎস্যপুরাণের মতে (২৬১·৩৯) এঁর দুই হাতে থাকবে বীণা এবং ত্রিশূল। এই মূর্তির বর্ণনা পড়লে আমাদের বীণাহস্তা সরস্বতীর কথাই মনে পড়ে এবং সেই সঙ্গে গণপতির সঙ্গে সরস্বতীর চরিত্রের সাদৃশ্য সকলের নজরে না পড়ে থাকবে না। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশখণ্ডে যাঁকে 'জ্ঞানরাশিস্বরূপিণম্' বলে সম্মান করা হয়েছে তাঁর হাতে বীণা থাকা কিছু বিচিত্র নয়। নারদপুরাণে এই গণপতির পুজো করলে 'বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাম্' এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

গণপতির এই আলোচনায় গাণপত্যদের কথা আমরা ইচ্ছে করেই বলিনি। সে আলোচনা অনেকেই করেছিল। গণপতি যে শুধুমাত্র গুপ্তোত্তর যুগের দেবতা ছিলেন না এবং তাঁর চরিত্রের মধ্যে অসাধারণ জটিলতা ছিল তাই দেখানোর জন্যই এই প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত হয়েছিলাম। লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে তিনি যেন দুবাহু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন। হিতোপদেশের সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকাংশটিকে মনে পড়ে— 'অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ'

গণেশের চরিত্রে বিদ্যা ও অর্থের এই ওতপ্রোত মিলনের জন্য তাঁর জনপ্রিয়তা কিছুমাত্র কমেনি। বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি আমাদের স্বপ্ন ও সাধনাকে একই সঙ্গে আকর্ষণ করেছেন।

দিব্যায়ন—শ্রীঅরবিন্দ-স্মারকগ্রন্থ। মুখ্য সম্পাদক মনোমোহন দত্ত। মেদিনীপুর জেলা শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সমিতি। প্রাপ্তিস্থান শ্রীঅরবিন্দ-পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছিলেন, স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি। তিনি শ্রীঅরবিন্দ। যে-স্বদেশের প্রতি প্রেমে বাইরের মুক্তি চেয়েছিলেন, সেই স্বদেশের প্রতি ধ্যানে খুঁজেছিলেন অন্তরের মুক্তি। জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং জীবনেরই কেন্দ্রে সুস্থিত হওয়া। প্রথমটিতে রাজনৈতিক চরমপন্থায়, দ্বিতীয়টিতে আধ্যাত্মিক যোগপন্থায়। এবং নিঃসন্দেহে দ্বিতীয়টি গভীরতর সাধনা। জড় ও চৈতন্য সত্তার শেষ প্রান্তে যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে, প্রথমে সেই পূর্ণানুভূতির সন্ধান; তারপর পরমাত্মায় আরোহণ, অবশেষে পরমাত্মার ঐশ্বর্যসম্ভার নিয়ে জীবনের মধ্যে জ্যোতি-শক্তি-আনন্দ নামিয়ে এনে জীবনের রূপান্তর ঘটানো। যে-জীবনকে নির্জ্ঞান বলে মনে হচ্ছে তার ভেতরও আছে দিব্য সম্ভাবনা। যে-জগৎকে নিরর্থক বলে ভাবছি, তাও আসলে এক আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্র। এই ক্রম-বিকাশের পথেই জড়-নির্জ্ঞান অবস্থা থেকে ক্রমে দিব্যচেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে চারিদিকে। মনের ওপরে রয়েছে অতি মানস। মন সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, অতি মানস সেই সত্যেরই স্বপ্রতিষ্ঠ উপলব্ধি। জীবনের মধ্যে অতি মানসের যোগেই পরিপূর্ণতার স্বপ্ন সফল হতে পারে। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের সুচেতনা-দৃষ্টি। বন্দেমাতরমের আন্দোলন থেকে লাইফ ডিভাইনের সিদ্ধিসৌকার্যে এমনি তাঁর উত্তরণ।

তাঁরই জন্মের শততম জয়ঘোষণা হোলো সম্প্রতি। প্রায় অস্ফুটস্বরে। এবং অনেকেরই অজানিতে তা পার হয়ে গেল। তবু এরই মাঝখানে 'দিব্যায়ন' নামে একখানি মহার্ঘ স্মারকগ্রন্থ উপহার দিলেন মেদিনীপুর জেলা শ্রীঅরবিন্দ-জন্মশতবার্ষিকী সমিতি। মহার্ঘ, কারণ শ্রীঅরবিন্দের জীবন ও সাধনার নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে নানা সুধীজনের দৃষ্টি এতে মিলেছে, বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধগুলির ভেতর দিয়ে সহজ পাঠ ও বোধোদয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে। সম্পাদক আগাগোড়া যত্নশীল, প্রচ্ছদের বর্ণব্যঞ্জনা থেকে প্রবন্ধের পরিচয়দান অবধি সর্বত্র তাঁর নিষ্ঠার প্রকাশ।

বিপ্লবী-জীবন ও সাধক-জীবন মিলিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে সামগ্রিক স্বরূপে তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে। সে সঙ্গে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে প্রতিতুলনায় তাঁর বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিচারিত হয়েছে ভারতীয় মনোবিজ্ঞান ও নানা শাস্ত্র-পন্থার বিকাশের সূত্রে তাঁর অভিনিবেশ ও সমন্বয়সাধনের কৃতিত্ব। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি অসাধারণ রচনার কথা অবশ্যই মনে পড়বে—যেমন, ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীঅরবিন্দ,' স্বামী লোকেশ্বরানন্দের 'Swami Vivekananda and Sri Aurobindo', অনির্বাণের

'শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন', শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীঅরবিন্দের বেদভাষ্য', শ্যামাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'অদ্বৈততত্ত্ব—আচার্য শঙ্কর ও শ্রীঅরবিন্দ', কে. বাগচীর 'The Philosophy of Evolution in Sri Aurobindo ও এন. কে. দাশগুপ্তের 'Depth Psychology and Sri Aurobindo'। সমকালীন ঘটনাধারার যোগে শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক সত্তার সম্যক্ পরিচয়টি বিশদ করেছেন মণি বাগচী, হিমাংশুভূষণ সরকার ও হরিপদ মণ্ডল। তাঁর সাহিত্য ও নন্দন-চেতনার আলোচনায় সুধা বসু, সুধীরকুমার নন্দী ও এস. পি. সেনগুপ্তের প্রবন্ধ তিনটি যথার্থ মূল্যবান। মুখ্য সম্পাদক তাঁর আলোচনায় ব্যক্তি শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্ত নিহিতার্থে উত্তরণের যোগপথটি নির্দেশ করে সংকলনের পূর্ণতা দিয়েছেন।

এর পরও একটি উল্লেখ বাকি থেকে যায়। নলিনীকান্ত গুপ্তের লেখা ছোট্ট ও নিটোল রচনাটি। আলাদা করে বললুম এজন্যে যে, নলিনীকান্তের স্নিগ্ধগভীর রচনা পড়া সব সময়েই এক প্রসন্ন অভিজ্ঞতা!

দেশব্রত চক্রবর্তী